পরিবেশ

সম্পাদনা

অধ্যাপক রথীন্দ্রনারায়ণ বসু

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

২০০১

মূল্য : ১০০.০০ টাকা

শ্রী প্রদীপ কুমার ঘোষ, সুপারিনটেনডেন্ট, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস,
৪৮, হাজরা রোড, কলিকাতা - ৭০০ ০১৯ কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

অধ্যায় রচয়িতাবৃন্দ

প্রথম অধ্যায়	পরিবেশের মৌল রূপরেখা	অধ্যাপক তারকমোহন দাস প্রাক্তন অধ্যাপক, কৃষি কলেজ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
দ্বিতীয় অধ্যায়	প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক প্রক্রিয়াসমূহ	অধ্যাপক পীযুষকান্তি সাহা উপাচার্য, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, অধ্যাপক, ভূগোল বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (অনুবাদক : শ্রী লক্ষ্মীনারায়ণ সৎপতি, লেকচারার, ভূগোল বিভাগ, বেলুড় লালবাবা কলেজ)
তৃতীয় অধ্যায়	পৃথিবীর ভূমি ও জল সম্পদ	অধ্যাপক পীযুষকান্তি সাহা (অনুবাদক : শ্রী লক্ষ্মীনারায়ণ সৎপতি)
চতুর্থ অধ্যায়	বাস্তুতন্ত্র	অধ্যাপক শুভেন্দু মুখার্জী অধ্যাপক, উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও অধ্যাপক নরেশচন্দ্র দত্ত প্রাক্তন অধ্যাপক, প্রাণিবিদ্যা বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
পঞ্চম অধ্যায়	জনসংখ্যা ও পরিবেশ	অধ্যাপক প্রবুদ্ধনাথ রায় প্রাক্তন সহ-উপাচার্য (শিক্ষা), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, প্রাক্তন অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
ষষ্ঠ অধ্যায়	শক্তির উৎসসমূহ	অধ্যাপক দিলীপকুমার বসু প্রাক্তন উপাচার্য, বর্দ্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, অধ্যাপক, ফলিত পদার্থবিদ্যা বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও অধ্যাপক দীপন ভট্টাচার্য অধ্যাপক, সাহা ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স, কলিকাতা

সপ্তম অধ্যায়	**বায়ু, শব্দ ও গন্ধ দূষণ**	**ডঃ জ্যোতিপ্রকাশ ঘোষ** সভাপতি, পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা সংসদ, প্রাক্তন অধ্যক্ষ, শেঠ আনন্দরাম জয়পুরিয়া কলেজ, কলিকাতা
অষ্টম অধ্যায়	**দূষণ এবং বর্জ্যপদার্থ ব্যবস্থাপন**	**অধ্যাপক বিনয়কান্তি দত্ত** অধ্যাপক, কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও **অধ্যাপক সুদীপকুমার ব্যানার্জী** অধ্যাপক, জীব-রসায়ন বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
নবম অধ্যায়	**পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্য**	**ডঃ অমিয় কুমার হাটি** প্রাক্তন অধিকর্তা, স্কুল অব ট্রপিকাল মেডিসিন, কলিকাতা
দশম অধ্যায়	**পরিবেশনীতি, আইনী ব্যবস্থা, পরিবেশ আন্দোলন এবং পরিবেশগত নৈতিকতা**	**অধ্যাপক প্রবুদ্ধনাথ রায়** প্রাক্তন সহ-উপাচার্য (শিক্ষা), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, প্রাক্তন অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় **ডঃ ঈশিতা মুখার্জী** রীডার, অর্থনীতি বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় **ডঃ রত্নাবলী চ্যাটার্জী** সাম্মানিক অধিকর্তা, উইমেনস্ স্টাডিজ রিসার্চ সেন্টার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। রীডার, ইসলামিক হিস্ট্রি বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও **ডঃ শ্যামল চক্রবর্তী** রীডার, রসায়ন বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
	প্লসারি (Glossary)	**অধ্যাপক রথীন্দ্র নারায়ণ বসু** প্রাক্তন উপাচার্য, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। অধ্যাপক, কৃষি কলেজ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

সূচীপত্র

ভূমিকা

ভূমিকা

পরিবেশ বলতে আমাদের পারিপার্শ্বিক প্রায় সব কিছুই বোঝায়। সামগ্রিক বাস্তুতান্ত্রিক পর্যালোচনায় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রাকৃতিক জগৎ ছাড়াও মানুষের গড়া বর্তমান প্রযুক্তিগত জগৎ (technosphere) এমনকি তার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়গুলিও এসে পড়ে।

আধুনিক মানুষ "হোমো স্যাপিয়েন্স" (*Homo sapiens*) পৃথিবীতে আসার বহু আগেই পৃথিবীর পরিবেশ জীবনের সৃষ্টি ও প্রসারের উপযুক্ত হয়ে গড়ে উঠেছিল। তারপর বহুকোটি বছরের জৈব বিবর্তনের শেষ ধাপে এসে পৌঁছলো দুপায়ে সোজা দাঁড়াতে-চলতে-দৌড়াতে সক্ষম কিন্তু তীক্ষ্ণ নখদন্তবিহীন আমাদের পূর্বসূরীরা, যারা বুদ্ধির জোরে পৃথিবীতে মানুষের আধিপত্য কায়েম করে নিল।

বিভিন্ন ভূ-তাত্ত্বিককালে পরিবেশের আমূল পরিবর্তন হয়েছে কিন্তু সে সবই ছিল প্রাকৃতিক। আর আজ যা সারা বিশ্বকে ভাবিয়ে তুলেছে তা হলো মনুষ্যসৃষ্ট পরিবেশ সংকট যার মোকাবিলা করতে না পারলে বর্তমান সভ্যতা নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে। পরিবেশ সমস্যা নিয়ে উদ্বেগ আগে ছিল মোটামুটিভাবে আঞ্চলিক, বর্তমানে কিন্তু এর জাগতিক প্রভাব খুবই চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে—বিশেষ ক'রে ভূ-পৃষ্ঠের ও আবহমণ্ডলের উষ্ণতামাত্রা বৃদ্ধি এবং তার ফলশ্রুতি হিসাবে জলবায়ু, বাস্তুতন্ত্র, কৃষি ইত্যাদিতে সম্ভাব্য পরিবর্তন এবং এসবের সাথে জড়িত নানা ধরনের জটিল সমস্যা।

মানুষ যতদিন শিকারী-সংগ্রহকারী (hunter-gatherer), যাযাবর-রাখাল (nomadic pastoral) অথবা স্থায়ী কৃষি (settled agriculture)-জীবনে অভ্যস্ত ছিল ততদিন তারা পরিবেশ অবক্ষয়ের জন্য খুব একটা দায়ী ছিল না। অর্থনৈতিক বনিয়াদ শক্ত করতে শিল্প-কলকারখানা গড়ে ওঠার সময় থেকেই এই অবক্ষয় শুরু হয়, মোটামুটিভাবে ইয়োরোপের শিল্প বিপ্লবের প্রারম্ভ থেকে। উন্নত, আরো—আরো বেশি—উন্নতমানের জীবনযাত্রার জন্য বহু ধরনের ভোগ্যপণ্যের যোগান দিতে গিয়ে অনিয়ন্ত্রিতভাবে জীবাশ্ম জ্বালানীর ব্যবহার আবহমণ্ডলে কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ বাড়িয়ে চলেছে যা শুষে নেবার প্রধান মাধ্যম সবুজ উদ্ভিদের অরণ্য আমরা জ্বালানী এবং অন্যান্য কাজের জন্য কাঠের প্রয়োজনে কেটে ফেলছি। এছাড়াও ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার জন্য খাদ্য উৎপাদনের প্রয়োজনে অরণ্য নিধন করে কৃষি আবাদ বাড়ানো হচ্ছে। এই কার্বন ডাইঅক্সাইডই মুখ্য গ্রীনহাউস গ্যাস—যা ভূ-পৃষ্ঠ এবং আবহমণ্ডলের উষ্ণতা বৃদ্ধির প্রধান কারণ। গাড়ী-বাড়ী ইত্যাদির তাপ নিয়ন্ত্রণ করবার জন্য এয়ার কন্ডিশনার (air conditioner) এবং গৃহস্থালী ও শিল্পে রেফ্রিজারেশন (refrigeration)-এর জন্য, ইলেকট্রনিক সারকিট (electronic circuit) পরিষ্কার রাখবার জন্য এবং প্রসাধন দ্রব্য বা কীটনাশক পদার্থ স্প্রে (spray) করবার জন্য এবং অন্যান্য কাজে ক্লোরোফ্লুরো কার্বন (CFC) যৌগদের ব্যবহার ও নির্গমন এবং অন্যান্য ওজোন ধ্বংসকারী গ্যাসীয় পদার্থের নির্গমন এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে শান্তমণ্ডল (stratosphere)-এ ওজোন গহ্বর (ozone hole) ক্রমাগত প্রসারিত হচ্ছে। বর্তমান বছরের (2000 A.D.) সেপ্টেম্বরের 9 এবং 10 তারিখে, দক্ষিণ চিলির পুন্টা এরেনাস (Punta Arenas) নামে একটি শহর এই ওজোন গহ্বরের ঠিক নীচে এসে গিয়ে সূর্যের ক্ষতিকর অতিবেগুনী রশ্মির শিকার হয়েছিল। এই সময় ওই ওজোন গহ্বরের আয়তন ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তিনগুণের উপর। বাতাসে সালফার ডাইঅক্সাইড এবং নাইট্রোজেন অক্সাইডের নির্গমনের ফলে অ্যাসিড বৃষ্টি বহু অঞ্চলের ক্ষতিসাধন করেছে। আমাদের গৃহস্থালী ও শিল্পজাত কঠিন ও তরল বর্জ্য পদার্থ, বাতাসে যানবাহন ও শিল্প নির্গত গ্যাসীয় পদার্থের মাত্রাতিরিক্ত নির্গমন, ব্যাপক হারে অরণ্য ধ্বংসে ইত্যাদির ফলে প্রকৃতির ভারসাম্য এখন বিপর্যস্ত হয়ে ভেঙ্গে পড়ার মুখে। পরিবেশের এই অবক্ষয় তাই এখন আর শুধুমাত্র বিশেষজ্ঞদের আলোচনার বিষয়বস্তু নয়—পরিবেশ দূষণ আজ জনসাধারণের সুস্থ স্বাভাবিক জীবনযাপনের ও নিরাপত্তার প্রশ্ন হিসাবে এসে গেছে এবং বিভিন্ন ধরনের সংবাদমাধ্যম সঠিকভাবেই তা জনসমক্ষে তুলে ধরছে।

একথা অনস্বীকার্য যে শিল্পবিপ্লবের সময় থেকে বিশেষ করে বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহার জীবনযাত্রায় যে পরিবর্তন এনেছে আমাদের কৃষিজীবি পূর্বসূরীদের তা ছিল কল্পনার অতীত। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় প্রযুক্তির এই অভাবনীয় অগ্রগতি বহুক্ষেত্রে পরিবেশের অবক্ষয় ত্বরান্বিত করেছে। পারমাণবিক শক্তির সামরিক ব্যবহার এর বড় উদাহরণ। এমনকি পরমাণুশক্তির অসামরিক ব্যবহারেও বিপদের যথেষ্ট ঝুঁকি রয়েছে, তাছাড়াও আছে তেজস্ক্রিয় বর্জ্যের অপসারণ ও ব্যবস্থাপনের কঠিন ও জটিল সমস্যা। কৃষিক্ষেত্রে অধিক ফসলের জন্য অতিমাত্রায় ক্ষতিকারক রাসায়নিক পদার্থের ব্যবহার, রোগজীবাণুবাহী পোকামাকড় নাশক বিষাক্ত রাসায়নিকের মাত্রাতিরিক্ত প্রয়োগ, দীর্ঘস্থায়ী জৈবদূষক সমূহের (persistent organic pollutants) জৈব বিবর্ধন (biomagnification) ইত্যাদির ফলে বাস্তুতন্ত্র ও জনস্বাস্থ্য আজ চরম বিপদের সম্মুখীন হয়ে পড়েছে।

আমাদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে ও সীমাহীন চাহিদা মেটানোর জন্য ভাবী প্রজন্মের মারাত্মক ক্ষতিসাধন করতেও আমরা কুণ্ঠিত নই। সমগ্র জীবজগতে সমস্ত প্রাণীদের মধ্যে সবচাইতে বুদ্ধিমান প্রাণীর এই সংকীর্ণতা, স্বার্থপরতা এবং চূড়ান্ত নির্বুদ্ধিতা সত্যিই আশ্চর্য্যজনক এবং নিশ্চিতভাবেই অদূর ভবিষ্যতে অমার্জনীয় অপরাধ বলে গণ্য হবে।

পরিবেশবিদ ও দার্শনিকদের মধ্যে যারা জীবকেন্দ্রিক (biocentric) মতবাদে বিশ্বাসী তাঁদের বক্তব্য পুরোপুরি মেনে না নিলেও পৃথিবী এবং তার পরিবেশ সম্পর্কে শুধুমাত্র মানবকেন্দ্রিক (anthropocentric) মানসিকতা গ্রহণ একান্তভাবেই অনৈতিক।

পরিস্থিতি যাই হোক না কেন, আমাদের কিন্তু নিরাশ হওয়ার কোন অবকাশ নেই। মানুষের নিজের সৃষ্টি এই দূষণের প্রতিকার মানুষকেই করতে হবে। বেশ কিছু প্রচেষ্টার মাধ্যমে অনিয়ন্ত্রিত গ্যাসীয় পদার্থ নির্গমনের উপর নিষেধাজ্ঞা চালু করে পৃথিবীতে অনেক দেশে অ্যাসিড বৃষ্টি কমিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে মূলতঃ আবহমণ্ডলে সালফার ও নাইট্রোজেন অক্সাইডদের নির্গমন উপযুক্ত প্রযুক্তির দ্বারা উৎসেই হ্রাস করার ফলে। ঐতিহাসিক স্মৃতিসৌধগুলির তথাকথিত "স্টোন ক্যানসার" (stone cancer) এই গ্যাসগুলিকে নিয়ন্ত্রণের ফলে অনেক কমে গেছে—আমাদের তাজমহলও তাই এখন আগের চাইতে বেশি নিরাপদ। নদীতে দূষিত পৌরবর্জ্য এবং অশোধিত শিল্পবর্জ্য নিষ্কাশন কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণের ফলে শতবর্ষ পরে টেম্‌স্ নদীতে স্যামন মাছ ফিরতে শুরু করেছে। আমাদের গঙ্গা নদীতেও অশোধিত বর্জ্য নিষ্কাশন নিষিদ্ধ করা হয়েছে। বহু বর্জ্য পদার্থের পুনরাবর্তন ও পুনর্ব্যবহার এখন সারা পৃথিবীতেই চালু হয়েছে এবং সরকারীভাবে উৎসাহ ও সমর্থন পেয়ে চলেছে। কৃষিতে অতিমাত্রায় রাসায়নিক সার, কীট-ছত্রাক-আগাছা-নাশক ইত্যাদির ব্যবহারের কুফল বুঝতে পেরে জৈব সার, ভেষজ রসায়ন ইত্যাদির উপর জোর দেওয়া হচ্ছে। তবুও পরিবেশকে বাঁচাতে হলে আরো অনেক কিছু করবার আছে—দৃঢ় সংকল্প নিয়ে এই দূষণের প্রতিরোধ ও প্রতিকার ছাড়া অন্য কোন পথ নেই।

পরিবেশদূষণরোধে সাফল্যের চাবিকাঠি রয়েছে সচেতন তথ্যসমৃদ্ধ জনগণের কাছে। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে কোন কিছুর প্রতিকার বা প্রতিরোধের প্রথম ধাপই হলো তথ্য সংগ্রহ, তথ্যের আদানপ্রদান এবং তথ্যের সঠিক মূল্যায়ন। উপযুক্ত তথ্য যে শুধুমাত্র তথ্যভিত্তিক আলোচনাকে সমৃদ্ধ করে তাই নয়, তা এমন একটি শক্তিশালী উপাদান যা মানুষকে সংগঠিত এবং যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সাহায্য করে। যদি আইনী ব্যবস্থারও আশ্রয় নিতে হয় সেক্ষেত্রে তথ্যসমৃদ্ধি সবচাইতে বড় হাতিয়ার হিসেবে পরিগণিত হবে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত পরিবেশ নিয়ে লেখা বর্তমান বইটি এই উপলব্ধির রূপায়ণে আমাদের একটি সমবেত প্রচেষ্টা।

পরিবেশের মত এত বহুমুখী বিষয় সম্ভবতঃ আর কিছু নেই। বহু রকম তথ্য এবং ধ্যানধারণা এ বিষয়টি সম্যক বুঝবার পক্ষে সহায়ক। এই বহুমুখিতার জন্য বর্তমান সংকলনটিকে অনেকগুলি শাখার বিশেষজ্ঞদের রচনা দিয়ে সমৃদ্ধ করার চেষ্টা করা হয়েছে। এই শাখাগুলির মধ্যে আছে পরিবেশ বিজ্ঞান, ভৌতবিজ্ঞান, রসায়ন, উদ্ভিদবিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা, ভূ-বিদ্যা,

চিকিৎসাবিদ্যা, প্রযুক্তি ও কারিগরী বিদ্যা, অর্থনীতি, কৃষিবিজ্ঞান, নারীর অধিকার সংক্রান্ত বিষয়, জনবিজ্ঞান ইত্যাদি। রচনাগুলির মূল দৃষ্টিভঙ্গি পরিবেশ রক্ষাভিত্তিক—বিশেষ করে দূষণ প্রতিরোধ ও প্রতিকারমূলক। বেশ কয়েকটি আলোচনাসভা ও ঘরোয়া বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্ত ও মতামতের উপর নির্ভর করে বইটির পরিকাঠামো এবং বিভিন্ন অধ্যায়ে আলোচ্য বিষয়বস্তুগুলি ঠিক করা হয়েছে। এই সংকলনে সব মিলিয়ে দশটি অধ্যায় এবং পরিশেষে পরিবেশ আলোচনায় বহুল ব্যবহৃত কিছু শব্দের একটি ইংরেজী ভাষায় লেখা সংক্ষিপ্ত পরিচিতি দেওয়া হয়েছে "গ্লসারি" (glossary) হিসাবে। এখন এই অংশটি ইংরেজীতে দেওয়া হলেও আমরা আশা করছি পরবর্তী সংস্করণে বাংলা অনুবাদটি দেওয়া সম্ভব হবে—এই কাজটি এখনো কিছুটা অসমাপ্ত থাকার জন্য আমরা দুঃখিত।

প্রথম অধ্যায়—পরিবেশের মৌল রূপরেখা—লিখেছেন অধ্যাপক তারকমোহন দাস। এই অধ্যায়টিতে পরিবেশের সংজ্ঞা ও মূল সূত্রগুলি এবং পরিবেশ অবক্ষয়ের প্রধান কারণগুলি তুলে ধরা হয়েছে যেগুলির বিস্তারিত আলোচনা পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে করা হয়েছে। সেই হিসাবে প্রথম অধ্যায়টি অন্যান্য অধ্যায়ের প্রেক্ষাপট হিসেবে কাজ করেছে। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় অধ্যায়ের রচয়িতা অধ্যাপক পীযূষকান্তি সাহা। দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক প্রক্রিয়াসমূহের সংক্ষিপ্ত আলোচনায় সৌরমণ্ডলীর সৃষ্টিরহস্য, ভূ-স্তর, জলমণ্ডল, আবহমণ্ডল ও জীবমণ্ডলের সৃষ্টি ও বিবর্তন এবং প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদানের ভারসাম্য বজায় রাখার অপূর্ব ব্যবস্থাগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণী দেওয়া হয়েছে। অধ্যাপক সাহা তৃতীয় অধ্যায়ে পৃথিবীর ভূমি ও জলসম্পদ নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং বিশেষ করে ভূমির বিভিন্ন ব্যবহার, জলের সঞ্চয় ও ব্যয় (বাজেট) এবং পৃথিবীর জল সমস্যার উপর আলোকপাত করেছেন। চতুর্থ অধ্যায়ে অধ্যাপক শুভেন্দু মুখার্জি এবং অধ্যাপক নরেশচন্দ্র দত্ত পৃথিবীর বাস্তব্যতন্ত্রের শ্রেণীবিভাগ ও গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করেছেন। বাস্তুতন্ত্রে শক্তিপ্রবাহ এবং পরিবেশ অবক্ষয়ের ফলে শক্তিপ্রবাহে বিঘ্ন ঘটলে যে সংকট দেখা দেবে তার পর্যালোচনা করে অধ্যাপক মুখার্জি এবং অধ্যাপক দত্ত বাস্তুতন্ত্র সংরক্ষণের উপর বিশেষ জোর দিয়েছেন। পঞ্চম অধ্যায়ে অধ্যাপক প্রফুল্লনাথ রায় জনসংখ্যা ও পরিবেশ শীর্ষক আলোচনায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার, বিভিন্ন উন্নয়নস্তরে পৃথিবীর ধারণ বা বহন ক্ষমতা (carrying capacity) এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে পরিবেশ অবক্ষয়ের সম্পর্কের বিষয় নিয়ে লিখেছেন। জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে সচেষ্ট তৃতীয় বিশ্বের উন্নতিকামী দেশগুলিতে পরিবেশ দূষণ নিয়ে কথা বলতে গিয়ে অধ্যাপক রায় অত্যন্ত সঠিকভাবে তাঁদের উভয়সংকটকে সামনে তুলে ধরেছেন। ষষ্ঠ অধ্যায়ে শক্তির উৎসসমূহ সম্বন্ধে লিখেছেন অধ্যাপক দিলীপকুমার বসু এবং অধ্যাপক দীপন ভট্টাচার্য। শক্তি সংগ্রহের ইতিহাস ও বিভিন্ন শক্তি উৎসের তথ্যভিত্তিক পর্যালোচনা ক'রে তাঁদের ভালোমন্দ দুটো দিকই দেখিয়েছেন লেখকেরা। শক্তির অপ্রচলিত এবং পুনর্নবীকরণযোগ্য উৎসসমূহকে ব্যবহারের উপর বেশ জোর দিয়েছেন অধ্যাপক বসু এবং অধ্যাপক ভট্টাচার্য—বিশেষভাবে পরিবেশ দূষণের উপর দৃষ্টি রেখে। ডঃ জ্যোতিপ্রকাশ ঘোষ সহজ ও সাবলীল ভঙ্গিমায় বায়ু, শব্দ ও গন্ধ দূষণের বিষয় লিখেছেন সপ্তম অধ্যায়ে। বায়ুদূষণের কারণ ও দূষণের ক্ষতিকর প্রভাব, গ্রীনহাউস গ্যাস, বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতামাত্রাবৃদ্ধি, জলবায়ুর পরিবর্তন, ওজোন গহ্বর ও তার ফলশ্রুতি নিয়ে আলোচনা ছাড়াও ডঃ ঘোষ শব্দ ও গন্ধদূষণ ও তাঁদের প্রতিকার নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। অষ্টম অধ্যায়ে অধ্যাপক বিনয়কান্তি দত্ত এবং অধ্যাপক সুদীপকুমার ব্যানার্জি দূষণ ও বর্জ্য পদার্থের পরিচালন ও ব্যবস্থাপন নিয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন। আগামী দিনে শিল্পে ও গৃহস্থালীতে ব্যবহারের জন্য জলের অভাব যে হবে সেটা প্রায় নিশ্চিতভাবেই বলা যায়। তাই বর্জ্য জলের শোধন একান্তই জরুরী। কঠিন ও গ্যাসীয় বর্জ্যের নির্গমন উৎসেই যাতে কমানো যায় সেই প্রযুক্তি নিয়েও তাঁরা আলোচনা করেছেন। দীর্ঘস্থায়ী জৈব দূষকের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে লেখকেরা এদের সীমিত ব্যবহার বা পুরোপুরি বর্জনের কথা বলেছেন। নবম অধ্যায়ে ডঃ অমিয়কুমার হাটির রচনার বিষয়বস্তু হলো পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্য। যে সব অসুখবিসুখ পরিবেশের সাথে জড়িত তাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এবং সম্ভাব্য প্রতিরোধের কথা বলা হয়েছে। ডঃ হাটি সঠিকভাবেই বলেছেন যে আগে থেকে সাবধান হয়ে স্বাস্থ্যহানি যাতে না ঘটে তার ব্যবস্থা করাটা অসুখ হলে চিকিৎসার চাইতে ভালো, তাই বিশেষভাবে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থাপনের

কথা তিনি লিখেছেন। দশম ও শেষ অধ্যায়ের বিষয়বস্তু পরিবেশনীতি, আইনী ব্যবস্থা, পরিবেশ সুরক্ষা নিয়ে আন্দোলন এবং পরিবেশ সংক্রান্ত কাজকর্মে ন্যায় ও নৈতিকতার প্রশ্ন। লেখকেরা হলেন অধ্যাপক প্রবুদ্ধনাথ রায়, ডঃ ঈসিতা মুখার্জি, ডঃ রত্নাবলী চ্যাটার্জি এবং ডঃ শ্যামল চক্রবর্তী। রচয়িতারা আমাদের দেশের পরিবেশ নীতির পর্যালোচনা করেছেন এবং এখন পর্যন্ত পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ নিয়ে যে সব আইনকানুন করা হয়েছে সেগুলির উল্লেখ করেছেন। নারী ও পরিবেশ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে লেখকেরা বলেছেন পরিবেশ দূষণের ফলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকেন মহিলারা, বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলের মহিলারা। লেখকেরা আমাদের দেশের তিনটি পরিবেশভিত্তিক আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়েছেন এই অধ্যায়ে।পরিশেষে পরিবেশ ও নৈতিকতার প্রশ্ন নিয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করা হয়েছে আমাদের এই শেষ অধ্যায়টিতে। এই সংকলনে ইংরেজী ভাষায় লিখিত সংক্ষিপ্ত পরিশিষ্টটি দেওয়ার উদ্দেশ্য পরিবেশসংক্রান্ত কোন শব্দের অর্থ ও পরিচয়টা চট করে জেনে নেওয়া। অনেক সময় পরিবেশ আলোচনায় বহুল ব্যবহৃত শব্দের সঠিক পরিচয় না জানার ফলে সহজ জিনিষও বুঝতে অসুবিধা হয়। তবে আগামী দিনে এটির বাংলা অনুবাদ হয়তো পাঠকের পক্ষে আরো সুবিধার হবে।

এই বইটিতে আমরা চেষ্টা করেছি যতটা সম্ভব বিষয়গুলির পুনরাবৃত্তি না করার—তবে বিভিন্ন অধ্যায়ে বিষয়বস্তুর মোটামুটি পূর্ণাঙ্গ স্বনির্ভর আলোচনার জন্য সব সময় সেটা করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি।

সম্পাদক হিসাবে আমি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক আশিসকুমার ব্যানার্জি, সহ-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপিকা সুরভি ব্যানার্জি এবং সহ-উপাচার্য (অর্থ) অধ্যাপক হিরণকুমার ব্যানার্জিকে তাঁদের সহযোগিতার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমাদের অধ্যায়রচয়িতাদের সাহায্য ও সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জানানো ছাড়াও ব্যক্তিগতভাবে আমি তাঁদের এই অবদানের জন্য কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। প্রাক্তন সহ-উপাচার্য (শিক্ষা) ও বর্তমানে রাজ্য পরিকল্পনা পর্ষদের সদস্য অধ্যাপক প্রবুদ্ধনাথ রায় আমাদের দুটি অধ্যায় রচনার সাথে যুক্ত—এছাড়াও বহুভাবে তিনি আমাদের সাহায্য করেছেন সেজন্য তাঁকে সবিশেষ ধন্যবাদ জানাই। অধ্যাপক তারকমোহন দাসের কাছ থেকে বিভিন্ন বিষয়ে বহুবিধ সাহায্য পেয়েছি সেজন্য আমরা তাঁর কাছে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। সাহা ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স-এর অধ্যাপক সুশ্মিল সেন আমাদের এই সংকলনে সাহায্যের হাত বাড়িয়েছেন—তাঁকেও আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বেলুড় লালবাবা কলেজের লেকচারার শ্রী লক্ষ্মীনারায়ণ সৎপতি দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ের সম্পূর্ণ অনুবাদ করেছেন তাঁকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। অনুবাদে বিশেষভাবে সাহায্য করেছেন ডঃ ঈসিতা মুখার্জি সেজন্য তাঁকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সেই সাথে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক অলোককুমার ভৌমিককেও অনুবাদে সাহায্য করার জন্য ধন্যবাদ জানাই। আমার বেশ কয়েকজন প্রাক্তন ও বর্তমান গবেষক ছাত্র-ছাত্রী বিভিন্নভাবে আমাদের এই সংকলনে সাহায্য করেছেন—যাদের মধ্যে আছেন ডঃ প্রতিভা পাল, ডঃ অলক কুমার মণ্ডল, ডঃ কল্পনা সুর, ডঃ ডলি রুদ্রপাল, ডঃ সুজিত কুমার রায় এবং শ্রী বিজয়কুমার দে—তাঁদের সহযোগিতার জন্য আমি তাঁদের প্রত্যেককে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসের ভারপ্রাপ্ত তত্ত্বাবধায়ক শ্রী প্রদীপকুমার ঘোষ যথেষ্ট দ্রুততার সাথে এই সংকলন প্রকাশ করেছেন সেজন্য তাঁকে আমরা ধন্যবাদ জানাই।

এই সংকলনটির ভুলভ্রান্তির পূর্ণ দায়িত্ব সম্পাদকের। অধ্যায়রচয়িতারা আমাকে পরিমার্জনা ও পরিবর্তনের যে অধিকার দিয়েছিলেন সেই অধিকারে অনেক ক্ষেত্রে তাঁদের লেখায় বেশ কিছু সংযোজন অথবা রচনার সংক্ষিপ্তকরণ করতে হয়েছে—তাই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি হয়তো থাকতেও পারে। ওই ভুলত্রুটির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে আগামী সংস্করণে সেগুলো শুধরে দেওয়া হবে। তাছাড়া পরিকাঠামো ও বিষয়সূচী নিয়ে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবকেও আমরা স্বাগত জানাচ্ছি।

কলকাতা
২২ শে ডিসেম্বর, ২০০০
(৬ই পৌষ, ১৪০৭ বঙ্গাব্দ)

রথীন্দ্রনারায়ণ বসু
সম্পাদক

প্রথম অধ্যায়

পরিবেশের মৌল রূপরেখা

অধ্যায় সূচী

1.1 আমাদের পরিবেশ

এই পৃথিবী আমাদের বাসভূমি। এখানে বংশ পরম্পরায় স্বচ্ছন্দে জীবন যাপনের জন্য আমাদের যা প্রয়োজন তা সবই আছে। এই পৃথিবীতে জল আছে, বায়ুমণ্ডল আছে, আছে লক্ষ লক্ষ উদ্ভিদ ও বন্যপ্রাণীসমৃদ্ধ অরণ্যভূমি ও উর্বর মৃত্তিকা, মৃত্তিকার অভ্যন্তরে বহুরকম খনিজ পদার্থ, সর্বোপরি জীবনের পক্ষে সহনীয় উষ্ণতা ও অফুরন্ত সূর্যালোক যা জীবনের সকল শক্তির উৎস।

এ পর্যন্ত সৌরমণ্ডলের অন্য কোন গ্রহে বা নিখিল বিশ্বের কোথাও জীবনের সন্ধান পাওয়া যায়নি। তবে এই অনন্ত বিশ্বে যেখানে সৌরমণ্ডলের মত কোটি কোটি তারামণ্ডল রয়েছে সেখানে জীবন কোথাও থাকলেও থাকতে পারে। তবুও

এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় 'জীবন' এই পৃথিবীর এক অনন্যসাধারণ সম্পদ। এই পৃথিবীতে এক অসাধারণ অনুকূল পরিবেশ ছিল এবং আজও আছে যার জন্য এখানে জীবনের উদ্ভব, বিবর্তন এবং সমৃদ্ধি সম্ভব হয়েছে। পরিবেশের এই আনুকূল্য থেকে বঞ্চিত হলে পৃথিবীতে জীবনের পক্ষে অস্তিত্ব রক্ষা করাও সম্ভব নয়।

1.1.1. পরিবেশ বলতে কি বোঝায়

পরিবেশ একটি ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ। নানারকম গাছপালা, মানুষ, পশুপাখি, মাছ, কীটপতঙ্গ, আলো, উত্তাপ, জল, বাতাস, মাটি, এবং মানুষের তৈরি ঘরবাড়ী, রাস্তাঘাট, কলকারখানা—এই নিয়েই আমাদের পরিচিত জগৎ। ঐগুলি একসঙ্গে আমাদের পরিবেশ রচনা করে। তাই পরিবেশ বলতে উদ্ভিদ, প্রাণী, আলো, উষ্ণতা, জল, বাতাস ও মাটির মিলিত সক্রিয় অবস্থানকে বোঝায়। এর মধ্যে উদ্ভিদ ও প্রাণী—সজীব উপাদান (living or biotic components) এবং আলো, উষ্ণতা, জল, বাতাস ও মাটি—জড় বা অজীব উপাদান (non-living or abiotic components)।

1.1.2. পরিবেশের উপর জীবনের নির্ভরশীলতা

পরিবেশের এই উপাদানগুলির ওপর জীবন একান্তভাবে নির্ভরশীল। উদ্ভিদ হলে সালোকসংশ্লেষের (photosynthesis) জন্য তার প্রয়োজন হয় সূর্যালোক, বাতাসের কার্বন ডাইঅক্সাইড (carbon dioxide), মাটির জল, শ্বাস-প্রশ্বাসের (respiration) জন্য বাতাসের অক্সিজেন (oxygen), খাদ্য-সংশ্লেষের জন্য মাটির কয়েকটি অত্যাবশ্যক খনিজ লবণ (mineral salts) বা অন্যান্য প্রাণীর বর্জ্য পদার্থ (excretory matters)। অনেক উদ্ভিদ পরাগ সংযোগের (pollination) জন্য পতঙ্গদের সাহায্য গ্রহণ করে থাকে, পতঙ্গদের সাহায্য ছাড়া তাদের বংশ বিস্তার সম্ভব নয়।

প্রাণী হলে খাদ্যের জন্য তাকে নির্ভর করতে হয় পরিবেশের অন্যান্য উদ্ভিদ ও প্রাণীর ওপর, তৃষ্ণার জন্য জল, শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য বাতাসের অক্সিজেন, আশ্রয়ের জন্য মাটি অথবা অন্যান্য জড় ও সজীব উপাদানের ওপর। একমাত্র সূর্যালোক ছাড়া পরিবেশের এই উপাদানগুলির মান আদৌ স্থির বা অপরিবর্তনশীল নয়। এই গুণগত মান বা বিশুদ্ধতার যদি অবনতি ঘটে অথবা তার পরিমাণের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে তাহলে ঐ পরিবেশে বসবাসকারী সকল জীবগোষ্ঠীর জীবনে নানা সমস্যা দেখা দেয়, অনেকে ঐ স্থান ত্যাগ করে চলে যায়, অনেক প্রজাতি চিরতরে অবলুপ্ত হয়ে যায়, পরিবেশের ভারসাম্য তার ফলে বিপর্যস্ত হয়।

1.1.3. প্রাচীন ভারতে পরিবেশের মূল্যায়ন

সভ্যতার উষাকাল থেকেই মানুষ পরিবেশের এই উপাদানগুলির কল্যাণময় ভূমিকা সম্পর্কে যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল ছিল। নানা দেশের মানুষ সূর্য, অগ্নি, জল, বাতাস, উদ্ভিদ ও নানা প্রজাতির প্রাণীকে দেবতাজ্ঞানে আরাধনা করে এসেছে। প্রাচীন ভারতীয় মনীষীরা মনে করতেন **ক্ষিতি** (earth), **অপ** (water), **তেজ** (energy), **মরুৎ** (air), **ব্যোম্** (void, empty space) এই পাঁচটি উপাদানে পার্থিব পরিবেশ গঠিত। জীবের মৃত্যুর পর ঐ পঞ্চভূতে মরদেহ বিলীন হয়ে যায়।

উদ্ভিদের রূপ, রস, ব্যাপ্তি, সজীবতা ও সহনশীলতাকে প্রাচীন ভারতীয়রা জীবনের আদর্শরূপে গণ্য করতেন। **কঠোপনিষদের** তৃতীয় অধ্যায়ে ব্রহ্মাণ্ডকে একটি প্রাচীন অশ্বত্থ বৃক্ষের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। এই অশ্বত্থ গাছের ছায়া ও আশ্রয়দানের তাৎপর্যকে উপনিষদে বড় করে তুলে ধরা হয়েছে।

ঈশোপনিষদে উদ্ভিদজগৎ ও প্রাণিজগতের মঙ্গলময় অবস্থানের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। সেখানে এটাও বলা হয়েছে—"কোনও প্রজাতি অন্য প্রজাতির চেয়ে উৎকৃষ্ট নয়। মানুষের উচিত নয় প্রকৃতির ওপর আধিপত্য করা। লোভ ত্যাগ

করেই প্রকৃতির বদান্যতা ভোগ করা যায়।"—যার সরলার্থ হল,—নিছক লোভের বশবর্তী হয়ে প্রকৃতির অবক্ষয় ঘটালে প্রকৃতির বদান্যতা থেকে মানুষ বঞ্চিত হবে।

বৌদ্ধযুগে ব্যাপক পরিবেশ সংরক্ষণ, প্রাণীহত্যার অসারতা ও সর্বজীবের প্রতি প্রেম ও অহিংসা বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে। প্রাচীন ভারতে পরিবেশ সম্পর্কে এই মূল্যায়ন ও জীবনদর্শন আমাদের পরিবেশ সংরক্ষণে আদর্শ দৃষ্টিভঙ্গী গঠনের সহায়ক।

1.1.4. পরিবেশ চর্চা ঃ অন্তর্নিহিত দর্শন ও উদ্দেশ্য

বস্তুতঃ প্রতিটি শাস্ত্রের মধ্যে একটা দর্শন আছে, যা তার মূল অভীষ্ট লক্ষ্যের সন্ধান দেয়, তার সমগ্র অবয়বকে ধরে রাখে এবং অন্য শাস্ত্রের সঙ্গে সেতু বন্ধনে সাহায্য করে। আমরা নিজেদের সুবিধার জন্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের তত্ত্বগুলিকে বিভিন্ন বিষয়ে ভাগ করে নিয়ে চর্চা করছি। কিন্তু বিশ্ব-প্রকৃতিতে তারা তো একই সঙ্গে আছে, অত্যন্ত সক্রিয়ভাবে একই সঙ্গে কাজ করছে পরস্পর নির্ভরশীল আশ্চর্য এক সুসংহত যৌথ কার্যক্রমের মাধ্যমে,—যার ওপর নির্ভর করে বিশ্ব-প্রকৃতি টিকে আছে এবং এই টিকে থাকার সমস্ত রহস্যই নিহিত আছে ঐ যৌথ অনুষ্ঠানসূচীর মধ্যে।

আমরা জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন তত্ত্বগুলি যেভাবে ভাগ করেছি, কোনো সন্দেহ নেই, তা এক কৃত্রিম পদ্ধতি। এই কৃত্রিমতার জন্যই আমাদের নিজস্ব পরিবেশে জীবন ও প্রকৃতি যে সকল নিয়ম-নীতিগুলি মেনে চলছে,—তার পেছনে যে অভিলক্ষ্য বা দর্শন আছে তা বুঝতে বেশ অসুবিধা হয়, তার মূল্য নির্ধারণে ব্যর্থতা ঘটে। আমরা ব্যষ্টিকে নিয়ে এত ব্যস্ত থাকি যে সমষ্টিকে দেখতে পাই না—চোখের সামনে থাকলেও। প্রতিদিন যাদের সঙ্গে ঘর করছি, দু-চোখ ভরে তাদের সমগ্ররূপ কোনদিন দেখা হয়ে ওঠে না। পরিবেশ চর্চা প্রকৃতির এই সামগ্রিক রূপ ও তার বিষয়বস্তু নিয়েই।

ভালভাবে বাঁচার জন্য মানুষ চেষ্টা করে পরিবেশকে জানতে, কিন্তু পরিবেশকে জানতে হলে বিশ্ব-প্রকৃতির সঙ্গে জীবনের সম্পর্ক আগে জানা দরকার। পরিবেশ চর্চার দর্শন হল প্রকৃতি সম্পর্কে এক সার্বিক দৃষ্টি লাভের অনুসন্ধান, জীবন-সম্পৃক্ত পরিবেশের সঠিক ব্যাখ্যা দেবার প্রচেষ্টা। এই দর্শন তাই এই শাস্ত্রের প্রাণকেন্দ্র,—যার সাহায্যে বিশ্ব-প্রকৃতি ও জীব জগতের স্বরূপ অবহিত হয়ে তারই আলোকে একাধারে পার্থিব জীবনকে সুরক্ষিত করা যায় এবং সেই সঙ্গে যথার্থভাবে নিজের জীবনকে চালিত করা যায়।

পরিবেশ চর্চার মূল উদ্দেশ্যও তাই নিহিত আছে এই দর্শনের মধ্যে। এই 'উদ্দেশ্য'—সংক্ষেপে বলা যায় ঃ পৃথিবীতে মানুষ সমেত সমগ্র জীবজগৎ যাতে স্বাভাবিকভাবে বসবাস ও সমৃদ্ধি লাভ করে তার জন্য পরিবেশের উপাদানগুলির মান, পরিমাণ, সক্রিয়তা ও ভারসাম্য রক্ষা করা এবং পরিবেশ সমস্যাগুলির স্বরূপ অনুধাবন করে তার স্থায়ী সমাধানে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং সেই কাজে নিজের ও অন্যান্য সকলের নিজ নিজ ভূমিকা পালনে অভ্যস্ত হওয়া ও সর্বসাধারণকে পরিবেশ-মনস্ক করে তোলা।

আমাদের পরিবেশের সমস্যাগুলির মূল উৎসের সন্ধান করতে হলে প্রকৃতির নিজস্ব গতিময় রূপ ও স্থিতিশীলতা সম্পর্কে একটা পরিষ্কার ধারণা থাকা দরকার। সৃষ্টির সূচনা থেকেই বিশ্ব-প্রকৃতির সব কিছুই চলছে অজস্র বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের (principles and theories) ওপর নির্ভর করে। সকল বিজ্ঞানই প্রকৃতিগত। আমরা নিজের হাতে কোনো বিজ্ঞান তৈরি করিনি বা বিজ্ঞান সৃষ্টি করিনি। আমরা পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষা, প্রমাণ ও যুক্তির ওপর নির্ভর করে, নির্দিষ্ট বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করে তা আবিষ্কার করেছি মাত্র। অতি সামান্যই এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়েছে। প্রকৃতির মধ্যে যে বিজ্ঞান ছিল আমরা নির্দিষ্ট পথ অনুসরণ করে তার অতি সামান্য অংশে করায়ত্ত করেছি। কিন্তু আবিষ্কৃত এই বৈজ্ঞানিক তত্ত্বগুলির ব্যবহার অনেক সময়ই উপযুক্ত সতর্কতা ও বিচক্ষণতার সঙ্গে করা হয়নি। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাৎক্ষণিক সমস্যা সমাধানে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে

ব্যবহার করা হয়েছে পরিবেশের কথা চিন্তা-ভাবনা না করেই। মানুষের কাছে যা আপাত সুখকর, অর্থকরী ও লাভজনক বলে মনে হয়েছে মানুষ তাই সাগ্রহে গ্রহণ করেছে পরিণতির কথা বিবেচনা না করেই। বহুক্ষেত্রে ঐ গুলিই আজ পরিবেশের নানা দুর্লঙ্ঘ্য সমস্যার সৃষ্টি করেছে।

প্রকৃতির মধ্যে যে বিজ্ঞান রয়েছে তার আদর্শ ব্যবহারের নির্দেশিকা বা ব্লু-প্রিন্ট (blue-print) প্রকৃতির মধ্যেই রয়েছে। পৃথিবীতে জীবন শত শত কোটি বছর ধরে টিকে আছে, লক্ষ লক্ষ প্রজাতির বিবর্তনে সমৃদ্ধ হয়েছে—তার মূল কৌশলের সন্ধান পাওয়া যায় ঐ নির্দেশিকার মধ্যেই। পৃথিবীর সুদীর্ঘ জীবনের ইতিহাস পরীক্ষা করলে দেখা যাবে পৃথিবীর সকল জীবই সর্বকালে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা করে এসেছে, আজও করছে পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজন করে,—অপরের কাছ থেকে বিকল্পহীন সাহায্য গ্রহণ করে, অপরকে অপরিমেয় সাহায্য দান করে। এই পারস্পরিক নির্ভরতাই জীবনের সবচেয়ে তাৎপর্যময় বিষয়, তার অস্তিত্বরক্ষার মূল কৌশল।

চিত্র 1.1. আদিম সামুদ্রিক ব্যাকটিরিয়ার জীবাশ্ম। প্রাচীনতম জীবনের প্রস্তরীভূত এই চিহ্ন যে শিলার উপর রয়ে গেছে তার বয়স আনুমানিক 350 কোটি বছর।

একটি সূক্ষ্ম জীবকোষের ক্রিয়াকলাপ বিশ্লেষণ করলে আমরা কি দেখতে পাব?—তার প্রতিটি সূক্ষ্ম অংশ একে অপরের ওপর নির্ভর করে, একে অপরের সহায়তায়, এক যৌথ উদ্যোগে নির্দিষ্ট কতকগুলি কাজ সুশৃঙ্খলভাবে সম্পন্ন করছে। জীবকোষের কোন সূক্ষ্ম অংশ যদি ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহলে জীবকোষের সমস্ত অংশেরই শৃঙ্খলা ভেঙ্গে পড়বে, তার প্রাণ সংশয় ঘটবে। জীবকোষ অতিসূক্ষ্ম বলে আমরা খালি চোখে তা দেখতে পাই না।

ঐ সূক্ষ্ম জীবকোষের সাহায্যে আমাদের দেহের যে সব অঙ্গ গঠিত,—যেমন হৃদয়, পাকস্থলী, বৃক্ক, ফুসফুস, মস্তিষ্ক ইত্যাদি,—তারাও নির্দিষ্ট কতকগুলি কাজ একে অপরের সহায়তায় এক যৌথ উদ্যোগে সম্পন্ন করে নিজেদের বাঁচিয়ে রাখে, আমাদেরও বাঁচিয়ে রাখে। কোনো একটি অঙ্গ বিকল হলে এই পারস্পরিক সহযোগিতার শৃঙ্খলটিই ভেঙ্গে পড়বে, আমাদেরও বেঁচে থাকা সম্ভব হবে না।

ঠিক তেমনিই আমাদের পরিবেশের মধ্যে অজস্র ঘটনা ঘটছে, অজস্র বিক্রিয়া ঘটছে—আমরা নিজেরাই যার অন্যতম উপাদান। পৃথিবীর সকল জীবগোষ্ঠীই এক বিস্ময়কর শৃঙ্খলার সঙ্গে পরস্পরের ওপর নির্ভর করে মিলিত উদ্যোগে কতকগুলি নির্দিষ্ট নিয়ম-নীতি পালন করে চলেছে, মূলতঃ তার ওপর নির্ভর করেই তারা পৃথিবীতে নিজেদের অস্তিত্বও রক্ষা করে চলেছে। এই ঘটনাগুলি অনেক ব্যাপক বলে এবং এর ব্যাপ্তিকাল অতি দীর্ঘ বলে আমাদের চোখে তা পড়ে না।

এই পারস্পরিক নির্ভরতার বিষয়টি বিশ্লেষণ করলে আমরা কতকগুলি নির্দিষ্ট সূত্রের সন্ধান পাব যার ওপর প্রকৃতির বাস্তব্যতন্ত্রের (ecosystem) বনিয়াদ গড়ে উঠেছে,—যেমন সবুজ উদ্ভিদের ওপর প্রাণী জগতের একান্ত নির্ভরতা, জীবের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ এবং জন্ম ও মৃত্যু হারের সমতা রক্ষা, পরিবেশের মধ্যে উদ্ভিদ ও প্রাণীর সুষম অনুপাত, জল ও মৌল পদার্থগুলির চক্রাকারে পুনঃপুনঃ আবর্তন এবং সকল জীবেরই অভিবাসন বা ছড়িয়ে পড়বার প্রবণতা ইত্যাদি।

এখানে লক্ষ্য করার বিষয় হল পৃথিবীর সকল উদ্ভিদ ও প্রাণীরা যেখানে সাধারণত বাস্তব্যতন্ত্রের সূত্রগুলি অনুসরণ করে পরিবেশের উপাদানগুলি সুষ্ঠুভাবে ব্যবহার করে যুগ যুগ ধরে পরিবেশের ভারসাম্য মোটামুটিভাবে রক্ষা করে চলেছে সেখানে মানুষ সংখ্যারভারে ভারাক্রান্ত হয়ে অতি বিপুলহারে পরিবেশের সম্পদগুলি ধ্বংস করে, জলে, স্থলে, বাতাসে ব্যাপক দূষণ ঘটিয়ে, আদিম অরণ্যের শোচনীয় অবক্ষয় ঘটিয়ে, শত শত বন্যপ্রাণী ও উদ্ভিদ প্রজাতিকে নিশ্চিহ্ন করে এবং সেই সঙ্গে নিজেদের মধ্যে অন্তহীনকাল ধরে যুদ্ধ-কলহে লিপ্ত থেকে (মানুষ ছাড়া অন্য কোনো প্রজাতির প্রাণীদের মধ্যে ঠাণ্ডা মাথায় দল বেঁধে নিজেদেরই প্রজাতির এক অংশকে নিশ্চিহ্ন করবার প্রবণতা একান্তই বিরল) নিজেদেরই অস্তিত্ব বিপন্ন করে তুলেছে এবং সেই সঙ্গে অজস্র পরিবেশ সমস্যার সৃষ্টি করেই চলেছে। এই সমস্যাগুলির ব্যাপকতা ও গভীরতা এতই বেশী যার জন্য আজ মানুষের প্রায় যাবতীয় জ্ঞান ও মনীষা প্রয়োগের প্রয়োজন হয় তার বাস্তব সমাধানের উপায় অনুসন্ধানে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়,—ভূগোল (Geography), ভূবিদ্যা (Geology), ভৌতবিজ্ঞান (Physics), রসায়ন (Chemistry) ও আবহাওয়াতত্ত্বের (Meteorology) সহায়তার প্রয়োজন হয় পরিবেশের ভৌত উপাদান ও আবহাওয়াবিষয়ক সমস্যাগুলির স্বরূপ বুঝতে, তেমনি উদ্ভিদবিদ্যা (Botany), প্রাণিবিদ্যা (Zoology), জীবরসায়ন (Biochemistry), শারীরবিদ্যা (Physiology), ইতিহাস (History) ও দর্শনশাস্ত্র (Philosophy) অনুধাবনের প্রয়োজন হয় এই সমস্যাগুলির মূল স্বরূপ ও অন্তর্নিহিত কারণ নির্ণয়ে। আবার নৃতত্ত্ব (Anthropology), প্রত্নতত্ত্ব (Archaeology), অর্থনীতি (Economics), রাষ্ট্রবিজ্ঞান (Political Science), সমাজবিজ্ঞান (Social Science), মনস্তত্ত্ব (Psychology) ও জনসংখ্যাবিষয়ক জ্ঞানের (Demography) প্রয়োজন হয় এই সমস্যাগুলির সঙ্গে মানুষ এককভাবে ও সমষ্টিগতভাবে শহরে, গ্রামে, দেশে বিদেশে কিভাবে জড়িত তার অনুসন্ধানে।

1.1.5. পরিবেশ চর্চার অবশ্য প্রয়োজনীয়তা

জীবন এই পৃথিবীর এক অনন্য সম্পদ। পরস্পরের ওপর নির্ভর করে বিভিন্ন প্রজাতির জীব এখানে বসবাস করছে কোটি কোটি বছর ধরে। এই পৃথিবীতে এক অসাধারণ অনুকূল পরিবেশ ছিল বলেই মানুষ সহ সকল জীবের উদ্ভব, বিবর্তন ও সমৃদ্ধি সম্ভব হয়েছে, পরিবেশের এই আনুকূল্য থেকে বঞ্চিত হলে পৃথিবীর কোন জীবের পক্ষেই সম্ভব নয় পৃথিবীতে টিকে থাকা। পৃথিবীর পরিবেশের এই জীবন-পালিকা শক্তি বর্তমান রূপে বিবর্তিত হতে বহু কোটি বছর সময় ব্যয় হয়েছে। অপরিণামদর্শী মানুষের অপটু হস্তক্ষেপে পরিবেশের এই বদান্যতা থেকে মানুষ আজ বঞ্চিত হতে চলেছে। মূলতঃ মানুষের একদেশদর্শী চিন্তা-ভাবনা প্রসূত কর্মকাণ্ড অথবা নিছক অজ্ঞানতার জন্যই তার হাতে পরিবেশের সীমিত সম্পদগুলির মান,

পরিমাণ ও ভারসাম্য শোচনীয়ভাবে অবক্ষয় হচ্ছে। অজস্র দুর্লঙ্ঘ্য সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে যা মানুষ সহ অধিকাংশ জীবের সামনেই অস্তিত্বরক্ষার সমস্যা (problem of existence) সৃষ্টি করেছে।

বলাবাহুল্য, মানুষের ঐকান্তিক এবং সক্রিয় সহযোগিতা ছাড়া পরিবেশের এই ব্যাপক অবক্ষয় রোধ করা সম্ভব নয় এবং শিক্ষিত, পরিবেশমনস্ক মানুষের দ্বারাই তা সম্ভব—শিক্ষার সর্ব বিষয়ে এবং সর্বস্তরে তাই পরিবেশ চর্চা আজ অপরিহার্য। এই শিক্ষা মানুষকে তার বর্তমান সমস্যাগুলি সনাক্ত করতে ও তার স্থায়ী সমাধান খুঁজে নিতে সাহায্য করবে। অনির্দিষ্টকাল ধরে পরিবেশের স্বয়ম্ভরতা (self-sustenance) রক্ষার মাধ্যমে মানবপ্রজাতির প্রকৃত সমৃদ্ধি ঘটবে।

1.2. চিরপরিবর্তনশীল পরিবেশ

1.2.1. প্রাকৃতিক পরিবর্তন

আমাদের পরিবেশ চিরপরিবর্তনশীল। ভূ-তত্ত্ববিদরা বলেন এক ধারাবাহিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে পৃথিবীর পরিবেশ এগিয়ে চলেছে, —সে চলার আজও বিরাম হয়নি, ভবিষ্যতে কোনদিন হবেও না। অতীতে যে সব পরিবর্তন ঘটেছে তা
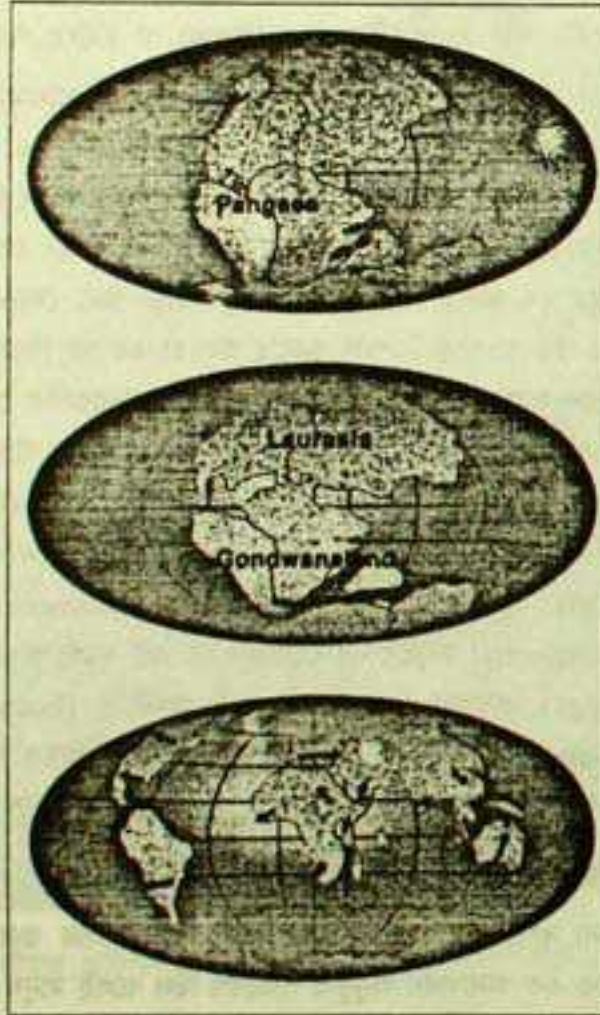
চিত্র 1.2. মহাদেশীয় সঞ্চালন (Continental drifting) : সবগুলি মহাদেশই একসময় "পানজিয়া" নামক বিশাল ভূখণ্ডে একই সঙ্গে অবস্থিত ছিল (উপরের চিত্র)। পরবর্তীকালে তারা ধীরে ধীরে গিয়ে "লরেসিয়া" এবং "গণ্ডোয়ানাল্যান্ড" এই দুই প্রধান ভূ-ভাগ গঠন করে (মাঝের চিত্র)। আনুমানিক 5 কোটি বছর আগে ভারতীয় প্লেট এবং এশিয়ান প্লেটের সংঘর্ষে পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বতমালা হিমালয়ের সৃষ্টি হয় (নীচের চিত্র)। এই ধরনের পরিবর্তন পৃথিবীতে অতি ধীরে চলছে এবং ভবিষ্যতেও চলতে থাকবে।

প্রায় সবই ছিল প্রাকৃতিক কারণে। কিন্তু সাম্প্রতিক কালে যে সব পরিবর্তন ঘটেছে বা অদূর ভবিষ্যতে ঘটতে চলেছে তার অধিকাংশই মানুষের তৈরি, যা—জীবজগতের পক্ষে চরম ক্ষতিকর এবং যার নেতিবাচক প্রভাব অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী।

প্রাকৃতিক কারণে যে সব পরিবর্তন হয়েছে তার কতকগুলি ঘটেছে অতি ধীরে ধীরে, যুগ যুগ ধরে, বহু কোটি বছর ছিল তার ব্যাপ্তিকাল, আজও তার বিরাম হয়নি। ভূ-তত্ত্ববিদরা বলেন পৃথিবীর মহাদেশগুলি কতকগুলি চলমান টেক্‌টনিক প্লেটের (tectonic plates) ওপর অবস্থিত। প্রায় 50-60 কোটি বছর আগে এই প্লেটগুলি পরস্পর সংলগ্ন ছিল, তখন স্থলপথেই উদ্ভিদ ও বন্যপ্রাণীরা এক মহাদেশ থেকে অন্য মহাদেশে গিয়ে বংশবিস্তারে সমর্থ ছিল। তারপর প্রাকৃতিক কারণেই মহাদেশগুলি পরস্পরের বাহুডোর ছিন্ন করে দূরে সরে যেতে শুরু করে প্রতিবছর এক থেকে পনেরো সেন্টিমিটার গতিতে। এক বছরের হিসাবে খুবই সামান্য কিন্তু কোটি বছরের হিসাবে তাই হয়েছে অসামান্য। ভারত ছিল আফ্রিকার সঙ্গে সংলগ্ন, দীর্ঘপথ অতিক্রম করে আজ এশিয়ার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে এবং আরও অভ্যন্তরে প্রবেশ করবার চেষ্টা করছে। এই অকল্পনীয় সংঘাতের ফলে হিমালয় পর্বতের সৃষ্টি হয় এবং এই বিক্রিয়া আজও চলছে। হিমালয়ের উচ্চতাও বাড়ছে অতি ধীরে ধীরে। আগে আফ্রিকা দক্ষিণের হিমমণ্ডলে ছিল, আজ বিষুবরেখা অতিক্রম করে উষ্ণমণ্ডলে অবস্থান করছে। সম্প্রতি উত্তপ্ত সাহারা মরুভূমির তলায় কিছু শিলাখণ্ডের সন্ধান পাওয়া গেছে যা থেকে বোঝা যায় ঐগুলি অতীতে একদিন হিমমণ্ডলের বরফের পুরু আস্তরণে ছিল ঢাকা। এই শিলাগুলি আফ্রিকার অতীত ইতিহাসের সাক্ষ্য বহন করছে।

এই চলমান মহাদেশগুলির স্থান পরিবর্তনের জন্য তাদের পরিবেশ ও আবহাওয়ার ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে, কোটি কোটি বছর ব্যয় হয়েছে ঐ পরিবর্তনগুলি নিষ্পন্ন হতে, তারফলে পৃথিবীর জীবজগৎ যথেষ্ট সময় পেয়েছে ঐ পরিবর্তিত পরিবেশের সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে, যারা পারেনি তারা চলে গেছে, সেই সঙ্গে বহু নূতন প্রজাতির আবির্ভাব ঘটেছে, পৃথিবীর জীবজগৎ পরোক্ষভাবে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে, জীবনের ক্রমবিকাশের ধারাবাহিকতা এক অসাধারণ সার্থকতার সঙ্গে সুরক্ষিত হয়েছে।

1.2.1.1. বায়ুমণ্ডলের উপাদানগুলির পরিবর্তন, তুষার যুগ

বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাইঅক্সাইড ও অক্সিজেনের অনুপাত এবং ধরাপৃষ্ঠের গড় তাপমাত্রা কখনও স্থির থাকেনি। অতি ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হয়েছে। তারফলে পৃথিবীর জীব বৈচিত্র্যেরও পরিবর্তন ঘটেছে অতি ব্যাপকভাবে। পৃথিবীর বুকে জীবনের
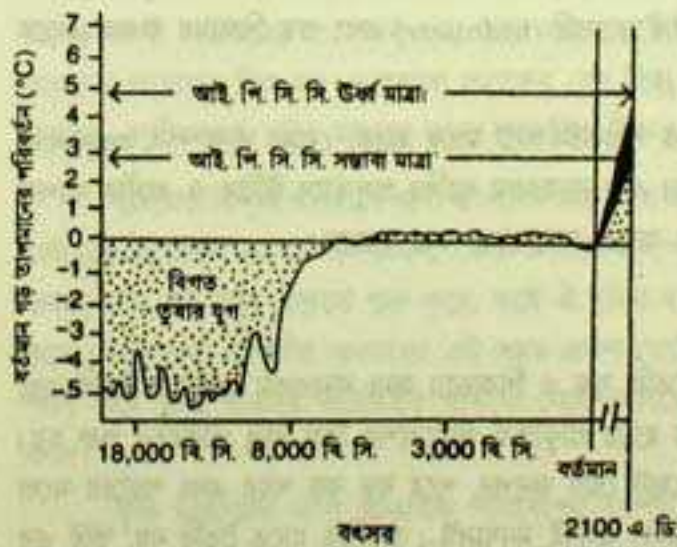
চিত্র 1.3. পৃথিবীতে সর্বশেষ তুষার যুগের আবির্ভাব ঘটেছিল খ্রীষ্টপূর্বের জন্মের প্রায় 18 হাজার বছর আগে এবং ভূ-পৃষ্ঠের গড় তাপমাত্রা নেমে গিয়েছিল 5° সেলসিয়াসে (বর্তমান গড় তাপমাত্রা 15° সেলসিয়াস)। এর ফলে পৃথিবীর বেশির ভাগ অঞ্চলই বরফাচ্ছাদিত হয়ে পড়ে। একবিংশ শতাব্দীতে পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা যদি তিন থেকে পাঁচ ডিগ্রী সেলসিয়াস বেড়ে যায় তবে তার প্রভাবে সারা পৃথিবীর আবহাওয়ার ব্যাপক পরিবর্তন ঘটতে পারে।

যখন প্রথম উদ্ভব ঘটেছিল তখন বায়ুমণ্ডলে কোন অক্সিজেনই ছিল না, ছিল কার্বন ডাইঅক্সাইড ও অন্যান্য গ্যাসে পূর্ণ। প্রথম আদাপ্রাণী বাতাসের পরিবর্তে অন্যান্য রাসায়নিক পদার্থ থেকে অক্সিজেন সংগ্রহ করে বেঁচে থাকতে অভ্যস্ত ছিল। তারপর বাতাসে অতি ধীরে ধীরে অক্সিজেনের পরিমাণ বাড়ে, সবুজ উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষ (photosynthesis) ক্রিয়ার ফলেই তা সম্ভব হয়েছিল। বাতাসে কার্বন ডাইঅক্সাইডের ঘনত্বের পরিমাণও কমতে থাকে, সেই সঙ্গে ধরা পৃষ্ঠের গড় তাপমাত্রাও কমে যায়। পরিবেশের এই পরিবর্তনের ফলে বাতাস থেকে অক্সিজেন নিয়ে অপেক্ষাকৃত অল্প তাপমাত্রায় জীবন ধারণে অভ্যস্ত এমন উদ্ভিদ ও প্রাণীর আবির্ভাব সম্ভব হয়েছে। এই গড় তাপমাত্রা মাঝে মাঝে এত কমে গিয়েছিল যে কয়েকটি তুষার যুগের আবির্ভাব হয়েছিল। অনেক বন্যপ্রাণী অবলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল ঐ সময়, আবার তুষার যুগের শেষে বহু নূতন প্রজাতির জীবের আবির্ভাবও ঘটেছিল।

1.2.1.2. অপেক্ষাকৃত দ্রুত প্রাকৃতিক পরিবর্তন, উদ্ভিদ পর্যায়

এই ধীরগতিসম্পন্ন পরিবর্তনগুলি ছাড়াও অপেক্ষাকৃত স্বল্পকালের মধ্যে অনেক দ্রুত পরিবর্তন ঘটে থাকে প্রকৃতিতে। যেমন পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন প্রজাতির উদ্ভিদের আগমন ও তিরোধানের মাধ্যমে জলাশয় থেকে স্বাভাবিক অরণ্য গড়ে ওঠা, অথবা নিষ্প্রাণ, শুষ্ক, শিলাময় পর্বতের ওপর ঘন অরণ্য সৃষ্টি হওয়া। কয়েকশত থেকে কয়েক হাজার বছরের মধ্যে তা ঘটতে পারে। জলাশয়ের পরিবেশে প্রথমে আধিপত্য বিস্তার করে নিমজ্জিত শ্রেণীর উদ্ভিদরা (submerged plants), তারপর পর্যায়ক্রমে সেখানে আসে ভাসমান শ্রেণীর উদ্ভিদরা (floating plants), তারপর আসে নানাশ্রেণীর জলাভূমির উদ্ভিদরা (marshy plants)। মৃত উদ্ভিদের জৈব পদার্থ জমতে জমতে যে পাঁক মাটির সৃষ্টি হয় সেখানে জন্মায় নানা প্রকার জলাভূমির গুল্ম জাতীয় উদ্ভিদ, পরিশেষে আসে মহীরুহরা (trees)—তারা সেখানে এক নিবিড় অরণ্য গড়ে তোলে।

বিভিন্ন জাতীয় উদ্ভিদ এইভাবে পর্যায়ক্রমে আধিপত্য স্থাপন করে শুষ্ক, শিলাময় পর্বতের ওপরও। প্রথমে সেখানে আসে লাইকেন জাতীয় উদ্ভিদরা, শৈবাল (algae) ও ছত্রাকের (fungi) মিলনে এদের দেহ গঠিত। বিচিত্র এদের জীবনপদ্ধতি, শৈবাল ছত্রাকের কাছ থেকে জল ও সার পদার্থ সংগ্রহ করে। ছত্রাক ঐ শৈবালের কাছ থেকে জৈব পদার্থ সংগ্রহ করে, পরস্পরের ওপর নির্ভর করে এরা বেঁচে থাকে। লাইকেনের দেহাবশেষের ওপরই পর্যায়ক্রমে সেখানে আসে মস (moss), বীরুৎ (herbs) ও গুল্ম জাতীয় (shrubs) উদ্ভিদরা এবং পরিশেষে অরণ্যের বৃহৎ মহীরুহরা ঐ স্থান দখল করে। শুষ্ক, উত্তপ্ত শিলাময় পরিবেশ পরিবর্তিত হয় আর্দ্র, শীতল ছায়াচ্ছন্ন অরণ্যে এবং বহুরকম কীট-পতঙ্গ ও বন্য প্রাণীর স্বাভাবিক আবাসস্থলে পরিণত হয়।

জলাশয় থেকে অরণ্য সৃষ্টির উদ্ভিদ-পর্যায়কে বলা হয় *হাইড্রোসেরি (hydrosere)* এবং শুষ্ক শিলাময় অঞ্চল থেকে অরণ্য সৃষ্টির উদ্ভিদ-পর্যায়কে বলা হয় *জেরোসেরি (xerosere)*।

এছাড়া আকস্মিক প্রাকৃতিক বিপর্যয়েও পরিবেশের ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে মাঝে মাঝে, যেমন ভূ-কম্পন, অগ্ন্যুৎপাত পর্বতের বুকে ধ্বস নামা, নদীর বন্যা, সাইক্লোন, টাইফুন, টর্নাডো এবং নানারকম ব্যাধির প্রাদুর্ভাবে উদ্ভিদ ও প্রাণীর ব্যাপক জীবনহানি ইত্যাদি। আকস্মিক প্রাকৃতিক বিপর্যয় সম্পর্কে পরে আরো আলোচনা করা হয়েছে।

1.2.2. মনুষ্যসৃষ্ট পরিবর্তন

সভ্যতার সূচনা থেকেই মানুষ যখন ঘর তৈরি, নৌকা তৈরি, যুদ্ধ ও শিকারের জন্য নানারকম হাতিয়ার তৈরি এবং অরণ্য উচ্ছেদ ক'রে কৃষিকার্য শুরু করল তখন থেকেই মানুষের হাতে প্রাকৃতিক পরিবেশের কিছু কিছু পরিবর্তন শুরু হয়। প্রথমে ছোট ছোট গ্রাম তৈরি করে বসবাস শুরু হল, তারপর ছোট ছোট জনপদ, পরে বড় বড় শহর এবং শহরের মধ্যে ঘরবাড়ী, রাস্তাঘাট, দোকান বাজার, কল-কারখানা সবই গড়ে উঠল। এসবই মনুষ্যসৃষ্ট ; প্রকৃতির হাতে তৈরি নয়, তাই এর

পরিবেশ কৃত্রিম। কিন্তু প্রাকৃতিক পরিবেশের যাবতীয় সম্পদের বিনিময়েই এগুলি গড়ে উঠেছে। শহরের এই কৃত্রিম পরিবেশের সঙ্গে প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রধান তফাৎ হল, প্রাকৃতিক পরিবেশ স্বয়ম্ভর (self-sustained) অর্থাৎ নিজের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় আহার্য বা শক্তি নিজেই উৎপন্ন করতে পারে, কিন্তু মনুষ্যসৃষ্ট শহরের পরিবেশ আদৌ স্বয়ম্ভর নয়। এখানকার অধিবাসীদের খাদ্যের জন্য, ঘরবাড়ী তৈরির জন্য, কলকারখানা চালনার জন্য,—কৃষিজ সম্পদ, বনজ সম্পদ, জ্বালানী কাঠ, কয়লা, পেট্রোলিয়াম, অন্যান্য বহুরকম খনিজ পদার্থ প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকেই সংগ্রহ করতে হয়। তারফলে প্রাকৃতিক পরিবেশ রিক্ত হয়। কিন্তু জমির একটা নির্দিষ্ট উৎপাদন ক্ষমতা আছে, খনিজ পদার্থগুলির পরিমাণও নির্দিষ্ট এবং তার চাহিদা মেটাবার একটা নির্দিষ্ট সীমা আছে, সব মিলিয়ে যাকে বলা হয় পরিবেশের বহন ক্ষমতা (carrying capacity), মানুষের ক্রমবর্ধমান চাহিদা যখন এই বহন ক্ষমতাকে ছাড়িয়ে যায় তখন কি প্রাকৃতিক পরিবেশ, কি মানুষের হাতে গড়া কৃত্রিম পরিবেশ, উভয়েরই বিপর্যয় আসন্ন হয়ে ওঠে, উভয়েরই তখন অস্তিত্বের সংকট (problem of existence) দেখা দেয়।

1.2.2.1. কৃষিকার্য, ভূমি-ব্যবহার ইত্যাদি

- পৃথিবীতে মনুষ্য প্রজাতি (*Homo sapiens*) প্রায় এক লক্ষ বছর ধরে বসবাস করছে। এই সুদীর্ঘ সময়ের প্রায় শতকরা 90 ভাগ সময়, অর্থাৎ 90 হাজার বছরই মানুষ অরণ্যচারী ছিল। ছোট বড় দলে বিভক্ত হয়ে অরণ্যে শিকার ও ফলমূল খেয়ে জীবন ধারণ করত (hunter and gatherer communities)। মানুষ চাষ-বাস শুরু করেছে দশ হাজার বছর হ'ল। ইরাকে গৃহপালিত কুকুরের যে জীবাশ্ম (fossil) পাওয়া গিয়েছে তা থেকে বোঝা যায় প্রায় এগারো হাজার বছর আগে মানুষ পশুপালনে অভ্যস্ত ছিল। জমিতে বীজ ছড়িয়ে ফসল উৎপাদন হল কৃষিকার্যের প্রথম পদক্ষেপ। এই সময় থেকেই ভূমির ব্যবহার এবং ভূমির মূল্য বুঝতে মানুষ শেখে। নানা উদ্দেশ্যে ভূমির ব্যবহার শুরু হয়,—চাষ-বাসের জন্য পশুপালনের জন্য। গ্রামের পথ-ঘাট, হাট-বাজার ও গৃহ নির্মাণের জন্য। এছাড়া বিস্তৃত বনভূমি পরিষ্কার করে উদ্যান, বাগিচা, পশুচারণ ভূমি ও জলাশয় ইত্যাদিও নির্মাণ শুরু হয়।

অরণ্যচারী মানুষ কৃষিকার্যে লিপ্ত হওয়ার ফলে তার জীবন পদ্ধতিতে যে গুণগত পরিবর্তন ঘটেছিল তার অন্যতম হল পার্থিব সম্পদ সঞ্চয়ে অসামান্য আগ্রহ ও উৎসাহ বৃদ্ধি। জমির মালিকানা বংশ পরম্পরায় ভোগ-দখল করা এবং প্রয়োজন মত হস্তান্তর। ভূমির অধিকার নিয়ে যুদ্ধ-বিগ্রহ ও দাসপ্রথা এ সবই কৃষি ব্যবস্থার ফল।

মানুষ যখন অরণ্যচারী ছিল তখন অপেক্ষাকৃত অল্প পরিশ্রমে আহার্য সংগ্রহে সক্ষম ছিল। কিন্তু কৃষিকার্যে সে তুলনায় অনেক বেশী পরিশ্রমের প্রয়োজন হয়, তবে সকলকে পরিশ্রম করতে হয় না। কিছু মানুষের উদয়াস্ত পরিশ্রমের ফসলে বহুজনের প্রয়োজন সিদ্ধ হয়। তারফলে সমাজের বেশ কিছু মানুষ অন্যান্য বৃত্তিগ্রহণে সক্ষম হয়েছিল। শিল্প-উৎপাদন, ব্যবসায়, চিত্রাঙ্কন, সঙ্গীতকলা চর্চার মাধ্যমে মানব-সংস্কৃতির বিকাশ সম্ভব হয়েছিল।

ইচ্ছামত বিপুল পরিমাণে খাদ্য উৎপাদন সম্ভব হওয়ায় কৃষি-নির্ভর সমাজে নিরাপত্তা বোধ বেড়েছিল, স্থায়িত্ব এসেছিল, সেইসঙ্গে প্রয়োজন বোধও বেড়েছিল, জৈব ও অজৈব সম্পদ আহরণের জন্য পরিবারে বেশী মানুষের প্রয়োজন হত। তাই জনসংখ্যাও এই সময় বাড়তে শুরু করে, তবে ঐ বৃদ্ধির হার দীর্ঘস্থায়ী হত না। যুদ্ধ-বিগ্রহ, মহামারী ও দুর্ভিক্ষে তা আবার কমে যেত। সারা পৃথিবীর জনসংখ্যা এই সময় একশ কোটির অনেক নীচে ছিল। মাত্র দেড় শতক আগে তা একশ কোটি স্পর্শ করে এবং তারপর অপ্রতিহত গতিতে বেড়ে চলেছে,—মূলতঃ শিশুমৃত্যু ও মহামারী সাফল্যের সঙ্গে নিয়ন্ত্রিত হবার ফলে।

কৃষি বিস্তারের ফলে প্রাকৃতিক পরিবেশের ব্যাপক পরিবর্তন শুরু হয়। তারমধ্যে ভূমিক্ষয় এবং বন ও বন্যপ্রাণীর অবলুপ্তি সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। অতি দীর্ঘকাল ধরে কৃষি জমি থেকে বিপুল পরিমাণ মূল্যবান সার মাটি জলের সঙ্গে ধুয়ে

অথবা বায়ু দ্বারা বাহিত হয়ে সমুদ্রে বিসর্জিত হয়েছে। বর্তমানে কৃষি-বিস্তার, শিল্প ও নগরায়নের প্রয়োজনে প্রতিবছর দুই থেকে আড়াই শতাংশ বনভূমি পৃথিবী থেকে অদৃশ্য হচ্ছে, সেই সঙ্গে বহু প্রজাতির উদ্ভিদ ও বন্যপ্রাণী চিরতরে অবলুপ্ত হয়ে গেছে। বিগত দু'শ বছরের মধ্যেই এই অবলুপ্তি সবচেয়ে বেশী ঘটেছে এবং এর হার ক্রমশঃ বাড়ছে। প্রকৃতিগত পরিবর্তনগুলির তুলনায় মনুষ্যসৃষ্ট এই পরিবর্তনগুলি এত দ্রুত, এত ব্যাপক ও এত গভীরভাবে ঘটেছে যে তার প্রভাবে যে সব উদ্ভিদ ও বন্যপ্রাণী অবলুপ্ত হয়ে গেছে তারা চিরতরেই হারিয়ে গেছে কোনো প্রতিনিধি না রেখেই।

1.2.2.2. নগরায়ন, শিল্প বিপ্লব ও জনসংখ্যা বিস্ফোরণ

বিগত দু'শ বছরের পরিবেশের ইতিবৃত্ত যদি আমরা অনুধাবন করি তাহলে তিনটি বিষয় সবচেয়ে বড় হয়ে আমাদের চোখে ধরা পড়বে—(1) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রয়োগে ইউরোপে শিল্পবিপ্লব, অর্থনৈতিক অবস্থার, বিশেষ করে উন্নতদেশগুলির, আমূল পরিবর্তন এবং জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে সর্বত্র পরিবেশ দূষণের ব্যাপ্তি। (2) শহর ও শিল্পাঞ্চলগুলির দ্রুত সমৃদ্ধি, বিশাল সংখ্যক মানুষের গ্রাম ছেড়ে শহরে আগমন এবং বিপুল পরিমাণ পরিবেশের সম্পদ ও সাধারণ মানুষের শ্রমের বিনিয়োগে রাষ্ট্রীয় ও ব্যক্তিগত পর্যায়ে অকল্পনীয় পরিমাণে ধনসঞ্চয়। (3) জনবিস্ফোরণ—যার নেতিবাচক প্রভাবে অজস্র পরিবেশ সমস্যার সৃষ্টি।

1.2.2.2.1. নগরায়ন

সুদূর অতীতে পৃথিবীর প্রাচীন শহরগুলি গড়ে উঠেছিল প্রধানতঃ নদীর তীর ধরেই, আমাদের গঙ্গানদী, সিন্ধুনদ ও পশ্চিম এশিয়ার তাইগ্রিস ও ইউফ্রেতিসের নাম এ বিষয়ে বিশেষ উল্লেখ্য। ঐতিহাসিকেরা বলেন প্রায় 6000 বছর আগে তাইগ্রিস ও ইউফ্রেতিস নদীর তীরেই পৃথিবীর প্রথম শহর ব্যাবিলনের পত্তন হয়েছিল। গঙ্গাতীরবর্তী শহরগুলি ছিল পাটলীপুত্র (পাটনা), বারানসী, হরিদ্বার ইত্যাদি। তখন দেশের অধিকাংশ মানুষই গ্রামে বাস করত, বর্তমানের তুলনায় ঐ সব শহরের জনসংখ্যাও ছিল অতি নগণ্য। পৃথিবীর অন্যান্য অংশের তুলনায় ইউরোপেই নগরায়ন, অর্থাৎ শহরের সংখ্যা ও সমৃদ্ধি বেশী ঘটেছে। তবুও দেখা যায় দু'শ বছর আগে খ্রীস্টীয় 1800 সালে ইউরোপের মাত্র 2.2 শতাংশ মানুষ শহরে বাস করত, বাকী 97.8 শতাংশ মানুষ গ্রামবাসী ছিল। ঐ সময় ইউরোপের কোন শহরেরই জনসংখ্যা দশলক্ষ ছাড়ায়নি। বরং ঐ সময় পৃথিবীর যে তিনটি শহরের জনসংখ্যা দশ লক্ষ ছাড়িয়েছিল তার সবকটিই ছিল এশিয়ায়,—যেমন টোকিও, সাংহাই ও কাম্বোডিয়ায় খমের প্রজাতন্ত্রের (Khmer Republic) রাজধানী নমপেন। ঐ সময় এই শহরগুলিকে ঘিরে বিশাল কৃষিক্ষেত্র গড়ে উঠেছিল যা খাদ্য-শস্য ও কাঁচা মাল সরবরাহ করে শহরগুলিকে বাঁচিয়ে রাখত।

এই সময় ইউরোপে শিল্পবিপ্লব ঘটে, যার প্রভাবে ইউরোপের শহরগুলির সমৃদ্ধি ও জনসংখ্যা বাড়তে শুরু হয়, তবুও 1900 সালের প্রথমে পৃথিবীর মাত্র 12টি (মতান্তরে 13টি) শহরের জনসংখ্যা দশ লক্ষ ছাড়িয়েছিল,—যেমন—লণ্ডন, প্যারিস, বার্লিন, ভিয়েনা, মস্কো, সেন্ট পিটার্সবার্গ, নিউইয়র্ক, সিকাগো, ফিলাডেলফিয়া, টোকিও, উয়ান (চীন) এবং আমাদের কলকাতা। (সম্ভবত ইস্তাম্বুলও)। এর মাত্র 85 বছর পর 1985 সালে এই তালিকায় মোট 230টি শহরের নাম উঠেছে। দু'শ' বছর আগে পৃথিবীতে গড়ে যেখানে এক শতাংশের কম মানুষ শহরে বাস করত সেখানে 40 শতাংশ মানুষ আজ শহরে বাস করছে। গ্রাম ছেড়ে অতি বিপুল সংখ্যক মানুষ শহরে এসে ভীড় করেছে।

মানুষের হাতে গড়া শহরের এই পরিবেশ শুরু থেকেই বেশীরভাগ অংশে ছিল, আজও আছে,—অপরিচ্ছন্ন, ধূলা, ধোঁয়ায় আকীর্ণ, পরিশ্রুত জল ও নিকাশী ব্যবস্থার অনটন, অতি স্বল্প পরিসর স্থানে অধিক লোকের বাস,—এক কথায় পরিবেশ ছিল অস্বাস্থ্যকর। কিন্তু শহরের অপর অংশে ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত, দৃষ্টি বিভ্রমকারী সম্পদে পূর্ণ, এবং সংস্কৃতি চর্চার পীঠস্থান। শহরগুলির মূল বৈশিষ্ট্য ছিল—কর্মসংস্থানের অভূতপূর্ব সুযোগ, সেইসঙ্গে শিক্ষাব্যবস্থা, চিকিৎসা ও সংস্কৃতি চর্চার আকর্ষণ,—যে কারণে গ্রাম ছেড়ে এত লোক দলে দলে শহরে এসেছে।

1.2.2.2.2. শিল্প বিপ্লব

অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানের নবলব্ধ আবিষ্কার ও উন্নত প্রযুক্তি-কৌশলের প্রয়োগে পরিবেশের খনিজ ও জীব সম্পদগুলির অতি বিপুল হারে বিনিয়োগ ও ব্যবহার শুরু হয় ইংল্যাণ্ডে, তারপর সমস্ত ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে,—যা ইতিহাসে শিল্প বিপ্লব নামে খ্যাত। এঙ্গেলস্ (Engels) 1844 খ্রীষ্টাব্দে এই নামকরণ করেন। ইংল্যাণ্ডের গ্রামীণ অর্থনীতি কিভাবে বিস্ময়কর দ্রুত গতিতে (1764-1840) এক সম্পূর্ণ শিল্পনির্ভর অর্থনীতিতে রূপান্তরিত হল তার বর্ণনা এবং ব্যাখ্যা তিনি দিয়েছেন। এটা শুরু হয় 1764 সালে হারগ্রেভের (Hargreave) উদ্ভাবিত যান্ত্রিক প্রযুক্তি বস্ত্রশিল্পে ব্যবহারের মাধ্যমে। কয়েক বছর পর 1769 সালে আর্করাইট (Arkwright) যন্ত্রচালিত তাঁতের ব্যবহার শুরু করেন। ক্রম্পটন (Crompton) যন্ত্রচালিত তাঁতের বহুল প্রচলন করেন 1770 সালে। জেমস্ ওয়াট (James Watt) স্টিম ইঞ্জিন আবিষ্কার করেন 1785 সালে। এই আবিষ্কারগুলি খনির গর্ভ হতে কয়লা উত্তোলন ও অন্যান্য ধাতুর উত্তোলন, বস্ত্রশিল্প, ইস্পাতশিল্প ও সহযোগী অন্যান্য অজস্র শিল্প বিস্তারে সাহায্য করে। সারা পৃথিবী জুড়ে রেলপথ নির্মাণ, জাহাজ নির্মাণ এবং সেই সঙ্গে ভারতসহ পৃথিবীর নানা প্রান্তের উপনিবেশ থেকে নামমাত্র মূল্যে সংগৃহীত অপর্যাপ্ত কৃষিজ ও বনজ সম্পদ এই শিল্পোদ্যোগগুলিকে রাতারাতি সমৃদ্ধ করে তোলে। ইউরোপের অন্যান্য দেশগুলি ঐ একই পন্থা অনুসরণ করে।

এই শিল্প বিপ্লবের সময় থেকেই মানুষের হাতে পরিবেশের গুণগত মানের ব্যাপক পরিবর্তন শুরু হয়। পাইকারী হাতে পণ্য উৎপাদনের সময় যেমন বিপুল পরিমাণে খনিজ পদার্থ এবং বন ও বন্যপ্রাণী বিনাশের প্রয়োজন হয় তেমনিই কলকারখানায় ঐ পণ্য তৈরীর সময় বিপর্যয়কর মাত্রায় নানা বর্জ্য পদার্থ পরিবেশের জল, বাতাস, মাটি ও জনবসতিকে কলুষিত করে তোলে।

এই সময় থেকেই পৃথিবীর সকল উন্নত দেশগুলিতে কয়লা ও পেট্রোলিয়াম থেকে সংগৃহীত শক্তির ব্যবহার অতি বিপুল পরিমাণে বাড়তে শুরু হয়, সেই সঙ্গে পৃথিবীর সকল খনিজ, বনজ ও সামুদ্রিক সম্পদগুলির আহরণ ও ব্যবহার রাতারাতি বাড়তে থাকে। পাশ্চাত্যের প্রায় প্রত্যেকটি দেশই এই সময় থেকে পরিবেশের যাবতীয় সম্পদ থেকে ভোগ্যপণ্যের উৎপাদন ও তার বাণিজ্য বাড়িয়ে যেতে শুরু করে। এই ভোগ্যপণ্যের উৎপাদন ও তার বাণিজ্যের ওপর তাদের অর্থনীতির ভিত স্থাপিত হয়। পরস্পরের মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতার মাধ্যমে পরিবেশের সম্পদগুলি যত বেশী, যত দ্রুত এবং যত বিচিত্ররকমে সম্ভব ভোগ্যপণ্যে রূপান্তরিত করা আরম্ভ হয়। মানুষের প্রয়োজন বোধকেও বাড়িয়ে তোলা হয় বিলাস দ্রব্য ব্যবহারে। নানাবিধ সুগন্ধিদ্রব্য, ফারকোট, মিঙ্ক কোট, হস্তীদন্তের শিল্প প্রসারের ফলে সমুদ্রের দুর্লভ প্রজাতির সীল, সিন্ধুঘোটক, তিমি ও অরণ্যের হস্তীসমূহের সর্বনাশ ঘটে। দূষণ নিয়ন্ত্রণের কোনরকম ব্যবস্থা না থাকায় দেশের ছোট বড় সব শিল্পকেন্দ্রগুলিই পরিবেশ দূষণের মূল উৎস হয়ে ওঠে।

শিল্প বিপ্লবের আগে ইংল্যাণ্ডে তেমন ধোঁয়া, ঝুল-কালি ছিল না বাতাসে। সেখানে ধূসররঙের ওক গাছের গায়ে সাদা রঙের ছোপ ছোপ লাইকেন (lichen) (শৈবাল ও ছত্রাকের সহাবস্থানে সৃষ্ট) প্রচুর জন্মাত এবং তার ওপর এক জাতীয় সাদা রঙের মথ্ (moth) বিস্টন বিটুলারিয়া (*Biston bitularia*) প্রচুর সংখ্যায় বসবাস করত। গাছের ছাল ও লাইকেনের রঙের সঙ্গে এই মথের গায়ের রঙের হুবহু মিল থাকায় তারা অনায়াসেই পাখিদের দৃষ্টি এড়িয়ে আত্মরক্ষা করতে সমর্থ হত এবং অবাধে বংশ বিস্তার করত। এদের মধ্য থেকেই মাঝে মধ্যে কিছু ঘোর কাল রঙের মথের সৃষ্টি হত কিন্তু পাখিদের দ্বারা অচিরেই ধ্বংস হত। শিল্প বিপ্লবের ফলে প্রায় সারা ইংল্যাণ্ডের বাতাসই ধোঁয়া ও ঝুল কালিতে পূর্ণ হয়ে উঠল এবং লাইকেন অধ্যুষিত সাদা ওক গাছের গুঁড়িগুলি কালো ঝুল কালিতে ঢেকে গেল। তখন সাদা রঙের মথগুলি যারা এতদিন নির্বিঘ্নে আত্মরক্ষা করে বেঁচেছিল তারা অতিব্যাপকহারে পাখিদের দ্বারা ধ্বংস হতে লাগল। অন্যদিকে কালরঙের মথগুলি পাখিদের দৃষ্টি এড়িয়ে দিব্যি দ্রুতহারে সংখ্যায় বাড়তে লাগল এবং এক ঘোর কালরঙের প্রজাতির সৃষ্টি করল যার নাম

বিস্টন কার্বোনারিয়া (*Biston carbonaria*)। তারাই শেষ পর্যন্ত টিকে রইল। মনুষ্য-সৃষ্ট দূষণ অন্য প্রজাতির প্রাণীদের মধ্যেও কিভাবে পরিবর্তন ঘটায় এটি তার বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত।

গত শতকে এই পরিবেশ দূষণ যখন ব্যাপকতা লাভ করে তখন এ সম্পর্কে মানুষের জ্ঞান ছিল খুবই অল্প, মূলতঃ সেই কারণেই এর বিরুদ্ধে কোন সার্থক নিয়ন্ত্রণ বা প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি। অবাধে এগুলি বেড়ে ওঠবার সুযোগ পেয়েছে। বস্তুতঃ 1972 সালে স্টকহোম-এ আন্তর্জাতিক বিশ্ব পরিবেশ সম্মেলনের আগে পর্যন্ত পরিবেশ বিষয়টিই যথাযথ গুরুত্ব লাভ করেনি।

1.2.2.2.3. জনসংখ্যা বিস্ফোরণ

বিখ্যাত জীবতত্ত্ববিদ্ চার্লস্ ডারউইন (Charles Darwin) লক্ষ্য করেন পৃথিবীতে কি উদ্ভিদ, কি প্রাণী প্রত্যেকেরই প্রজনন ক্ষমতা অতি বিপুল, কিন্তু তবুও কোন জীবের সংখ্যা অবাধে দীর্ঘকাল ধরে দ্রুতহারে বাড়ছে না। প্রকৃতির মধ্যে নানা বিচিত্র উপায়ে এই সংখ্যা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে, তার ফলে পরিবেশের মধ্যে প্রত্যেকেরই সংখ্যা মোটামুটি একই থাকে। জীবের এই সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকৃতির বাস্তব্যতন্ত্রের (ecosystem) অন্যতম বনিয়াদ, যার অবক্ষয় ঘটলে পরিবেশের নানা ক্ষতিকর পরিবর্তন ঘটে।

নৃতত্ত্ববিদরা বলেন পৃথিবীতে বর্তমান মনুষ্য প্রজাতির (*Homo sapiens*) আবির্ভাব ঘটেছে প্রায় এক লক্ষ বছর আগে, এই সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে মানুষের সংখ্যা বিশেষ বাড়েনি, প্রাকৃতিক উপায়েই তা নিয়ন্ত্রিত হয়ে এসেছে। মাত্র দেড়শ'-দুশ' বছর যাবত এই সংখ্যা বাড়ছে বিপুল হারে। লুই পাস্তুর (Louis Pasteur) প্রথমে রোগ জীবাণুদের বিস্ময়কর কার্যকলাপ ও তার নিয়ন্ত্রণের সার্থক পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। তাঁর এই আবিষ্কার পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই অতি দ্রুত হারে কাজে লাগিয়ে মৃত্যু হার, বিশেষ করে শিশু মৃত্যুর হার নাটকীয়ভাবে কমিয়ে ফেলা হয়। কিন্তু এই মৃত্যুহার কমানোর সঙ্গে সঙ্গে জন্মহার কমানোও যে ঐ বিজ্ঞান-ভাবনা ও তার সার্থক প্রয়োগের অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল তা সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়। মূলতঃ তার ফলে জনসংখ্যা বেড়ে চলল অবাধ গতিতে। 1830 খ্রীষ্টাব্দে পৃথিবীর জনসংখ্যা প্রথম বিলিয়ন বা একশ কোটি স্পর্শ করে। তারপর মাত্র 170 বছরের মধ্যে ছয়গুণ বেড়ে ছয় বিলিয়ন স্পর্শ করেছে। বর্তমানে ভারতের জনসংখ্যা 100 কোটি। 170 বছর আগে এটা সারা পৃথিবীর জনসংখ্যা ছিল। প্রতিবছর অস্ট্রেলিয়ার যা জনসংখ্যা তা ভারতে যুক্ত হচ্ছে। প্রতিদিন ভারতে 72000 শিশু জন্মগ্রহণ করে। এটা পৃথিবীর যে কোন দেশের থেকে বেশী। এর কাছাকাছি আছে চীন, সেখানে 60,000 শিশু জন্মগ্রহণ করে প্রতিদিন। এই জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার উত্তর গোলার্ধের উন্নত দেশগুলির তুলনায় দক্ষিণ গোলার্ধের অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলিতেই বেশী। এই জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, যোগাযোগ ব্যবস্থা ও স্বাস্থ্য পরিষেবার বিরাট চাহিদাও ক্রমবর্ধমান। পরিবেশের সম্পদের বিনিময়েই তা সংগ্রহ করতে হয় এবং তা পরিবেশের বহন ক্ষমতার (carrying capacity) অতিরিক্ত হলে অস্তিত্বের সঙ্কট দেখা দেয়। পৃথিবীর গড় জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বর্তমানে কিছুটা কমের দিকে, ভারতেও পূর্বের তুলনায় এই হার কিছুটা কমেছে, কিন্তু তা যথেষ্ট নয়। বিশ্বব্যাঙ্কের (World Bank) সমীক্ষা অনুসারে 12.4 বিলিয়নের কমে পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার স্থিরতা দেখা যাবে না, জাতিসঙ্ঘের (UNO) হিসাবে এই সংখ্যাটি 14 বিলিয়ন, বর্তমান জনসংখ্যার প্রায় আড়াই গুণ। এখানে উল্লেখ্য, এই জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এ পর্যন্ত খাদ্যশস্যের ফলন বছর বছর বাড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হয়েছে, তারজন্য যথেষ্ট বন ও বন্যপ্রাণী সম্পদ আমাদের হারাতে হয়েছে, প্রতি বছর দুই থেকে আড়াই শতাংশ বনভূমি অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে, অতিরিক্ত রাসায়নিক সার ও কীটনাশক পদার্থ ব্যবহারের ফলে জমির রাসায়নিক চরিত্রেরও পরিবর্তন ঘটছে, সুতরাং ভবিষ্যতে এইভাবে কতদূর যাওয়া সম্ভব হবে সে বিষয়ে একটা বিরাট জিজ্ঞাসার চিহ্ন থেকেই যাচ্ছে।

জীবন নিরবিচ্ছিন্নভাবে শক্তির ব্যবহার করে থাকে, ঐ শক্তি আসে সূর্য থেকে, সবুজ উদ্ভিদ তা সংগ্রহ করে তার অতি বৈশিষ্ট্যময় সালোকসংশ্লেষ বিক্রিয়ার মাধ্যমে। যতটা শক্তি উদ্ভিদ সংগ্রহ করে তার শতকরা 80 ভাগই সে নিজে খরচ করে, জীবাণুরাও তা থেকে ভাগ বসায়—প্রাণীদের কাছে শেষ পর্যন্ত সামান্যই শক্তি এসে পৌঁছায়, তাই পৃথিবীর যে কোন নির্দিষ্ট অঞ্চলে মনুষ্যসহ প্রাণীদের অস্তিত্ব রক্ষা করতে হলে তার চারপাশে বহুগুণ সবুজ উদ্ভিদের অস্তিত্ব বজায় রাখা দরকার। সরল অঙ্কের হিসাবে ন্যূনপক্ষে 99 গুণ বেশী। পৃথিবীতে প্রতিদিন মানুষের সংখ্যা বাড়ছে প্রায় তিনলক্ষ, সুতরাং প্রতিদিন ঐ নূতন জনসংখ্যার খাদ্য বা শক্তির যোগানোর জন্য বিপুল পরিমাণ সবুজের আস্তরণ বাড়িয়ে যাওয়া দরকার,—কিন্তু বাস্তবে প্রতি মিনিটে পৃথিবীতে চারটি ফুটবল মাঠের সমান সবুজের আস্তরণ অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে আমরা এমন একটা যুদ্ধ করছি প্রতিদিন যেখানে পিছু হটছি।

1.2.2.3. পরিবেশ সমস্যার ব্যাপকতা

পরিবেশ দূষণের সমস্যাগুলি শুধু যে স্থানীয় বা একটা নির্দিষ্ট অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে তাই নয়, ক্ষেত্র বিশেষে এগুলি ক্রমশঃ বর্ধিত হয়ে সারা পৃথিবীর জল-বায়ু, জীব জগৎ, নদনদী এবং মহাসমুদ্রের ওপর ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করে। মহাসমুদ্র, মহাকাশ ও দক্ষিণ মেরু মহাদেশ (Antarctica) কোন একটি দেশের নিজস্ব সম্পত্তি নয়, এগুলি পৃথিবীর সকল দেশের এক যৌথ-সম্পত্তি, যাকে বলা হয় গ্রেট কমনস্ (great commons), এই গ্রেট কমনস্‌ও আজ পরিবেশ দূষণে আক্রান্ত।

1896 খ্রীষ্টাব্দে বিখ্যাত সুইডিস বৈজ্ঞানিক সভানতে অ্যারহেনিয়াস্ (Svante Arrhenius) প্রথম আশঙ্কা প্রকাশ করেন, ইউরোপে শিল্প বিপ্লবের ফলে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে যে জীবাশ্ম জ্বালানীর (fossil fuels) দহনজাত বিপুল পরিমাণ কার্বন ডাইঅক্সাইড জমেছে তার ফলে পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা বর্ধিত হয়ে পরিবেশের বিপর্যয় ঘটাতে পারে। সেদিন তাঁর কথায় কেউই কর্ণপাত করেনি। বায়ুমণ্ডলের কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস ধরাপৃষ্ঠের গড় তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রিত করে থাকে। ধরাপৃষ্ঠে প্রতিফলিত সূর্যালোক থেকে যে তাপরশ্মি নির্গত হয় তার উষ্ণতাটুকু সযত্নে ধরে রাখে এই কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস—আমাদের গায়ের গরম জামা যেমন শরীরের উত্তাপকে ধরে রাখে, দেহকে গরম করে রাখে। এই কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস না থাকলে সব উষ্ণতাটুকুই মহাকাশে বিলীন হয়ে যেত, ধরাপৃষ্ঠের গড় তাপমাত্রা নেমে যেত শূন্য ডিগ্রির নীচে, –18° সেলসিয়াসে। পৃথিবী চির তুষারে আচ্ছাদিত থাকত, জীবনের উদ্ভবই হয়ত সম্ভব হত না। জ্বালানীর দহনের ফলে এই গ্যাসের ঘনত্ব ক্রমশঃ বাড়ছে, তার ফলে আজ বিজ্ঞানীরা আশঙ্কা করছেন সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি সহ অসময়ে ঝড়, বৃষ্টি, সাইক্লোন, রোগ, পোকা, ভাইরাসের আক্রমণে কৃষি ও কৃষিজ ফলনের ওপর ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করবে।

জীবনের অন্যতম ধর্ম হল পরিবেশ থেকে যা কিছু সে গ্রহণ করে তা সবই পরিবেশের মধ্যে ফিরিয়ে দেয়। জীবের প্রয়োজনীয় মৌল পদার্থের প্রতিটি পরমাণুই পুনঃ পুনঃ চক্রাকারে ব্যবহৃত হয়ে এসেছে অজৈব থেকে জৈব পদার্থে, জীবাণু দ্বারা পুনরায় ভেঙ্গে তা ফিরে এসেছে তার অজৈব সত্তায়। মানুষের হাতে এই চক্রটি শোচনীয়ভাবে ভেঙে পড়েছে। কৃষিক্ষেত্রে ব্যবহৃত অধিকাংশ সারই কৃষিক্ষেত্রে ফেরৎ আসে না, অরণ্যভূমির সঞ্চিত আদিম সার পদার্থও নয়। বর্তমানে মানুষ অসংখ্য কীটপতঙ্গ ও ছত্রাক নাশক বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থের সংশ্লেষ ঘটিয়েছে, যার অধিকাংশই জীবাণুরা ভাঙ্গতে পারে না, খাদ্য শৃঙ্খলের মধ্যে তা জমছে, জটিল সমস্যার সৃষ্টি করছে। এরমধ্যে ক্লোরিন ঘটিত স্থায়ী কীটনাশক পদার্থ DDT (dichloro-diphenyl-trichloro ethane), BHC (benzene hexachloride), PCB (polychlorinated biphenyls) অ্যালড্রিন (aldrin), ক্লোরডেন (chlordane), লিনডেন (lindane), ডায়েলড্রিন (dieldrin), হেপ্টাক্লোর (heptachlor), মাইরেক্স (mirex), কেপোন (kepone) খুবই উল্লেখযোগ্য। এগুলি পোকা-মাকড় দমনের জন্য গৃহে বা কৃষিক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় এবং মাটিতে দীর্ঘকাল অবিকৃত অবস্থায় থাকে। তারপর খাদ্যশস্যের মাধ্যমে মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর দেহে চর্বিজাতীয়

পদার্থের মধ্যে সঞ্চিত হতে থাকে। সেইসঙ্গে চাষের জমির ধোয়ানী জলের সঙ্গে মিশে নদীতে এবং নদী থেকে সমুদ্রে গিয়ে মেশে, সেখানে মাছ ও অন্যান্য জলচর প্রাণীদের শরীরে জমতে থাকে, এস্কিমোদের শরীরেও বর্তমানে DDT পাওয়া গেছে। মহাসমুদ্র ও মেরু অঞ্চলকেও কলুষিত করছে।

আমাদের নিত্য ব্যবহার্য প্লাসটিক ও নাইলন বিষাক্ত নয়, কিন্তু সহজে বিনষ্ট হয় না, জীবাণুরা এদের ভাঙতে পারে না, তাই এগুলি পরিবেশের মধ্যে স্থায়ী আবর্জনার সৃষ্টি করে। নাইলনের পরিত্যক্ত জাল মহাসমুদ্রের বুকে তিমি, ডলফিন ও অন্যান্য সামুদ্রিক প্রাণীদের অশেষ ক্ষতির কারণ হয়।

মানুষের হস্তক্ষেপে পরিবেশের ক্ষতিকর পরিবর্তন ভূ-পৃষ্ঠের কত উর্ধ্বে এবং জনমানবহীন কত দুর্গম প্রান্তে ঘটতে পারে, দক্ষিণ মেরুর উর্ধ্বাকাশে ক্লোরোফ্লুরো কার্বন (CFC) অনুদের বিক্রিয়ায় ওজোন স্তরের (ozone layer) অবক্ষয় তার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। CFC (chloroflurocarbon) মনুষ্যসৃষ্ট রাসায়নিক পদার্থ যা অতি দীর্ঘকাল অবিকৃত অবস্থায় থাকে। এটি বহুল পরিমাণে রেফ্রিজারেটারে গ্যাস হিসাবে রং, প্লাসটিক, ফোম, স্প্রে ও প্যাকেজিং শিল্পে ব্যবহৃত হয়।

উর্ধ্বাকাশে ওজোনের একটি স্তর থাকায় তা ভেদ করে সূর্যের অতি-বেগুনি রশ্মি (ultra-violet rays) অবাধে পৃথিবীতে আসতে পারে না। যদি তা আসত তাহলে মানুষের চোখে ছানি পড়া, ত্বকের ক্যানসার থেকে শুরু করে জীব জগতের বহু বিপর্যয় ঘটত। ইউনাইটেড নেশন এনভায়রনমেন্ট প্রোগ্রাম (UNEP)-এর এক সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে সতর্ক করা হয়েছে,—এই আলট্রাভায়োলেট রশ্মির প্রভাব যদি ক্রমশঃ বাড়তে থাকে, তাহলে অদূর ভবিষ্যতে সারা পৃথিবী একদিন নির্বীজ ও জীবশূন্য হয়ে পড়বে। এই CFC-রা ওজোন স্তরে গহ্বর সৃষ্টি করে ঐ বিপর্যয় আসন্ন করে তুলেছে।

এখানে বলা দরকার ওজোন অমৃত নয়। পৃথিবীতে অমৃত বলে সম্ভবতঃ কোন কিছুই নেই। অবিমিশ্র কল্যাণকর অথবা অবিমিশ্র ক্ষতিকর বলে কোন বস্তুই সম্ভবতঃ পৃথিবীতে নেই। পৃথিবীর অধিকাংশ বস্তুরই কল্যাণকর ও ক্ষতিকর দুটি স্বতন্ত্র রূপ আছে, সেটা তার ঘনত্ব এবং স্থান, কাল, পাত্রের ওপর নির্ভরশীল। ওজোন এবং অতি-বেগুনি রশ্মি তার ব্যতিক্রম নয়। ওজোন একটি বিষাক্ত গ্যাস,—বিশেষ করে উদ্ভিদের কাছে। অতি সামান্য ঘনত্বের ওজোন গ্যাস তীব্র বিষক্রিয়া সৃষ্টি করে উদ্ভিদ কোষে। শহরে এবং কৃষিক্ষেত্রে ফোটোকেমিক্যাল (photochemical) বিক্রিয়ায় যে সামান্য ওজোন গ্যাস সৃষ্টি হয় তা আমাদের ফুল, ফল ও শস্যের ফলনের প্রচণ্ড ক্ষতি করে থাকে। আবার এই ওজোনই উর্ধ্বাকাশে অতি-বেগুনি রশ্মি শোষণ করে জীব জগতের অস্তিত্ব রক্ষা করে থাকে।

তেমনি অতি-বেগুনি রশ্মিও জীবজগতের কাছে অবিমিশ্র ক্ষতিকর নয়। ওজোন স্তরের সতর্ক পাহারা এড়িয়ে সূর্যোদয়ের সময় যে সামান্য আলট্রা-ভায়োলেট রশ্মি পৃথিবীতে চলে আসে, তা আমাদের ত্বকে ক্যালসিফেরল (calciferol) বা ভিটামিন-ডি (vitamin D)-এর সংশ্লেষ ঘটায়। শিশুদের হাড়ের স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য এই ভিটামিন D অবশ্য প্রয়োজনীয়। সদ্যোজাত শিশুদের তেল মাখিয়ে সকালের রৌদ্রে শুইয়ে রাখটা সম্পূর্ণ বিজ্ঞানসম্মত একটি পুরাতন প্রথা।

মনুষ্যসৃষ্ট পরিবেশের এই পরিবর্তনগুলি—তা জনসংখ্যা বৃদ্ধি জনিত কারণেই হোক অথবা অরণ্য ধ্বংসে বা CFC-র ব্যবহার বা জ্বালানীর দহনের জন্যই হোক—সেগুলি শুরু হয় স্থানীয়ভাবেই কিন্তু তার প্রভাব ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ে সারা পৃথিবীতে। পৃথিবীর অন্যান্য অংশের অধিবাসীরা যারা ঐসব ঘটনার সঙ্গে তেমনভাবে বা আদৌ জড়িত নয় তারাও তার ফল ভোগ করে সমানভাবেই। তাই এইসব সমস্যার মোকাবিলা করতে হলে সারা বিশ্বের কথা মাথায় রেখে শুরু করতে হবে স্থানীয় সহায় সম্পদ নিয়েই—Act locally, think globally—কিন্তু ঐ কাজে সারা বিশ্বের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন ও পূর্ণ সহযোগিতার প্রয়োজন। এখানেও পারস্পরিক নির্ভরতা ও সহযোগিতার ওপর এর চূড়ান্ত সাফল্য নির্ভরশীল।

1.3. পরিবেশের আকস্মিক বিপর্যয় ও ঝুঁকি

1.3.1. প্রাকৃতিক বিপর্যয়

পরিবেশ পরিবর্তনশীল। সময় সময় সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক কারণে পরিবেশের এমন আকস্মিক, বিপর্যয়কর পরিবর্তন ঘটে যা অতি ভয়াবহ ও প্রভূত জীবন ও সম্পদহানিকর। এই প্রাকৃতিক বিপর্যয়গুলির মধ্যে ভূ-কম্পন, অগ্ন্যুৎপাত, সাইক্লোন, হারিকেন, টাইফুন, টর্নাডো, বন্যা পর্বতগাত্রে ধ্বস, ইত্যাদি প্রধান।

1.3.1.1. ভূকম্পন (Earthquakes)

প্রায় প্রতি বছরই পৃথিবীর কোথাও না কোথাও ভূমিকম্পে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি ও জীবনহানি ঘটে থাকে। পৃথিবীতে অনেকগুলি ভূ-কম্পনপ্রবণ এলাকা আছে,—যেমন জাপান, চীন, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইনস্, মধ্য এশিয়া, ক্যালিফোর্নিয়া, পেরু, ইত্যাদি,—ভূ-কম্পনের সম্ভাবনা ঐসব অঞ্চলেই বেশী, তবে পৃথিবীর যে কোন স্থানে যে কোন মুহূর্তে ভূমিকম্প ঘটতে পারে এবং ঐ সম্পর্কে কোন ভবিষ্যৎ বাণী করা সম্ভব নয়। 1999, 21শে সেপ্টেম্বর তাইওয়ানে যে ভয়াবহ ভূ-কম্পন হয় তাতে দু'হাজারের বেশী নরনারীর জীবনহানি ঘটে, রিকটার স্কেলে (Richter scale) এর তীব্রতা ছিল 7.6, ভূ-কম্পনের অব্যবহিত পর আরও বহুবার ঐ অঞ্চলে কম্পন অনুভূত হয়, যার তীব্রতা ছিল 6.8 থেকে 6.0 রিকটার। 1999, 17ই অগাস্ট তুরস্কের ইজমিত শহরটিকে কেন্দ্র করে যে প্রবল ভূ-কম্পন হয় তাতে 15000 মানুষ প্রাণ হারায়। এর তীব্রতা ছিল 6.7 রিকটার। এখানে পৃথিবীর আরো কয়েকটি ভয়াবহ বিপর্যয়কর ভূ-কম্পনের উল্লেখ করা হল, বন্ধনীর মধ্যে রিকটার স্কেলে তীব্রতার উল্লেখ করা হয়েছে : 1991 উত্তর ভারত, মৃতের সংখ্যা 744 (6.1)। 1988 আর্মেনিয়া, মৃতের সংখ্যা 25,000 (7.6)। 1976 তাংসান, চীন, মৃতের সংখ্যা 2,42,000 (8.2)। 1970 পেরু, প্রাণ হারায় 66000 জন (7.7)। 1935
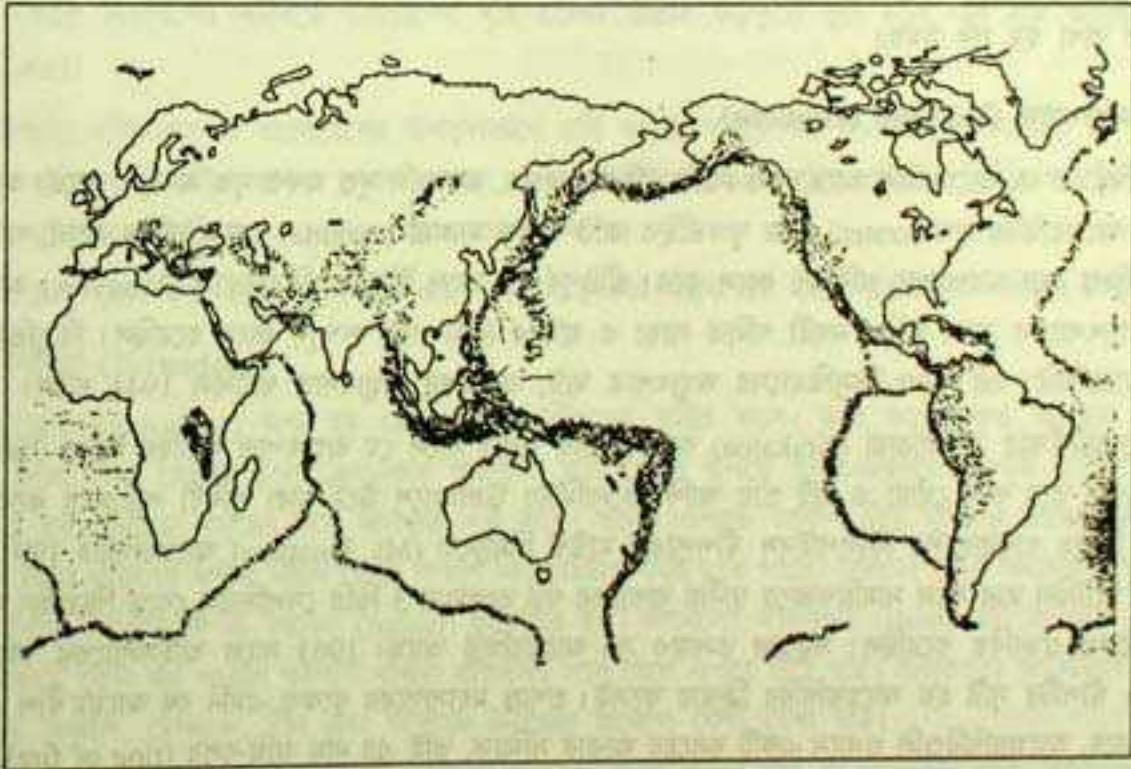
চিত্র 1.4. বেশির ভাগ ভূমিকম্প পৃথিবীর কতকগুলি মোটামুটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে হয়ে থাকে (চিত্রের অপেক্ষাকৃত গাঢ় জায়গাগুলি)। মানচিত্রে যে বিশেষ অঞ্চলগুলিতে ভূ-পৃষ্ঠের নীচে অবস্থিত টেকটনিক প্লেটগুলির মধ্যে সংঘর্ষ হতে পারে সেই সম্ভাব্য স্থানগুলিকে চিহ্নিত করা হয়েছে।

কোয়েটা, পাকিস্তান, প্রাণ হারায় 60,000 জন (7.5) । 1923 টোকিও মৃতের সংখ্যা 1,43,000 (8.3)। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মধ্যে ভূ-কম্পনেই ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ সর্বাপেক্ষা বেশী হয়।

অনেক কারণে ভূ-কম্পন ঘটে থাকে তার মধ্যে প্রধান হল ধরাপৃষ্ঠ যে টেক্‌টনিক্ প্লেট (tectonic plates) গুলির ওপর অবস্থিত তারা যখন ধীরে ধীরে সরে যায় তখন তারা অনেক সময় মুখোমুখি সংঘর্ষ বা একের ওপর অন্যটি উঠে পড়বার চেষ্টা করে, ফলে অকল্পনীয় শক্তির মুক্তি ঘটে যা সিস্‌মিক তরঙ্গের (seismic wave)আকারে ভূ-গর্ভে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং তার প্রচণ্ড চাপে ভূমি কম্পিত হয়, ঘরবাড়ী তাসের ঘরের মত ভেঙ্গে পড়ে। এই শক্তির পরিমাণ একটি উদাহরণের সাহায্যে বোঝান যায়,—হিরোসিমায় যে পরমাণু বোমা ফেলা হয়েছিল—সাধারণত তার থেকে কয়েক হাজার গুণ বেশী শক্তির মুক্তি ঘটে এই সংঘর্ষকালে। সমুদ্রেও ভূ-কম্পন অনুভূত হয়, সমুদ্রের ঢেউ অতি তীব্র গতিতে (সর্বাধিক ঘন্টায় ৪00 কিলোমিটার) চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে, উপকূলের কাছে এর গতি হ্রাস পায়, কিন্তু উচ্চতা ভয়াবহ আকার (সর্বাধিক 50 মিটার) ধারণ করে এবং প্রবল জলোচ্ছ্বাস ঘটায়।

অ্যামেরিকান ভূ-বিজ্ঞানী চার্লস রিকটার (Charles Richter) রিকটার স্কেলে ভূ-কম্পন পরিমাপ পদ্ধতির প্রচলন করেন। এই পদ্ধতির সাহায্যে সিস্‌মোগ্রাফে (seismograph) সিস্‌মিক তরঙ্গের প্রসারতা (amplitude) মাপা হয় এবং এর মাত্রা লগারিদম-এ (logarithm) প্রকাশ করা হয়, অর্থাৎ 7 রিকটার 6 রিকটার থেকে দশগুণ বেশী, ইত্যাদি।

ভূ-কম্পন নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়, তবে এর ক্ষয়-ক্ষতি কিছুটা হ্রাস করা সম্ভব। ভূ-কম্পন প্রবণ এলাকায় বিশেষ ধরনের বাড়ী তৈরি করা হয়। আগে জাপানে কাঠের বাড়ী তৈরি হত, বর্তমানে বিশেষ ধরণের বাড়ী তৈরি হয় ভূমিকম্পের সময় যাতে সহজে ভেঙ্গে না পড়ে। ক্যালিফোর্নিয়ার সানফ্রান্সিস্‌কো শহরে ভূমিকম্পের সম্ভাবনা এত প্রবল যে প্রত্যেক গৃহস্থকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে—একটি ঘরে এক সপ্তাহের মত খাদ্য, পানীয়, টর্চ, ফার্স্ট-এড বক্স, খনন করবার যন্ত্র ইত্যাদি যেন মজুত রাখা হয় সব সময়।

1.3.1.2. অগ্ন্যুৎপাত (Volcanic eruptions)

পৃথিবীতে বহু আগ্নেয়গিরি আছে। কতকগুলি সক্রিয় অবস্থায়, অন্যগুলি সুপ্ত অথবা মৃত অবস্থায় আছে। অগ্ন্যুৎপাতের সময় এই আগ্নেয়গিরির মুখ (crater) দিয়ে ভূগর্ভস্থিত অতি উত্তপ্ত ম্যাগমা (magma) থেকে গলিত লাভা, গ্যাস ও ছাই উর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হয়ে চারপাশের পরিবেশ ধ্বংস করে। খ্রীষ্টপূর্ব 79 সালে ইটালীর ভিসুভিয়াস্ (Vesuvius) আগ্নেয়গিরির ভয়াবহ অগ্ন্যুৎপাতের ফলে পম্পি নগরী গলিত লাভা ও ছাই-এ ঢাকা পড়ে সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়েছিল। ভিসুভিয়াস্ একটি সক্রিয় আগ্নেয়গিরি। এর পরও ভিসুভিয়াসের অগ্ন্যুৎপাত ঘটে, এর শেষ অগ্ন্যুৎপাত ঘটেছিল 1944 সালে।

ইন্দোনেশীয়ার ক্রাকাতোয়া (Krakatoa) আগ্নেয়গিরির 1983 সালে যে অগ্ন্যুৎপাত ঘটেছিল তাঁতে 36000 জনের প্রাণহানি ঘটে। তার কাল ধোঁয়া ও ছাই প্রায় আশি কিলোমিটার উর্ধ্বাকাশে উঠে সারা পৃথিবী পরিক্রমণ করেছিল। দীর্ঘ 600 বছর নিদ্রিত থাকবার পর ফিলিপাইনস্ দ্বীপপুঞ্জের মাউন্ট পিনাটুবো (Mt. Pinatubo) আগ্নেয়গিরির 1991 সালে যে অগ্ন্যুৎপাত ঘটেছিল তার ফলে সাময়িকভাবে স্থানীয় বাতাসের গড় তাপমাত্রা 3 ডিগ্রি সেলসিয়াস্ বেড়ে গিয়েছিল যা পৃথিবীর আবহাওয়াকেও প্রভাবিত করেছিল। সমুদ্রের তলায়ও বহু আগ্নেয়গিরি আছে। 1963 সালে আইসল্যান্ডের কাছে সুরট্‌সে (Surtsey) দ্বীপটির সৃষ্টি হয় আগ্নেয়গিরির ক্রিয়ার ফলেই। প্রশান্ত মহাসাগরের বুকেও এমনি বহু আগ্নেয় দ্বীপ (volcanic island) আছে, আগ্নেয়গিরিগুলি ওখানে একটি বলয়ের আকার সজ্জিত, তাই এর নাম অগ্নি-বলয় (ring of fire), বিজ্ঞানীরা মনে করেন সুদূর অতীতে এই আগ্নেয়গিরির ক্রিয়ায় সমুদ্রের জল ও বায়ুমণ্ডলের সৃষ্টি হয়েছিল, জীবনের উদ্ভব ও স্থায়িত্বে আগ্নেয়গিরির অবদান তাই অনস্বীকার্য।

আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের সময় ভূ-কম্পনও হয়। অনেক ক্ষেত্রে আগে থেকেই মৃদু ভূ-কম্পন ও গ্যাসের নিঃসারণ শুরু হয় সেটা অগ্ন্যুৎপাতের পূর্বাভাষ হিসাবে বিবেচনা করে স্থানীয় অধিবাসীরা সতর্ক হয় এবং নিরাপদ স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করে। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কিছুটা এড়ান সম্ভব হয়।

1.3.1.3. সাইক্লোন (Cyclones), টাইফুন (Typhoons), হারিকেন (Hurricanes)

এই তিনটিই প্রবল সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড়ের বিভিন্ন নাম, পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন নামে অভিহিত হয়ে থাকে। ভারত মহাসাগরে সৃষ্ট ঘূর্ণিঝড় যা ভারত, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা, মায়ানমারের ওপর আছড়ে পড়ে তাকে বলে সাইক্লোন (cyclones)। প্রশান্ত মহাসাগরে সৃষ্ট ঘূর্ণিঝড় যা জাপান সহ দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার বিভীষিকা তার নাম টাইফুন (typhoons)। আবার উত্তর আটল্যান্টিক (North Atlantic) থেকে ক্যারিবিয়ান সাগর (Caribbean sea) পর্যন্ত অঞ্চলে সৃষ্ট এই ঘূর্ণিঝড় যা আমেরিকার পূর্ব উপকূল ও ওয়েস্ট ইন্ডিজে ধ্বংসলীলা ঘটায়, সেখানে এর নাম হারিকেন (hurricanes)।

নিরক্ষরেখার কাছাকাছি অঞ্চলে অনেক সময় সমুদ্রের ওপরের বাতাস উত্তপ্ত হয়ে অতি দ্রুত উর্ধ্বে উঠে যায়, তখন প্রবল নিম্নচাপের সৃষ্টি হয়। ঐ স্থান দখল করতে চারপাশ থেকে ঠাণ্ডা বাতাস তীব্র বেগে ছুটে আসে এবং ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড়ের সৃষ্টি করে। ঐ অঞ্চলের বায়ুস্রোতে বৃষ্টি ঝড় ঘণ্টায় সর্বাধিক 300 কিলোমিটার গতিতে ছুটে চলে, প্রায় ৪00 কিলোমিটার দূরত্ব অবধি এর তাণ্ডব লীলা বিস্তৃত হয়। আকাশের জলকণা পূর্ণ ঘন মেঘের প্রভাবে (cumulonimbus clouds) ঐ সময় প্রবল বর্ষণ শুরু হয় এবং সমুদ্রের জলরাশি সর্বাধিক প্রায় আট মিটার পর্যন্ত ফুলে ফেঁপে ওঠে, তার ফলে উপকূলভাগ অঞ্চলে একই সঙ্গে ঝড়-বৃষ্টি, সমুদ্রোচ্ছ্বাস ও বন্যার তাণ্ডব শুরু হয়, কয়েকদিন পর্যন্ত তা স্থায়ী হতে পারে। এই ঘূর্ণিঝড়ের কেন্দ্রবিন্দু অপেক্ষাকৃত শান্ত, তার নাম চক্ষু (eye)। উত্তর গোলার্ধে এই ঝড় ডান দিক থেকে বাঁ-দিক (anti-clockwise) এবং দক্ষিণ গোলার্ধে বাঁ-দিক থেকে ডানদিকে (clockwise) ঘুরপাক খায়। সময় সময় সম্পূর্ণ বিপরীত কারণেও সাইক্লোনের সৃষ্টি হয়। কেন্দ্রে নিম্নচাপের পরিবর্তে উচ্চচাপের সৃষ্টি হলেও বাতাস ঝড়তুলে ছুটে চলে, এর নাম অ্যান্টি সাইক্লোন (anti-cyclone)।

আমাদের দক্ষিণবঙ্গে ও বাংলাদেশের উপকূলভাগে প্রতি বছরই সাইক্লোনের জন্য প্রভূত ক্ষয়ক্ষতি ও জীবন হানি ঘটে থাকে। পরিবেশ বিজ্ঞানীরা আশঙ্কা প্রকাশ করছেন মনুষ্য সৃষ্ট গ্রীনহাউস এফেক্টের প্রভাবে পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে এই সাইক্লোনের সৃষ্টি ও ভয়াবহতা আরও বাড়তে পারে।

সাইক্লোন রোধ করা সম্ভব নয়, তবে এর পূর্বাভাস দেওয়া সম্ভব যার ফলে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কিছুটা কমে।

1.3.1.4. টর্নাডো (Tornadoes)

টর্নাডোর (tornadoes) জন্ম হয় মেঘসম্পৃক্ত ঘূর্ণিঝড়ের সৃষ্টির ফলে। তবে অপেক্ষাকৃত অল্পস্থান জুড়ে এর ধ্বংসলীলা চলে, কিন্তু যেখানে চলে সেখানকার গাছপালা মাটি থেকে উপড়ে স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি মাটি থেকে তুলে দূরে নিক্ষিপ্ত হয়। টর্নাডো সমুদ্রের বুকে জলস্তম্ভ সৃষ্টি করে। স্থলের ওপরও আকাশ ছুঁয়ে ঘূর্ণিঝড় স্তম্ভের আকারে ছুটে আসে। এর চলার গতিবেগ ঘণ্টায় চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ কিলোমিটার পর্যন্ত হতে পারে। টর্নেডো সৃষ্টির অব্যবহিত পূর্বে মেঘের তলাকার বাতাস নিম্নচাপযুক্ত ও ফানেল (funnel) আকৃতির হয়। ফানেলের দীর্ঘনলটি (stem) মাটিতে এসে মেশে, এই নলের কাছাকাছি কোন বস্তু পড়লে ঘুরপাক খাওয়া বাতাসের সঙ্গে মিশে ওপরে উঠে যায়। সাধারণতঃ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ব উপকূল অঞ্চলে, মেক্সিকো, চীন এবং জাপানে টর্নাডোর প্রকোপ বেশী দেখা যায়।

টর্নাডোর পূর্বাভাষ দেওয়া সম্ভব। কিন্তু হাতে এত অল্প সময় পাওয়া যায় যে ক্ষয়ক্ষতি এড়ান অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সম্ভব হয় না।

1.3.1.5. বন্যা (Floods)

নদীর জল ধারণের একটা নির্দিষ্ট সীমা আছে। সময় সময় ঐ সীমা ছাড়িয়ে যখন তার চেয়ে বেশী জল নদীতে চলে আসে তখন দুকূল ছাপিয়ে ঐ অতিরিক্ত জল নদীতীরবর্তী অঞ্চল প্লাবিত করে,—এরই নাম বন্যা (floods)।

অনেক কারণে বন্যা হয়। নদীর অববাহিকা অঞ্চলে অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত ঘটলে অথবা পর্বতের বরফগলা জলে যে সব নদীর সৃষ্টি সেখানে নানা কারণে বরফগলা জলের পরিমাণ বর্ধিত হলে বন্যা হতে পারে। তাছাড়া সমুদ্র উপকূলে সাইক্লোন বা ভূমিকম্পজনিত সমুদ্রোচ্ছ্বাসে বা নানা ভূ-তাত্ত্বিক পরিবর্তনের ফলেও বন্যার সৃষ্টি হতে পারে।

বন্যার সৃষ্টি ও তার পৌনঃপুনিকতা বৃদ্ধিতেও মানুষের কিছু ভূমিকা আছে। নদীর অববাহিকা অঞ্চলে অরণ্য উচ্ছেদ করে ব্যাপক চাষবাস করার ফলে মাটি আলগা হয় এবং জলে ধুয়ে ঐ আলগা মাটি পলির আকারে নদীগর্ভে জমতে থাকে, তাতে নদীর জল ধারণের ক্ষমতা কমে, তাই বর্ষাকালে স্বাভাবিক বৃষ্টিপাত ঘটলেই বন্যাপ্রবণ এলাকাগুলি প্রতি বছর প্লাবিত হয়। এই বন্যার ফলে অতি বিপুল পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতি, ধন-প্রাণ ও ফসলহানি ঘটে থাকে, মানুষের দুর্গতির অবধি থাকে না। জল দূষণের জন্য বন্যার পর নানা ব্যাধির প্রাদুর্ভাব ঘটে। বন্যা কবলিত অঞ্চলে জলে ডুবে মৃত্যু অপেক্ষা এই ব্যাধির প্রকোপেই বেশী মৃত্যু হয়।

বন্যা নিয়ন্ত্রণে নানা ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব। প্রথমত বন্যা-প্রবণ এলাকাগুলি আগে থেকে সঠিকভাবে চিহ্নিত করা, ঐ স্থানের নদীর পাড়গুলি উচ্চ করা (dike), পাড় বাঁধান, বন্যার সময় নদীর অতিরিক্ত জল অন্যত্র স্থানান্তরিত করা বা ঐ স্থানেই ধরে রাখবার জন্য বাঁধ নির্মাণ করা। অববাহিকা অঞ্চলে বনসৃজন করা, উচ্চ ভিতের ওপর গৃহ নির্মাণ করা ইত্যাদি। আমাদের দেশে বন্যাপ্রবণ এলাকাগুলিতে খুঁটির ওপর গৃহ-নির্মাণ পদ্ধতি প্রচলিত আছে। ঐ সব এলাকার অধিবাসীরা নদী ও বন্যার সঙ্গে বসবাস করে আসছে দীর্ঘকাল ধরে।

বন্যার পূর্বাভাস দেওয়া সম্ভব। নদীর জলের উচ্চতা বিপদসীমা লঙ্ঘন করলে বন্যার সতর্কবাণী প্রেরণ করা হয় এবং বন্যা কবলিত অঞ্চলগুলি থেকে নিরাপদ স্থানে অধিবাসীদের স্থানান্তর সহ নানা বিপদকালীন ত্রাণ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এজন্য পূর্ব থেকেই উচ্চস্থানে সাময়িক বাসস্থানের ব্যবস্থা করা খাদ্য ও পানীয় মজুত করে রাখা ও রোগ প্রতিষেধক টিকা গ্রহণ ইত্যাদি। এগুলি আগে থেকেই করা প্রয়োজন।

1.3.1.6. ধ্বস (Landslides)

পর্বতগাত্রে ক্ষুদ্র থেকে অতি বিরাট প্রস্তরখণ্ডের সমষ্টি মাটি ও বিরাট বিরাট গাছপালা নিয়ে সময় সময় অভিকর্ষের প্রভাবে নিচে গড়িয়ে পড়ে। গড়িয়ে পড়বার সময় তার আঘাতে আরো বহু বড় বড় প্রস্তরখণ্ড স্থানচ্যুত হয়ে বাড়ীঘর চূর্ণ করে বিপর্যয়ের সৃষ্টি করে। অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত, গাছপালার অসম বৃদ্ধি, সতর্কতামূলক নিয়ম অনুসরণ না করে অতিরিক্ত ঘর-বাড়ী তৈরি, পর্বতগাত্র খনন, ঝড়, ভূমিকম্প ইত্যাদি এই ধ্বস (landslides) নামার কারণ। পর্বতগাত্রে জমা তুষারের ভার ও হিমবাহের গতির ফলেও ধ্বস নামতে পারে।

এই ধ্বস নামার সঠিক পূর্বাভাস দেওয়া সম্ভব না হলেও সাধারণতঃ ঝড় ও প্রবল বৃষ্টিপাতের সময় এটা বেশী ঘটে থাকে। আশঙ্কাজনক কোণ (angle) সৃষ্টি করে বেড়ে ওঠা মহীরুহ উচ্ছেদ করে ও পর্বতের বিশেষ বিশেষ স্থানে জমা তুষার সরিয়ে এবং ছোট বড় প্রাচীর সৃষ্টি করে এই বিপর্যয় নিবারণের চেষ্টা করা হয়ে থাকে।

1.3.2. মনুষ্যসৃষ্ট বিপর্যয়

মানুষের অসতর্কতা, ভুল সিদ্ধান্ত বা অজ্ঞতার জন্যও বহু আকস্মিক বিপর্যয় ঘটে থাকে যার জন্য ব্যাপক জীবনহানিসহ পরিবেশের অপূরণীয় ক্ষতি হয়। এখানে তিনটি উদাহরণ দেওয়া হল :

1.3.2.1. ভূপাল গ্যাস দুর্ঘটনা (Bhopal gas tragedy)

1984 সালের ডিসেম্বর তিন তারিখের মধ্য রাত্রে ভূপাল শহরে কীটনাশক দ্রব্য প্রস্তুত কারক ইউনিয়ন কার্বাইডের (Union Carbide) কারখানায় দুর্ঘটনাবশতঃ যে অতি বিষাক্ত মিক (MIC) গ্যাস বা মিথাইল আইসোসায়ানেট (methyl isocyanate) মুক্ত পরিবেশে নিঃসৃত হয়েছিল তার ফলে সরকারী রিপোর্টের হিসাবে 2300 মানুষ মারা যায় (UNICEF এর বেসরকারী হিসাবে দুর্ঘটনার এক সপ্তাহের মধ্যে 10,000 মানুষ মারা যায়), দু'লক্ষ মানুষ পঙ্গু হয়। আরো কয়েক লক্ষ মানুষ নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সবশুদ্ধ প্রায় পাঁচলক্ষ মানুষ ক্ষতিপূরণের দাবী জানায়। শিল্পক্ষেত্রে দুর্ঘটনার ইতিহাসে এটাই পৃথিবীর সবথেকে ভয়াবহ ও জীবনহানিকর দুর্ঘটনা। এই দুর্ঘটনার ফলে মানুষ ছাড়াও অসংখ্য গবাদি পশু, জীবজন্তুর মৃত্যু ও পরিবেশের গাছপালার অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছিল।

এই কারখানায় কীটনাশক সেভিন (sevin) উৎপাদনের জন্য মিক প্লান্ট (MIC Plant) স্থাপিত হয়েছিল। এই মিক বা মিথাইল আইসোসায়ানেট অতি বিষাক্ত, উদ্বায়ী পদার্থ। এই মিকের সঙ্গে আলফা ন্যাপথলের (alpha napthol) সংযোগে সেভিন তৈরি হয়। সেভিন কার্বারিল (carbaryl) শ্রেণীর কীটনাশক। অতি বিষাক্ত ফসজিনের (phosgene) সঙ্গে মিথাইল অ্যামিনের (methyl amine) সংযোগে এই মিক্ (MIC) বা মিথাইল আইসোসায়ানেট তৈরি হয়। স্বাভাবিক তাপমাত্রায় এটি গ্যাসীয় পদার্থ কিন্তু জলের সঙ্গে বিক্রিয়া ঘটলে তাপ ও চাপের সৃষ্টি হয়। কারখানায় দ্বিস্তর যুক্ত বিরাট স্টেনলেস স্টিল ট্যাঙ্কের মধ্যে এই মিক্ গ্যাস 0°C তাপমাত্রায় রক্ষিত ছিল।

দুর্ঘটনার দিন রাত্রে রেফ্রিজারেশন যন্ত্র বিকল হয়ে যায়। অনুসন্ধান কমিটির ধারণা এই সময় বেশ কিছু জল মিক্ গ্যাসের সংস্পর্শে আসে, তার ফলে ট্যাঙ্কের মধ্যে তাপ ও চাপ দুইই বেড়ে যায় ভয়াবহ মাত্রায় (তাপমাত্রা প্রায় 200°C এবং চাপ প্রায় 180 psi)। দুঃখের বিষয় যাবতীয় নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা ঠিকমত কাজ না করায় সেফটি ভাল্ব উন্মুক্ত হয়ে দীর্ঘ দু'ঘণ্টা ধরে প্রায় 36 টন বিষাক্ত মিক্ গ্যাস বাইরের বাতাসের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল । যে যন্ত্রটি (scrubber) এইভাবে নিঃসৃত গ্যাসকে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় নিষ্ক্রিয় করে পুনরায় একটি খালি ট্যাঙ্কে ফিরিয়ে আনবার জন্য লাগান হয়েছিল,—সম্পূর্ণ ভুল বশতঃ তার পাম্পটিকে চালান হয়নি। এইভাবে নিঃসৃত গ্যাসকে পুড়িয়ে ফেলবার জন্যও (MIC একটি দাহ্য পদার্থ) একটি অগ্নিশিখা তৈরির ব্যবস্থা ছিল,—ঐ অংশটি সেদিন পরিষ্কার করবার জন্য খুলে রাখা হয়েছিল। সবচেয়ে ক্ষতির কারণ হয়েছিল ঐ কারখানার পাঁচিল ঘেঁষে হাজার হাজার মানুষের বস্তী তৈরি করে বসবাসের জন্য—যাদের ঐ গ্যাসের বিষক্রিয়া বা ঐ সময়ে কি করা উচিত সে সম্পর্কে কোন জ্ঞানই ছিল না। সুতরাং যতদুর ক্ষতি হওয়া সম্ভব সেদিন তাই ঘটেছিল।

1.3.2.2. চেরনোবিল দুর্ঘটনা (Chernobyl accident)

1986 খ্রীষ্টাব্দে 26শে এপ্রিল রাত দেড়টার সময় পূর্বতন সোভিয়েট ইউনিয়নের চেরনোবিল পরমাণু শক্তি কেন্দ্রের চার নম্বর রিঅ্যাক্টারে যে বিপর্যয় ঘটেছিল, পৃথিবীর পরমাণু দুর্ঘটনার মধ্যে তা ছিল বৃহত্তম ও ভয়ঙ্করতম। চেরনোবিল দুর্ঘটনার পেছনে যন্ত্র এবং মানুষ দুইই সমানভাবে দায়ী ছিল। রিঅ্যাক্টরের ডিজাইনই ছিল ত্রুটিপূর্ণ, আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী নয়। বৃটেন 1947 সালে দুর্ঘটনার আশঙ্কায় এই ধরনের ডিজাইন বাতিল করে দেয়। দ্বিতীয়ত দুর্ঘটনার দিনে ভারপ্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়াররা এক অননুমোদিত মারাত্মক পরীক্ষায় রত হয়েছিলেন,—তাঁরা দেখছিলেন স্টিম বন্ধ করে দেবার পর টারবাইনের ফ্রি হুইল কিছুক্ষণের জন্য যে আপনা-আপনি ঘোরে, তাতে স্বল্পক্ষণের জন্য যে বিদ্যুৎ শক্তি উৎপন্ন হয়, তাতে রিঅ্যাক্টার ঠাণ্ডা করবার জলের পাম্পগুলি কাজ করে কিনা। রিঅ্যাক্টরটি এর ফলে ক্রমশই উত্তপ্ত হয়ে উঠছিল, পরমাণু চুল্লিটি ঠাণ্ডা করবার যে স্বয়ংক্রিয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছিল, পরীক্ষারত ইঞ্জিনিয়াররা পরীক্ষার খাতিরে আগেই তা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। সুতরাং তাপমাত্রা

দ্রুত বিপদসীমা ছাড়িয়ে গেল এবং পাইল-ক্যাপ (pile-cap) বিস্ফোরিত হয়ে বিপুল তেজস্ক্রিয়তা ব্যাপকভাবে আকাশে-বাতাসে, মাটিতে, জলে ছড়িয়ে পড়ল। তিন থেকে পনেরো কিলোমিটারের মধ্যে চব্বিশ হাজার মানুষ 350 থেকে 550 msv তেজস্ক্রিয়তায় স্নাত হল, যার ঐ অঞ্চলে স্বাভাবিক মাত্রা ছিল মাত্র 2.4 msv। তাৎক্ষণিক তেজস্ক্রিয়তার প্রভাবে 28 জনের মৃত্যু ঘটল, দু-জন রাবিশ চাপা পড়ে মারা গেল। পরমাণু শক্তি কেন্দ্র থেকে ত্রিশ কিলোমিটার ব্যাসার্ধের মধ্যের সকল অধিবাসীকে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যেতে হল, যাদের সংখ্যা ছিল এক লক্ষের ওপর। তেজস্ক্রিয়তার বিলম্বিত প্রভাব আগামী পঞ্চাশ বছর ধরে এদের বহন করতে হবে। এই তেজস্ক্রিয়তা বায়ুস্রোতের সঙ্গে মিশে সারা ইউরোপ ও এশিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছিল, দূরত্ব বৃদ্ধির সঙ্গে যদিও তার মাত্রা কমে গিয়েছিল।

এই তেজস্ক্রিয়তা পরবর্তী প্রজন্মের কতদূর ক্ষতি করে তার প্রমাণ এক বছরের মধ্যেই পাওয়া গেল। দূরবর্তী চাষীদের খামারে গরু-বাছুর, শূকরছানা ও অন্যান্য জন্তু বিকৃত অঙ্গ নিয়ে জন্মাল, কারও পা নেই, কারও চোখ নেই, কারও মাথা নেই। পরের বছরও এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হল। দেশের কর্তৃপক্ষ তাই ঐ অঞ্চলের নারীদের সন্তান ধারণ না করবার জন্য পরামর্শ দিয়েছিলেন।

চেরনোবিল দুর্ঘটনার আগে ও পরে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে পরমাণুশক্তি কেন্দ্রে ছোট বড় অনেক দুর্ঘটনা ঘটেছে, যেমন—1957 সালে ইংল্যান্ডের কামব্রিয়ার অন্তর্গত উইন্ডস্কেল পরমাণু কেন্দ্রের দুর্ঘটনা, 1979 সালে 28 শে মে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের পেনসিলভেনিয়ায় থ্রি-মাইল আইল্যান্ড পরমাণু শক্তিকেন্দ্রের দুর্ঘটনা এবং অতি সম্প্রতি 1999 সালে সেপ্টেম্বর মাসে জাপানে তোকাইমুরা (Tokaimura) শহরের পরমাণু কেন্দ্রের দুর্ঘটনা ইত্যাদি।

পরমাণু কেন্দ্রের দুর্ঘটনার সঙ্গে প্রাকৃতিক বিপর্যয় সহ অন্যান্য দুর্ঘটনার প্রধান তফাৎ হল এর ক্ষতিকর প্রভাব জন্ম-জন্মান্তর ধরে বহন করতে হয়। 1945 সালে হিরোসিমা ও নাগাসাকিতে যে পরমাণু বোমা ফেলা হয়েছিল তার বিভৎস প্রভাব পরবর্তী প্রজন্মের মানুষ আজও বহন করছে।

1.3.2.3. মিনামাটা ব্যাধি (Minamata disease)

1955 খ্রীষ্টাব্দে জাপানে মিনামাটা উপসাগরের কূলের অধিবাসীরা ঐ সমুদ্রের মাছ খেয়ে পারদ ঘটিত এক দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয় এবং বহু মানুষের মৃত্যু ঘটে ও অসংখ্য মানুষ স্থায়ীভাবে পঙ্গু হয়, এরই নাম মিনামাটা ব্যাধি। জাপানের ঐ অঞ্চলে চিসো কেমিক্যাল নামে এক ফ্যাক্টরিতে প্লাসটিক পেন্ট তৈরি হত। ঐ ফ্যাক্টরির বর্জ্য পদার্থরূপে পারদযুক্ত যৌগ প্রচুর পরিমাণে সমুদ্রে ফেলা হত। পূর্বাহ্নে এই সম্পর্কে কোন ভাবনা চিন্তাই করা হয়নি। তার ফলে ঐ জলের পরিবেশে বিষাক্ত মিথাইল মার্কারী (methyl mercury) জমা হতে থাকে। প্রথমে তা আণুবীক্ষণিক শৈবালের দেহে, তা থেকে আণুবীক্ষণিক প্রাণিদেহে, তা থেকে ছোট মাছ এবং বড় মাছ শেষে ঐ মাছ থেকে মানুষের দেহে ঐ পারদ ক্রমশঃ অধিক ঘণত্বে পরিবাহিত হতে থাকে। প্রাণহানিসহ পরিবেশের ব্যাপক বিপর্যয় ঘটে। যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল তারা আইনের সাহায্য নিয়ে দীর্ঘ সংগ্রাম করে ঐ দূষণ বন্ধ করেছিল এবং ক্ষতিপূরণ সংগ্রহে সক্ষম হয়েছিল। দূষণের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের জয় হিসাবে এটি পৃথিবীর সর্বত্র আদৃত হয়ে থাকে।

1.3.3. পরিবেশের ঝুঁকি ও পরিবেশ সংঘাত সম্পর্কে মূল্যায়ন

আর্থসামাজিক উন্নয়নের জন্য, কৃষিকার্যের জন্য অথবা নিছক জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্য পরিবেশের সম্পদগুলি আমাদের প্রতিনিয়ত ব্যবহার করতে হয়, তার ফলে পরিবেশের সঙ্গে আমাদের নিয়ত সংযোগ ও সংঘাত (impact) ঘটেছে। উত্তরোত্তর ব্যাপকভাবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে ব্যবহার করা হচ্ছে এই উদ্দেশ্যে। তাই সকল ক্ষেত্রেই এই সব কাজের ফলে পরিবেশের মান অবক্ষয়ের অথবা সম্ভাব্য বিপর্যয়ের একটা ঝুঁকি (risk) থেকেই যায়।

মনুষ্যসৃষ্ট পরিবেশের বিপর্যয়ের এর আগে তিনটি উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। উন্নততর প্রযুক্তি, উন্নততর নিরাপত্তা ব্যবস্থা, সর্বোপরি উপযুক্ত, শিক্ষিত, সতর্ক ও বিচক্ষণ মস্তিষ্ক উপস্থিত থাকলে এই তিনটি দুর্ঘটনাই এড়ান যেত। কিন্তু সবরকম সতর্কতা সত্ত্বেও যেমন প্লেন দুর্ঘটনা এড়ান যায় না, এটারও তেমনি একটা ঝুঁকি বা রিস্ক ফ্যাক্টর (risk factor) আছেই। ভবিষ্যতে কোন শিল্পকেন্দ্রে কোন বিপর্যয় ঘটবে না এ প্রতিশ্রুতি কেউ দিতে পারে না, তবে ঐ ঝুঁকি বা রিস্ক ফ্যাক্টর কমাবার অনেক অবকাশ আছে, সংক্ষেপে এখানে তা আলোচনা করা হল :

কোন শিল্পকেন্দ্র স্থাপনের আগে ঐ কেন্দ্র কোথায় স্থাপিত হবে এবং ঐ কেন্দ্র থেকে কি ধরনের দূষিত বর্জ্য পদার্থ কত পরিমাণে পরিবেশের জল, বাতাস ও মাটিতে মিশ্রিত হবে এবং তার ফলে ঐ অঞ্চলের মানুষ, উদ্ভিদ ও প্রাণীর জীবনে কি সঙ্কট দেখা দেবে এবং ঐ দূষণ কি ভাবে নিয়ন্ত্রিত হলে তা অনুমোদিত সীমার (permissible limit) মধ্যেই থাকবে তার একটি বিস্তৃত সমীক্ষা করা হয়, এই সমীক্ষাকে বলে 'পরিবেশ সংঘাত সম্পর্কে মূল্যায়ন' বা 'এনভায়রনমেন্টাল ইম্প্যাক্ট অ্যাসেস্‌মেন্ট' (Environmental Impact Assessment, সংক্ষেপে EIA)। এই সমীক্ষার ফলাফল সন্তোষজনক হলেই ঐ শিল্প স্থাপনের সরকারী অনুমোদন পাওয়া যায়। এই সমীক্ষায় শিল্পকেন্দ্রের মধ্যে দুর্ঘটনা নিবারণের জন্যে কি কি সতর্কতামূলক ব্যবস্থা রাখা দরকার এবং দুর্ঘটনা ঘটলে কি কি বিপদকালীন ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে তারও বিবরণ থাকে।
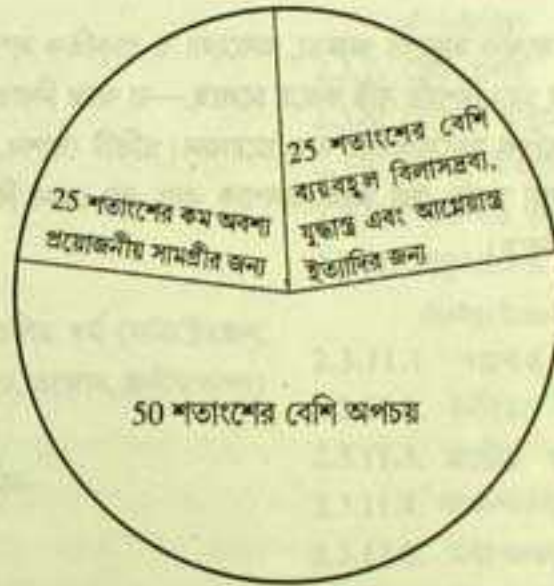
চিত্র 1.5. পৃথিবীর প্রাকৃতিক সম্পদের (জল, জ্বালানী, খনিজ পদার্থ ইত্যাদির) ব্যবহার : ব্যবহৃত সম্পদের মাত্র এক চতুর্থাংশ অত্যাবশ্যক প্রয়োজনীয় জিনিষের জন্য (খাদ্য, বস্ত্র, গৃহ, চিকিৎসা, পরিবহন, শিক্ষা, সাংস্কৃতিক কার্যকলাপ ইত্যাদিতে) ব্যবহার করা হয়। অর্ধেক নষ্ট হয় প্রধানতঃ অনুপোযুক্ত প্রযুক্তি এবং ত্রুটিপূর্ণ ব্যবহারের জন্য। এক চতুর্থাংশেরও বেশি খরচ হয় অনাবশ্যক জিনিষে যার মধ্যে আছে অপ্রয়োজনীয় অতিবিলাসদ্রব্য, ড্রাগ ও মাদকদ্রব্য এবং মারাত্মক কিন্তু অপ্রয়োজনীয় যুদ্ধাস্ত্র। অনেক দ্রব্যই ব্যবহৃত হয় যা জনস্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক।

ভূপাল গ্যাস দুর্ঘটনার সময় দেখা গেল কারখানার গায়েই হাজার হাজার বস্তী গড়ে উঠেছে—যা নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থার সম্পূর্ণ বিরোধী। শত শত মানুষের জীবন রক্ষা পেত যদি তারা কারখানা থেকে নিরাপদ দূরত্বে বসবাস করত। কারখানার মধ্যে যে দুটি নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা ছিল,—তার একটির যন্ত্রাংশ আগে থেকেই খুলে রাখা হয়েছিল অন্যটি ঠিকমত চালু করা সম্ভব হয়নি—চালকের জ্ঞান বা বিচক্ষণতার অভাবে। তাছাড়া মিক্ গ্যাসের বিষক্রিয়া সম্পর্কে কোন ধারণা বা উপযুক্ত চিকিৎসা ব্যবস্থা বা প্রতিষেধক ঔষধ—সবকিছুরই অভাব ছিল সেদিন।

মিনামাটা বিপর্যয়ের সময় দেখা গেল ঐ পারদ ঘটিত বর্জ্য পদার্থ উপসাগরের জলে ফেললে কি ক্ষতি হতে পারে সে সম্পর্কে কোন ধারণা বা তা নিয়ন্ত্রণের জন্য নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা—কোনটাই ছিল না। চেরনোবিল পরমাণু শক্তি উৎপাদন কেন্দ্রে যেখানে বিপদের ঝুঁকি সবচেয়ে বেশী সেখানে কয়েক জন মানুষের নিছক হঠকারিতা ও গাফিলতির ফলে চরম বিপর্যয় ঘটেছিল।

এইসব ঘটনা বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা আরো জোরদার, আরো নিশ্ছিদ্র হওয়া দরকার। এবং তা যথাযথভাবে পালিত হলে অধিকাংশ দুর্ঘটনাই নিবারণ করা যায় কিন্তু সম্পূর্ণ নিবারণ করা সম্ভব নয়।

1.3.4. ক্রমপুঞ্জীভূত কারণে দীর্ঘমেয়াদী বিপর্যয়

মুষ্টিমেয় কয়েকজন মানুষের মারাত্মক ভুল, অজ্ঞতা বা অবহেলার ফলে যেমন চরম বিপর্যয় ঘটে তেমনি লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রতিদিনকার সামান্য অবহেলা, কু-অভ্যাস, অজ্ঞতা বা ভুল সিদ্ধান্তের জন্য সমস্যাগুলি ক্রমপুঞ্জীভূত হয়ে দীর্ঘকাল পরে চরম বিপর্যয় অনিবার্য হয়ে ওঠে, যেমন যথেচ্ছ পরিমাণে জীবাশ্ম জ্বালানীর ব্যবহারের ফলে গ্রীনহাউস এফেক্ট সৃষ্টি, বা CFC জাতীয় পদার্থের অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহারের ফলে উর্ধাকাশে ওজন স্তরের অবক্ষয়, বা যথেচ্ছ মাত্রায় কীটনাশকের ব্যবহারের ফলে প্রকৃতির ভারসাম্যের অপূরণীয় ক্ষতি অথবা ধীরে ধীরে অরণ্যের উচ্ছেদের ফলে বণ্যপ্রাণীর অবলুপ্তি, ইত্যাদি।

এগুলির পেছনে এক বিশাল সংখ্যক মানুষের অজ্ঞতা, অবহেলা ও প্রাকৃতিক সম্পদের অপব্যবহার জনিত দীর্ঘদিনের ক্রিয়াকাণ্ড জড়িত যা ক্রমপুঞ্জীভূত হয়ে চরম বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চলেছে,—যা আজ নিবারণ করা খুবই শক্ত। এগুলি নিবারণের জন্য সকল মানুষেরই সচেনতা ও ঐকান্তিক সহযোগিতার আশু প্রয়োজন। প্রতিটি দেশের, প্রতিটি মানুষের তাই আজ পরিবেশ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও সচেতনতা অর্জন করা অতি আবশ্যক এবং এর কোন বিকল্প নেই। এর সঙ্গে মনুষ্য প্রজাতি সহ সকল জীবেরই অস্তিত্ব নির্ভর করছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক প্রক্রিয়াসমূহ

অধ্যায় সূচী

আমরা ভূ-পৃষ্ঠে বসবাস করি। কেবল মানুষই নয়, সমস্ত সজীব প্রজাতি ধরিত্রীমাতার কাছ থেকে তাদের বেঁচে থাকার রসদ সংগ্রহ করে। কাজেই পৃথিবী কেবল সুন্দরই নয়—সকল জীবপ্রজাতির বেঁচে থাকার পূর্বশর্তগুলিও পূরণ করে। এই পৃথিবী সৌরজগতের একটি গ্রহ। সূর্য সৌরজগতের সকল শক্তির উৎস। অন্য কোন গ্রহে জীবনের অস্তিত্ব রয়েছে কিনা তা এখনো নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। সেক্ষেত্রে পৃথিবী এক অনবদ্য ও অসংখ্য জীবনের স্পন্দনে মুখর এক গ্রহ, কারণ প্রকৃতি এখানে জীবের পুনরুৎপাদনের অনুকূল পরিবেশ রচনা করেছে।

আমাদের টিকে থাকার জন্যই প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক ঘটনাবলী সম্পর্কে অবহিত হওয়া প্রয়োজন। প্রকৃতিকে বুঝতে হলে প্রথমেই আমাদের পৃথিবীর সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে হবে, জানতে হবে কীরূপ পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে কীভাবে এর উদ্ভব ঘটেছে।

2.1. গ্রহরূপে পৃথিবী—উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

আগেই বলা হয়েছে পৃথিবী একটি গ্রহ এবং তা সৌরজগতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। সৌরজগৎ আবার মহাজগতের অন্তর্গত। পদার্থ, শক্তি ও স্থানের সার্বিক সমন্বয়ে মহাজগৎ গঠিত। কাজেই মহাজগতের মধ্যে আমরা দেখি অগনিত ছায়াপথ ও নক্ষত্রপুঞ্জের মাঝে বিশাল শূন্যস্থান। ছায়াপথ ও নক্ষত্রপুঞ্জের মধ্যে রয়েছে অসংখ্য নক্ষত্র, গ্রহ এবং উল্কাপিণ্ড। ছায়াপথগুলিকে বিস্তীর্ণ শূন্যতার মধ্যে পদার্থের দ্বীপ (island of matters) ভাবা যেতে পারে, যেখানে প্রচুর পরিমাণে গ্যাস, ধুলো এবং শত-সহস্র কোটি নক্ষত্র বিরাজমান। আমরা যে ছায়াপথে বাস করি তার নাম 'মিল্কি ওয়ে' (Milky Way) বা আকাশ গঙ্গা। এর আকৃতি অনেকটা চাকতির মতো এবং পৃথিবীর অবস্থান এর কেন্দ্র থেকে প্রায় অর্দ্ধ দূরত্বে। আমরা যখন এর কেন্দ্রের দিকে বা কেন্দ্রের বাইরের দিকে বা এই চাকতির যেকোন দিকে তাকাই, তখন অসংখ্য নক্ষত্র এবং প্রচুর পরিমাণে ধুলো ও গ্যাস লক্ষ করি। গ্রহ হিসেবে পৃথিবীর উৎপত্তি সম্পর্কে সম্যক বুঝতে হলে গাগনিক বস্তুগুলির প্রতি একঝলক দৃষ্টিপাত করা আবশ্যক।

2.1.1. নক্ষত্রের উদ্ভব

আন্তঃনাক্ষত্রিক শূন্যস্থানে গ্যাসীয় মেঘের আকস্মিক ক্রিয়াশক্তি হারাবার ফলে নক্ষত্রের সূচনা হয় এবং তাদের মধ্যে পারমাণবিক একীকরণের (nuclear fusion) ফলে হাইড্রোজেন হিলিয়ামে পরিণত হয় ও সেগুলি নক্ষত্রে পরিণত হয়। সূর্য এবং অন্য অনেক নক্ষত্রের মধ্যে যে ধরণের পারমাণবিক একীকরণ ঘটে, তাতে চারটি হাইড্রোজেন পরমাণুর কেন্দ্রক একটি হিলিয়াম পরমাণুর কেন্দ্রকে পরিণত হয়। সক্রিয় অবস্থায় একীকরণের ফলে উদ্ভূত শক্তি বহির্মুখী প্রবল চাপের সৃষ্টি করে, যা নক্ষত্রগুলির অন্তর্মুখী অভিকর্ষ বলের সাথে সমতাবিধান করে। প্রতিটি নক্ষত্রেরই নিজস্ব জীবনচক্র রয়েছে—তারা যেমন জন্মায়, তেমনি তাদের মৃত্যুও ঘটে। সাধারণতঃ অতি উত্তপ্ত নক্ষত্রগুলি, যেগুলি সূর্যের চেয়েও বেশী উত্তপ্ত, তাদের আয়ু কম, কারণ সেগুলি অত্যন্ত দ্রুততার সাথে তাদের জ্বালানী খরচ করে ফেলে এবং শীতল হয় অথবা এক লক্ষ বছরের মধ্যেই নির্বাপিত হয়। সূর্যের মতো নক্ষত্রগুলি এক হাজার কোটি বছর পর্যন্ত টিকে থাকতে পারে। আবার সূর্যের চেয়ে শীতল নক্ষত্রগুলি 50 হাজার কোটি বা তারও বেশী বছর ধরে জীবিত থাকতে পারে।

নক্ষত্রগুলি যখন তাদের গর্ভস্থ সমস্ত হাইড্রোজেন খরচ করে ফেলে, তখন তারা আর কোন হাইড্রোজেন পরমাণুর হিলিয়ামে একীকরণ করতে পারে না। এর ফলে এগুলি তাদের অভিকর্ষ টানকে উপেক্ষা করতে পারে না এবং সেজন্য তাদের অন্তরভাগ সঙ্কুচিত হতে থাকে। এই সঙ্কোচনের সময় যে শক্তি নির্গত হয় তাতে বাইরের স্তরগুলি বহির্মুখী ধাক্কা খায়। এতে বাইরের স্তরগুলি আরও বেড়ে যায় ও ঠাণ্ডা হয়, এবং নক্ষত্রগুলি 'লালদানব' (red giants)-এ পরিণত হয়। অবশেষে কিছু লালদানব নক্ষত্রের বাইরের স্তর বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে ও সেগুলি বহিঃপ্রান্তে ভাসতে থাকে, যার পরিমাণ নক্ষত্রগুলির

মোট ভরের 20 শতাংশ। এই ধরণের পরিব্যাপ্ত গ্যাসীয় খোলকগুলির নাম কক্ষাবর্ত নীহারিকা (planetary nebula)। নীহারিকাগুলি গ্যাস ও ধুলোর মেঘ হবার জন্য আমাদের চোখে অস্পষ্ট দেখায়। কিছু কিছু নীহারিকা মুমূর্ষু নক্ষত্রের বহির্গত গ্যাসের খোলক হিসেবে অবস্থান করে। ছেড়ে যাওয়া নীহারিকাগুলির রঙ নীল, কারণ এগুলি নক্ষত্রের অন্তস্তর-এর বহিঃপ্রকাশ ঘটায় এবং সেজন্য বেশ গরম হয়। ধরা যাক 50,000 বছর বা কাছাকাছি সময়ে কক্ষাবর্ত নীহারিকা ভেসে পালাবার ফলে কেন্দ্রীয় নক্ষত্র শীতল হয়ে পড়ল। এমন অবস্থায় কেন্দ্রীয় নক্ষত্র সঙ্কুচিত হতে থাকবে যতক্ষণ না পৃথিবীর প্রায় সমান আকারের হয়। যদি সূর্যের ভরের 1.4 গুণের চেয়ে নক্ষত্রের ভর কম হয়, তাহলে এই প্রক্রিয়াটি অনির্দিষ্টভাবে চলতে থাকবে। তখন নক্ষত্রের এই পর্যায়টিকে বলা হবে 'সাদা বামন' (white dwarf), বস্তুতঃ লাল দানব, নীহারিকা ও সাদা বামন—এগুলি সাধারণ নক্ষত্রের জীবনের ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়মাত্র।

কোন নক্ষত্র লাল দানবে পরিণত হবার পর তা আবার আকারে বাড়তে থাকে এবং অতিদানবে (super giant) পরিণত হয়। এর পরে একসময় এটি সম্পূর্ণভাবে বিস্ফোরিত হয়, এবং সুপারনোভার (supernova) জন্ম দেয়। সুপারনোভা ছায়াপথের উজ্জ্বলতম বস্তু। সুপারনোভা নক্ষত্রকে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে, ফলে ভারী ভারী মৌলের সৃষ্টি হয় এবং সেগুলি মহাশূন্যে নিক্ষিপ্ত হয়। আমাদের সৌরজগতের সৃষ্টি হবার সময় সূর্য ও গ্রহগুলি এইসব ভারী ভারী মৌলিক পদার্থের দ্বারা গড়ে ওঠে। মনে করা হয় যে, আমাদের সৌরজগৎ গ্যাস ও ধুলোয় গড়া কোন এক সুপারনোভার পতনের/নির্বাপনের (collapse) ফলে তৈরি হয়েছে। কোন সুপারনোভার বিস্ফোরণের সময় নক্ষত্রের কেন্দ্রীয়-এলাকা অত্যধিকভাবে সঙ্কুচিত ও পতিত হয় যতক্ষণ-না পর্যন্ত তা বেশ ক্ষুদ্রাকারে পরিণত হচ্ছে। সূর্যের চেয়ে 1.4 – 4 গুণ বেশী ভরের নক্ষত্রগুলি যতক্ষণ-না যথেষ্ট ক্ষুদ্রাকারে পরিণত হয় ততক্ষণ নির্বাপিত হতে থাকে। এই সময় বেশীরভাগ নক্ষত্র কেবল নিউট্রন (neutron) গ্যাস-সমৃদ্ধ থাকে বা নিউট্রন সৃষ্টিকারী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদার্থের কণা যাদের কোয়ার্ক (quark) বলে, তাই দিয়ে ভর্তি থাকে। এই সময় নক্ষত্রটিকে নিউট্রন-নক্ষত্র (neutron star) বলে চিহ্নিত করা হয়।

কোন কোন ক্ষেত্রে অবশ্য সূর্যের ভরের 4 গুণ ভারী সুপারনোভা বিস্ফোরণের পরেও নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারে। তবে তারপরে নক্ষত্রের পতন অনিবার্য হয়ে পড়ে এবং অভিকর্ষ বলের (gravity) জন্য এরা ক্রমাগত সঙ্কুচিত হতে থাকে। আপেক্ষিকতাবাদ (theory of relativity) তত্ত্বে বলা হয়েছে যে, অত্যন্ত শক্তিশালী অভিকর্ষ বলের জন্য এমনকি আলো পর্যন্ত এতই বেঁকে যায় যে, তা নক্ষত্রটিকে অতিক্রম করতে পারে না। এক্ষেত্রে নক্ষত্রটি কৃষ্ণগহ্বর (black hole)-এ পরিণত হয়। কৃষ্ণগহ্বরগুলি এমনকি নিউট্রন নক্ষত্রের চেয়েও অস্পষ্ট।

2.1.1.1. সৌরজগতের মধ্যমণি সূর্য

বেশীরভাগ নক্ষত্রকেই রাতেরসময় দেখা যায়। কেবল সূর্যই দিনের বেলায় দৃশ্যমান। মাত্র 15 কোটি কিমি দূরত্বে অবস্থিত সূর্য পৃথিবীর সবচেয়ে কাছের নক্ষত্র। সূর্যের আলো ভূ-পৃষ্ঠে পৌঁছাতে মাত্র 8.3 মিনিট সময় লাগে, অন্যদিকে সূর্য ছাড়া পৃথিবীর নিকটতম নক্ষত্রের দূরত্ব 4 আলোকবর্ষেরও বেশী। অন্যসকল নক্ষত্রের মতো সূর্যও উত্তপ্ত গ্যাসের বল। এর কেন্দ্র অত্যধিক উষ্ণ, তবে বহিঃস্তরের উষ্ণতা অপেক্ষাকৃত কম। সৌর-পৃষ্ঠ থেকে বিকিরিত আলো ও তাপ ভূ-পৃষ্ঠের শক্তির যোগান দেয়। পৃথিবীতে সকল জীব প্রজাতির বেঁচে থাকা সূর্যের ওপর নির্ভরশীল।

শক্তি : সূর্যের কেন্দ্রমণ্ডলের গভীরে পারমাণবিক একীকরণ প্রক্রিয়ায় হাইড্রোজেন হিলিয়ামে পরিণত হবার সময় প্রচুর শক্তির সৃষ্টি হয়। এই একীকরণের ফলে উৎপন্ন প্রতিটি হিলিয়াম পরমাণুর ভর চারটি হাইড্রোজেন পরমাণুর যৌথ ভরের চেয়ে প্রায় 0.7 শতাংশ কম হয়। অ্যালবার্ট আইনস্টাইন-এর সূত্রের ($E = mc^2$) মাধ্যমে জানা যায় যে, এই সামান্য পরিমাণ ভরের বিলোপ এবং সেই বিলুপ্ত ভরের (m) সঙ্গে আলোর গতিবেগের বর্গের (c^2) গুণফলের জন্য বিপুল পরিমাণ

শক্তির উৎপাদন ঘটে। সূর্য একটি উৎকৃষ্ট পারমাণবিক একীকরণ চুল্লীর উদাহরণ, যাকে মানুষ এখনো শক্তি উৎপাদনের কাজে পুরোপুরি ব্যবহার করতে পারেনি।

আলোকমণ্ডল : সৌর পৃষ্ঠ আলোকমণ্ডল (photosphere) নামে পরিচিত। এই পরিশব্দটি গ্রীক শব্দ photo—অর্থাৎ আলোক থেকে এসেছে। সাধারণভাবে, সৌরপৃষ্ঠের প্রায় সর্বত্র সমুজ্জ্বল, তবে প্রান্তবর্তী এলাকাগুলি ঈষৎ কৃষ্ণাভ। এর পৃষ্ঠদেশেও কোথাও কোথাও কিছু অন্ধকার এলাকা রয়েছে। সৌরপৃষ্ঠের এই অন্ধকারাচ্ছন্ন এলাকাগুলি তুলনামূলকভাবে শীতল অঞ্চল, এবং এগুলি সৌরকলঙ্ক (sun spot) নামে পরিচিত। সৌরকলঙ্ক চক্র (মোটামুটি 11 বছরের চক্র) পৃথিবীর জলবায়ুকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে।

2.1.2. পৃথিবীর উৎপত্তি

পৃথিবীর উৎপত্তি এখনোও এক বিতর্কের বিষয়। সূর্য থেকে পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহগুলির উৎপন্ন হবার পূর্বতন ধারণাটি এখন আর গ্রাহ্য হয় না। পৃথিবীর উৎপত্তি মহাবিশ্বের বিপুল জটিলাবস্থা এবং নক্ষত্র ও নীহারিকার উৎপত্তির সঙ্গে জড়িত। অতিকায় ধূলিকা মেঘের ঘনীভবনের ফলে সৌরজগতের আবির্ভাব সংক্রান্ত তত্ত্বটি আমাদের চিন্তাভাবনায় এক বৈপ্লবিক বিকাশ ঘটিয়েছে যার ফলে আমাদের গ্রহটির রাসায়নিক ইতিবৃত্ত সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসার সৃষ্টি হয়েছে। কুইপার (Kuiper)-এর মতে ধূলো ও গ্যাসের প্রাথমিক পিণ্ডের একটি অংশ সূর্যের এবং বাকী অংশটি গ্রহগুলির সৃষ্টি করে। প্রথমে আদি ধূলিকা-মেঘ সম্ভবতঃ ঘনীভূত হয়ে কণাগ্রহ (planetesimals) সমৃদ্ধ আদি গ্রহগুলির (protoplanets) সূচনা করে। কণাগ্রহগুলির সাথে যে গ্যাস সম্ভবতঃ ঘনীভূত হয়, পরবর্তীকালে তা বিতাড়িত হয়ে অবশেষে গ্রহগুলির সৃষ্টি করে। বুধ, শুক্র, পৃথিবী ও মঙ্গল—এই পার্থিব/অন্তঃস্থ গ্রহগুলি খুব সম্ভব তাদের এই গ্যাস বিমুক্ত হয়েছে। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের রূপান্তর ও উপাদানসংক্রান্ত গবেষণায় এটি স্পষ্ট হয়েছে। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল এবং সূর্যসহ নক্ষত্রগুলির আবহমণ্ডলের মধ্যে একটি কৌতূহলোদ্দীপক সম্পর্ক দেখা যায়। যদিও পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে নিয়নগ্যাস খুবই কম পরিমাণে রয়েছে, তথাপি নক্ষত্রগুলির মধ্যে এই গ্যাসের তুলনামূলকভাবে প্রাচুর্য দেখা যায়। পৃথিবীর প্রারম্ভকালে সম্ভবতঃ নিয়নগ্যাস এবং তৎকালের বায়ুমণ্ডলের জলীয় বাষ্প ও অন্যান্য উদ্বায়ী পদার্থ ছিটকে বেরিয়ে যায়। পৃথিবীর বর্তমান বায়ুমণ্ডল পরবর্তীকালে ভূ-অভ্যন্তরস্থ নাইট্রোজেন, কার্বন ও জলের বহির্গমনের ফলে সৃষ্টি হয়েছে। পরবর্তী ভূ-তাত্ত্বিককালে তেজস্ক্রিয় পটাশিয়ামের ক্ষয়ের ফলে আর্গনের সৃষ্টি হয় এবং এটিও ভূ-অভ্যন্তর থেকে বেরিয়ে আসে। একইভাবে জেনন ও ক্রিপ্টনের মতো নিষ্ক্রিয় গ্যাসগুলিও পৃথিবী থেকে প্রায় অবলুপ্ত। হাইড্রোজেন ও হিলিয়ামও সম্ভবতঃ মহাকাশে বেরিয়ে পড়ে এবং এগুলি বর্তমানে খুব স্বল্প পরিমাণে ঊর্দ্ধ বায়ুমণ্ডলে দেখা যায়। পৃথিবী থেকে হাইড্রোজেনের নির্গমনের ফলে একটি অক্সিজেনসমৃদ্ধ বায়ুমণ্ডলের আবির্ভাব ঘটে। মিথেন (CH_4) ও অ্যামোনিয়ার (NH_4) হাইড্রোজেন ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হবার ফলে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে নাইট্রোজেন পড়ে থাকে। পক্ষান্তরে বৃহস্পতি ও শনির মতো অতিকায় গ্রহগুলি তাদের এমনকি অধিক উদ্বায়ী হাইড্রোজেন ও হিলিয়ামকেও ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে। ইউরেনাস ও নেপচুন তাদের বেশীরভাগ হাইড্রোজেন, হিলিয়াম, মিথেন ও নিয়ন গ্যাস হারিয়ে ফেলেছে কিন্তু জল, অ্যামোনিয়া এবং কম উদ্বায়ী পদার্থগুলিকে ধরে রাখতে পেরেছে।

এইসব আদিগ্রহগুলির বিভিন্ন অংশে জল, অ্যামোনিয়া এবং হাইড্রোকার্বন—যেমন মিথেন, সম্ভবতঃ তরল ও কঠিন অবস্থায় ঘনীভূত হয়। বর্তমান গ্রহগুলির অন্তর্বর্তী এলাকাগুলিতে ধূলিকণা সম্ভবতঃ বিশাল তুষার ঝড়ের দ্বারা ঘনীভূত হয়ে পড়ে। পরবর্তী দীর্ঘকালীন সময়ে জল, অ্যামোনিয়া, হাইড্রোকার্বন, লোহা বা লোহার অক্সাইড প্রভৃতি পদার্থগুলির আবির্ভাব ঘটে। দেখা গেছে যে, বর্তমান ভূ-ত্বকের প্রধান উপাদান হল সিলিকা। অতীতকালে উচ্চ উষ্ণতামান হাইড্রোজেনের উপস্থিতিতে লোহার অক্সাইডের বিজারণের ফলে লোহার উৎপত্তি ঘটায়। যেহেতু গলিত লোহা অপেক্ষাকৃত ভারী, তাই তা সিলিকার

মধ্য দিয়ে ডুবে গিয়ে বিস্তীর্ণ ভাণ্ডার হিসেবে ক্রমঃপুঞ্জীভূত হয়। এখন তাই পৃথিবীর কেন্দ্রমণ্ডলে লৌহজাতীয় পদার্থের প্রাচুর্য দেখা যায়।

2.1.2.1. মহাদেশ ও মহাসাগর তলদেশের উৎপত্তি

ভূ-পৃষ্ঠের সাধারণ রূপবৈচিত্র্য দুটি স্বতন্ত্র প্রধানভাগে বিভক্ত করা যায়। এগুলি হল—মহাদেশ ও সমুদ্র অববাহিকা বা তলদেশ। মহাদেশগুলি শুধু যে মহাসাগরগুলি থেকে উঁচুতে অবস্থিত তাই নয়, এরা ভিন্ন ধরণের পদার্থ দিয়ে গড়া। মহাদেশগুলি গ্রানাইট জাতীয় শিলা দ্বারা গঠিত। সাধারণভাবে এগুলি 'সিয়াল' (SiAl = Silicon + Aluminium) ভূ-ত্বক নমে পরিচিত। অন্যদিকে, মহাসাগর-ত্বক প্রধানতঃ ব্যাসল্ট দিয়ে তৈরি। এগুলি সিলিকন ও ম্যাগনেশিয়াম সমৃদ্ধ হওয়ায় এদের 'সিমা' (SiMa = Silicon + Magnesium) বলা হয়।

মহাদেশ ও মহাসাগর তলের উৎপত্তির ব্যাপারে নানান মতবাদ রয়েছে। অনেকের মতে, মহাদেশ ও মহাসাগরতলের বিভেদপূর্ণ অবস্থার জন্য রাসায়নিক বিবর্তন দায়ী, কেননা জলের তলার অংশগুলি বায়ুমণ্ডলে অনাবৃত অংশগুলির তুলনায় আলাদাভাবে বিকশিত হয়েছে। অন্য একটি মতে, গলিত অবস্থা থেকে ক্রমশীতলমান পৃথিবী প্রথমে গ্রানাইটের পাতলা স্তরযুক্ত ত্বক লাভ করে। এই স্তর পরবর্তীকালে বিচ্ছিন্ন হয়ে অন্তর্বর্তী ব্যাসল্ট স্তরকে উন্মোচিত করে। অনেক সময় আবার আকস্মিক অগ্ন্যুৎপাতের ফলে ভূগর্ভস্থ গলিত ম্যাগমা বেরিয়ে আসে। বলা হয় যে, প্রাথমিকভাবে পৃথিবীর আবরণ ছিল ব্যাসল্ট জাতীয় শিলাসমৃদ্ধ। পরে ভূ-ত্বকের বিকৃতির (deformation) ফলে মহাদেশ ও মহাসাগরতল—এই দুটি স্বতন্ত্র অস্তিত্বের আবির্ভাব ঘটে। অন্য আরেকটি প্রভাবশালী মত হল, গলিত পৃথিবী শীতল হলে গ্রানাইট জাতীয় শিলা কেলাসিত হয় এবং তা ওপরে ভাসতে থাকে।

2.1.2.2. বায়ুমণ্ডলের উৎপত্তি

বর্তমান বায়ুগুলের পাঁচের-চার ভাগ নাইট্রোজেন এবং পাঁচের-একভাগ অক্সিজেন। এছাড়া সঙ্গে রয়েছে সামান্য পরিমাণ কার্বন ডাইঅক্সাইড, আর্গন ও অত্যন্ত সীমিত পরিমাণে বেশ কিছু অন্যান্য গ্যাস। পৃথিবীর প্রারম্ভকাল থেকে অতীতে বিভিন্ন ভূ-তাত্ত্বিক সময়ে বায়ুমণ্ডল বিভিন্ন ধরণের পরিবর্তনের সামিল হয়েছে। অবশেষে, প্রায় 58 কোটি বছর আগে ক্যামব্রিয় উপযুগে (cambrian period) বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বায়ুমণ্ডল বর্তমান স্থিতাবস্থায় আসে।

দেখা গেছে যে, পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের উপাদানগুলি সৌরজগতের অন্যান্য গ্রহে অপ্রতুল। বায়ুমণ্ডলের উৎপত্তির সম্ভাব্য ব্যাখ্যা এর উপাদানগুলির মধ্যে অনুসন্ধান করা যেতে পারে। বর্তমানে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের প্রধান গ্যাসীয় উপাদানগুলি হল—নাইট্রোজেন (78.08 শতাংশে), অক্সিজেন (20.95 শতাংশে), আর্গন (0.93 শতাংশে) এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড (0.035 শতাংশে)। এগুলি একত্রে বায়ুমণ্ডলের মোট আয়তনের শতকরা 99.99 ভাগ দখল করেছে। দুটি খুব হালকা উপাদান—হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম বায়ুমণ্ডলের বাইরের দিকে দেখা যায়। বিভিন্ন ভূ-তাত্ত্বিক সময়ের মধ্যদিয়ে এই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, যা শিলামণ্ডল ও বারিমণ্ডলের বর্তমান চেহারায় পরিণত হবার সঙ্গেই ঘটেছে খুব ধীরে ধীরে।

পৃথিবীর জন্মের প্রাথমিক পর্যায়ে, যেহেতু মহাজাগতিক গ্যাস নিয়ে এর গঠন হয়েছিল, তাই এর অভিকর্ষ টান কম ছিল, যা সম্ভবতঃ হাইড্রোজেন ও হিলিয়ামের মতো অত্যন্ত হালকা গ্যাসগুলিকে মহাশূন্যের কাছাকাছি ভেসে বেড়াতে সাহায্য করেছে। এছাড়াও বর্তমান বায়ুমণ্ডলের গ্যাসগুলি কিন্তু আদি পৃথিবীর সরাসরি অবশেষ নয়। সম্ভবতঃ আদি পৃথিবীর গ্যাসগুলি পরিবর্তিত হয়ে দ্বিতীয় (গৌণ) বায়ুমণ্ডলের সৃষ্টি করেছিল। এই বায়ুমণ্ডলের উৎপত্তি হয় আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত, উষ্ণ প্রস্রবণ এবং কঠিন পদার্থের রাসায়নিক ভাঙ্গনের ফলে এবং তা পরবর্তীকালে উদ্ভিদের দ্বারা পরিশীলিত হয়। গোড়ার দিকে

সম্ভবতঃ জলীয় বাষ্প (60-70 শতাংশ), কার্বন ডাইঅক্সাইড (10-15 শতাংশ) এবং নাইট্রোজেন (8-10 শতাংশ) অধিক পরিমাণে ছিল, কিন্তু পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে কোন অক্সিজেন ছিল না। ভূ-পৃষ্ঠ ছিল অত্যন্ত গরম এবং তা ঠাণ্ডা হবার সময় ঘনীভবনের ফলে সুদীর্ঘ ভূ-তাত্ত্বিক সময়ে অবিরাম বৃষ্টিপাত হতে থাকে। বৃষ্টি-জল ভূ-পৃষ্ঠের অবনত অংশগুলিকে ভর্তি করে ফেলে এবং মহাসাগর, সাগর ও হ্রদগুলির উদ্ভব ঘটে। অতঃপর উদ্ভিদের উৎপত্তি ঘটে। পৃথিবীতে উদ্ভিদের আবির্ভাব বায়ুমণ্ডলের উপর প্রভূত প্রভাব ফেলে। ধীর গতিতে হলেও ক্রমশঃ বায়ুমণ্ডলের রূপান্তর হতে থাকে, এবং উদ্ভিদ সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বায়ুমণ্ডল থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইডের আত্তীকরণ ঘটায়, বিনিময়ে বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেন ছেড়ে দেয়। অদ্যাবধি ভূমি, জল, বায়ু এবং উদ্ভিদ ও প্রাণীদের পারস্পরিক অন্তর্ক্রিয়ার ফলে বায়ুমণ্ডলের পুনর্নবীকরণ হচ্ছে এবং সাথে সাথে বায়ুমণ্ডলের প্রধান গ্যাসীয় উপাদানগুলির সূক্ষ্ম সমতা বজায় থাকছে। উদ্ভিদের বিনাশ, শিলার আবহবিকার, জ্বালানীর দহন ও প্রাণীদের শ্বাস-প্রশ্বাসে অক্সিজেনের ব্যবহার ঘটে এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড বায়ুমণ্ডলে নির্গত হয়। পক্ষান্তরে, উদ্ভিদের এবং কিছুটা মহাসাগরগুলির দ্বারা কার্বন ডাইঅক্সাইডের ব্যবহার এবং বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেনের নির্গমনের ফলে বায়ুমণ্ডলের এই দুই গ্যাসের সমতা বজায় থাকছে। প্রতিবছর প্রায় 200 কোটি টন কার্বন ডাইঅক্সাইড বায়ুমণ্ডল থেকে সমুদ্রের জলে মেশে। প্রকৃতিতে নাইট্রোজেন চক্রটি (cycle) বেশ জটিল, কেননা তা মৃত্তিকায় ব্যাকটেরিয়ার কাজকর্ম থেকে শুরু করে প্রাণীদেহের কলা, জৈবপদার্থের বিয়োজন ইত্যাদির মাধ্যমে অবশেষে বায়ুমণ্ডলে এসে পৌঁছায়।

বায়ুমণ্ডলের এই ধরণের রূপান্তর অতীত ও বর্তমান পরিবেশ সম্পর্কে সঠিক ধারনার পক্ষে অত্যন্ত সহায়ক। আমরা পরবর্তী পর্যায়ে ভূ-উষ্ণায়ণ (global warming) প্রসঙ্গে অতীত ও বর্তমানকালে জলবায়ুর পরিবর্তনের প্রকৃতি সম্পর্কে আলোচনা করব।

2.2. পৃথিবীর উপাদানসমূহ

পরিবেশ বলতে পারিপার্শ্বিক অবস্থাকেই বোঝায়। আমরা যে বায়ুতে শ্বাস নিই, যে ভূমিতে বাস করি, যে জলাশয়গুলি আমাদের জলের যোগান দেয়, এবং চারপাশের সমস্ত ধরণের সজীব অস্তিত্বগুলি আমাদের পরিবেশের অঙ্গ। আমাদের পারিপার্শ্বিক সকল জীব বা অজীব অস্তিত্বের সমাহারই হল প্রাথমিক পরিবেশ। এই অর্থে পরিবেশের জৈব এবং অজৈব দুধরনের উপাদানই থাকতে পারে। এর অজৈব উপাদানগুলি হল— (ক) বায়ুমণ্ডল, (খ) শিলামণ্ডল, ও (গ) বারিমণ্ডল। জীবমণ্ডল জৈব উপাদানগুলি নিয়ে গঠিত।

2.2.1. বায়ুমণ্ডল

বায়ুমণ্ডল হল পরিবেশের প্রধান উপাদানগুলির মধ্যে অন্যতম। ভূ-পৃষ্ঠের ওপরে ঝুলে থাকা বায়ুর আবরণকে বায়ুমণ্ডল বলে। স্থল ও জলভাগের মতোই এটিও পৃথিবীর একটি অংশ, তবে বহুদিক দিয়ে এটি তাদের থেকে পৃথক। বায়ুমণ্ডলের প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্যসমূহ, এবং বিভিন্ন পদ্ধতি পরিবেশের গুণগত মানের একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারক। কাজেই বায়ুমণ্ডলের প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্যগুলি এবং প্রভাবশালী প্রক্রিয়াগুলি বোঝার মূল্য অনেক।

সাধারণভাবে বায়ুমণ্ডল বলতে বায়ুকেই বোঝায়। বায়ু একাধিক গ্যাস, জলীয় বাষ্প এবং বিবিধ সূক্ষ্মকণা ও ঝুলন্ত পদার্থের একটি মিশ্রণ। গ্যাসীয় আবরণ হিসেবে বায়ুর কতকগুলি অভিনব বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

2.2.1.1. বায়ুমণ্ডলের স্তরবিন্যাস

ভূ-পৃষ্ঠ থেকে উপরিভাগে বিভিন্ন গ্যাসের অনুপাত হিসেবে আবহমণ্ডল (বায়ুমণ্ডল)-কে সমমণ্ডল (homosphere) এবং বিষম মণ্ডল (heterosphere) এই দুইভাগে ভাগ করা হয়েছে। সমমণ্ডল সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে 90-100 কিলোমিটার উচ্চতা

অবধি বিস্তৃত এবং এই অঞ্চলে মোটামুটিভাবে বিভিন্ন গ্যাসের অনুপাত একই থাকে। বিষম মণ্ডলে গ্যাসগুলির আনুপাতিক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়, 90-100 কিলোমিটার উচ্চতায় হাইড্রোজেন ও হিলিয়ামের মত হাল্কা গ্যাসের অনুগুলি নীচের স্তর থেকে বেশি থাকে এমনকি অক্সিজেনের মত গ্যাসের অনু ভেঙ্গে পরমাণু অবস্থায় চলে যেতে পারে। বিষম মণ্ডলের পর 450-475 কিলোমিটার উপর থেকে বর্হিমণ্ডলের (exosphere) শুরু।

তাপমাত্রার ভিত্তিতে সমমণ্ডলকে ট্রোপোস্ফিয়ার (troposphere) বা ক্ষুব্ধ মণ্ডল, স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার (stratosphere) বা শান্ত মণ্ডল এবং মেসোস্ফিয়ার (mesosphere) বা মধ্য মণ্ডল এই তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

ক্ষুব্ধমণ্ডল ভূ-পৃষ্ঠ থেকে নিরক্ষীয় অঞ্চলে প্রায় 16 কিলোমিটার এবং মেরু অঞ্চলে 8 কিলোমিটারের মধ্যে অবস্থিত। এই মণ্ডলের পরিস্থিতি মেঘ, বৃষ্টি, জলবায়ু এবং আবহাওয়ার প্রকৃতি নির্ধারণ করে। ট্রোপোস্ফিয়ারে প্রতি কিলোমিটার উচ্চতায় উষ্ণতামাত্রা 6.5° সেলসিয়াস হ্রাস পায়। ভূ-পৃষ্ঠের গড় উষ্ণতা 15° সেলসিয়াস আর ট্রোপোস্ফিয়ারের সর্ব্বোচ্চ স্তরে প্রায় –60° সেলসিয়াস (213° কেলভিন, যেহেতু কেলভিন স্কেলের 273°K = 0° সেলসিয়াস)। ট্রোপোস্ফিয়ারের ঠিক উপরে 3-4 কিলোমিটার ব্যাপী প্রায় 20 কিলোমিটার উচ্চতা পর্যন্ত তাপমাত্রার কিন্তু কোনো হ্রাসবৃদ্ধি হয়না, এই সমতাপবিশিষ্ট অঞ্চলটির নাম দেওয়া হয়েছে ট্রোপোপজ (tropopause)।
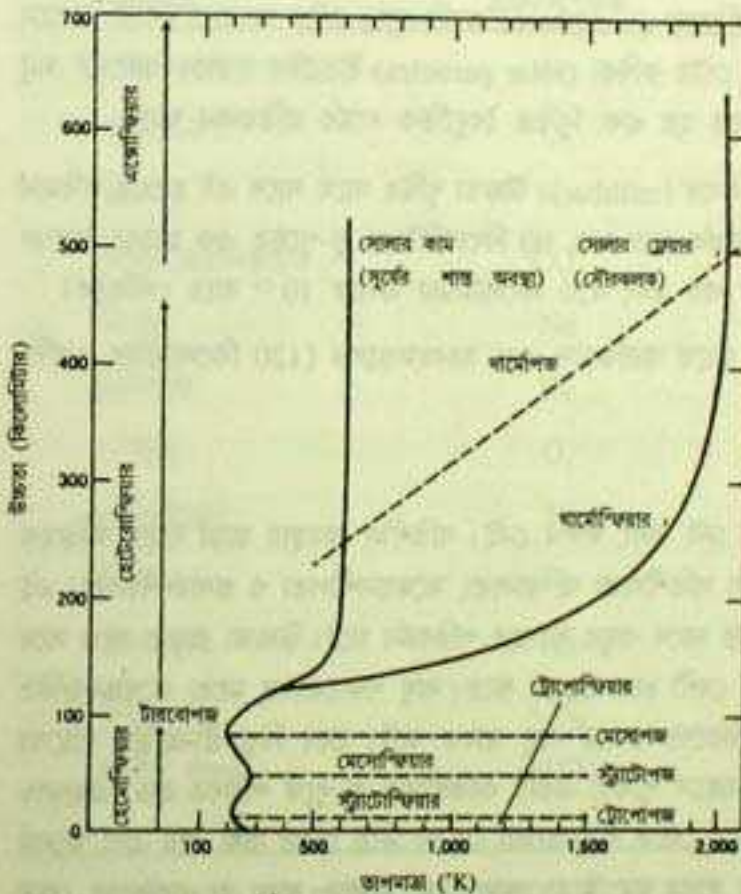
(ক)
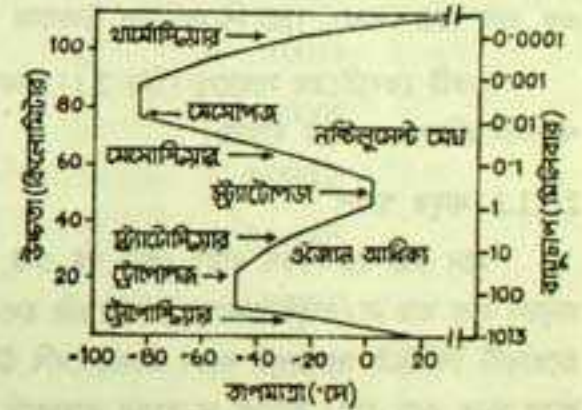
(খ)

চিত্র 2.1. বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন স্তর। (ক) বায়ুমণ্ডলের উচ্চতার সাথে উষ্ণতামাত্রার তারতম্য বর্হিমণ্ডল (exosphere) অবধি দেখানো হয়েছে কেলভিন স্কেলে (0°K = –273° সেলসিয়াস), চিত্রের উৎস : এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা (ম্যাক্রোপিডিয়া), পঞ্চদশ সংস্করণ, 1977, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা 307। (খ) ভূ-পৃষ্ঠ থেকে 100 কিলোমিটার অবধি বিভিন্ন স্তরে উষ্ণতামাত্রা (সেলসিয়াস স্কেলে) এবং বায়ুচাপ (মিলিবারে) দেখানো হয়েছে।

ট্রোপোপজের পর থেকে উষ্ণতা আবার বাড়তে শুরু করে এবং এখান থেকেই শুরু স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারের। এখানে বেশ কিছু পরিমান অক্সিজেনের সূর্যরশ্মির প্রভাবে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় ওজোন গ্যাসে রূপান্তর ঘটে। এই রাসায়নিক বিক্রিয়াই উষ্ণতা বাড়িয়ে –60° সেলসিয়াস (213°K) থেকে 0° সেলসিয়াস (273°K)-তে পৌঁছে দেয়—উষ্ণতামানের এই বৃদ্ধি মোটামুটি 45 কিলোমিটার অবধি ঘটে। তারপর 45 থেকে 50 কিলোমিটার পর্যন্ত 0° সেলসিয়াসেই থেকে যায়। এই অঞ্চলটিকে স্ট্র্যাটোপজ (stratopause) বলা হয়।

স্ট্র্যাটোপজের পর আবহমণ্ডলের উষ্ণতামান আবার কমতে থাকে এবং আবহমণ্ডলের তৃতীয়স্তর মেসোস্ফিয়ারের শুরু হয় ভূ-পৃষ্ঠ থেকে মোটামুটি 50 কিলোমিটারের উপর থেকে। এই উষ্ণতামাত্রা সবচেয়ে ক'মে মধ্যমণ্ডলের প্রায় 85 কিলোমিটার উচ্চতায় নেমে যায় 160° কেলভিনে। তবে ট্রোপোস্ফিয়ারের মতো মেসোস্ফিয়ারেও ঋতু পরিবর্তনের সাথে উচ্চ বলয়গুলিতে উষ্ণতার পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। মধ্যমণ্ডলের শেষ সীমা মেসোপজ (mesopause) এবং তারপর শুরু হয় ঊর্দ্ধ আবহমণ্ডল (upper atmosphere) যার প্রথম স্তর থার্মোস্ফিয়ার(thermosphere) যেখান থেকে উষ্ণতা দ্রুত বাড়তে থাকে, সাধারণতঃ প্রায় 500°K অবধি এবং সৌর ঝলক (solar flare)-এর সময় 1750°K পর্যন্ত পৌঁছে যায়। যে উচ্চতায় এবং অঞ্চলে এই উষ্ণতা বৃদ্ধি আর হয় না তাকে বলা হয় থার্মোপজ (theromopause)।

মেসোস্ফিয়ার থেকে বায়ুমণ্ডলের শেষ প্রান্ত এক্সোস্ফিয়ার (exosphere) অবধি জুড়ে আছে আয়নোস্ফিয়ার যেখানে এক্সরে (X-ray), অতি-বেগুনি রশ্মি (ultra-violet ray), সৌর কণিকা (solar particles) ইত্যাদির প্রভাবে পদার্থের অনু পরমানু আয়নিত হয়ে আয়ন, ইলেকট্রন ইত্যাদিতে পরিণত হয় এবং বিভিন্ন বৈদ্যুতিক ধর্মের প্রতিফলন ঘটায়।

স্বাভাবিক অবস্থায় বায়ুর চাপ সমুদ্রপৃষ্ঠে 1013 মিলিবার (millibar)। উচ্চতা বৃদ্ধির সাথে সাথে এই চাপের পরিমান কমতে থাকে। ভূ-পৃষ্ঠের 6 কিলোমিটার উচ্চতায় এটি অর্ধেক হয়ে যায়, 60 কিলোমিটারে ভূ-পৃষ্ঠের এক হাজার ভাগের এক ভাগ (10^{-3} বার), 180 কিলোমিটার উচ্চতায় 10^{-9} বার এবং 420 কিলোমিটার উপরে 10^{-21} বারে পৌঁছাবে।

একটি রেখাচিত্রের সাহায্যে (চিত্র 2.1) উচ্চতার সাথে স্তরবিন্যাস এবং আবহমণ্ডলের (120 কিলোমিটার অবধি) পরিবর্তনগুলিকে দেখানো হয়েছে।

2.2.1.2. বায়ুর স্বরূপ

মনে করা হয় বিশুদ্ধ বায়ুর কোন রঙ নেই, গন্ধ নেই এবং স্বাদও নেই। গতিশীল অবস্থায় ছাড়া বায়ুর অস্তিত্বও অনুভব করা যায় না। বায়ুর অন্যান্য বৈশিষ্ট্যগুলি হল—এর গতিশীলতা বা সচলতা, সঙ্কোচনশীলতা ও প্রসারণশীলতা। এই প্রত্যেকটি বৈশিষ্ট্যই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ আমরা দেখি উচ্চতার সাথে বায়ুর ঘনত্বের পরিবর্তন ঘটে। উচ্চতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বায়ুর ঘনত্ব কমে যায়। কাজেই ভূ-তলের কাছাকাছি বায়ু বেশী চাপ প্রয়োগ করে। বায়ু শব্দতরঙ্গের মতো সঙ্কোচনজনিত তরঙ্গগুলিকে বহন করতেও পারে। অনেক প্রকারের বিকিরণের ক্ষেত্রে বায়ু স্বচ্ছও বটে। তবে কিছু গ্রীনহাউস গ্যাসের (greenhouse gas—G.H.G.) ক্ষেত্রে অবশ্যই তা নয়, নাহলে পৃথিবী একটি অতিশীতল ভূ-পৃষ্ঠে পরিণত হত। এছাড়াও বায়ু একটি সুবিশাল চাঁদোয়ার মতো হয়ে উল্কাপিণ্ডকে বাইরে থেকে বায়ুমণ্ডলের ভেতর দিয়ে যেতে বাধা দেয় এবং অনেক ক্ষেত্রেই বায়ুমণ্ডলের সাথে ঘর্ষণে এগুলি পুড়ে ছাই হয়ে যায়। বায়ু ছাড়া কোন মেঘ, বাতাস, ঝঞ্ঝা বা এককথায় কোন আবহ-প্রাণালীর সৃষ্টি সম্ভব ছিল না। ফলতঃ পৃথিবীতে কোন প্রাণের আবির্ভাব হতো না। বর্মের মতো বায়ুর আবরণ আবার জীবকূলকে সূর্যের অতিবেগুনী রশ্মির ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষাও করে। আমাদের সজীবগ্রহে এটি একটি অনবদ্য বৈশিষ্ট্য।

বায়ুমণ্ডলের মোট ভর হল প্রায় 5.2×10^{15} টন, এবং এই ভরের প্রায় 50 শতাংশ ভূ-পৃষ্ঠ থেকে 5.5 কিমির মধ্যে ও শতকরা 99 ভাগ 30 কিমির মধ্যে অবস্থান করে।

2.2.1.3. বায়ুর উপাদান

বায়ুমণ্ডলের উৎপত্তি সম্পর্কিত আলোচনায় বায়ুমণ্ডলের উপাদান সম্বন্ধে একটি মোটামুটি ধারণা আগেই দেওয়া হয়েছে। বায়ুমণ্ডলের বায়ু বিভিন্ন গ্যাসীয় উপাদানগুলির একটি মিশ্রণ, কিন্তু যেহেতু গ্যাসগুলি তাদের নিজস্ব ধর্ম বজায় রাখে তাই এটিকে কখনোই যৌগিক পদার্থ বলা যাবে না। তাছাড়া, দেখা গেছে যে বায়ুমণ্ডলের কেবল নীচের অংশে এই গ্যাসগুলির অনুপাত মোটামুটিভাবে সর্বত্র সমান থাকছে। তাই বায়ুমণ্ডলের এই নীচের অংশটিকে (ভূ-তল থেকে প্রায় 100 কিমি উচ্চতা পর্যন্ত) সমমণ্ডল (homosphere) বলা হয়। এই সীমার বাইরে গ্যাসের অনুপাতের তারতম্য হয়, তাই তাকে বিষমমণ্ডল (heterosphere) বলে।

সমমণ্ডলে গ্যাসগুলির অনুপাত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়, কেননা এই অঞ্চলটি আবহ-প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে সবচেয়ে কার্যকরী ভূমিকা পালন করে এবং তা পরিবেশের ওপর প্রভূত প্রভাব ফেলে। নীচের সারণীতে বায়ুমণ্ডলের নীচের অংশের (0 – 25 কিমির মধ্যে) বিভিন্ন গ্যাসগুলির শতকরা হিসেব দেওয়া হল।

সারণী 2.1. নিম্ন বায়ুমণ্ডলে (0 – 25 কিমির মধ্যে) বিভিন্ন গ্যাসের অনুপাত

উপাদান	চিহ্ন/সংকেত	শুষ্ক বায়ুর মোট আয়তনের শতকরা হিসেবে
নাইট্রোজেন	N_2	78.08
অক্সিজেন	O_2	20.98
আরগন	Ar	0.93
কার্বন ডাইঅক্সাইড	CO_2	0.035
নিওন	Ne	0.0018
হিলিয়াম	He	0.0005
ওজোন	O_3	0.00006
হাইড্রোজেন	H	0.00005
ক্রিপটন	Kr	স্বল্পমাত্রা
জেনন	Xe	স্বল্পমাত্রা
মিথেন	CH_4	স্বল্পমাত্রা
জলীয় বাষ্প	H_2O	কম এবং স্থানীয় বায়ুতে পরিবর্তনশীল (0 – 4)

সারণী থেকে এটা পরিষ্কার যে বায়ুমণ্ডলের নীচের অংশে বায়ুর মোট আয়তনের প্রায় 99.99 শতাংশ—নাইট্রোজেন, অক্সিজেন, আরগন ও কার্বন ডাইঅক্সাইড নিয়ে গঠিত। বায়ুর অন্যান্য গ্যাসীয় উপাদানগুলি হল নিওন, হিলিয়াম, ওজোন, হাইড্রোজেন, ক্রিপটন, জেনন এবং মিথেন। এদের মধ্যে ওজোন বেশ গুরুত্বপূর্ণ, যদিও তা বায়ুর মোট আয়তনের মাত্র 0.00006 শতাংশ জুড়ে রয়েছে। এই আয়তনকে সঙ্কুচিত করলে বায়ুমণ্ডলের কয়েক শত কিমি গভীরতার নিরীখে এর পুরুত্ব (thickness) দাঁড়াবে মাত্র 3 মিলিমিটার।

2.2.1.4. বায়ুমণ্ডলের প্রধান গ্যাসগুলির ধর্ম (নাইট্রোজেন, অক্সিজেন, কার্বন ডাইঅক্সাইড, ওজোন, জলীয় বাষ্প)

নাইট্রোজেন ঃ নাইট্রোজেন সরাসরি অন্যকোন গ্যাসের সঙ্গে মিলিত হয় না। বিভিন্ন জৈব যৌগে, বিশেষতঃ প্রোটিনে নাইট্রোজেন রয়েছে। জীবনের সৃষ্টির জন্য অতিপ্রয়োজনীয় অ্যামাইনো অ্যাসিডগুলি (amino acids) নাইট্রোজেন থেকেই উদ্ভূত হয়েছে। বায়ুমণ্ডলকে মুক্ত গ্যাসীয় নাইট্রোজেনের গুদাম-ঘর (store house) বলা চলে। আবার নাইট্রোজেন-যৌগগুলি জীবদেহে এবং মৃত্তিকার মধ্যে পাওয়া যায়। নাইট্রোজেনস্থাপনকারী কিছু ব্যাক্টেরিয়া, যেমন অ্যাজোটোব্যাক্টর *(Azotobacter)*, ক্লসট্রিডিয়াম *(Clostridium)*, ডারক্সিয়া *(Derxia)*, রাইজোবিয়াম *(Rhizobium)* ইত্যাদি বাদে অন্য কোন জীবের পক্ষে বায়ুমণ্ডল থেকে সরাসরি নাইট্রোজেন ব্যবহার করা সম্ভব হয় না। উদ্ভিদের কাজে লাগার জন্য একে প্রথমে নাইট্রেটে পরিবর্তিত হতে হয়। উদ্ভিদেরা এগুলিকে অ্যামাইনো অ্যাসিড ও প্রোটিনের সংশ্লেষায়নের কাজে ব্যবহার করে, এবং সেগুলিকে তাদের কলায় রূপান্তরিত করে। শাকাশী প্রাণীরা উদ্ভিদ-প্রোটিন ভক্ষণ করে এবং নিজেদের কলায় তার রূপান্তর ঘটায়। মাংসাশীরা শাকাশীদের কাছ থেকে প্রোটিন পেয়ে থাকে এবং তা তাদের দেহ-কলায় পরিণত করে। মৃত উদ্ভিদ ও প্রাণীদেহ এবং তাদের বর্জ্য পদার্থ বিভিন্ন বিয়োজকের দ্বারা বিয়োজিত হয়, অতঃপর গ্যাসীয় নাইট্রোজেনের আকারে বায়ুমণ্ডলে নির্গত হয়। জীবনের উদবর্তনের জন্য জীবমণ্ডলের নাইট্রোজেন চক্র অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

অক্সিজেন ঃ অক্সিজেন যেকোন বস্তুর দহন ও জ্বলনের মতো জারণক্রিয়ার জন্য প্রয়োজন হয়। এটি খুব সহজেই অন্য অনেক রাসায়নিক পদার্থের সঙ্গে মিলিত হতে পারে। জারণ পরিবেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি যা শিলার রাসায়নিক আবহবিকারের জন্য দায়ী। অক্সিজেন একটি জীবন-দায়ী গ্যাস হিসেবে বিবেচিত হয়, কারণ অবাত জীবাণুগুলি (anaerobic microbes) বাদে সকল জীবের শ্বসনের জন্য মুক্ত অক্সিজেনের দরকার পড়ে। অক্সিজেন প্রাণীর বিপাক (metabolism) এবং দেহে নির্দিষ্ট শক্তি ও উষ্ণতামান বজায় রাখার ক্ষেত্রে সহায়তা করে। সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদ-দেহ থেকে অক্সিজেন বায়ুমণ্ডলে নির্গত হয়। সেই কারণে পরিবেশবিদরা ইদানীংকালে বায়ুতে অক্সিজেনের নির্দিষ্টমাত্রা বজায় রাখার ক্ষেত্রে উদ্ভিদের ভূমিকার ওপর জোর দিচ্ছেন। জীবমণ্ডলে অক্সিজেনের গ্রহণ ও পুনরুৎপাদনের সমতা অক্সিজেন চক্রের মাধ্যমে দেখান হয় এবং এটিও বেশ গুরুত্বপূর্ণ।

কার্বন ডাইঅক্সাইড ঃ জৈব কার্বন সমৃদ্ধ পদার্থের দহনের ফলে কার্বন ডাইঅক্সাইড উৎপন্ন হয়। উদ্ভিদ ও প্রাণী শ্বসনের ফলে বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাইঅক্সাইড পরিত্যাগ করে। অন্যদিকে উদ্ভিদেরা সালোকসংশ্লেষের মাধ্যমে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্রহণ করে এবং এই প্রক্রিয়ায় বায়ুমণ্ডলে জলের অক্সিজেন ছেড়ে দেয়। কার্বন ডাইঅক্সাইড একটি গ্রীনহাউস গ্যাস। কার্বন ডাইঅক্সাইড ভূ-পৃষ্ঠ থেকে পুনর্বিকীরিত অবলোহিত বিকিরণ (reradiated infra-red radiation) শোষণ করে। এই ধরণের বিকিরণ বর্ণালীর লম্বা তরঙ্গদৈর্ঘ্য অঞ্চলে অবস্থিত। ক্ষুব্ধমণ্ডলে শক্তির এই প্রকার শোষণ ভূ-তলে উষ্ণায়নের (warming) প্রধান কারণ। প্রকৃতপক্ষে, পার্থিব বিকিরণকে ধরে রেখে কার্বন ডাইঅক্সাইড পৃথিবীকে বাসযোগ্য করে তোলার ব্যাপারে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। যদি বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাইঅক্সাইডের মতো কোন গ্রীনহাউস গ্যাস না থাকত, তাহলে পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা –18 ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি হত। যেহেতু পৃথিবীর বর্তমান গড় উষ্ণতামান 15 ডিগ্রি সেলসিয়াস, তাই কার্বন ডাইঅক্সাইড 33 ডিগ্রি সেলসিয়াস উষ্ণতামান বাড়াতে সাহায্য করেছে। কাজেই, বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ বাড়লে তা পৃথিবীর তাপমাত্রা বাড়িয়ে তুলবে। দেখা গেছে যে 1860 থেকে জীবাশ্ম জ্বালানীর বাড়তি দহনের ফলে বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ অত্যধিক বেড়েছে। অধুনা বছরগুলিতে এই বৃদ্ধির পরিমাণ বিস্ময়কর। প্রতিবছর প্রায় ৪ শত কোটি টন কার্বন ডাইঅক্সাইড বায়ুমণ্ডলে যুক্ত হচ্ছে। 1989-এর এক হিসেব অনুযায়ী বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ ছিল প্রতি দশ লক্ষে (ppm = parts per million) 353 (বা শতকরা 0.0353 ভাগ)। কার্বন ডাইঅক্সাইডের বর্তমান সংযোজন হার অব্যাহত থাকলে 2050 সাল নাগাদ তা 400 থেকে 600 ppm এ দাঁড়াবে। এই

পরিমাণ কার্বন ডাইঅক্সাইড বাড়ার ফলে বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতামান 2050 সাল নাগাদ প্রায় 4 ডিগ্রি সেলসিয়াস বেড়ে যাবে। পরবর্তী সহস্রাব্দে কার্বন ডাইঅক্সাইড বাড়বে প্রায় 15 গুণ এবং তার ফলে 22 ডিগ্রি সেলসিয়াস উষ্ণতা বেড়ে যাবে। জীবাশ্ম জ্বালানী দহনের সঙ্গে জড়িত কার্বন ডাইঅক্সাইডের বৃদ্ধি পরিবেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয়।

ওজোন ঃ ওজোন তুলনামূলকভাবে একটি সরল অণু, যার মধ্যে তিনটি অক্সিজেনের পরমাণু সংঘবদ্ধ থাকে। বায়ুমণ্ডলে ওজোন একটি অস্থির গ্যাস হিসেবে উপস্থিত থাকে এবং এই গ্যাসের পরিমাণ নিতান্তই কম। প্রমাণ বায়ুমণ্ডলীয় চাপে সঙ্কুচিত করলে এর গুরুত্ব দাঁড়াবে মাত্র 3 মিলিমিটার-এ। কিন্তু এর প্রভাব অপরিসীম। ভূ-তলের কাছাকাছি ওজোন গ্যাসের উপস্থিতি সপ্রাণ জীবের পক্ষে ক্ষতিকর কেননা, এটি অন্যান্য অণুর সঙ্গে তীব্রভাবে বিক্রিয়াশীল। পক্ষান্তরে, উর্ধ্বাকাশে এটি জীবনদায়ী ভূমিকা পালন করে। এই গ্যাস সূর্যের অতিবেগুনী রশ্মি শুষে নেয় এবং পৃথিবীর জীবকূলকে রক্ষা করে। ওজোন-এর বেশীরভাগটাই (90 শতাংশ) স্তরমণ্ডলে (stratosphere) ভূ-তল থেকে প্রায় 15 থেকে 35 কিমি উচ্চতার মধ্যে রয়েছে। অক্সিজেন অণুর এক পরমাণুবিশিষ্ট অক্সিজেনে ভাঙন ও পরবর্তী পর্যায়ে অপর কোন অক্সিজেন অণুর সঙ্গে তার সংযুক্তির ফলে বায়ুমণ্ডলে ওজোনের সৃষ্টি হয়। উচ্চ বায়ুমণ্ডলে সচরাচর মোটামুটি 80 থেকে 100 কিমি উচ্চতায় সূর্য থেকে আসা অতিবেগুনী রশ্মির প্রভাবে অক্সিজেন-অণু দুটি অক্সিজেন পরমাণুতে ভেঙে যায়।

বিশ্বব্যাপী পর্যবেক্ষণের ফলে দেখা গেছে যে, বিগত দুই দশকে স্তরমণ্ডলের ওজোন-এর হ্রাস ঘটেছে, যে হ্রাসের পরিমাণ মোটামুটিভাবে শীতকালে 10 শতাংশ এবং গ্রীষ্ম ও শরৎকালে 5 শতাংশে। এই হ্রাস পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বিশেষতঃ আন্টার্কটিকার ওপর, এবং ইয়োরোপ, উত্তর আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন অংশের ওপর দেখা গেছে। গবেষকরা উত্তর মেরুর ওপরও ওজোনের হ্রাস লক্ষ করেছেন। এই সমস্যা বছর বছর অধিক সঙ্কটময় হয়ে উঠছে। 1995-এর 25 সেপ্টেম্বর-এর উপগ্রহ-চিত্রে আন্টার্কটিকার ওপর ওজোন-গহ্বর সুস্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যায়।

ওজোন-স্তর বিনাশের জন্য প্রধানভাবে দায়ী হল ক্লোরোফ্লুরোকার্বন (CFC_{11} এবং CFC_{12})। ওজোন-স্তর ধ্বংসের ব্যাপারে CFC গুলির ভূমিকা বিষয়ে গবেষণার জন্য 1995-তে রসায়নে নোবেলজয়ী F. Sherwood Rowland ও Mario Molina মনে করেন যে বেশীরভাগ ক্লোরিন পরমাণু ওজোনের সঙ্গে সংযুক্তির ফলে চেন বিক্রিয়ার (chain reaction) সূচনা হয়। এই আবৃত্ত বিক্রিয়ার ফলে একটি মাত্র ক্লোরিন-পরমাণু কমবেশী 1,00,000 ওজোন-অণুর বিনাশ ঘটাতে পারে।

Rowland ও Molina অনুমান করেন যে, শিল্প কারখানাগুলি থেকে প্রতি বছরে যদি 10 লক্ষ টন CFC বায়ুমণ্ডলে নির্গত হওয়া বজায় থাকে, তবে বায়ুমণ্ডলের ওজোন 7 থেকে 13 শতাংশ হ্রাস পাবে। এই হ্রাসের ফলে অধিক মাত্রায় অতি-বেগুনি রশ্মি ভূ-তলে এসে পৌঁছাবে। মনে করা হয় যে, এর ফলে ত্বকের ক্যানসার, চোখের ছানি এবং শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাস ইত্যাদি সমস্যা দেখা দেবে ; এবং উদ্ভিদের বৃদ্ধি মন্থর হয়ে পড়বে। যেহেতু কিছু কিছু CFC বায়ুমণ্ডলে 100 বছরেরও বেশী সময় ধরে উপস্থিত থাকতে পারে, স্বভাবতঃই এগুলি পুরো একুশ শতাব্দী ধরে বায়ুমণ্ডল জুড়ে থাকবে। Rowland ও Molina তাই এইসব CFC গুলির বায়ুমণ্ডলে নির্গত হবার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞার দাবীও তোলেন। বায়ুমণ্ডলে ওজোন-হ্রাসের ব্যাপারে সতর্ক হবার পর আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, নরওয়ে এবং সুইডেন এরোসল স্প্রে (aerosol spray)-গুলিতে CFC ব্যবহারের উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করেছে।

জলীয় বাষ্প ঃ বায়ুর বিভিন্ন গ্যাসীয় উপাদানগুলির মধ্যে জলীয় বাষ্প সবচেয়ে পরিবর্তনশীল এবং স্থানীয় বায়ুমণ্ডলে 0 থেকে 4 শতাংশ পর্যন্ত থাকে, যদিও অন্যান্য প্রধান গ্যাসগুলির অনুপাত সর্বদা মোটামুটি স্থির থাকে। বায়ুতে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ অবশ্যই জলবায়ুর প্রকৃতির ওপর বিশেষ প্রভাব ফেলে। বায়ুর আর্দ্রতার ঘনীভবনের ফলে বৃষ্টিপাত, তুষারপাত, শিশির, কুয়াশা ইত্যাদি ঘটে থাকে। বায়ুতে জলীয় বাষ্প না থাকলে বাষ্পীভবন অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে হতে থাকে এবং

অগভীর পুকুর বা এই জাতীয় জলাশয়গুলি খুব শীঘ্রই শুকিয়ে যায়। তাপের সমতা বজায় রাখার ক্ষেত্রেও জলীয় বাষ্পের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। অন্যান্য গ্রীনহাউস গ্যাসগুলির মতো এটিও পৃথিবী থেকে বিকিরিত তাপ ধরে রাখতে পারে এবং স্থানীয় বায়ুর উষ্ণতামান বাড়াতে সাহায্য করে।

2.2.2. শিলামণ্ডল

পৃথিবীর সবচেয়ে বাইরের খোলক বা ভূ-ত্বকের একটি প্রধান অংশ হল শিলামণ্ডল। বিভিন্ন ধরনের অপেক্ষাকৃত শক্ত শিলা বা পাথর দিয়ে এটি গঠিত। শিলামণ্ডলের পুরুত্ব (thickness) 64 থেকে 96 কিমির মধ্যে। শিলামণ্ডলের সবচেয়ে ওপরের অংশটি সিলিকা (Si) ও অ্যালুমিনিয়াম (Al) সমৃদ্ধ হবার জন্য একে 'সিয়াল' (SIAL)-স্তর বলা হয়। মহাদেশগুলি সিয়াল-স্তর দ্বারা গঠিত এবং এখানে গ্রানাইট জাতীয় পাথরের সমাবেশ ঘটেছে। সিয়াল-এর নিচে সিলিকা (Si) ও ম্যাগনেশিয়াম (Ma, এটি উচ্চারণগত সংক্ষেপমাত্র—কোন রাসায়নিক চিহ্ন নয়) সমৃদ্ধ বলে একে 'সিমা' (SIMA)-স্তর বলা হয়। সিমা-স্তর প্রাথমিকভাবে ব্যাসল্ট শিলা দ্বারা গঠিত এবং মহাসাগর তলদেশে এর সমাবেশ ঘটেছে। এই স্তর অপেক্ষাকৃত ভারী, যেহেতু ব্যাসল্টের আপেক্ষিক গুরুত্ব (3.2) গ্রানাইটের (2.9) চেয়ে কিছুটা ভারী হয়। সিমা স্তরের নিচে গভীরতার সঙ্গে সঙ্গে ঘনত্বও বাড়ে। এই ঘনত্বের তারতম্যের জন্য ভূ-গাঠনিক স্তরগুলি একে অন্যের ওপর ভাসতে থাকে। ভূ-ত্বকের ভাসমান বৃহৎ অংশগুলি পাত (plates)-এর মতো মনে হয়, এবং এগুলি সঞ্চালিত হবার সময় মহাদেশগুলিকেও সরিয়ে নিয়ে যায়। ভূ-গঠন প্রক্রিয়াগুলি (বা ভূ-আন্দোলন, যেমন ভূমিকম্প) এই ধরনের সঞ্চালনের ফল। সিয়াল-স্তর পার্বত্য এলাকাগুলির তুলনায় নিম্নভূমিগুলিতে অপেক্ষাকৃত পাতলা। পর্বতগুলির উচ্চতার অনুপাতে মহাদেশগুলি পর্বতের তলায় নিচের দিকে অনুপ্রবিষ্ট রয়েছে। আবার পর্বতগুলির নির্মোচনের সময় অবনমিত অংশগুলি ওপরে উঠতে থাকে।

গুরুমণ্ডল : শিলামণ্ডলের নিচেই গুরুমণ্ডলের অবস্থান। পৃথিবীর বেশীরভাগ পদার্থ নিয়ে গুরুমণ্ডল গঠিত। এর গড় পুরুত্ব প্রায় 2800 কিমি বলে মনে করা হয়। গুরুমণ্ডলের দুটি অংশ—বহিঃগুরুমণ্ডল ও অন্তঃগুরুমণ্ডল। বহিঃগুরুমণ্ডল, শিলা-গুরুমণ্ডল বা অ্যাসথেনোস্ফীয়ার (asthenosphere) এবং অন্তঃ বা নিম্ন গুরুমণ্ডলকে মধ্যমণ্ডল (mesosphere) বলা হয়। বহিঃগুরুমণ্ডলের শিলাগুলির আপেক্ষিক গুরুত্ব 3 থেকে 3.5 এর মধ্যে, কিন্তু আপেক্ষিক গুরুত্ব গভীরতার সঙ্গে বাড়তে বাড়তে 4.5 বা তার বেশী হয়। শিলা-গুরুমণ্ডলের বাইরের অংশে সনমনীয়তা (plasticity) লক্ষ করা যায় এবং সেজন্য বহিঃচাপের মোচন ঘটলে বিকৃতি ঘটে ও এটি তরল পদার্থে পরিণত হয়।

কেন্দ্রমণ্ডল : পৃথিবীর সবচেয়ে ভেতরের অংশটি কেন্দ্রমণ্ডল বলে পরিচিত। এই কেন্দ্রমণ্ডল ধাতব খনিজ সমৃদ্ধ এবং তার বেশীর ভাগই হল লোহা, নিকেল ও কোবাল্ট, তৎসহ সালফার ও সিলিকার মিশ্রণ। নিকেল (Ni) ও লোহার (Fe) প্রাচুর্য থাকার জন্য একে NIFE স্তরও বলা হয়। কেন্দ্রমণ্ডলের বিস্তার মোটামুটি 3500 কিমি, যার মধ্যে 1250 কিমি অন্তঃকেন্দ্রমণ্ডল ও বাকী 2250 কিমি বহিঃকেন্দ্রমণ্ডল বলে ধরা হয়। অন্তঃকেন্দ্রমণ্ডল কঠিন এবং বহিঃকেন্দ্রমণ্ডল গলিত ধাতব পদার্থ নিয়ে গঠিত বলে মনে করা হয়। কেন্দ্রমণ্ডলের আপেক্ষিক গুরুত্ব 13 পর্যন্ত হতে পারে, যেখানে ভূ-ত্বকের শিলাগুলির গড় আপেক্ষিক গুরুত্ব মাত্র 2.8 হতে দেখা যায়। পৃথিবীর কেন্দ্রের উষ্ণতা অত্যধিক, এবং তা 500 থেকে 5500 ডিগ্রি সেলসিয়াস বলে ধরা হয়।

2.2.2.1. ভূ-ত্বকের উপাদান ও গঠন

শিলা ও খনিজ : ভূ-ত্বক একটি পাতলা কঠিন আবরণে ঢাকা, যাকে খনিজ-ত্বক বলে ভাবা যেতে পারে। এই কঠিন আবরণ বিভিন্নপ্রকার শিলা দ্বারা গঠিত এবং তা ভূ-ত্বকের 70 শতাংশের বেশী অংশ জুড়ে রয়েছে। শিলাগুলি আসলে বিভিন্ন খনিজ পদার্থের সমন্বয়ে গঠিত। দুই বা তার অধিক খনিজের দানাগুলি জোড়-রক্ষাকারী (cementing) পদার্থের দ্বারা

সংযুক্ত থাকে। এই জোড়-রক্ষাকারী পদার্থগুলি পাশাপাশি অবস্থিত খনিজ কণার মধ্যবর্তী স্থান দখল করে থাকে। খনিজ পদার্থগুলি আবার বিভিন্ন রাসায়নিক উপাদান সহযোগে গঠিত। সাধারণভাবে ভূ-ত্বকে আটটি রাসায়নিক উপাদানের প্রাচুর্য রয়েছে।

সারণী 2.2. ভূ-ত্বকের উপাদানভিত্তিক গঠন (ভরের শতকরা হিসাব)

উপাদান	চিহ্ন বা প্রতীক	মোট ভরের শতাংশ
অক্সিজেন	O	46.6
সিলিকন	Si	27.7
অ্যালুমিনিয়াম	Al	8.1
লোহা	Fe	5.0
ক্যালসিয়াম	Ca	3.6
সোডিয়াম	Na	2.8
পটাশিয়াম	K	2.6
ম্যাগনেশিয়াম	Mg	2.1

ভূ-ত্বকে অক্সিজেনের আধিক্য সবচেয়ে বেশী, মোট ভরের প্রায় অর্দ্ধেক। এর পরেই রয়েছে সিলিকন যা মোট ভরের চারের-এক ভাগ। তার পরেই অ্যালুমিনিয়াম ও লোহার স্থান, এবং ক্রমহ্রাসমান স্থানাধিকারী হিসাবে বাদবাকীরা হল ক্যালিসিয়াম, সোডিয়াম, পটাশিয়াম এবং ম্যাগনেশিয়াম। এই তালিকার বাইরে কিছু গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল টাইটানিয়াম, হাইড্রোজেন, ফসফরাস, বেরিয়াম এবং স্ট্রনটিয়াম। আকর্ষণীয়ভাবে লক্ষ করা গেছে যে, অনেক গুরুত্বপূর্ণ ধাতব উপাদান, যেমন তামা, সীসা, দস্তা, নিকেল এবং টিন ভূ-পৃষ্ঠে অত্যন্ত বিরল।

শিলার শ্রেণীবিভাজন ঃ উৎপত্তি এবং রাসায়নিক গঠন অনুসারে শিলার শ্রেণীবিভাজন করা হয়ে থাকে। কাজেই শিলাগুলিকে মোটামুটিভাবে তিনটি শ্রেণীতে ফেলা যায়, যথা (ক) আগ্নেয় বা প্রাথমিক শিলা, (খ) পাললিক বা স্তরীভূত শিলা এবং (গ) রূপান্তরিত শিলা। রাসায়নিক গঠন অনুসারে এই শিলাগুলিকে আবার অনেক প্রকারে শ্রেণীবদ্ধ করা সম্ভব।

আগ্নেয় শিলা ঃ ভূ-অভ্যন্তর থেকে ম্যাগমা (magma) বেরিয়ে এসে লাভা (lava)-র আকারে তা ভূ-তলে ছড়িয়ে পড়ে বা ভূ-ত্বকের ভেতরেই কঠিন আকার ধারণ করে। এই ম্যাগমা হল গলিত পদার্থ এবং গ্যাস সমৃদ্ধ। এইসব গলিত পদার্থ শীতল হবার পর কঠিন হলে আগ্নেয় শিলায় পরিণত হয়। আগ্নেয় শিলার ধরন শীতল হবার পদ্ধতি ও উৎপত্তির স্থানের ওপর নির্ভরশীল। তাছাড়াও এই শিলাগুলিকে তাদের রাসায়নিক গঠনের ওপর ভিত্তি করে শ্রেণীবদ্ধ করা যায়।

পাললিক শিলা ঃ উৎপত্তির সময় থেকেই প্রাথমিক বা আগ্নেয় শিলা আবহবিকার ও ক্ষয়ীভবনের শিকার হয়। এইসব শিলা দ্বারা গঠিত ভূমিরূপ নির্মোচিত হলে ক্ষয়জাত পদার্থগুলি নদী, হিমবাহ, বাতাস ইত্যাদির দ্বারা বাহিত হয়ে সমুদ্র বা হ্রদে পলির আকারে জমা হতে থাকে। সুদীর্ঘ সময়ে এই পলিগুলির ভৌত ও রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে এবং সংঘবদ্ধ হয়ে কঠিন হলে শিলার রূপ পায়। একে পাললিক শিলা বলা হয়। যেহেতু পলি দিয়ে গঠিত তাই এর নাম পাললিক। বিভিন্ন সময়ে পলিগুলি বিভিন্ন স্তরে জমা হয়। তাই এই শিলায় স্তর ও স্তরতল দেখা যায়। বিভিন্ন স্তরগুলির ভেদ-সূচক তলকেই স্তরতল (bedding plane) বলা হয়। এজন্য অনেক সময় পাললিক শিলাকে স্তরীভূত শিলা হিসেবে অভিহিত করা হয়। বেলেপাথর, চুনাপাথর, কাদাপাথর ইত্যাদি হল কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ পাললিক শিলার উদাহরণ।

রূপান্তরিত শিলা : কোন বস্তুর পরিবর্তিত প্রকৃতি বা বৈশিষ্ট্যকে রূপভেদ বলা হয়। অত্যধিক চাপ ও উচ্চ তাপের ফলে আগ্নেয় এবং পাললিক শিলার রূপান্তর ঘটে। প্রধানতঃ ভূ-আন্দোলনের ফলেই এটি হয়ে থাকে। ফলতঃ আদি শিলার (parent rock) চেয়ে বেশী সংঘবদ্ধ, কেলাসিত এবং কঠিন এক নতুন ধরনের শিলার আবির্ভাব ঘটে। এই ধরনের শিলাকে রূপান্তরিত শিলা বলা হয়, এবং এই প্রক্রিয়ার নাম রূপান্তর প্রক্রিয়া। সবচেয়ে সাধারণ রূপান্তরিত শিলাগুলি হল—নীস (গ্রানাইটের রূপান্তর), কোয়ার্টজাইট (বেলেপাথরের রূপান্তর), শ্লেট (শেল-এর রূপান্তর), মার্বেল (চুনাপাথরের রূপান্তর) ইত্যাদি।

2.2.3. বারিমণ্ডল

ভূ-তলের অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল বারিমণ্ডল। ভূ-তলের সকল জলাশয়গুলিকে সামগ্রিকভাবে বারিমণ্ডল বলা হয়। বিস্তীর্ণ ও সুবিশাল জলাশয়গুলিকে বলা হয় সাগর ও মহাসাগর এবং এগুলি ভূমিতলের গঠন বৈশিষ্ট্যের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। ভূমিতলের ওপরও জলাশয় দেখা যায়। কিন্তু সাগর ও মহাসাগরের তুলনায় এগুলির গুরুত্ব কম। ভূ-তলের মোট এলাকার প্রায় 71 শতাংশ সাগর ও মহাসাগরগুলির অন্তর্গত। বাদবাকী মাত্র 29 শতাংশ এলাকা ভূমির দখলে রয়েছে। পৃথিবীর উভয় গোলার্ধে জল ও স্থলভাগের বন্টন প্রতিপাদিক (antipodal) বলে ভাবা যেতে পারে, কারণ উত্তর গোলার্ধে ভূমিতলের আধিক্য রয়েছে, আবার দক্ষিণ গোলার্ধে প্রায় সবটাই জলভাগের দখলে।

2.2.3.1. সাগর ও মহাসাগর

বিশ্ব-মহাসাগর (world ocean) বলতে পৃথিবীর সকল সাগর ও মহাসাগরকে একসঙ্গে বোঝায়। পৃথিবীতে প্রায় 361,059,200 বর্গ কিমি এলাকা বারিমণ্ডলের দখলে। এর মধ্যে প্রশান্ত মহাসাগর, আটলান্টিক মহাসাগর ও ভারত মহাসাগর—তিনটি প্রধান জলাশয় হিসাবে চিহ্নিত। এই তিনটি মহাসাগর একত্রে বারিমণ্ডলের মোট এলাকার প্রায় 89 শতাংশ জুড়ে রয়েছে। বিভিন্ন সাগর ও মহাসাগরগুলির মোট এলাকা ও আয়তন নীচে দেওয়া হল।

সারণী 2.3. সাগর ও মহাসাগর—গড় এলাকা ও আয়তন

নাম	এলাকা (বর্গ কিমি)		আয়তন (ঘন কিমি)	
আটলান্টিক মহাসাগর	82,441,500		323,613,000	
ভারত মহাসাগর	73,442,700		291,030,000	
প্রশান্ত মহাসাগর	165,246,200		707,555,000	
মহাসাগরগুলির মোট	321,130,400	(88.94%)	1,322,198000	(96.5%)
সুমেরু সাগর	14,090,100		16,980,000	
মালয় সাগর	8,143,100		9,873,000	
মধ্য-আমেরিকা সাগর	4,319,500		9,573,000	
ভূ-মধ্যসাগর	2,965,900		4,238,000	
অন্তর্মহাদেশীয় সাগরগুলির মোট	29,518,600	(8.2%)	40,664,000	(2.96%)

নাম	এলাকা (বর্গ কিমি)		আয়তন (ঘন কিমি)	
বাল্টিক সাগর	422,300		23,000	
হাডসন উপসাগর	1,232,300		158,000	
লোহিত সাগর	437,900		215,000	
পারস্য উপসাগর	238800		6,000	
ক্ষুদ্রাকার আবদ্ধ সাগরগুলির মোট	2,331,300	(0.64%)	402,000	(0.03%)
বেরিং সাগর	2,268,200		3259,000	
ওখটস্ক সাগর	1,527,600		1279,000	
জাপান সাগর	1,007,700		1361,000	
পূর্ব-চীন সাগর	1,249,200		235,000	
আন্দামান সাগর	797,600		694,000	
ক্যালিফোর্নিয়া সাগর	162,200		132,000	
উত্তর সাগর	575,300		54,000	
ইংলিশ চ্যানেল ও আইরিশ সাগরসমূহ	178,500		10,000	
লরেন্সীয় সাগর	237,800		30,000	
বাস (Bass) সাগর	74,800		5,000	
প্রান্তবর্তী সাগরগুলির মোট	8,078,900	(2.22%)	7,059,000	(0.51%)
বারিমণ্ডল	361,059,200		137,032,5000	

সারণী থেকে দেখা যায় যে সবকটি মহাসাগরের মধ্যে প্রশান্ত মহাসাগর এলাকা ও আয়তনের দিক দিয়ে সবচেয়ে বড়, এবং তার পরেই রয়েছে আটলান্টিক ও ভারত মহাসাগরের স্থান। অন্তর্মহাদেশীয় (inter-continental) সাগরগুলি বারিমণ্ডলের মোট এলাকার প্রায় 8 শতাংশ এবং মোট আয়তনের 3 শতাংশ জুড়ে রয়েছে। এর পরেই প্রান্তবর্তী সাগরগুলির (fringing seas) স্থান। এগুলি বারিমণ্ডলের মোট এলাকার 2 শতাংশে এবং মোট আয়তনের 0.5 শতাংশে দখল করেছে। ক্ষুদ্রাকার আবদ্ধ সাগরগুলি (smaller enclosed seas) বারিমণ্ডলের সবচেয়ে কম এলাকা (0.64%) এবং সবচেয়ে কম আয়তন (0.03%) দখল করেছে, কিন্তু এগুলির প্রভূত গুরুত্ব আছে।

মহাসাগরগুলির সাধারণ বৈশিষ্ট্যসমূহ ঃ সাগর ও মহাসাগরগুলির গভীরতার যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। ভূমি-সীমানা বরাবর প্রান্তবর্তী সাগরগুলি তুলনামূলকভাবে কম গভীর, কেননা এখানে বিস্তীর্ণ মহীসোপান (continental shelf) লক্ষ করা যায়। মহীসোপানগুলি আসলে মহাসাগরের মধ্যে মহাদেশগুলির বর্দ্ধিত অংশমাত্র। মহীসোপানগুলির গভীরতা 200 মিটারের মধ্যে হয়। সারণীতে দেখা যাচ্ছে যে, আটলান্টিক মহাসাগরে সবচেয়ে বেশী মহীসোপান এলাকা (13.3%) রয়েছে, তুলনায় প্রশান্ত (5.7%) ও ভারত মহাসাগরে (4.2%) এর পরিমাণ কম। মহীসোপানের প্রান্তদেশে মহাসাগর তলদেশের ভূ-প্রকৃতি তুলনামূলকভাবে অধিক ঢালযুক্ত হয়ে পড়ে, একে মহীঢাল (continental slope) বলে। মহীঢাল অবশেষে প্রায়-সমতল

মহাসমুদ্রের মেঝেতে গিয়ে মেশে। এই প্রায়-সমতল মহাসাগর তলদেশকে গভীর সমুদ্রের সমভূমি (deep sea plain) বলা হয়। সংলগ্ন সাগরগুলিকে বাদ দিলে এই অংশটি মহাসাগরগুলির সবচেয়ে বেশী এলাকা (প্রায় 83%) জুড়ে রয়েছে। বিভিন্ন মহাসাগরে এই গভীর সমুদ্রের সমভূমির গভীরতার পার্থক্য হয়, তবে তা 2000 থেকে 6000 মিটারের মধ্যে থাকে। মোট এলাকার শতকরা হিসেবে গভীর সমুদ্রের সমভূমি প্রশান্ত মহাসাগর, ভারত মহাসাগর ও আটলান্টিক মহাসাগরে যথাক্রমে 90.6, 90.6 ও 85.8 অংশ অধিকার করেছে। মহাসাগর তলদেশের অনেক এলাকার গভীরতা 6000 মিটারেরও বেশী। তবে এগুলি মহাসাগরগুলির মোট এলাকার 1.2 শতাংশের বেশী দখল করে না। এগুলিকে মহাসাগর-খাত (ocean deeps) বলা হয়। বেশীরভাগ মহাসাগর-খাত প্রশান্ত মহাসাগরে দেখা যায়। তবে আটলান্টিক ও ভারত মহাসাগরে এদের সংখ্যা খুবই কম। বিভিন্ন মহাসাগর-খাতের মধ্যে উত্তর প্রশান্ত মহাসাগরে অবস্থিত মারিয়ানা বা চ্যালেঞ্জার (5269 মিটার) পৃথিবীতে গভীরতম। এর পরেই রয়েছে মধ্য দক্ষিণ-প্রশান্ত মহাসাগরের টোঙ্গা খাত (5022 মিটার)। অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ খাতগুলি হল প্রশান্ত মহাসাগরের ফিলিপাইন খাত (4767 মিটার), জাপান খাত (4655 মিটার), মারে খাত (3540 মিটার) ; আটলান্টিক মহাসাগরের পুত্তরতোরিকো খাত (4662 মিটার), রোমানশে খাত (4030 মিটার) ; এবং ভারত মহাসাগরে অবস্থিত সুণ্ডা খাত (3828 মিটার)। এই গভীরতার সঙ্গে 6000 মিটার যোগ করলে সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে খাতের তলদেশ অবধি গভীরতা পাওয়া যাবে।

মহাসাগরগুলিতে উষ্ণতামান ও লবণতার বন্টন সাধারণভাবে অক্ষাংশের সাথে বদলায়। ক্রান্তীয় মহাসাগরগুলির ওপর তুলনামূলকভাবে উচ্চ উষ্ণতামান বজায় থাকে। আবার উষ্ণ নিরক্ষীয় সমুদ্রস্রোত নিরক্ষরেখার কাছাকাছি উৎপন্ন হয়ে পৃষ্ঠ-স্রোত হিসেবে মেরুপ্রদেশের দিকে প্রবাহিত হয়। অন্যদিকে, মেরুঅঞ্চলগুলিতে শীতলাবস্থা স্থায়ীভাবে প্রকট থাকে, যেজন্য এখানে শীতল সমুদ্রস্রোতের সৃষ্টি হয় এবং তা নিম্ন অক্ষাংশের দিকে চলে আসে। মহাসাগর জলের উষ্ণতামান আবার গভীরতার সঙ্গেও সম্পর্কিত। সচরাচর তিনটি গঠনগত উষ্ণতা-স্তর দেখা যায়—সমুদ্র-পৃষ্ঠ থেকে 500 মিটার গভীরতা পর্যন্ত উচ্চ পৃষ্ঠতাপমাত্রা ; 500 থেকে 1000 মিটার গভীরতায় উষ্ণতামানের প্রচণ্ড হ্রাস, যেটিকে থার্মোক্লাইন (thermocline) বা তাপহ্রাস অঞ্চল বলা হয় ; এবং 1000 মিটারের অধিক গভীরতায় নিরবচ্ছিন্ন শীতলতা। মহাসাগরগুলিতে উষ্ণতার উলম্ব বন্টন জীবনের জন্য পরিবেশ পাঠের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। যে ওপরের স্তরগুলিতে সূর্যালোক ভেদ করে ঢুকতে পারে তাদের লিমনেটিক (limnetic) বা হ্রদতুল্য অঞ্চল বলে। এই অঞ্চলে সালোকসংশ্লেষ ও বৃদ্ধির হার সর্বাধিক, ফলতঃ অক্সিজেনের পরিমাণ বেশী হয় এবং পুষ্টি পদার্থের গ্রহণ খুব দ্রুততার সঙ্গে হয়। কাজেই এই অঞ্চলটি উদজ প্রজাতিতে পরিপূর্ণ থাকে। হ্রদতুল্য অঞ্চলের নিচে রয়েছে প্রোফানডাল (profundal) বা নিগূঢ় অঞ্চল এবং বেন্থিক (benthic) বা অতলস্থ অঞ্চল। এই অঞ্চলগুলি অন্ধকারময়, কিন্তু বিয়োজন, খনিজের উৎপাদন এবং পুষ্টি পদার্থের পুঞ্জীভবন এখানে ঘটে থাকে। এই অন্ধকারময় অঞ্চলে অবশ্য দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ কম থাকে এবং সেজন্য অবাত অনুজীবীয় কর্মকাণ্ডের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। শুষ্ক অবস্থায় ক্রান্তীয় সাগরগুলির জলে লবণের পরিমাণ সবচেয়ে বেশী হয়। আবদ্ধ সমুদ্রগুলিতে জলের মিশ্রন প্রায় হয় না বলে লবণতার পরিমাণ সবচেয়ে অধিক হয়। লোহিত সাগর ও ভূ-মধ্যসাগরে লবণতার পরিমাণ সর্বাধিক। নিম্ন অক্ষাংশে অবশ্য লবণতা সমুদ্রের গভীরতার সাথে বদলায়, তবে 100 থেকে 200 মিটার গভীরতা পর্যন্ত এটি দ্রুতহারে বাড়তে থাকে, তারপরে আবার দ্রুতহারে কমতে কমতে প্রায় 800 মিটার গভীরতায় এর পরিমাণ সবচেয়ে কম হয়।

2.2.3.2. বারিমণ্ডলের গুরুত্ব

মানব জাতির কাছে বারিমণ্ডলের গুরুত্ব অপরিসীম। বাষ্পীভবনের মাধ্যমে মহাসাগরগুলি বায়ুমণ্ডলকে জলীয় বাষ্পের যোগান দেয়। আবার জলীয় বাষ্প ঘনীভবন ও অধঃক্ষেপণের ফলে পুনরায় বায়ুমণ্ডল থেকে ভূ-তলে ফিরে আসে। বৃষ্টির জল নদীপ্রবাহের আকারে সমুদ্রে গিয়ে মেশে। বারিপাতের (precipitation) একটি অংশ ভূমির নিচে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে ভৌম-

জলের ভাণ্ডার গড়ে তোলে। উদ্ভিদেরা বিভিন্ন ভৌম উৎস থেকে তাদের প্রয়োজনীয় জল সংগ্রহ করে, এবং এই জল আবার 'বাষ্পীমোচন' (evapotranspiration) প্রক্রিয়ায় বায়ুমণ্ডলে নির্গত হয়। এই প্রক্রিয়া নিরন্তর চলতে থাকে এবং আমাদের সজীব পৃথিবীর জল ও আর্দ্রতার মান প্রধান মহাসাগর ও বায়ুমণ্ডলের দ্বারা নির্ধারিত হয়। এই প্রক্রিয়াকে উদকচক্র (hydrologic cycle) বলা হয়। একটি অনুমানে বলা হয়েছে যে, মহাসাগরগুলি থেকে প্রতি বছর 4.49×10^{17} কিলোগ্রাম জল বাষ্পীভবনের মাধ্যমে বায়ুমণ্ডলে এসে পৌঁছায়, কিন্তু বারিপাতের আকারে 4.12×10^{17} কিলোগ্রাম এগুলির ওপর ফিরে আসে। ভূ-তলের জলাশয়গুলি থেকে বাষ্পীভবন ও গাছপালা থেকে বাষ্পীমোচনের ফলে বছরে 0.71×10^{17} কিলোগ্রাম জল বায়ুমণ্ডলে এসে হাজির হয়, কিন্তু এদের ওপর প্রায় 1.05×10^{17} কিলোগ্রাম বারিপাত ঘটে। অর্থাৎ এখানে বারিপাতের পরিমাণ বাষ্পীভবনের চেয়ে অনেক বেশী। এর মধ্যে প্রায় 0.37×10^{17} কিলোগ্রাম জল বিভিন্ন নদী-স্রোতের আকারে অবশেষে মহাসাগরগুলিতে গিয়ে পড়ে। অবশিষ্ট পরিমাণ জল ভূ-তলের জলাশয়গুলিতে ও মাটির নিচে জমা থাকে, যা পৃথিবীতে জীবনের অস্তিত্ব রক্ষায় একান্তভাবে অপরিহার্য। জীবমণ্ডলে, বিশেষতঃ স্থলভাগের বাস্তুতন্ত্রগুলির জন্য প্রয়োজনীয় স্বাদুজলের যোগানের ক্ষেত্রে উদকচক্রের ভূমিকা যথেষ্ট।
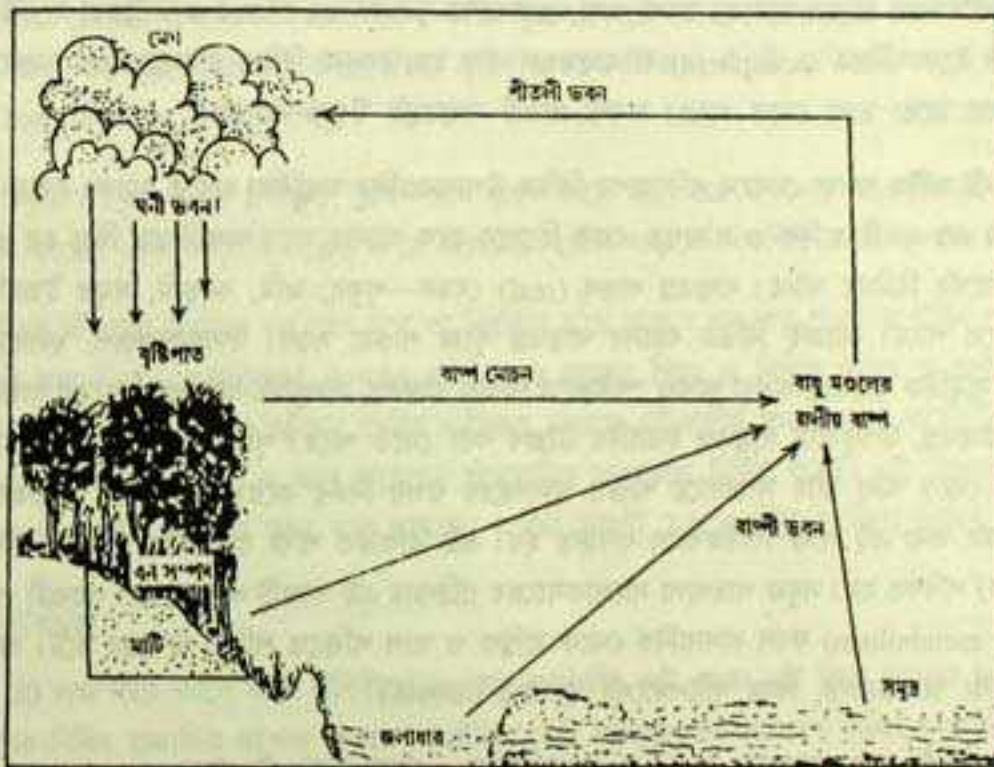
চিত্র 2.2. উদকচক্র (জল চক্র)। (অধ্যাপক তারকমোহন দাসের সৌজন্যে প্রাপ্ত)।

মহাসাগরগুলি কার্বন ডাইঅক্সাইডের বিশাল ভাণ্ডার। এগুলি বায়ুমণ্ডলের চেয়েও বেশী কার্বন ডাইঅক্সাইড শোষণ করতে পারে। এগুলিতে সঞ্চিত মোট কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ হল প্রায় 13 লক্ষ কোটি টন, যা বায়ুমণ্ডলের কার্বন ডাইঅক্সাইডের চেয়ে প্রায় 50 গুণ বেশী। তাছাড়া মহাসাগরগুলি 20 হাজার কোটি টন কার্বন ডাইঅক্সাইড বায়ুমণ্ডলের সাথে বিনিময় করে। মহাসাগরগুলিতে কার্বন ডাইঅক্সাইডের ভাণ্ডার কিছু পরিমাণে নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা পালন করে। যখন বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাইঅক্সাইড খুব বেশী হয়ে পড়ে, মহাসাগরগুলি তা শোষণ করে, আবার বায়ুমণ্ডলে এর ঘাটতি মহাসাগরগুলি থেকে পূরণ হয়।

মহাসাগরগুলি বিপুল পরিমাণ সম্পদের ভাণ্ডারও বটে। এখান থেকে পাওয়া যায় প্রচুর জল, লবণ, খনিজপদার্থসমূহ এবং খাদ্য। মহাসাগরের এই সম্পদগুলি এখনও সম্যকভাবে আহরণ করা হয় না, এবং সুচিন্তিতভাবে ব্যবহার করলে এগুলি বহু সহস্রাব্দ ধরে কাজে লাগানো সম্ভব হবে। মহাসাগরগুলি ভূমিতল থেকে আসা দূষক ও বর্জ্য-পদার্থ গ্রহণের মাধ্যমে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তবে মহাসাগরগুলির এই ভূমিকাকে যথাসম্ভব নিয়ন্ত্রণ করতে হবে এবং সেজন্য স্থলভাগে বিপর্যয় সৃষ্টিকারী বর্জ্য-পদার্থ ও দূষকগুলির উৎপাদন যথেষ্ট কমিয়ে ফেলা দরকার। আবার মানব সভ্যতার উষালগ্ন থেকেই মহাসাগরগুলি পরিবহন পথ হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। পৃথিবীতে প্রাণের অস্তিত্ব ও উদবর্তনের জন্য বারিমণ্ডলের ভূমিকা সর্বাধিক। এটা প্রায় নিশ্চিত হওয়া গেছে যে, পৃথিবীতে প্রথম প্রাণের আবির্ভাব সামুদ্রিক পরিবেশেই ঘটেছিল। উদকচক্রের মাধ্যমে স্থলভাগে জলের পর্যাপ্ত যোগান না থাকলে স্থলভাগেও জীবনের আবির্ভাব হয়তো সম্ভব ছিল না। আমাদের আবার এটাও বুঝতে হবে যে ভূমিতলে জলসম্পদের পরিমাণ যথেষ্ট কম এবং সর্বত্রলভ্য নয়।

2.2.4. জীবমণ্ডল

পৃথিবীর জৈব উপাদানগুলি জীবমণ্ডলের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। পৃথিবীর তিনটি গুরুত্বপূর্ণ মণ্ডল—শিলা, বারি ও বায়ু—এদের মধ্যে জীবমণ্ডল ছড়িয়ে রয়েছে। অবশ্য অন্য মণ্ডলগুলির তুলনায় এর পরিসর ও গভীরতা যথেষ্ট কম। অনেকসময় এটিকে আবার ইকোস্ফীয়ার (ecosphere) বা বাস্তুমণ্ডল বলা হয়, কেননা বিভিন্ন বাস্তুতন্ত্রগুলির সমন্বয়ে গঠিত এটি একটি বিশাল জালের মতো ভাবা যেতে পারে। অবশ্য প্রতিটি বাস্তুতন্ত্রই উন্মুক্ত ধরনের।

বাস্তুতন্ত্র একটি জটিল ব্যবস্থা যেখানে পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানগুলির অন্তর্ক্রিয়া চলতে থাকে। এখানে প্রতিটি সপ্রাণ এবং অপ্রাণ উপাদান এক একটি স্থানিক ও গঠনগত একক হিসেবে একে অন্যের সাথে অন্তর্ক্রিয়ায় লিপ্ত হয় এবং ফলস্বরূপ নিজেদের মধ্যে পদার্থের বিনিময় ঘটায়। বাস্তুতন্ত্র বাস্তব (real) যেমন—পুকুর, জমি, বনভূমি, সমুদ্র ইত্যাদি বা তত্ত্বগত (hypothetical) হতে পারে। কাজেই বিভিন্ন ধরনের বাস্তুতন্ত্র খুঁজে পাওয়া সম্ভব। উদাহরণস্বরূপ, স্থলভাগের বাস্তুতন্ত্র, জলাভূমির বাস্তুতন্ত্র, সামুদ্রিক বাস্তুতন্ত্র, অথবা আরও স্পষ্টভাবে পার্বত্য বাস্তুতন্ত্র, মরুভূমির বাস্তুতন্ত্র, পুকুরের বাস্তুতন্ত্র, তৃণভূমির বাস্তুতন্ত্র, বনভূমির বাস্তুতন্ত্র, উপকূলীয় বাস্তুতন্ত্র ইত্যাদির উল্লেখ করা যেতে পারে। পৃথিবীতে সকল প্রকার সজীব অস্তিত্ব এক জীব সম্প্রদায় থেকে অন্য জীব সম্প্রদায়ে শক্তির স্থানান্তরের ওপর নির্ভর করে। সূর্য শক্তির প্রাথমিক উৎস, এবং জীবকূলের কাজকর্মের জন্য এই শক্তি বিভিন্নভাবে ব্যবহৃত হয়। এই বিকিরিত শক্তি রাসায়নিক শক্তিতে কার্বহাইড্রেট বা শর্করা জাতীয় খাবার) পরিণত হয়। সবুজ গাছপালা সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় এই কাজটি করে থাকে। পরবর্তী পর্যায়ে কোষীয় বিপাকের (cellular metabolism) ফলে রাসায়নিক থেকে যান্ত্রিক ও তাপ শক্তিতে শক্তির রূপান্তর ঘটে। বাস্তুতন্ত্রে শক্তির স্থানান্তর একমুখী এবং অ-চক্রাকার, কিন্তু পুষ্টিপদার্থের স্থানান্তর চক্রাকার।

জীবমণ্ডলে তিনটি মুখ্য সম্প্রদায় (community) রয়েছে—যেমন (ক) উৎপাদক (producers), (খ) খাদক (consumers) এবং (গ) বিয়োজক (decomposers)। 'উৎপাদক' শব্দটি অনেকসময় বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে। তাই অপেক্ষাকৃত উপযুক্ত পরিভাষা হিসেবে 'পরিবর্তক' (converters) শব্দটি ব্যবহার করা যেতে পারে। এগুলি হল সবুজ গাছপালা যারা সূর্যের বিকিরিত শক্তিকে রাসায়নিক শক্তিতে পরিবর্তন/রূপান্তর ঘটায়। শাকাশী এবং মাংসাশী উভয়ই খাদক হিসেবে পরিচিত। খাদ্যশৃঙ্খল ব্যবস্থায় (food chain system) মাংসাশীরা শাকাশীদের ওপর এবং শাকাশীরা গাছপালা বা স্বভোজীদের (autotrophs) ওপর শক্তি ও পুষ্টিপদার্থের জন্য নির্ভরশীল। উদ্ভিদ ও প্রাণীদের দেহাবশেষ এবং বর্জ্য-পদার্থসমূহ বিভিন্ন ধরনের ব্যাক্টেরিয়া, ছত্রাক ও অনুজীবের দ্বারা বিয়োজিত হয়। তাই এগুলিকে বিয়োজক বলা হয়। বাস্তুতন্ত্রে শক্তি ও পুষ্টির প্রবাহ পূর্ববর্তী স্তরগুলি থেকে বিয়োজকদের কাছে পৌঁছায়। একস্তর থেকে অন্যস্তরে যাবার সময় শক্তির মোট পরিমাণ

দ্রুত কমে যায়। পরিশেষে বিয়োজকেরা পরিবেশে পুষ্টি পদার্থের নির্গমন ঘটায় যেগুলি আবার ব্যবহারের জন্য পাওয়া সম্ভব হয়।

2.2.4.1. ভূ-তাত্ত্বিক কাল ও জীবনের বিবর্তন

আনুমানিক 460 কোটি বছর আগে যখন পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছিল, তখন পৃথিবীর ভৌতিক অবস্থা প্রাণসৃষ্টির সম্পূর্ণ প্রতিকূল ছিল—একশো কোটি বছরেরও বেশি সময় কেটে গেল পৃথিবীতে প্রাণের প্রথম স্পন্দনের অপেক্ষায়। তখন কিন্তু বায়ুমণ্ডলে মুক্ত অক্সিজেন ছিল না—ছিল হাইড্রোজেন, অ্যামোনিয়া, মিথেন, প্রচুর জলীয় বাষ্প ইত্যাদি। এই ধরনের পরিমণ্ডলে বিদ্যুৎ এবং অতি-বেগুনি রশ্মির প্রভাবে অনেক রকমের জৈব রাসায়নিক পদার্থ সৃষ্টি হতে পারে যেমন ফ্যাটি অ্যাসিড, অ্যামাইনো অ্যাসিড (প্রোটিনের প্রাথমিক উপাদান) ইত্যাদি। পরীক্ষাগারে এদের ঐভাবে সংশ্লেষ করা সম্ভব হয়েছে এবং তা প্রমাণ করে যে আদিম পৃথিবীতে জীব সৃষ্টির আগেই অজৈব পদ্ধতিতে জৈব পদার্থ তৈরি হয়েছিল। এখন বহু বিজ্ঞানীই মনে করছেন যে ঐ অবস্থায় প্রোটিন, এমনকি ফসফরাসঘটিত পদার্থের সহযোগে জীবনের প্রধান উপাদান স্ববিভাজনক্ষম নিউক্লিক অ্যাসিডও তৈরি হতে পারে এবং খুব সম্ভবতঃ তা ঘটেছিল সমুদ্রজলে,—তথাকথিত "সুপে" বা পুষ্টির ধারে (dilute soup of nutrients)। নিউক্লিক অ্যাসিড, প্রোটিন, উৎসেচক ইত্যাদি জৈব পর্দার ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে (cell) আবদ্ধ হয়ে এমন একটি অবস্থায় পৌঁছায় তাকে সত্যিই জড় বস্তু থেকে আলাদা ক'রে জীবন সৃষ্টির প্রায় অনতিক্রম্য ধাপটি অতিক্রম করতে সক্ষম করলো। এবং এটাই হলো জৈব বিবর্তনের প্রথম সোপান।

প্রথম সৃষ্টি জীবেরা জলে দ্রবীভূত জৈব পদার্থ গ্রহণ ক'রে যাত্রা শুরু করলেও পরবর্তীকালে প্রয়োজনের তাগিদে অজৈব রসায়ন-সংশ্লেষ এবং সালোকসংশ্লেষ ক'রে জীবনের স্বাধীন সত্বাকে বিকশিত ক'রে তুললো।

পৃথিবীতে জীবনের উদ্ভবের পর যুগে যুগে তা বিবর্তিত হ'য়ে চলেছে শত শত প্রজাতির উদ্ভিদ ও প্রাণীদের আবির্ভাব ও তিরোধানের মধ্য দিয়ে। ভূতাত্ত্বিকগণ ভূপৃষ্ঠের গঠন, নানা ধরণের শিলা ও বিভিন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণীর জীবাশ্ম (fossil) ইত্যাদির অনুধাবন ও বিশ্লেষণ এবং অন্যান্য বহুবিধ পরীক্ষার মাধ্যমে এই সুদীর্ঘ সময়কালকে কয়েকটি যুগ (Era), উপযুগ (Period) এবং অধিযুগ (Epoch)-এ ভাগ করেছেন আনুমানিক সময়কাল নির্দিষ্ট ক'রে। এই বিভাগগুলিতে কোন কোন জীবের বিকাশ ও বিস্তার হয়েছিল তাও বলা হয়েছে। আমরা সারণী 2.4 এগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়েছি।

2.2.4.2. জীববৈচিত্র্য

প্রায় 20 লক্ষ বছর আগে যখন পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাব ঘটে, তখন এই বিশ্বে অসংখ্য গাছপালা, প্রাণী, ছত্রাক এবং অনুজীবের বিবিধ প্রজাতির ব্যাপক সমাবেশ ঘটেছিল। এই ব্যাপক জীব সমাবেশ পৃথিবীর বসতির (habitat) একটি অঙ্গ হিসেবে বিরাজ করতে থাকে এবং তা মানুষের ভাগ্যবিধান রচনা করে। এমনকি আজকের দিনেও আমাদের বেঁচে থাকা এর সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত, কারণ জীবমণ্ডল আমাদের পক্ষে এক অপরিহার্য জীবনদায়ী ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে।

জীবনের বৈচিত্র্যকে জীববৈচিত্র্যের (biodiversity) মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়, যা প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীর সমস্তরকমের জীবন-ধারক নিয়ে গঠিত। পৃথিবীর সমস্তধরনের প্রজাতির, যেমন জীবাণু, উদ্ভিদ, পতঙ্গ, উভচর, সরীসৃপ, পাখি এবং স্তন্যপায়ী যাদের জীবনমণ্ডলে দেখা যায় এবং যারা বাস্তুতন্ত্রের সাথে সম্পর্কিত, তাদের সকলের সমাহারকে জীববৈচিত্র্য বলা যায়। জীববৈচিত্র্য তিনটি বিভিন্ন স্তরে পাঠ করা হয়ে থাকে। এগুলি হল—(ক) কোন বাস্তুতন্ত্রের মধ্যে জীব সম্প্রদায়ের বৈচিত্র্য, (খ) কোন জীব সম্প্রদায়ের মধ্যে জীব প্রজাতির বৈচিত্র্য, এবং (গ) কোন জীব প্রজাতির মধ্যে জিনগত গঠনের বৈচিত্র্য।

সারণী 2.4. ভূ-তাত্ত্বিককাল এবং জীবনের বিকাশ ও বিস্তার

যুগ (Era)	উপযুগ (Period)	অধিযুগ (Epoch)	বয়স (কোটি বছর) বর্তমান সময় থেকে	জীবের আবির্ভাব এবং বিস্তার	কোন প্রাণীর প্রাধান্যের সময়
কেনোজোয়িক (Cenozoic)	কোয়াটারনারি (Quaternary)	হলোসিন (Holocene)	0.001	আধুনিক মানুষ, মানব সভ্যতার বিস্তার।	আধুনিক মানুষ (*Homo sapiens*) -এর সময়কাল
		প্লাইস্টোসিন (Pleistocene)	0.10	বর্তমান মানুষের (হোমো স্যাপিয়েন্স)-এর বিকাশ। খুব বড় আকারের স্তন্যপায়ীদের বিলুপ্তি।	
	টারসিয়ারি (Tertiary)	প্লায়োসিন (Pliocene)	1.3	আধুনিক মানুষ (*Homo sapiens*)-এর সৃষ্টির প্রাক্কাল।	স্তন্যপায়ী প্রাণীদের সময়কাল
		মায়োসিন (Miocene)	2.5	তিমি, বাদুড় এবং বানরদের বিকাশ।	
		অলিগোসিন (Oligocene)	3.6	মনুষ্যেতর প্রাণীদের (অ্যানথ্রোপয়েড)দের উত্থান ও বিকাশ।	
		ইয়োসিন (Eocene)	5.8	আদিম স্তন্যপায়ীদের বিকাশ। ঘাস জাতীয় উদ্ভিদ ও অন্যান্য উন্নত উদ্ভিদের বিকাশ।	
		প্যালিওসিন (Paleocene)	6.3	আদিম অশ্ব প্রজাতির আবির্ভাব।	
মেসোজোয়িক (Mesozoic)	ক্রিটেসাস (Cretaceous)		1.35	ডাইনোসরদের বিলুপ্তি, সপুষ্পক উদ্ভিদের বিকাশ।	সরীসৃপ প্রাণীদের সময়কাল
	জুরাসিক (Jurassic)		18.0	ডাইনোসরদের প্রাধান্য কিন্তু শেষের দিকটায় তারা পিছিয়ে পড়ে। প্রথম পাখিদের আবির্ভাব।	
	ট্রায়াসিক (Triassic)		23.0	প্রথম ডাইনোসরদের আবির্ভাব। আদিম স্তন্যপায়ীদের উদ্ভব। কনিফার ও সাইকাড জাতীয় উদ্ভিদের বিস্তার।	
(Carboniferous)	পারমিয়ান (Permian)		28.0	সরীসৃপদের বিকাশ, পোকা মাকড় এবং উভচর প্রাণীদের প্রসার। সামুদ্রিক ট্রাইলোবাইটদের অবলুপ্তি। কনিফারদের বিস্তার।	উভচর প্রাণীদের সময়কাল
	পেনসিলভানিয়ান (Pennsylvanian)		31.0	নগ্নবীজ উদ্ভিদের আধিপত্য (যাদের থেকে পরে কয়লার সৃষ্টি হয়)। পোকা মাকড়দের বিকাশ। সরীসৃপদের সৃষ্টি।	
	মিসিসিপিয়ান (Mississippian)		34.5	হাঙরদের বিস্তার, ক্রিনয়েড জাতীয় প্রাণীদের অবলুপ্তি।	
	ডেভোনিয়ান (Devonian)		40.5	প্রথম উভচরদের আগমন, প্রবালদের বিস্তার, বেশ কিছু প্রকার স্থলজ উদ্ভিদের সৃষ্টি এবং মাটিতে অরণ্যের বিকাশ।	মৎস্যের সময়কাল
	সাইলুরিয়ান (Silurian)		42.5	প্রথম স্থলজ উদ্ভিদের আবির্ভাব, বায়ু-গ্রহণকারী প্রাণীদের আগমন, মৎস্যদের বিকাশ।	
প্যালিওজোয়িক (Paleozoic)	অর্ডোভিসিয়ান (Ordovician)		50.0	জীবন জলে (সমুদ্রে) সীমাবদ্ধ, শামুক জাতীয় (molluscs) প্রাণীদের বিস্তার।	সামুদ্রিক অমেরুদণ্ডীদের সময়কাল
	ক্যামব্রিয়ান (Cambrian)		57.0	ট্রাইলোবাইটদের প্রাধান্য, তবে অনেক সামুদ্রিক অমেরুদণ্ডী প্রাণীর বিকাশ।	
প্রিক্যামব্রিয়ান যুগ (Precambrian era) 460 থেকে 57 কোটি বছর অবধি (ভূ-তাত্ত্বিক কালের 87 শতাংশ)				পৃথিবী সৃষ্টির (460 কোটি বছর আগে) আনুমানিক 110 কোটি বছর পরে অতি ক্ষুদ্র এককোষী ব্যাকটিরিয়া ধরণের জীবের সৃষ্টি হয়েছিল। যা থেকে পরে রসায়ন-সংশ্লেষকারী এবং সালোক-সংশ্লেষকারী ব্যাকটিরিয়া, নীল-সবুজ শৈবাল ইত্যাদির উদ্ভব হয়েছিল। জীবাশ্ম বেশি না থাকায় এইযুগ সম্বন্ধে অনেক কিছুই অজানা।	প্রাণসৃষ্টি ও আদিতম জীবকুলের উদ্ভবের সময়কাল

জীববৈচিত্র্যের গুরুত্ব : মানব জীবন ও সমাজের টিকে থাকার জন্য জীববৈচিত্র্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কেননা আমরা অন্যান্য জীবের ওপর অনেকাংশে নির্ভর করে থাকি। আমাদের চারপাশের সজীব পদার্থগুলি থেকেই আমরা প্রয়োজনমত খাবার, ওষুধ, বিভিন্ন দরকারী রাসায়নিক পদার্থ, আবাস ও পরিচ্ছদের বস্তুসমূহ সংগ্রহ করে থাকি। এইসব জিনিসের অভাব ঘটলে আমাদের জীবন ও জীবনযাত্রা দারুণভাবে বিঘ্নিত হবে। কাজেই আমাদের নিজস্ব তাগিদেই জীব প্রজাতিগুলির গুরুত্ব বুঝে নিতে হবে। আমাদের জানতে হবে যে :

(ক) সকল খাদ্যের প্রাথমিক উৎস হল গাছপালা। মানুষসহ পৃথিবীর অন্যান্য সকল জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তির যোগান সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় কেবল উদ্ভিদের দ্বারাই আবদ্ধ হয়। শক্তি এক ভোজন-স্তর (trophic level) থেকে অন্যস্তরে পরিবাহিত হয়, কিন্তু তার পরিমাণ দ্রুতহারে কমতে থাকে।

(খ) সপ্রাণ জীবগুলি থেকেই আমরা রোগ নিরাময়ের জন্য প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র পেয়ে থাকি। অনেক ওষুধ সরাসরি গাছপালা, ছত্রাক বা ব্যাক্টেরিয়াগুলি থেকে সংগৃহীত হয়। বর্তমানে কৃত্রিম সংশ্লেষায়নের মাধ্যমে যেসব ওষুধ তৈরি করা হচ্ছে, তাও প্রাথমিকভাবে প্রকৃতিতেই আবিষ্কৃত হয়। আধুনিক বিশ্বে জৈব-ওষুধের (biomedicines) চাহিদা গুরুত্ব উত্তরোত্তর বাড়ছে।

(গ) জীববৈচিত্র্য মূল্যবান জিন-সম্পদের আধার। লক্ষ লক্ষ বছর ধরে চিরাচরিত ও বন্য প্রকৃতির উদ্ভিদ ও প্রাণীগুলি জীবের বিবর্তনের ইতিহাসে পরীক্ষিত হয়েছে। এগুলিকে ভবিষ্যতের জন্য সুদক্ষ জিন-আধারের সংগ্রহ হিসেবে রাখা যেতে পারে। কাজেই জীববৈচিত্র্যের হ্রাস ঘটলে তার নেতিবাচক ফল আগামী দিনে জীবপ্রজাতির প্রজনন ও উন্নতিসাধনের পথে অন্তরায় হবে।

(ঘ) জীববৈচিত্র্য বাস্তুতন্ত্রের সংরক্ষণের ব্যাপারে একটি হাতিয়ার হিসেবে গণ্য হতে পারে। কোন একটি বিশেষ বাস্তুতন্ত্রে সকল জীবপ্রজাতিগুলি পরস্পর নির্ভরশীল হয়ে বসবাস করে। কোন বিশেষ ধরনের প্রজাতির বিনাশ ঘটলে বাস্তুতন্ত্রের খাদ্য-শৃঙ্খল ও খাদ্য-জালকে বিচ্ছিন্নতা দেখা দেবে, এবং অন্যান্য নির্ভরশীল প্রজাতিগুলির বেঁচে থাকার রসদ পেতে অসুবিধে হবে ও তারা অত্যন্ত সমস্যার সম্মুখীন হবে।

আমাদের জীবনধারণ ব্যবস্থায় জীববৈচিত্র্যের এহেন গুরুত্বের জন্য 1992-এর জুন মাসে ব্রাজিলের রিও ডি জেনেইরোতে (Rio de Janeiro) সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের পরিবেশ ও উন্নয়ন সংক্রান্ত সম্মেলন (United Nations Conference on Environment and Development, UNCED) বা যে বসুন্ধরা শিখর সম্মেলন (Earth Summit) অনুষ্ঠিত হয় সেখানে জীববৈচিত্র্যের মূল্যবান দিকগুলি আলোচিত হয় এবং গৃহীত হয়। এই সম্মেলনে পুনরায় নিম্নলিখিত বিষয়ে সোচ্চার হতে বলা হয় :

(ক) জীববৈচিত্র্যের অন্তর্নিহিত মূল্য ;

(খ) বিভিন্ন দেশের নিজস্ব জীব/জৈব সম্পদের ওপর সার্বভৌম অধিকার ;

(গ) বাস্তুতন্ত্র ও প্রাকৃতিক বসতিগুলির স্ব-ক্ষেত্র (in situ) সংরক্ষণের মৌলিক প্রয়োজনীয়তা ;

(ঘ) পর-ক্ষেত্র (ex situ) ব্যবস্থাপনার নির্বাহী ভূমিকা ;

(ঙ) জীববৈচিত্র্যের সংরক্ষণ ও টেকসই ব্যবহারের ব্যাপারে স্থানীয় লোক-সম্প্রদায় ও নারীদের অপরিহার্য্য ভূমিকা ;

(চ) চিরাচরিত জ্ঞান, দক্ষতা, উদ্ভাবনা ও অভ্যাসগুলি থেকে প্রাপ্ত সুযোগ-সুবিধাগুলির সম অংশীদারীর প্রয়োজনীয়তা;

(ছ) সংরক্ষণের ব্যাপারে আঞ্চলিক ও ভৌগোলিক (global) সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তার গুরুত্ব ; এবং

(জ) জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য পর্যাপ্ত বিনিয়োগের প্রয়োজনীয়তা।

2.2.4.3. ভারতের জীববৈচিত্র্য

জীববৈচিত্র্যের দিক দিয়ে ভারত বেশ বিত্তশালী। ভারতের ভূ-প্রাকৃতিক ও জলবায়ুগত বিপুল বৈচিত্র্যের জন্যই এটা সম্ভব হয়েছে। আমরা এখানে ক্রান্তীয় বৃষ্টি-অরণ্য থেকে শুরু করে উপ-ক্রান্তীয় সাভানা বা গুল্ম বনভূমি, নাতিশীতোষ্ণ ধরনের বনভূমি, পার্বত্য মসজাতীয় উদ্ভিদ এবং মরু অঞ্চলে কাঁটা ঝোপঝাড় (xerophytic vegetation) দেখতে পাই। জীব-ভূগোলের দিক থেকে ভারত দুটি প্রধান জীব রাজ্য [পালিআরক্‌টিক (palaearctic) বা পুরা আর্কটীয় এবং ইন্দো-মালব (Indo-Malayan)] এবং তিনটি বায়োম (biomes)-এর (ক্রান্তীয় আর্দ্র বনভূমি, ক্রান্তীয় শুষ্ক বা পর্ণমোচী বনভূমি, এবং উষ্ণ মরুভূমি বা প্রায় মরুভূমি) প্রতিনিধিত্ব করে। তবে ভারতকে প্রাথমিকভাবে 10 টি জীব-ভৌগোলিক অঞ্চলে ভাগ করা সম্ভব, যেমন— (ক) অতি হিমালিয় (Trans-Himalayan), (খ) হিমালিয় (Himalayan), (গ) ভারতীয় মরু (Indian Desert), (ঘ) অর্ধ-মরু (Semi-Arid), (ঙ) পশ্চিমঘাট (Western Ghats), (চ) দাক্ষিণাত্যের উপদ্বীপ (Deccan Peninsula), (ছ) গাঙ্গেয় সমভূমি (Gangetic Plain), (জ) উত্তর-পূর্ব ভারত (North-East India), (ঝ) উপকূল (Coasts), এবং (ঞ) দ্বীপসমূহ।

আনুমানিক 45000 এরও বেশী উদ্ভিদ প্রজাতি ভারতে রয়েছে, যা সমগ্র বিশ্বের তাবৎ উদ্ভিদ প্রজাতির 7 শতাংশ। এদের মধ্যে প্রায় 15000 সপুষ্পক। অন্যান্য উদ্ভিদপ্রজাতিগুলির মধ্যে 64 ব্যক্তবীজী (gymnosperms), 2843 মসজাতীয় (bryophytes), 1012 ফার্ণজাতীয় (pteridophytes), 1940 লাইকেন (lichens), 12480 শৈবাল (algae), এবং 23000 ছত্রাক (fungi)। এখানকার প্রাণীসম্পদও কম বৈচিত্র্যপূর্ণ নয়। প্রাণী-প্রজাতিগুলির সংখ্যা আনুমানিক 81000-এর মতো। এগুলি সারা বিশ্বের প্রাণীকূলের প্রায় 6.4 শতাংশ। অমেরুদণ্ডীদের (invertebrates) মধ্যে 5000-এর অধিক মোলাস্‌ক্স (molluscs) এবং 57000 পতঙ্গ শ্রেণীর। মেরুদণ্ডীদের (vertebrates) মধ্যে 2546 মাছ, 204 উভচর, 428 সরীসৃপ, 1228 পক্ষী এবং 372 স্তন্যপায়ী। অবশ্য, ভারতে অনুজীব-বৈচিত্র্যের ব্যাপারে এখনো পর্যন্ত আমাদের জ্ঞান সীমিত।

2.2.4.4. বিশ্বের জীববৈচিত্র্য

পৃথিবীতে মোট জীব প্রজাতির সঠিক সংখ্যা কত তার অনুমান করা বেশ কষ্টসাধ্য কাজ। 1980 পর্যন্ত এর পরিমাণ ছিল 1 থেকে 3 কোটির মধ্যে। পরে অবশ্য ক্রান্তীয় বনভূমির বৃক্ষরাজিতে উচ্চ পত্র-বাসী পতঙ্গগুলিকে হিসেবের মধ্যে ধরার ফলে সংখ্যাটি 3 কোটিতে দাঁড়িয়েছে। অনেক আশাবাদী অনুমান অবশ্য এটাকে 10 কোটি বলে মনে করে। অবশ্য বিভিন্ন ট্যাক্সনমিক (taxonomic) গবেষণার ফলে এ-পর্যন্ত 1.6 কোটি জীব প্রজাতির সন্ধান মিলেছে।

সারণী 2.5. বিভিন্ন বিভাগে জীব প্রজাতির সংখ্যা

ট্যাক্সনমিক বিভাগ	প্রজাতি	সংখ্যা
অমেরুদণ্ডী	প্রোটোজোয়া (Protozoa)	502,000
	পোরিফেরা (Porifera)	10,000
	সিলেনটেরাটা (Caelonterata)	9,000
	প্ল্যাটিহেলমিন্থিস (Platyhelmenthes)	12,000
	নিমাটোডা (Nematoda)	10,000
	মোলাসকা (Mollusca)	100,000
	অ্যানিলিডা (Annelida)	8,200

ট্যাক্সনমিক বিভাগ	প্রজাতি	সংখ্যা
	অ্যানথ্রোপোডা (Anthropoda)	920,000
	ইচীনডারমাটা (Echindermata)	6,000
মেরুদণ্ডী	মীন/মাছ (Pisces)	23,000
	উভচর (Amphibia)	2,400
	সরীসৃপ (Reptilia)	5,200
	পক্ষী (Aves)	8,300
	স্তন্যপায়ী (Mammalia)	4,200
	প্রাণী-প্রজাতির মোট সংখ্যা	1,168,500
নিম্নশ্রেণীর সবুজ উদ্ভিদ	শৈবাল (Algae)	20,175
	ছত্রাক (Fungi)	80,000
	ব্রায়োফাইটস (Bryophytes)	14,900
	টেরিডোফাইটস (Pteridophytes)	11,000
	সরলবর্গীয় (Conifers)	650
সপুষ্পক উদ্ভিদ		300,000
	প্রাণী ও উদ্ভিদ প্রজাতির মোট সংখ্যা	1,59,5225

ওপরের সারণীর সঙ্গে ভারতের জীববৈচিত্র্যকে আমরা তুলনা করতে পারি। অত্যন্ত স্পষ্টভাবে দেখা যাবে যে জীববৈচিত্র্যের দিক থেকে ভারত পৃথিবীতে একটি বেশ বিত্তবতী দেশ।

বিলোপের ভয় ঃ পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র বেশ কিছু জীব-প্রজাতি গণবিলোপের শিকার হচ্ছে এবং এর ফলে পৃথিবীর জীববৈচিত্র্য দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। অনুজীব, ছত্রাক, উন্নত গাছপালা এবং প্রাণী—সব ধরণের জীবই এই ভয়ঙ্কর ফলশ্রুতির কবলে পড়েছে। অনেক প্রাণী-প্রজাতি ইতিমধ্যেই চিরতরে হারিয়ে গেছে। এদের মধ্যে রয়েছে 60 রকমের স্তন্যপায়ী, 30 রকমের সরীসৃপ, এবং 75 রকমের পাখি। এছাড়াও প্রায় 650 রকমের স্তন্যপায়ী, 210 রকমের সরীসৃপ ও 1100 রকমের পাখি বিলুপ্ত হবার ভয়ে ভীত। জীববৈচিত্র্যের বিনাশ ক্রান্তীয় বৃষ্টি-অরণ্যগুলিতেই সর্বাধিক। এই অরণ্যগুলি কৃষিজমির প্রসারণ, কাষ্ঠাহরণ, খনন এবং মানুষের অন্যবিধ কাজকর্মের ফলে বিস্ময়করভাবে বিপন্ন। বনভূমির ধ্বংসের ফলে সামগ্রিক পরিবেশের অবনমন ঘটছে এবং জীব-প্রজাতিগুলির বসতির ক্ষতি হচ্ছে। অনেকক্ষেত্রে আবার উৎপাদনজাত (বিশেষতঃ শিল্পের) বর্জ্য—পদার্থগুলি দূষকের আকারে অনেক জীব-প্রজাতির বসতিকে একেবারেই নষ্ট করে দিয়েছে। তাছাড়া বিভিন্ন কারণে বসতি এলাকাগুলি (habitat areas) ছোট হতে হতে বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো অবস্থান করছে। চার্লস ডারউইন (Charles Darwin) পর্যবেক্ষণ করেন যে, এই বসতি এলাকা যত ছোট হবে জীব-প্রজাতির সংখ্যাও তত কম হবে। কাজেই এটা স্বাভাবিক

যে, সম্মিলিত প্রয়াসের মাধ্যমে এই বসতিগুলির রক্ষা করা দরকার, বিশেষ করে ক্রান্তীয় বনভূমিগুলির সংরক্ষণ একান্ত জরুরী বিষয়।

2.2.4.5. ভারতের বিপন্নপ্রাণী ও উদ্ভিদ

ভারতের অসাধারণ বৈচিত্র্যময় উদ্ভিদ ও প্রাণিসম্পদ পৃথিবীর জীববৈচিত্র্যের মানচিত্রে এক বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। কিন্তু এখানেও জনসংখ্যার চাপ বৃদ্ধি, কৃষিক্ষেত্রের বিস্তার ও দ্রুত নগরায়নের ফলে অরণ্যের পরিধি ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হয়ে আসছে সেই সঙ্গে অরণ্যবাসী উদ্ভিদ ও প্রাণীদের জীবনেও অস্তিত্বের সঙ্কট দেখা দিয়েছে। ভারতের বিপন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণীদের তালিকাটি বেশ দীর্ঘ এবং এটি ক্রমশঃ দীর্ঘতর হচ্ছে, কারণ মৃত্যুপথযাত্রী উদ্ভিদ ও প্রাণী প্রজাতির সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়ছে। ভারতের 372 টি স্তন্যপায়ী প্রজাতির প্রাণীর মধ্যে 81 টি প্রজাতির প্রাণীই আজ 'বিপন্ন', এর মধ্যে বাঘ, সিংহ, গণ্ডার ছাড়াও বহু দুর্লভ, মূল্যবান প্রজাতির স্তন্যপায়ী প্রাণী রয়েছে, যেমন তুষার চিতা (snow leopard), হুলক গিবন (hoolock gibbon), সোনালী হনুমান (golden langur), বুনো গাধা (wild ass), লাল পাণ্ডা (red panda), পিপীলিকাভুক প্যাঙ্গোলিন (pangolin), সবচেয়ে বড় আকারের হরিণ হাঙ্গুল (hangul), সবচেয়ে ছোট সাইজের হরিণ মাউস ডিয়ার (mouse deer), সবচেয়ে দামী হরিণ কস্তুরী মৃগ (musk deer), গঙ্গানদীর ডলফিন (Gangetic dolphin) ইত্যাদি। বিপন্ন সরীসৃপদের মধ্যে নদীমোহানার কুমীর (estuarine crocodile), ঘড়িয়াল (alligator), গোসাপ (water monitor), ভারতীয় ময়াল সাপ (Indian python), বিভিন্ন প্রজাতির সামুদ্রিক কচ্ছপ (green turtle, leather-backed turtle, Indian tent turtle) ইত্যাদি প্রধান। ভারতের প্রায় 2100 প্রজাতির প্রাণির মধ্যে বহু প্রজাতিরই অবস্থা অতি বিপন্ন। ধনেশ পাখি (great Indian hornbill), পার্বত্য কোয়েল (mountain quail), গ্রেট ইণ্ডিয়ান বাস্টার্ড (great Indian bustard), বিভিন্ন প্রজাতির ঈগল, সারস, ফেজান্ট (pheasant), ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

আমাদের দেশ থেকে যে সব উদ্ভিদ অদৃশ্য হতে চলেছে তার তালিকাটিও বেশ দীর্ঘ। এই তালিকায় আবৃতবীজী *(angiosperms)*, নগ্নবীজী *(gymnosperms)*, ফার্ণ, মস প্রভৃতি সব রকমের উদ্ভিদই আছে। আমাদের দেশে বহু রকম উদ্ভিদ আছে যাদের শেকড়, ছাল, পাতা বা ফুল-ফল থেকে বহুরকম ঔষধ তৈরি হয়, অতিরিক্ত উৎপাটনের ফলে এইসব উদ্ভিদ তাদের নিজস্ব বাসভূমি থেকে অদৃশ্য হতে চলেছে, এদের মধ্যে উল্লেখ্য হল সর্পগন্ধা *(Rauwolfia serpentina)*, ইণ্ডিয়ান বেলাডোনা *(Atropa acuminata)*, ডায়োসকেরিয়া *(Dioscorea deltoidea)*, কোপিস্ টিটা *(Coptis teeta)*, রক্ত চন্দন *(Pterocarpns santalinus)*, রক্তচন্দনের গাছ থেকে ঔষধ ছাড়াও এর কাঠ থেকে জাপানীরা 'সামিসেন' *(shamisen)* নামে বাদ্যযন্ত্র তৈরি করে, অন্যকাঠ ঐ যন্ত্রের পক্ষে অচল, অতিরিক্ত রপ্তানীর ফলে এই গাছটি অদৃশ্য হতে চলেছে। এছাড়া কাসিয়া পর্বতের বিচিত্র কলস উদ্ভিদ *(Nepenthes khasiana)*, হিমালয়ের মনোমুগ্ধকর ব্রহ্মকমল *(Saussurea bracteata)*, ব্লু-অর্কিড *(Vanda caerulea)*, অতিকায় ট্রি-ফার্ন *(Cyathea gigantia)*, বহু রকম প্রজাতির প্রাচীন নগ্নবীজী উদ্ভিদ—যেমন সাইকাস *(Cycas)*, নিটাম *(Gnetum)*, পোডোকারপাস্ *(Podocarpus)* প্রভৃতি গণের (genus) বৃক্ষ ভারতীয় অরণ্যে ক্রমশঃ বিরল হয়ে উঠছে।

ধান, গম, ভুট্টা প্রভৃতি শস্য ও কিছু ফুল ও ফলের গাছ বাদ দিলে পৃথিবীর অধিকাংশ প্রজাতির উদ্ভিদই বন্য এবং বন্য অবস্থাতেই থাকতে তারা স্বাভাবিক ভাবে অভ্যস্ত। এই বন্য জীবনই তাদের অস্তিত্বরক্ষার মূল কবচ। অতিরিক্ত উৎপাটনের জন্য এবং অরণ্যের সঙ্কোচনের ফলে এবং আরও নানা কারণে আমাদের দেশের অসংখ্য প্রজাতির উদ্ভিদ আজ অবলুপ্ত হতে চলেছে। এই মূল্যবান প্রজাতির উদ্ভিদগুলি অবলুপ্ত হলে অরণ্যের হরিণ, গণ্ডার, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি সকল প্রাণীরই চরম ক্ষতি হবে এবং আমাদেরও ক্ষতি হবে অপূরণীয়, তাই অরণ্যসংরক্ষণের বিষয়টির ওপর বিশেষ গুরুত্বদানের প্রয়োজনীয়তা আছে।

2.3. পৃথিবীর জলবায়ু

জলবায়ুর ইংরেজী প্রতিশব্দ 'climate' কথাটি গ্রীক শব্দ 'klima' (যার অর্থ পৃথিবীর ঢাল) থেকে এসেছে। গ্রীক দার্শনিকরা পৃথিবীর ওপর কতকগুলি তাপীয় বলয় চিহ্নিত করেন। এগুলি ইনসোলেশান (insolation) বা সূর্যের বিকিরিত শক্তির ভূ-তলে বণ্টনের ফলে সুনির্দিষ্ট ধরনের জলবায়ুর প্রকাশকে ভিত্তি করে আলাদা করা হয়। ইনসোলেশান-এর অক্ষাংশগত পরিবর্তনের ফলে ভূ-পৃষ্ঠের বিভিন্ন স্থানের উষ্ণতামানও আলাদা হয়। অবশ্য এই উষ্ণতামানের পার্থক্য মহাদেশ ও মহাসাগরগুলির অবস্থানসহ অন্যান্য অনেক কারণের ওপর নির্ভরশীল। সাধারণভাবে দেখা যায় যে উপকূলীয় এলাকাগুলি মৃদু জলবায়ু এবং মহাদেশগুলির অভ্যন্তর এলাকাগুলি তুলনামূলকভাবে কঠোর (harsh) ধরনের জলবায়ু ভোগ করে।

2.3.1. জলবায়ুর সামুদ্রিক ও মহাদেশীয় প্রভাব

ভূমি ও জলের বিপরীতধর্মী প্রকৃতির জন্যই জলবায়ুতে মহাদেশীয় ও সামুদ্রিক প্রভাব/বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। ভূমি ও জলের বৈষম্যমূলক তাপগ্রহণের ফলে সমুদ্র ও মহাদেশগুলির কাছাকাছি এলাকাগুলিতে ভিন্নধর্মী জলবায়ুর সৃষ্টি হয়। অবশ্য এই বৈপরীত্য অন্যকিছু কারণ, যেমন পার্বত্য বাধা, সমুদ্র-স্রোত, বায়ুপিণ্ডের স্থানান্তর, উচ্চ ও নিম্নচাপ বলয়গুলির তুলনামূলক অবস্থান ইত্যাদির ওপরও অনেকাংশে নির্ভর করে। উপকূলীয় এলাকাগুলিতে এবং মহাদেশগুলির অভ্যন্তরভাগে সাধারণভাবে নিম্নলিখিত জলবায়ুগত অবস্থাগুলি বিরাজ করতে দেখা যায়।

অক্ষাংশে	অবস্থান	জলবায়ুগত অবস্থা
নিম্ন (ক্রান্তীয় ও উপক্রান্তীয়)	উপকূলীয়	মৃদু/মাঝারী উষ্ণতামান (বার্ষিক প্রসর কম), মাঝারী থেকে ভারী বর্ষণ, স্থল ও সমুদ্র বায়ুর প্রাধান্য।
	মহাদেশীয়	চরম উষ্ণতামান (বার্ষিক প্রসর অত্যধিক), কম বৃষ্টিপাত, কঠোর শুষ্ক ও প্রায়-শুষ্ক জলবায়ু।
মধ্য (নাতিশীতোষ্ণ)	উপকূলীয়	গ্রীষ্মকালে মৃদু উষ্ণভাব, শীতকালেও হিমায়ন (freezing) হয় না, মধ্য-অক্ষাংশের ঘূর্ণবাতের ফলে মাঝারী বৃষ্টিপাত।
	মহাদেশীয়	শীতকালে চরম ঠাণ্ডা, বৃষ্টিপাত খুব কম, মহাদেশীয় মেরু বায়ুপিণ্ডের প্রাধান্য।

উপকূলীয় ও মহাদেশীয় এলাকাগুলিতে জলবায়ুর এরূপ পার্থক্যের জন্য অনেকগুলি কারণ রয়েছে, তার কয়েকটি হল নিম্নরূপ :

(ক) দেখা গেছে যে ভূমি-তলের অ্যালবিডো (albedo) জল-তলের অ্যালবিডোর চেয়ে বেশী হয়। ভূমিতলের গড় অ্যালবিডো যেখানে প্রায় 35 শতাংশ, সেক্ষেত্রে মহাসাগরগুলির ওপর এর পরিমাণ 7 থেকে 23 শতাংশের মধ্যে হয়। অ্যালবিডো বলতে ভূ-পৃষ্ঠে সৌর-বিকিরণ প্রাপ্তি (ইনসোলেশান) এবং ভূ-পৃষ্ঠ থেকে এই বিকিরণের তাৎক্ষণিক প্রতিফলনের অনুপাতকে বোঝায়। নিচের সারণীতে বিভিন্ন ধরনের তলে (surface) গড় অ্যালবিডোর মোটামুটি হিসাব দেওয়া হল।

সারণী 2.6. বিভিন্ন তলের আনুমানিক গড় অ্যালবিডো

তল	অ্যালবিডো (শতকরা হিসেবে)
ক্রান্তীয় বনভূমি	21
পর্ণমোচী বনভূমি	18
সরলবর্গীয় বনভূমি	13
সাভানা (তৃণভূমি)	15
মরু অঞ্চল	28
মহাসাগর (60-70 ডিগ্রি অক্ষাংশে)	7-23
অভ্যন্তরীণ জলাশয়	2-78
বরফ/তুষার	70-90

ভূমি ও জলভাগের অ্যালবিডোর পার্থক্যের ফলে জল-তল অনেক বেশী সৌর বিকিরণ গ্রহণ করে এবং উত্তপ্ত হয়। তাছাড়া যেহেতু ভূমিভাগের আপেক্ষিক তাপ (specific heat) বেশী, সেজন্য ভূমিভাগ দিনের বেলায় তাড়াতাড়ি গরম হয় ও রাত্রে দ্রুত ঠাণ্ডা হয়ে যায়। অন্যদিকে বৃহৎ জলাশয়গুলি তুলনামূলকভাবে ধীরে গরম ও ঠাণ্ডা হয়। সেইসঙ্গে জলভাগের তাপ আবর্তের (turbulence) মাধ্যমে পুনর্বণ্টিত হয়। উত্তপ্ত উপরিস্থিত জল নীচে চলে যায় এবং নীচের শীতল জল ওপরে উঠে আসে। কাজেই তাপের ছড়িয়ে পড়ার ফলে সামগ্রিক উষ্ণতায় মৃদুভাব এসে পড়ে।

(খ) দৈনন্দিন উষ্ণতার পার্থক্যের জন্য উপকূলীয় এলাকায় স্থল ও সমুদ্র সমীরণের (breeze) সৃষ্টি হয়, বিশেষ করে স্থলভাগের ওপর। দিনের বেলায় স্থলভাগ উত্তপ্ত হয় এবং সেজন্য নিম্নচাপক্ষেত্রের উৎপত্তি হয়। পক্ষান্তরে সমুদ্রের ওপর শীতলতা তুলনায় বেশী থাকে বলে উচ্চচাপ বিরাজ করে। এমন অবস্থায় স্বাভাবিকভাবেই সামুদ্রিক হাওয়া/বাতাস স্থলভাগের দিকে প্রবাহিত হয়, যাকে সমুদ্র-সমীকরণ বলা হয়। রাতের বেলায় আবার এই অবস্থাটা সম্পূর্ণ বিপরীত হয়ে পড়ে। তখন স্থলভাগ দ্রুত ঠাণ্ডা হয় কিন্তু সমুদ্রের ওপর উচ্চ উষ্ণতামান বজায় থাকে। কাজেই রাতের বেলায় বাতাস স্থলভাগ থেকে সমুদ্রের দিকে বইতে থাকে। এই হাওয়াকে স্থল-সমীরণ বলা হয়। স্থল ও সমুদ্র সমীরণ ক্রান্তীয় ও উপক্রান্তীয় অঞ্চলের উপকূলভূমিতে বেশ সাধারণ ব্যাপার। এগুলি অবশ্য উচ্চ অক্ষাংশের উপকূলীয় অঞ্চলেও অনুভূত হয়।

(গ) ক্রান্তীয় অঞ্চলের মৌসুমী (monsoon circulations) চক্রপ্রবাহ ও স্থল ও সমুদ্রের ওপর ঋতুগত উষ্ণতা এবং চাপের পার্থক্যজনিত কারণে ঘটে থাকে। গ্রীষ্মকালে ভূমিভাগ অত্যন্ত উত্তপ্ত হয়ে পড়লে উত্তর-পশ্চিম ভারত, পাকিস্তান এবং মধ্য-ক্রান্তীয় ভূ-খণ্ডে নিম্নচাপ বলয়ের সৃষ্টি হয়, যা মহাসাগরগুলি (দক্ষিণ এশিয়ার ভারত মহাসাগর এবং দক্ষিণ-পূর্ব বা পূর্ব এশিয়ার প্রশান্ত মহাসাগর) থেকে আর্দ্র বাতাস টেনে আনে। এই মৌসুমী চক্রপ্রবাহের মধ্যে প্রচুর নিম্নচাপ ও ঘূর্ণবাত (cyclones) থাকে, যা প্রভূত পরিমাণে বৃষ্টিপাত ঘটায়। সমুদ্র উপকূল থেকে যতই দূরের দিকে এই বায়ু যেতে থাকে ততই বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কমতে থাকে।

(ঘ) উপকূলীয় অঞ্চলের জলবায়ুতে মৃদুভাব আনার ব্যাপারে সমুদ্রস্রোতের ভূমিকাও যথেষ্ট। উষ্ণ সমুদ্র-স্রোত হিসেবে উপসাগরীয় স্রোত (gulf stream) বা উত্তর আটলান্টিক সঞ্চরণ (North Atlantic drift) সন্নিহিত উপকূল-

এলাকাগুলিকে উষ্ণ রাখে। এরই প্রভাবে একই অক্ষাংশে অবস্থিত মধ্য-ইউরোপের তুলনায় উত্তর-পশ্চিম ইওরোপ অধিক উষ্ণ থাকে। একইভাবে উষ্ণ কুরোশিও (kurroshio) স্রোতের প্রভাবে মধ্য-এশীয় ভূ-খণ্ডের চেয়ে জাপান বেশী উষ্ণ থাকে।

(ঙ) এশিয়ার অভ্যন্তর-ভূমি পর্বতশৃঙ্খলগুলির দ্বারা বেষ্টিত থাকে বলে বায়ুপিণ্ড (air mass) চলাচলে বাধা পায়। সেজন্য দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে আগত মৌসুমী-প্রবাহ এই মহাদেশের একেবারে ভেতরে প্রবেশ করতে পারে না। ফলতঃ মধ্য-এশিয়ায় শুষ্ক বা প্রায়-শুষ্ক অবস্থা বিরাজ করতে থাকে। পক্ষান্তরে, মধ্য-এশিয়া মেরু অঞ্চলের শীতল বায়ুপিণ্ডের কাছে উন্মুক্ত হওয়ার জন্য উষ্ণতা হিমাঙ্কের নিচে চলে যায়। কিন্তু এই শীতল বায়ুপিণ্ড দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার উপকূলভূমিতে পৌঁছাতে পারে না, তাই এই এলাকাগুলি শীতকালেও উষ্ণ থাকে।

2.3.2. বাত প্রণালী সমূহ (Wind Systems)

বায়ুর সংকোচনশীলতা ও প্রসারণশীলতার ধর্ম রয়েছে। এর সংকোচনশীলতার জন্য বায়ু চাপ প্রয়োগ করতে পারে। ভূ-তলের কাছাকাছি সমুদ্র সমতলে এই চাপ সবচেয়ে বেশী হয়। উচ্চতার সাথে সাথে বায়ুর চাপ কমতে থাকে। সমুদ্র সমতলে বায়ুর ওজন প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে 14.7 পাউণ্ড বা প্রতি বর্গ সেমিতে 1.026 কিগ্রা হয় এবং বায়ুর চাপের পরিমাণ দাঁড়ায় 1013.2 মিলিবারে (mb)। বায়ুর ঘনত্বও উচ্চতার সঙ্গে কমতে থাকে। সমুদ্র সমতলে বায়ুর ঘনত্ব প্রতি ঘনমিটারে 1.2 কিগ্রা, কিন্তু 5000 মিটার উচ্চতায় তা কমে দাঁড়ায় মাত্র 0.7 কিগ্রাতে।

2.3.3. বায়ুর চাপ

ভূ-তলে বায়ুর চাপ ব্যারোমিটার যন্ত্রের পারদ স্তম্ভের উচ্চতার সাহায্যে পরিমাপ করা হয়, বায়ুমণ্ডলের প্রমাণ চাপ 76 সেমি পারদস্তম্ভের উচ্চতার সমান বলে ধরা হয়। কাজেই বায়ুমণ্ডলীয় চাপ (P) এইভাবে গণনা করা যায়, $P = h\rho g$ (যেখানে h = পারদস্তম্ভের উচ্চতা, ρ = পারদের ঘনত্ব এবং g = পৃথিবীর প্রমাণ অভিকর্ষ টানের মান) = $76 \times 13.5 \times 980$ ডাইন (dyne) বা 1013000 ডাইন বা 1013 মিলিবার (mb)। বিভিন্ন কারণে ভূ-তলে বায়ুর চাপের পার্থক্য হয়। 45° অক্ষাংশে সমুদ্র সমতলে বায়ুমণ্ডলের চাপ হল 1013 মিলিবার। একে প্রমাণচাপ বলা হয়। বায়ুতে উপস্থিত উষ্ণতা ও জলীয়বাষ্প বায়ুর চাপকে নিয়ন্ত্রণ করে। উষ্ণতা ও আর্দ্রতা বৃদ্ধি পেলে বায়ুর চাপ কমে। কাজেই স্থলভাগের ওপর গ্রীষ্মকালে সাধারণভাবে নিম্নচাপ এবং শীতকালে তুলনামূলকভাবে উচ্চচাপ থাকে। বায়ুমণ্ডলীয় চাপ সর্বোচ্চ 1025 মিলিবার এবং প্রবল ক্রান্তীয়-ঘূর্ণবাতের সময় সর্বনিম্ন 950 মিলিবার পর্যন্ত পাওয়া গেছে। ভৌগোলিক ব্যাপ্তির ভিত্তিতে বিভিন্ন ঋতুতে এবং বিভিন্ন অক্ষাংশে বায়ুমণ্ডলের চাপের প্রভূত পার্থক্য লক্ষ করা যায়। সেজন্য পৃথিবীতে কতকগুলি চাপ বলয় চিহ্নিত করা সম্ভব। এগুলিকে স্থায়ী বা প্রায়-স্থায়ী চাপ বলয় বলা হয়।

2.3.4. পৃথিবীর চাপ বলয় সমূহ

পৃথিবীর নিরক্ষীয় অঞ্চল সারাবছর ধরে সৌরকিরণ পায়। কাজেই নিরক্ষীয় অঞ্চলে একটি স্থায়ী নিম্নচাপ বলয় লক্ষ করা যায়। একে নিরক্ষীয় নিম্নচাপ (Equatorial Low) বলা হয়। একইভাবে মেরু অঞ্চলগুলি সবচেয়ে কম সৌরকিরণ পায় এবং উষ্ণতামান বছরের বেশীরভাগ সময় ধরে হিমাঙ্কের নিচে থাকে। মেরু অঞ্চলের (90° উত্তর ও দক্ষিণ) ওপর তাই স্থায়ী উচ্চচাপ ক্ষেত্রের সৃষ্টি হয়েছে। এগুলিকে মেরু উচ্চচাপ (Polar High) বলা হয়। নিরক্ষীয় নিম্নচাপ এবং মেরু উচ্চচাপ—দুটিই তাপীয় অবস্থার কারণে সৃষ্টি হয়েছে। এগুলিকে তাই অনেক সময় তাপীয় নিম্নচাপ ও তাপীয় উচ্চচাপ বলা হয়ে থাকে। এই চাপক্ষেত্রগুলি ছাড়াও 30° উত্তর ও দক্ষিণ অক্ষাংশের কাছাকাছি উভয় গোলার্ধে উপক্রান্তীয় অঞ্চলে উচ্চচাপ ; এবং 60° উত্তর ও দক্ষিণ অক্ষাংশের কাছাকাছি উপমেরু অঞ্চলে নিম্নচাপ বলয় দেখা যায়। এগুলিকে উপক্রান্তীয়

উচ্চচাপ (Subtropical High) এবং উপমেরু নিম্নচাপ (Subpolar High) বলা হয়। এই চাপ বলয়গুলি তাপীয় অবস্থার কারণে সৃষ্ট হয়নি। এগুলিকে সচল উচ্চ (Dynamic High) ও সচল নিম্ন (Dynamic Low) এলাকা বলে অভিহিত করা হয়। দেখা গেছে যে উপক্রান্তীয় অঞ্চলে ঊর্ধ্ববায়ুপিণ্ডের নিম্নগমনজনিত বায়ুর ক্রমঃপুঞ্জীভবনের ফলে এই উচ্চ চাপের সৃষ্টি হয়েছে। অন্যদিকে, ভূ-তল বায়ুর (অর্থাৎ পশ্চিমা ও পুবালী বায়ু) সমকেন্দ্রাভিমুখীতার (convergence) ফলেই সম্ভবতঃ উপমেরু অঞ্চলে নিম্ন চাপের উৎপত্তি ঘটেছে।

2.3.5. বায়ুর সঞ্চালন ও বাতাসের উৎপত্তি

উচ্চ চাপ কক্ষ বা বলয় থেকে নিম্নচাপ কক্ষ বা বলয়ের দিকে বায়ু বয়ে চলে। প্রবহমান বায়ুকে বাতাস বলা হয়। বায়ুর অনুভূমিক প্রবাহ চারটি গুরুত্বপূর্ণ কারণের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, যেগুলিকে অনুভূমিক গতির নিয়ম (laws of horizontal motion) বলা হয়। এগুলি হল : (ক) বায়ুর চাপের তারতম্যজনিত বল (pressure gradient force), (খ) কোরিওলি বল (Corioli force), (গ) কেন্দ্রাভিমুখী ত্বরণ (centripetal acceleration) এবং (ঘ) ভূ-পৃষ্ঠে বায়ুপ্রবাহের ঘর্ষণজনিত বল (frictional force)।

বায়ুর অনুভূমিক গতি প্রাথমিকভাবে বায়ুর চাপের পার্থক্যজনিত বলের ওপর নির্ভর করে। এই বল প্রতি একক দূরত্বে চাপের হ্রাসের সাহায্যে পরিমাপ করা হয় এবং এটি বায়ুর ঘনত্বের সাথে ব্যস্তানুপাতিক (inversely proportional) হয়।

কোরিওলি বল হল বায়ুর অনুভূমিক চলাচলের নিয়ন্ত্রণকারী অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ। এই বল পৃথিবীর ঘূর্ণনের ফলে সৃষ্টি হয়, এবং সেজন্য প্রবহমান বায়ুকে উত্তর গোলার্ধে ডানদিকে কিন্তু দক্ষিণ গোলার্ধে বাম দিকে আপাতভাবে বেঁকে যেতে দেখা যায়।

কেন্দ্রাভিমুখী ত্বরণও একটি কল্পিত বল, যা চক্রাকার পথে কোন চলমান বস্তুর কৌণিক ভরবেগ বজায় রাখার জন্য সৃষ্ট হয়। নিউটনের প্রথম গতিসূত্র অনুসারে কোন একটি বস্তুকে চক্রপথে চলতে হলে কিছু বল প্রয়োগের দরকার পড়ে। এই বল বস্তুটিকে চক্রপথে চলতে সাহায্য করে বলে একে কেন্দ্রাভিমুখী বল বলা হয়।

বায়ুর চলাচলে ঘর্ষণজনিত বলেরও গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রয়েছে। এই বল ভূমিতলের সঙ্গে বায়ুর ঘর্ষণের ফলে সৃষ্টি হয় এবং সেজন্য এটি উচ্চতার সাথে সাথে কমতে থাকে।

2.3.6. বাতাসের স্বাভাবিক সংবহন (General circulation of winds)

আমরা জানি যে বায়ু উচ্চচাপ এলাকা থেকে নিম্নচাপ এলাকার দিকে প্রবাহিত হয়। সমগ্র ভূ-তলের বিচারে উপক্রান্তীয় উচ্চচাপ বলয়গুলি বিকীর্ণ বাতাসের উৎস-ক্ষেত্র, যেখান থেকে একটি নিরক্ষীয় নিম্নচাপ বলয়ের দিকে এবং অন্যটি উপমেরু নিম্নচাপ বলয়ের দিকে ধাবিত হয়। উপক্রান্তীয় উচ্চচাপের থেকে নিরক্ষীয় নিম্নচাপের দিকে প্রবাহিত বাতাসকে আয়ন বাতাস বা বাণিজ্য বাতাস (trades) বলা হয়। এটি উত্তর গোলার্ধে উত্তর-পূর্ব আয়ন বাতাস এবং দক্ষিণ গোলার্ধে দক্ষিণ-পূর্ব আয়ন বাতাস নামে পরিচিত। আয়ন বাতাসগুলি নিরক্ষীয় নিম্নচাপ অঞ্চলে এসে মিলিত হয় এবং এই মিলনস্থলকে অন্তর্ক্রান্তীয় সমকেন্দ্রিক অঞ্চল (Inter Tropical Convergence Zone বা ITCZ) বলা হয়। যে রেখা বরাবর এই মিলন ঘটে সেখানে শান্ত প্রকৃতির আবহাওয়া বিরাজ করে। এজন্য একে নিরক্ষীয় শান্ত বলয় বা ডোলড্রামস (doldrums) বলে। এই মিলনস্থল থেকে প্রাকৃতিক নিয়মেই বায়ু ওপরে উঠতে থাকে এবং নিরক্ষীয় তাপ উৎস-ক্ষেত্র (heat source) থেকে মেরুঅঞ্চলে তাপ হ্রাস-ক্ষেত্রের (heat sink) দিকে তাপ ও ভরবেগের স্থানান্তর হয়। কাজেই ক্রান্তীয় অঞ্চলে ঊর্ধ্বাকাশের বায়ুপ্রবাহ আশা করা যায় ভূ-তলের বায়ুপ্রবাহের (যথা উত্তর-পূর্ব আয়ন ও দক্ষিণ-পূর্ব আয়ন) ঠিক বিপরীত হবে।

উপক্রান্তীয় উচ্চচাপ থেকে অপর বিকীর্ণ প্রবাহটি উপমেরু নিম্নচাপের দিকে ধাবিত হয়। সেজন্য মধ্য-অক্ষাংশে অঞ্চলে যে বাতাস পশ্চিমা হিসেবে বইতে থাকে, তার কারণ কোরিওলি বলের প্রভাবে এখানে বাতাসের বিক্ষেপ বেশী হয়। এই মধ্য-অক্ষাংশে অঞ্চলে অবশ্য বায়ুর সংবহন বৃহৎ পরিচলন-প্রণালী হিসেবে দেখা যায় না। এখানে ভূ-তল প্রবাহ উষ্ণ ক্ষেত্র থেকে অপেক্ষাকৃত শীতল ক্ষেত্রের দিকে হয়। মধ্য-অক্ষাংশে অঞ্চলে, বিশেষতঃ শীতকালে, দ্রাঘিমা বরাবর উষ্ণতার পার্থক্য বেশী হয়। এর ফলে অক্ষাংশ বলয় (latitude belts) গুলির মধ্যে বায়ুপিণ্ডের আদান-প্রদানের মাধ্যমে তাপের স্থানান্তর ঘটে। রসবি (Rossby) মধ্য-অক্ষাংশে অঞ্চলে আবহাওয়ার উৎপত্তির ব্যাপারে নিরক্ষরেখা ও মেরুবিন্দুর দিকে ধাবমান যথাক্রমে মেরু ও ক্রান্তীয় বায়ুপিণ্ডের ভূমিকার কথা গুরুত্ব সহকারে তুলে ধরেন। এই অক্ষাংশভিত্তিক বলয়ে (latitudinal belt) বায়ুপিণ্ডের বিনিময় ঘূর্ণবাত ও প্রতীপ ঘূর্ণবাতের পর্যায়ক্রমিক সমন্বয়ে হয় এবং সেগুলি পশ্চিম থেকে পূর্বদিকে যেতে থাকে। এগুলি আবার ঊর্ধ্ব ক্ষুব্ধমণ্ডলের সুদীর্ঘ তরঙ্গগুলির সাথে একত্রিত হয়। মধ্য-অক্ষাংশে অঞ্চলে কোরিওলি বল বেশী হবার জন্য ক্রান্তীয় অঞ্চলের তুলনায় এখানের বায়ুপ্রবাহে বিক্ষেপ বেশী হয়। সেজন্যই বাতাসগুলি পশ্চিমদিক থেকে (পশ্চিমা) বইতে থাকে।

উচ্চ অক্ষাংশগুলিতে বা মেরু অঞ্চলে বায়ুপ্রবাহ পূবালী (easterlies)। পূবালী-বাতাস হিসেবে মেরু উচ্চচাপ থেকে বায়ু উপমেরু নিম্নচাপের দিকে গিয়ে পশ্চিমা বাতাসের সাথে মিলিত হয়। এই মিলনস্থলে বায়ু ওপরে ওঠে এবং ঊর্ধ্বাকাশের পশ্চিমা বাতাস হিসেবে মেরুঅঞ্চলের দিকে ধাবিত হয়। মেরু বা উচ্চ অক্ষাংশের বায়ু সংবহন এবং ক্রান্তীয় অঞ্চলের সংবহনের মধ্যে প্রচুর মিল রয়েছে।

2.3.7. জেট প্রবাহ

মধ্য-অক্ষাংশ অঞ্চলের ক্ষুব্ধমণ্ডলের উপরিভাগ, ট্রপোপজ (tropopause)-এর কাছাকাছি, প্রায়শঃ ঘন্টা প্রতি 400 কিমির বেশী বেগে সাধারণভাবে পশ্চিম দিক থেকে প্রবাহিত দ্রুতগতির বায়ুপ্রবাহকে জেট প্রবাহ (jet stream) বা জঙ্গী প্রবাহ বলে। অনেক সময় মনে করা হয় যে এই জঙ্গী প্রবাহই ঘূর্ণবাত সৃষ্টির কারণ, কেননা মেরু সীমান্ত (polar front) বরাবর সবচেয়ে বেশী সংখ্যায় ঘূর্ণবাতের উদ্ভব ঘটে। মধ্য-অক্ষাংশে অঞ্চলে এই জেট কেবল ঘূর্ণবাতগুলিকে নিয়ন্ত্রণই করে না, বারিপাতের প্রকৃতির ওপর প্রভাব বিস্তার করে এবং ভূ-পৃষ্ঠের উষ্ণতামানের তারতম্য বাড়িয়ে দেয়। ভূ-পৃষ্ঠের কাছাকাছি মধ্য-অক্ষাংশ অঞ্চলে আবহাওয়ার জটিল অবস্থার জন্য মুখ্যতঃ এই জঙ্গীপ্রবাহই দায়ী।

2.3.8. মৌসুমী বাতাস ও চক্রপ্রবাহ

'মৌসুমী' কথাটি আরবী শব্দ 'মৌসিন' (উর্দু 'মৌসম'), যার অর্থ ঋতু, থেকে এসেছে। কাজেই মৌসুমী একটি ঋতুভিত্তিক বা সাময়িক বাতাস। পৃথিবীর নিয়ত বায়ুপ্রবাহের মতো না হয়ে মৌসুমী সংবহন-এর দিক ঋতুভেদে পরিবর্তিত হয়। উত্তর গোলার্ধে গ্রীষ্মকালে এটি দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে উত্তর-পূর্ব দিকে বইতে থাকে। তাই এটি দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বাতাস বলে খ্যাত। কিন্তু শীতকালে এটি উত্তর-পূর্ব দিক থেকে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে যায়, অর্থাৎ উত্তর-পূবালী নামে পরিচিত। কিন্তু এটা মনে রাখতে হবে যে মৌসুমী বাতাস কেবল ঋতুগত বাতাসের গতি-প্রকৃতিই নয়, বিস্তীর্ণ স্থল ও জলভাগের বৈপরীত্যজনিত তাপীয় পার্থক্যের মধ্যেই এর কারণ নিহিত। মৌসুমী বাতাস প্রধানতঃ 25° উত্তর থেকে 35° উত্তর অক্ষাংশে এবং 45° পশ্চিম দ্রাঘিমা থেকে 140° পূর্ব দ্রাঘিমার মধ্যবর্তী অঞ্চলে দেখা যায়। এই অর্থে মৌসুমী বাতাসকে ভৌগোলিক সংবহন হিসেবে ভাবা যেতে পারে। তবে মৌসুমী বাতাস ভারতের ওপর আদর্শভাবে বিকাশলাভ করেছে। সেজন্য ভারতকে অনেক সময় 'মৌসুমী বাতাসের দেশ' (land of monsoon) বলা হয়। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতেও মৌসুমী জলবায়ু দেখা যায়। এছাড়া ক্রান্তীয় দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকার নাইজেরিয়া থেকে সিয়েরা লিওন এবং উত্তর অস্ট্রেলিয়াতে গ্রীষ্ম ও শীতকালে বিপরীতমুখী বায়ুপ্রবাহ হয় এবং সেখানে মৌসুমীর মতো জলবায়ু দেখা যায়।

2.3.9. মেঘের উৎপত্তি/সঞ্চার

আমরা জানি যে ভূমিতলে বৃষ্টি ও তুষারপাতের উৎস হল মেঘ। মেঘের উৎপত্তি আর্দ্র বায়ু পুলিন্দার (parcel) উর্দ্ধগমনের সাথে সম্পর্কযুক্ত। বায়ু যতই ওপরে ওঠে তার চাপ তত কমতে থাকে। এর ওপরকার বায়ুমণ্ডলীয় ওজনেরও হ্রাস ঘটতে থাকে এবং বায়ু পুলিন্দাটি আয়তনে প্রসারিত হয়। উর্দ্ধগামী বায়ু প্রসারিত হলে মোট শক্তির কিছুটা প্রসারণ কার্যে ব্যয়িত হয়। কাজেই বায়ু পুলিন্দার উষ্ণতামান কমে। ফলতঃ হিমাঙ্কের কাছাকাছি উষ্ণতার পতন ঘটলে ঘনীভবন প্রক্রিয়া শুরু হয় এর ফলে ঘনীভবনের লীনতাপ বায়ুমণ্ডলে নির্গত হয়, যা আবার বায়ু পুলিন্দাটিকে উচ্চতর স্তরে ঠেলে তুলতে থাকে। প্রসারণের এই পদ্ধতিকে তাপনিরুদ্ধ প্রসারণ (adiabatic expansion) এবং শীতলীকরণকে তাপনিরুদ্ধ শীতলীকরণ (adiabatic cooling) বলা হয়। তাপনিরুদ্ধ প্রসারণ ও শীতলীকরণ বায়ুমণ্ডলে আবহাওয়া উৎপাদনের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া হিসেবে বিবেচিত হয়। বায়ুমণ্ডলের অস্থিতাবস্থা বা স্থিতাবস্থা (stability and instability) তাপনিরুদ্ধ প্রসারণ ও শীতলীকরণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। বায়ুমণ্ডলে শীতলতার হার উপস্থিত জলীয়বাষ্পের পরিমাণ এবং ওপরে ওঠার গতির ওপর নির্ভর করে। প্রায়- সম্পৃক্ত বায়ু দ্রুতগতিতে উঠতে থাকলে তা কিউমুলোনিম্বাস (cumulonimbus) মেঘের সঞ্চার করে এবং অত্যন্ত অস্থিতিশীল আবহ পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটায়। সকলপ্রকার আবহ-গোলযোগ এই ধরনের বায়ুমণ্ডলীয় অবস্থার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।

মেঘ সাধারণভাবে বায়ুমণ্ডলের বিরাজমান ভৌত প্রক্রিয়ার নির্দেশ দেয়। অতএব কোন স্থানের আবহাওয়ার পূর্বাভাসের জন্য মেঘ-পাঠের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। আবহাওয়ার পূর্বাভাস দিতে হলে মেঘের ধরণধারণ চিনতে ও বুঝতে হবে। যে কোন মেঘ মানচিত্রাবলী (atlas) থেকে মেঘের প্রকারগুলি চিহ্নিত করা যায়। তাদের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের জন্য সকল মেঘকে 4টি মুখ্য পরিবার এবং 10টি শ্রেণীতে দলবদ্ধ করা সম্ভব। এগুলি নিম্নরূপ :

পরিবার 'ক' : উচ্চমেঘ (গড় নিম্নতম উচ্চতা 600 মিটার)

1. সিরাস (Cirrus, Ci) : এই মেঘ দেখতে পালকের মতো ও তুষার/বরফকণা দিয়ে তৈরি। এর গঠন পাতলা ও তন্তু—বুননের মতো। এই মেঘ যখন বিচ্ছিন্নভাবে আকাশে ছড়িয়ে থাকে, তখন পরিষ্কার আবহাওয়ার ইঙ্গিত দেয়, কিন্তু যখন এরা পরস্পর মিশে বন্ধনী তৈরি করে এবং সিরোস্ট্রাটাস বা অল্টোস্ট্রাটাস-এর সাথে যুক্ত হয়, তখন খারাপ আবহাওয়ার পূর্বাভাস দিতে পারে।

2. সিরোস্ট্রাটাস (Cirrostratus, Cs) : পাতলা সাদা চাদরের মতো এই মেঘ সারা আকাশ ঢেকে থাকে, এবং আকাশ ছায়াপথের মতো দেখায়। এই মেঘ সূর্য বা চাঁদের চারপাশে বলয়ের সৃষ্টি করে, যা ঝড়ের পূর্ব ঘোষণা জানায়।

3. সিরোকিউমুলাস (Cirrocumulus, Cc) : খণ্ডখণ্ড সাদা পেঁজা তুলোর মতো দেখায় এবং সাধারণতঃ ছায়া পড়ে না। এগুলি দলবদ্ধ হতে পারে, অথবা আকাশরেখা, বা ঢেউ-এর মতো বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হয় যাকে 'ম্যাকারেল আকাশ' (mackarel sky) বলে।

পরিবার 'খ' : মধ্যমেঘ (গড় উচ্চতম সর্বোচ্চ 600 মিটার এবং গড় নিম্নতম উচ্চতা 200 মিটার)

4. অল্টোস্ট্রাটাস (Altostratus, As) : সমানভাবে বিস্তৃত ধূসর বা নীল রঙের মেঘ এবং স্বাভাবিক অবস্থায় এর গঠন তন্তুর মতো। এই মেঘ দেখতে ঘন সিরোস্ট্রাটাসের মতো এবং উর্দ্ধাকাশে ক্রমে তাদের সঙ্গে মিলে যায়। এই মেঘের সঞ্চারের ফলে অবিরাম এবং ব্যাপক বৃষ্টি হতে পারে।

5. অল্টোকিউমুলাস (Altocumulus, Ac) : চ্যাপ্টা, গোল দানাদার এই মেঘ রেখা বা ঢেউ-এর আকারে সাজানো থাকে। সিরোকিউমুলাসের তুলনায় এর গোলাকার দানা বড় এবং এর ছায়াপাত হয়।

পরিবার 'গ' নিম্ন মেঘ (গড় সর্বোচ্চ উচ্চতা 200 মিটার এবং নিম্নতম উচ্চতা ভূমির কাছাকাছি)

6. স্ট্রাটোকিউমুলাস (Stratocumulus, Sc) : বড় গোলাকার দানা বা নরম ধূসর, মোড়ানো এই মেঘ উজ্জ্বল ও অন্তর্বর্তী ছিদ্র বিশিষ্ট। নির্দিষ্ট বিন্যাসে এই মেঘ সাজানো থাকে।

7. স্ট্রাটাস (Stratus, St) : এই ধরনের মেঘের সুসম স্তরগুলি কুয়াশার মতো দেখতে। তবে এই মেঘের নিম্নতল ভূ-তলের উর্ধ্বে অবস্থান করে।

8. নিম্বোস্ট্রাটাস (Nimbostratus, Ns) : এই মেঘ ঘন এবং আকারহীন। বেশীরভাগ ক্ষেত্রে নীচু মেঘের লোমশ স্তর থেকে বৃষ্টিপাত হয়।

পরিবার 'ঘ' : উলম্ব মেঘ (কোন সুনির্দিষ্ট উচ্চতা নেই, তবে সর্বোচ্চ উচ্চতা 6000 মিটারের কিছু বেশী এবং সবচেয়ে কম 480 মিটার-এর মতো হয়)

9. কিউম্যুলাস (Cumulus, Cu) : এই ধরনের মেঘ ঘন পুরু এবং উলম্বভাবে বিস্তৃত। এর উপরিভাগ দেখতে গম্বুজের মতো, অনেকটা ফুলকপির মতো, কিন্তু এর পাদভূমি অনুভূমিক হয়। সাধারণভাবে এগুলি পরিষ্কার আবহাওয়া নির্দেশ করে।

10. কিউম্যুলোনিম্বাস (Cumulonimbus, Cb) : এই মেঘকে অনেকসময় বজ্রমেঘও (thunder clouds) বলা হয়। এই মেঘ খুবই গভীর ও উলম্বভাবে বিস্তৃত। এর উপরিতল অনেক ওপরে থাকে, যা দেখতে পর্বত, গম্বুজ বা নেহাই (anvil)-এর মতো হয়। এগুলি বায়ুমণ্ডলের অস্থিতাবস্থার বৈশিষ্ট্য এবং ফলতঃ ঝড়-বৃষ্টি, বাতাস, বজ্রমেঘ, এমনকি শিলাবৃষ্টিও হতে পারে।

2.3.10. বারিপাত (বৃষ্টিপাত ও তুষারপাত) প্রক্রিয়া

দেখা গেছে যে, কেবল ঘনীভবন পদ্ধতি এবং সাধারণভাবে মেঘকণার বৃদ্ধির ফলে বারিপাতের সূচনা নাও হতে পারে। বারিপাত বলতে বৃষ্টিপাত এবং তুষারপাত উভয়কেই বোঝায় ; বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতা হিমাঙ্কের নীচে চলে গেলে তুষারপাত হয়, অন্যথায় বৃষ্টিপাত একটি অতি সাধারণ ঘটনা। অবশ্য বৃষ্টিপাত এবং তুষারপাতের প্রক্রিয়া একই। বার্জেরন এবং ফিন্ডিসেন (Bergeron and Fiendisen) বৃষ্টি হবার ব্যাপারে একটি নতুন ধারণার অবতারণা করেছেন।

বার্জেরন-ফিন্ডিসেন তত্ত্ব : ইদানিংকালে বারিপাতের প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মেঘে জলকণার সঙ্গে বরফকণার উপস্থিতির গুরুত্বকে তুলে ধরা হচ্ছে। বার্জেরন মনে করেন যে, কোন মেঘে বরফকণা এবং অতিশীতল জলবিন্দু মিশে থাকলে কলয়ডিয় অস্থিতাবস্থার (colloidal instability) সৃষ্টি হবে। বার্জেরন-ফিন্ডিসেন-এর বৃষ্টির উৎপত্তি সংক্রান্ত তত্ত্বটি নিম্নলিখিত তথ্যগুলির ওপর প্রতিষ্ঠিত।

বায়ুর আপেক্ষিক আর্দ্রতা জল-পৃষ্ঠের তুলনায় তুষার-পৃষ্ঠে বেশী। বায়ুর উষ্ণতামান 0° সেলসিয়াসের নিচে নেমে গেলে বায়ুর বাষ্পচাপ জলের তুলনায় তুষার-পৃষ্ঠে দ্রুত কমে যায়। এই কারণে বিশেষতঃ –5° থেকে –25° সেলসিয়াস উষ্ণতায় জলের ওপর সম্পৃক্ত বাষ্প-চাপ (saturation vapour pressure বা SVP) তুষার-পৃষ্ঠের তুলনায় অনেক বেশী হয়। এই সম্পৃক্ত বাষ্পচাপের পার্থক্য যেখানে 0.2 মিলিবারের বেশী হয় এবং তুষার কেলাস ও অতিশীতল জলবিন্দু একসঙ্গে অবস্থান করে, সেক্ষেত্রে অতিশীতল জলকণা বাষ্পীভূত হবে এবং তুষার কেলাসের ওপর (উর্ধ্বপাতন প্রক্রিয়ায়) তুষার হিসাবে জমা হবে। বিশুদ্ধ বায়ুতে ক্ষুদ্র জলকণাগুলি –40° সেলসিয়াস উষ্ণতা পর্যন্ত অতিশীতল হয়। অবশ্য স্বতঃস্ফূর্ত হিমায়ন সাধারণতঃ –22° সেলসিয়াস উষ্ণতাতেই আরম্ভ হয়। তুষার কেলাস গঠনের ক্ষেত্রে হিম-কেন্দ্রাণুর (freezing nuclei) বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। মেঘে ঘনীভবন কেন্দ্রাণুর (condensation nuclei) চেয়ে হিম-কেন্দ্রাণুর সংখ্যা অনেক কম থাকে।

–30° সেলসিয়াস উষ্ণতায় এর সংখ্যা প্রতি লিটারে মাত্র 10টি। সুক্ষ্ম মৃত্তিকা কণা, এরোসল (aerosols), আগ্নেয়গিরির ধূলিকণা ইত্যাদি হিম-কেন্দ্রাণু তৈরিতে সহায়তা করে। সঞ্চয়ের মাধ্যমে হিম-কেন্দ্রাণুর বৃদ্ধি ঘটে। প্রাথমিক একটি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে হিম-কেন্দ্রাণু অবশ্য আলাদাভাবে গঠিত হতে পারে, অন্যদিকে অতিশীতল জলের হিমায়নের ফলে তুষার ছররার (splinters) সৃষ্টি হয়। তুষার কেলাসগুলি, বিশেষ করে 0° থেকে –5° সেলসিয়াস উষ্ণতায় পরস্পরের সাথে সংঘর্ষের ফলে সমষ্টিকৃত হয়।

তুষার কেলাসগুলি আকারে বড়ো হলে আর মুক্ত বায়ুতে ভেসে থাকতে পারে না, তখন নীচের দিকে পড়তে শুরু করে। মেঘের পাদসীমায় যেখানে উষ্ণতামান 0° সেলসিয়াসের বেশী সেখানে তুষার কেলাসগুলি বড়ো বড়ো জলবিন্দুতে পরিণত হয় এবং পরিশেষে বৃষ্টির আকারে ভূ-তলে পতিত হয়।

কৃত্রিম বৃষ্টিপাত ঘটানোর জন্য বার্জেরন এবং ফিন্ডিসেনের মূল ধারণাটিকে কাজে লাগান হয়। মেঘের মধ্যে ভূমি-উৎক্ষেপক, বিমান বা রকেটের সাহায্যে সিলভার ডাইঅক্সাইড বা কঠিন কার্বন ডাইঅক্সাইড অনুপ্রবিষ্ট করা হয়। এই কণাগুলি মেঘের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে হিম কেন্দ্রাণু হিসেবে কাজ করে এবং বৃষ্টিপাত ঘটায়। অবশ্য কৃত্রিম বৃষ্টি উৎপাদন একটি ব্যয়বহুল ব্যাপার এবং কোন কোন ক্ষেত্রে এই পরীক্ষা চাহিদামত ফলপ্রসূ হয় না। তবে এই পদ্ধতিটি নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে ভূমি-কুয়াশা নিষ্কাশনে বিশেষ সুবিধা দিয়েছে।

2.3.11. বায়ুমণ্ডলের গোলযোগসমূহ (Atmospheric disturbances)

বায়ুমণ্ডলের গোলযোগগুলি আবহাওয়ার বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। এইসব গোলযোগের অনেকে ভূ-তলে জীবন ও সম্পত্তির ব্যাপক হানির কারণ। সেজন্য এগুলিকে অনেক সময় জলবায়ুগত অনিশ্চয়তাও বলা হয়, এবং এগুলি মানুষসহ জীববসতিকে (habitat) মারাত্মকভাবে প্রভাবিত করে।

বায়ুমণ্ডলীয় গোলযোগগুলি বিভিন্ন কারণে হতে পারে। তাদের উৎপত্তির দিক থেকে এই গোলযোগগুলিকে কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়, যেমন—

(ক) বজ্রঝড় এবং টর্নাডো ঝড়, যেগুলি প্রধানতঃ স্থলভাগে প্রচণ্ড আলোড়নপূর্ণ পরিচলন ঝঞ্ঝা হিসেবে দেখা যায়।

(খ) ক্রান্তীয় ঝড়, ক্রান্তীয় ঘূর্ণবাত, হারিকেন (hurricanes) বা টাইফুন (typhoons) যেগুলি সাধারণতঃ ক্রান্তীয় সমুদ্রে উৎপন্ন হয়ে উপকূলবর্তী এলাকাগুলিকে দখল করে এবং স্থলভাগের ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে।

(গ) মধ্য-অক্ষাংশের বা অতিক্রান্তীয় অঞ্চলের ঘূর্ণবাত, যেগুলি মধ্য-অক্ষাংশের ভূমিতলে কোন নিম্নচাপকে কেন্দ্র করে বিপরীতধর্মী বায়ুপিণ্ডের সমকেন্দ্রিকতার ফলে সৃষ্টি হয়। সাধারণভাবে মধ্য-অক্ষাংশের ঘূর্ণবাতগুলি ক্রান্তীয় ঘূর্ণবাতের চেয়ে অনেক কম ক্ষতিকারক।

2.3.11.1. বজ্রঝড়

প্রখর পরিচলনজনিত অস্থিতাবস্থা থেকে বজ্রঝড়ের সৃষ্টি হয় এবং এর প্রধান বৈশিষ্ট্য হল বিদ্যুৎ চমকানো ও বাজ পড়া। মূলগতভাবে বজ্রঝড় হল একটি তাপ-গতি ভিত্তিক যন্ত্রের মতো, যেখানে ঘনীভবনের লীনতাপের স্থিতিশক্তি এবং আর্দ্র, শর্তসাপেক্ষ এবং পরিচলন-অস্থির বায়ুর একীকরণের ফলে গতিশক্তিতে দ্রুত রূপান্তরের মাধ্যমে বিশৃঙ্খল বাতাসের উর্ধ্বগমন ঘটে এবং এর সঙ্গে থাকে প্রবল বৃষ্টি, শিলা, ধূলি ধূসরিত ঝঞ্ঝা, বাত্যা, বিদ্যুতের চমক বজ্রপতন ইত্যাদি।

উত্তপ্ত ভূমিতলের ওপর চিমনির আকারে বায়ুশক্তির ওপরে ওঠা ও নীচে নামার মাধ্যমে বজ্রঝড় চেনা যায়। গ্রীষ্মের মাসগুলিতে বিশেষতঃ দুপুর বেলায় ভূমিতল দ্রুত অত্যধিক গরম হয়ে পড়লে বায়ু উলম্বভাবে ওপরে উঠতে থাকে। যেখানে

বায়ু যথেষ্ট আর্দ্র বা প্রায় সম্পৃক্ত, খুব কম সময়ের মধ্যেই ঊর্ধ্বগামী বায়ু শিশিরাঙ্কে পৌঁছায় এবং সেটা কম উচ্চতাতেই ঘটে থাকে। ঘনীভবনের পর লীনতাপ নির্গত হলে বায়ু নীচ থেকে ঠেলে আবার ওপরে ওঠে। এই ঊর্ধ্বগমন চলতে থাকে যতক্ষণ না বায়ু হিমস্তরে পৌঁছায়। এর পরে সম্পৃক্ত বায়ু নীচের দিকে নামতে থাকে এবং তার সঙ্গে প্রবল বৃষ্টি, ঝঞ্ঝা-বাত্যা, শিলা (hails), বিদ্যুৎ ও বজ্রপাত জড়িয়ে থাকে। আসলে ঊর্ধ্বগামী বায়ু এবং আর্দ্র ও পরিচলন পরিবেশে উষ্ণতার হ্রাসের হার বেড়ে যাবার মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। কাজেই বজ্রঝড় তৈরি হবার পিছনে বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতা হ্রাসের হার বাড়িয়ে তোলার কারণগুলিই রয়েছে। বজ্রঝড়ের প্রাবল্য নির্ভর করে লীনতাপের (শক্তির) মোট যোগান এবং সেই নিহিত শক্তির খরচের ওপর। অতএব একটি বজ্রঝড় প্রবল অস্থিতাবস্থার বহিঃপ্রকাশ মাত্র।

2.3.11.2. টর্নাডো ঝড়

টর্নাডো ঝড়গুলি অনিশ্চিত এবং মারাত্মক। এদের বেগ এতই ভয়ঙ্করভাবে বিশৃঙ্খল যে প্রবল ঘূর্ণাবর্তের মাধ্যমে এগুলি সবকিছুকে পাকিয়ে দুমড়ে ফেলতে পারে এবং যার পরিসমাপ্তিতে অবর্ণনীয় ক্ষতির খতিয়ানমাত্র। এজন্য আমেরিকায় একে বলা হয় 'টুইস্টার' (Twister)। 'টর্নাডো' শব্দটি স্পেনীয় শব্দ 'ট্রোনাডা' (tronada) থেকে এসেছে, যার অর্থ বজ্রঝড়।

আসলে টর্নাডো বজ্রঝড়ের প্রবল উৎপত্তির সাথে সম্পর্কযুক্ত। ঊর্ধ্বগামী উষ্ণ বায়ু ফুলে-ফেঁপে ওঠার সময় ঘুরতে থাকে। যদি এই ঘূর্ণন যথেষ্ট জোরালো হয় তখন এটিকে টর্নাডো বা 'ফানেল' মেঘ আখ্যা দেওয়া হয়। বজ্রঝড়ের গম্ভীর উপস্থিতির ফলে কিউম্যুলোনিম্বাস মেঘের পাদদেশ শুঁড়ের মতো মাটি স্পর্শ করে এবং প্রচণ্ডজোরে সবকিছু শুষে নিতে থাকে। ফানেল মেঘ পাক খেতে থাকে এবং সেই অবস্থাতেই ভূমি বরাবর চলতে থাকে, যখন এর গতি অত্যন্ত প্রবল—এমনকি ঘণ্টায় 400 কিমির বেশী থাকে। নিম্নচাপ-এর শূন্যস্থান পূরণ করার জন্য চারদিক থেকে বায়ু যখন প্রচণ্ডগতিতে ছুটে আসে, তখন নতুনভাবে মারাত্মক ঝড়ের সৃষ্টি হয়। অবশ্য এই ধরনের ফানেল মেঘ বা টর্নাডো ঝড়ের বিস্তার অত্যন্ত কম—চওড়ায় মাত্র 200–500 মিটার এবং লম্বায় 15-25 কিমির মধ্যে হয়।

বেশীর ভাগ টর্নাডো ঝড়ই একটি নির্দিষ্ট প্রখর আবহ প্রণালীর মধ্যে তৈরি হয়। একে 'দানব কক্ষ' (super cell) বলা যেতে পারে। এই দানবাকার বজ্রঝড় তৈরি হয় যখন ঊর্ধ্বগামী উষ্ণবায়ু উপরিস্থ কোন স্থিতাবস্থার স্তরের ভেতর দিয়ে যাত্রা করে এবং একটি শুষ্ক শীতল বায়ুর স্তরে পৌঁছাতে চায়। এইভাবে যে অস্থিতাবস্থা তৈরি হয় তার ফলে শক্তিশালী শাঙ্কব ঘূর্ণিগতির (vortex motion) সৃষ্টি হয়, যাকে টর্নাডো ঝড়ের চালক যন্ত্র বলা যেতে পারে।

এখনো পর্যন্ত টর্নাডো ঝড়ের পূর্বাভাস একটি অসম্ভব কাজ বলে মনে করা হয়, এবং সেজন্য ক্ষয়ক্ষতি কমাবার মতো ব্যবস্থা আগেভাগে গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। অনেক সময় ঊর্ধ্বগামী বায়ু টর্নাডো ঝড়ের সৃষ্টি করে আবার করেও না। বজ্রঝড় থেকে টর্নাডো ঝড়ে পরিণত হতে সময় লাগে মাত্র 10 মিনিটের মতো। কাজেই এর ক্রিয়ার পর্যবেক্ষণ, চিহ্নিতকরণ এবং সর্বোপরি এ ব্যাপারে সতর্কীকরণ এই অল্প সময়ের মধ্যে দেওয়া সম্ভব হয় না। যদিও ভৌগোলিক ব্যাপ্তীতে টর্নাডো ঝড় বেশ বিরল, এটি ওড়িশা ও পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত এলাকায় এবং বাংলাদেশে মার্চ থেকে মে মাসের মধ্যে গ্রীষ্মকালে দেখা যায়। 1996-এর 13 মে বাংলাদেশে একটি প্রবল টর্নাডো ঝড় কমপক্ষে 500 লোকের জীবনহানি ঘটায় এবং 5000 -এর বেশী লোককে আহত করে। 1998-এর মে মাসে ওড়িশার বালেশ্বর জেলা এবং পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর জেলায় একটি টর্নাডো ঝড় মানুষের জীবনহানিসহ ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি করেছিল। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যভাগে, বিশেষতঃ কানশাশ থেকে ইণ্ডিয়ানা রাষ্ট্রের মধ্যে মাঝে মাঝেই টর্নাডো ঝড় হয়। এখানে গড়পড়তা 150টি টর্নাডো ঝড় বছরে দেখা যায়। এই ঝড়গুলি সাধারণত মার্চ, এপ্রিল এবং মে মাসে 14-00 টা থেকে 22-00 টার মধ্যে ঘটতে দেখা যায়। নীচের সারণীতে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে 1996-এর মার্চ, এপ্রিল ও মে মাসের টর্নাডো ঝড়গুলির বিবরণ দেওয়া হল।

সারণী 2.7. আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মারাত্মক টর্নাডো ঝড়গুলির পরিসংখ্যান (1996 এর মার্চ থেকে মে)

তারিখ	সময়	অবস্থান	জীবনহানি
6 মার্চ	04–01	পশ্চিম সেলমা, আলবামা	4
6 মার্চ	05–15	মন্টগোমারী, আলবামা	2
14 এপ্রিল	18–36	অ্যালিসন, আরকানসাস	5
14 এপ্রিল	18–42	সাইলামোর, আরকানসাস	2
19 এপ্রিল	19–00	এন. আর. ওগডেন, ইলিনয়	1
20 এপ্রিল	07–30	ক্যারলটন, ম্যাসাচুসেটস	1
21 এপ্রিল	22–20	ভ্যান বুরেন, আরকানসাস	2
21 এপ্রিল	23–15	সেন্টপল, আরকানসাস	2
12 মে	20-12	ওকিচোবী, ফ্লোরিডা	1

সূত্র : ন্যাশনাল ওশানিক অ্যান্ড অ্যাটমসফেরিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র

2.3.11.3. ক্রান্তীয় ঘূর্ণিঝড়

পিড্‌লটন (Piddleton) ক্রান্তীয় অঞ্চলের ঘূর্ণমান ঝড়ের জন্য সাইক্লোন (cyclone) শব্দটি ব্যবহার করেন। 'সাইক্লোন' শব্দটি গ্রীক শব্দ 'cyclo' (সাইক্লো) থেকে এসেছে, যার অর্থ সাপের কুণ্ডলী, এই ধরনের গোলযোগ প্রধানতঃ উষ্ণ ক্রান্তীয় সমুদ্রের ওপর নিম্নচাপকেন্দ্রকে ঘিরে উৎপন্ন হয়। এই ধরনের নিম্নচাপকেন্দ্র সাধারণতঃ মে থেকে সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে নিরক্ষরেখার উত্তর অংশে থেকে 5°–10° উত্তর অক্ষাংশের মধ্যে উৎপন্ন হয়। এখানে উভয় গোলার্ধের আয়ন বায়ুপ্রবাহ গ্রীষ্মকালীন নিরক্ষীয় নিম্নচাপ ক্ষেত্রে এসে মিলিত হয়। এই অঞ্চলটিকে বলা হয় অন্তর্নিরক্ষীয় সমকেন্দ্রিকতা বা সংঘর্ষ অঞ্চল (Inter-Tropical Convergence Zone বা ITCZ). ITCZ-এর অবস্থানের পরিবর্তন হয় এবং তা সূর্যের কৌণিক অবস্থানের ওপর নির্ভরশীল।

ITCZ যখন সক্রিয় হয়ে ওঠে তখন নিম্নচাপ ক্ষেত্রের সৃষ্টি হয়। এই নিম্নচাপ ক্ষেত্র গভীর নিম্নচাপ (deep depression) ও পরিশেষে প্রবল ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হতে পারে। তীব্রতা অনুসারে এ ধরনের ক্রান্তীয় গোলযোগগুলিকে নিম্নলিখিতভাবে শ্রেণীবদ্ধ করা যায়। যথা :

(ক) ক্রান্তীয় গোলযোগ : একটি বা কোন আবদ্ধ সমচাপ রেখা ছাড়াই চিহ্নিত করা যায়; বাতাসের চক্রপ্রবাহ বিশেষ বিকাশ লাভ করে না, এর গতিও খুব কম থাকে।

(খ) ক্রান্তীয় নিম্নচাপ বা ডিপ্রেশান : একটি বা তার অধিক আবদ্ধ সমচাপরেখার মাধ্যমে চিহ্নিত করা যায়; ব্যুফোর্ট স্কেল (Beufort scale)-এ বাতাসের গতি-এর সমান (অর্থাৎ প্রতি ঘণ্টায় 25 থেকে 30 মাইলের মধ্যে) থাকে।

(গ) ক্রান্তীয় ঝড় : আবদ্ধ সমচাপরেখার সাহায্যে চিহ্নিত করা যায়; বাতাসের গতি ব্যুফোর্ট স্কেল-এ 6 থেকে 12 (অর্থাৎ প্রতি ঘণ্টায় 75 মাইলের মধ্যে) হয়।

(ঘ) হারিকেন বা টাইফুন ঝড় : প্রখর নিম্নচাপের সাহায্যে চিহ্নিত করা হয়; বায়ুর চাপের পার্থক্য অনেক বেশী থাকে এবং বাতাসের গতি ব্যুফোর্ট স্কেল-এ 12 এর বেশী (অর্থাৎ প্রতি ঘণ্টায় 75 মাইলের বেশী) হয়। ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জের প্রবল ঘূর্ণিঝড়কে হারিকেন এবং প্রশান্ত মহাসাগরের ওপর এগুলিকে টাইফুন বলা হয়। এদের বৈশিষ্ট্য মোটামুটি একই রকমের।

2.3.11.4. বঙ্গোপসাগর ও আরব সাগরের ওপর ঘূর্ণিঝড়

প্রতি বছর বঙ্গোপসাগর ও আরব সাগরের ওপর ঘূর্ণবাত এবং নিম্নচাপের উৎপত্তি হয়, যা ভারত, বাংলাদেশ এবং মায়ানমারের বিভিন্ন এলাকাকে প্রচণ্ডভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে। এগুলির বেশীরভাগ মারাত্মক আকার ধারণ করে এবং জীবন ও সম্পত্তির ব্যাপক হানি ঘটায়।

নীচের সারণীতে বঙ্গোপসাগর এবং আরব সাগরের ওপর ঘূর্ণিঝড়ের সংঘটন সংখ্যা (1891 থেকে 1960 এর গড়) দেওয়া হল।

মাস	বঙ্গোপসাগর	আরব সাগর
জানুয়ারী	4 (1)	2 (0)
ফেব্রুয়ারী	1 (1)	0 (0)
মার্চ	4 (2)	0 (0)
এপ্রিল	18 (7)	5 (4)
মে	28 (18)	13 (11)
জুন	34 (4)	13 (8)
জুলাই	38 (7)	3 (0)
আগষ্ট	25 (1)	1 (0)
সেপ্টেম্বর	27 (8)	4 (1)
অক্টোবর	53 (19)	17 (7)
নভেম্বর	56 (23)	21 (16)
ডিসেম্বর	26 (9)	3 (1)
মোট	314 (100)	82 (48)

মন্তব্য : বন্ধনীর মধ্যেকার সংখ্যাগুলি যে সব ঝড় প্রবল আকার ধারণ করে তাদের সংখ্যাকে প্রকাশ করছে।

সারণীতে এটা স্পষ্ট যে বঙ্গোপসাগরের ওপর ঝড়ের সংখ্যা আরব সাগরের তুলনায় অনেক বেশী। উভয় এলাকার ক্ষেত্রেই এই ঝড়গুলোর সংঘটনকালকে তিনটি স্বতন্ত্র সময়ে ভাগ করা যেতে পারে, যেমন—

(ক) এপ্রিল এবং মে মাস নিয়ে মৌসুমী-পূর্ব সময়কাল;

(খ) জুন থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত মৌসুমী ঋতুকাল; এবং

(গ) অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত মৌসুমী-পরবর্তী সময়কাল।

জানুয়ারী থেকে মার্চ মাস পর্যন্ত সময়ে ঝড়ের সংখ্যা বঙ্গোপসাগর এবং আরব সাগর উভয়ক্ষেত্রেই কম।

মৌসুমী ঋতুতে গোলযোগগুলি প্রধানতঃ উত্তর বঙ্গোপসাগরে উৎপন্ন হয়ে প্রায়শঃ উত্তর-পশ্চিম দিকে যাত্রা করে। এই সময়ের ঝড়গুলি তুলনামূলকভাবে কম তীব্র হয়, কিন্তু ওড়িশা, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার মালভূমি এবং মধ্যপ্রদেশের পূর্বদিকের জেলাগুলিতে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টিপাত ঘটায়। তবে ওড়িশা ও পশ্চিমবঙ্গের উপকূলভাগে বৃষ্টির পরিমাণ অধিক হয়। অন্যদিকে, মৌসুমী-পূর্ব ও মৌসুমী-পরবর্তী ঋতুগুলিতে উৎপন্ন বঙ্গোপসাগরের গোলযোগগুলি বিভিন্ন দিকে ধাবিত হয়। এদের অনেকের

প্রবাহপথ পুনরায় বেঁকে যায়। সাধারণতঃ এই ঝড়গুলি প্রবল আকার ধারণ করে এবং অন্ধ্রপ্রদেশ, উত্তর তামিলনাড়ু, ওড়িশা, পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশের উপকূলের জেলাগুলি ও মায়ানমারের আরাকান উপকূলের ব্যাপক ক্ষয়সাধন করে।

তিনভাবে এই ক্রান্তীয় ঘূর্ণিঝড় ক্ষয়সাধন করে থাকে, যথা :

(ক) ঝড় তাড়িত সমুদ্রের জল অস্বাভাবিক উঁচু হয়ে উপকূল এলাকাগুলিকে গভীরভাবে প্লাবিত করে।

(খ) উচ্চগতিসম্পন্ন ঝড় ঘর-বাড়ী ও অন্যান্য পরিকাঠামো ধ্বংস করে।

(গ) প্রবল বৃষ্টির ফলে বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত এবং জলমগ্ন হয়ে পড়ে।

ক্যারিবিয়ান সাগর ও উত্তর আটলান্টিক মহাসাগরের হারিকেন ঝড় : ক্যারিবীয় সাগর ও উত্তর আটলান্টিক মহাসাগরের ওপর সাধারণভাবে গ্রীষ্মকালে, বিশেষ করে আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে হারিকেন ঝড়ের সৃষ্টি হয়। জাতীয় হারিকেন (গবেষণা) কেন্দ্র (National Hurricane Centre) অনুসারে এই সময় গড়ে 9টি ঝড় ক্যারিবীয় সাগরে এবং 6টি ঝড় উত্তর আটলান্টিক মহাসাগরে উৎপন্ন হয়। এই হারিকেন ঝড়গুলি প্রতিবছর সেন্ট্রাল আমেরিকান আইল্যাণ্ড রাষ্ট্রগুলি এবং আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ব উপকূলীয় এলাকাগুলিতে জীবন ও সম্পত্তির ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে। 1998-তে 'মিষ্ট্রাল' (Mistral) নামের হারিকেন ঝড়টি মধ্য-আমেরিকা এবং আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলে ব্যাপক ধ্বংসলীলা চালায়। এটিকে বিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে ভয়ঙ্কর পরিবেশ বিপর্যয়গুলির অন্যতম বলে মনে করা হয়।

2.3.11.5. মধ্য-অক্ষাংশের ঘূর্ণিঝড়

মধ্য-অক্ষাংশের উপমেরু নিম্নচাপ অঞ্চলে শীতল মেরু (cP) এবং সামুদ্রিক ক্রান্তীয় (mT) নামের দুটি বিপরীতধর্মী বায়ুপিণ্ড এসে মিলিত হয়। এই বায়ুপিণ্ডগুলি তাদের প্রান্ত বরাবর সীমানা (front) সৃষ্টি করে, যা পরিশেষে ঘূর্ণাবর্তে পরিণত হয়। এই ধরনের ঘূর্ণাবর্তের মডেলটি জে. বিয়ার্কনেস (J. Bjerknes, 1937) মেরুসীমান্ত তত্ত্ব (Polar Front theory) হিসেবে প্রথম তুলে ধরেন। এই মডেল-এ বলা হয় যে, প্রাথমিকভাবে মেরুপ্রান্তের শীতল বায়ুপিণ্ড এবং ক্রান্তীয় মহাসাগরগুলির উষ্ণবায়ুপিণ্ড একটি নিম্নচাপক্ষেত্র বরাবর বিভেদ রেখার সৃষ্টি করে। উষ্ণতার তারতম্যের জন্য বায়ুপিণ্ডগুলির ঘর্ষণ এবং স্থানান্তর হয়। এর ফলে হালকা উষ্ণবায়ু উপরে ওঠে, কারণ ভারী শীতলবায়ু পেছন থেকে কীলকের মতো ধাক্কার সৃষ্টি করে। তাই দুটি সীমান্তের সৃষ্টি হয়, যেমন—শীতল সীমান্ত এবং উষ্ণ সীমান্ত, যারা সবদিক দিয়েই স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যযুক্ত হয়। চলাচলের ক্ষেত্রে শীতল সীমান্ত বেশী সক্রিয় এবং উষ্ণ সীমান্তের চেয়ে দ্রুতগতিসম্পন্ন। তাই অবশেষে শীতল সীমান্ত উষ্ণ সীমান্তকে ধরে ফেলে এবং ঘূর্ণাবর্তের কেন্দ্রস্থলে অন্তর্ধৃতির (occlusion) উৎপত্তি হয়। এই অন্তর্ধৃতি ঘূর্ণাবর্তের সমাপ্তির ইঙ্গিত দেয়।

2.3.11.6. পশ্চিমা গোলযোগ (Western disturbances)

উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম ভারতে শীত ও শীতের শেষ মাসগুলিতে পশ্চিমা গোলযোগ আবহাওয়ার একটি বৈচিত্র্যপূর্ণ ঘটনা। এই গোলযোগগুলি স্পেন-এর কাছাকাছি আটলান্টিক মহাসাগর ও ভূ-মধ্যসাগরে উৎপন্ন হয়ে এশিয়া মাইনরের ভেতর দিয়ে ধেয়ে আসে। ভূমিতলের ওপর এই নিম্নচাপগুলি দুর্বল হয়ে পড়ে, কিন্তু উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম ভারতে ঢুকে পড়ার পর এগুলি পুনরায় সক্রিয় হয়ে ওঠে। এই নিম্নচাপ থেকে জম্মু ও কাশ্মীর, পাঞ্জাব, হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশ, এমনকি উত্তর বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, অসম এবং অরুণাচল প্রদেশে শীতকালীন বৃষ্টিপাত হয়।

পশ্চিমা গোলযোগে আমরা অন্তর্ধৃতি সীমান্তের প্রভাব দেখতে পাই। এতে শীতল ও উষ্ণ সীমান্ত দুটি দুর্বল থাকে। উষ্ণ সীমান্ত বরাবর ঝিরঝিরে ও হালকা বৃষ্টি হয় এবং তারপরে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই আবহাওয়া পরিষ্কার হয়ে যায়।

কিন্তু তারপরেই শীতল সীমান্ত বরাবর বজ্র-বিদ্যুৎসহ ভারী বর্ষণ হতে থাকে। অতঃপর উষ্ণতামান অনেকটাই কমে যায় এবং সংলগ্ন এলাকাগুলি পেছনের শীতল তরঙ্গের প্রভাবে আসে। পশ্চিমা গোলযোগের প্রভাবে সকালের দিকে দীর্ঘ সময় ধরে ভূমি-কুয়াশা বিরাজ করে এবং দৃষ্টিস্বচ্ছতা যথেষ্ট কমে যায়। অবশ্য উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম ভারতে এর ফলে শীতকালে যে বৃষ্টিপাত এবং পাহাড়ী এলাকায় তুষারপাত হয়, তাতে গম চাষের সুবিধা হয়।

2.4 প্রাকৃতিক চক্রসমূহ

পৃথিবীতে বিভিন্ন প্রাকৃতিক চক্র (natural cycles) চিহ্নিত করা সম্ভব। এই চক্রগুলি শিলামণ্ডল, বায়ুমণ্ডল ও জীবমণ্ডলের সাম্য বজায় রাখার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এগুলির মধ্যে মাত্র কয়েকটি চিত্তাকর্ষক চক্র হল :

(ক) উদক চক্র (Hydrologic cycle)

(খ) ভূ-তাত্ত্বিক চক্র বা ভূ-চক্র (Geologic cycle or Earth cycle)

(গ) জীব-ভূরাসায়নিক চক্র (Bio-geochemical). উদাহরণ—কার্বন চক্র, নাইট্রোজেন চক্র, অক্সিজেন চক্র, সালফার চক্র, ফসফরাস চক্র ইত্যাদি।

2.4.1. উদক চক্র

পৃথিবীতে স্বাদু জলের যোগানের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করে এবং ভূ-পৃষ্ঠের সজীব প্রজাতিগুলির চাহিদা মেটায়। উদক চক্র সম্পর্কে আমরা 2.2.3. এবং তিন নম্বর পরিচ্ছেদের 3.3.2. তে আলোচনা করেছি। এখন তাই বাকী চক্রগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক।

2.4.2. ভূ-চক্র

হাটন (Hutton)-ই প্রথম ভূ-চক্রের প্রস্তাব রাখেন। পাত সঞ্চরণ (plate tectonic) তত্ত্বের ভিত্তিতে এবং গুরুমণ্ডলের পরিচলন মডেল (mantle convention model)-এর বিকাশের ফলে যুক্তি দেখান হয় যে ভূ-পৃষ্ঠে এবং ভূ-অভ্যন্তরস্থ প্রক্রিয়াগুলি ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত। পৃথিবীকে একটি অতিকায় যন্ত্র হিসেবে ভাবলে দেখা যাবে যে যতই আভ্যন্তরীণ তাপ ক্রমশঃ কমতে থাকে ততই তার শিলামণ্ডলের সৃষ্টি ও ধ্বংস সাধন হয়ে থাকে। পাতগুলির অন্তর্ক্রিয়ার ফলে পৃথিবীর কোন অংশের উত্থান ঘটে, আবার কোন কোন এলাকা অবনমিত হয়।

পৃথিবীর উৎপত্তির সময় থেকেই আবহবিকার ও ক্ষয়ীভবনের বিভিন্ন মাধ্যমগুলি ভূ-পৃষ্ঠের ওপর নিরন্তর কাজ করতে থাকে। এই মাধ্যমগুলি সক্রিয়ভাবে ভূমিভাগের নগ্নীভবন (denudation) ঘটায় এবং উৎপন্ন পলিগুলিকে বহন করে নিয়ে গিয়ে মহাদেশগুলির প্রান্তবর্তী সমুদ্রে জমা করতে থাকে। এই সমুদ্রগুলি পাতের সন্নিহিত নিচু এলাকা, যেগুলি গঠনগতভাবে দুর্বল। এগুলিকে ভূ-অধোভঙ্গ বা জিওসিনক্লাইন (geosyncline) বলা হয়, যেমন টেথিস (tethys)।

এইসব নিম্নগামী অঞ্চলগুলিতে (subducted zones) প্রচুর পরিমাণে পলির সঞ্চয় হতে থাকে। প্রোথিত পলিকণাগুলি রূপান্তরিত হয়ে শক্ত পাললিক শিলায় পরিণত হলে প্রচণ্ড চাপের সৃষ্টি হয় এবং তার ফলে পাতগুলি চলতে আরম্ভ করে। এর ফলে পাললিক শিলায় ভাঁজের সৃষ্টি হয় এবং তার থেকেই উঁচু পর্বতগুলির সৃষ্টি হয়েছে। বোঝা যায় যে, ভূ-তাত্ত্বিক অতীতে সকল পর্বতই ভূগঠনের ফলে সুউচ্চ ছিল। পরবর্তীকালে তাদের ওপর আবহবিকার, ক্ষয়, নগ্নীভবন ইত্যাদির ফলে সেগুলি ছোট হয় এবং পলিগুলি অবনমিত এলাকায় জমা হয়। এইভাবে ভূ-প্রকৃতি চক্রাকারে পরিবর্তিত হতে থাকে। পলিকণা যে শিলামণ্ডলীয় পাতের সাথে স্থানান্তরিত হয় তাও আবার গুরুমণ্ডলের তাপজনিত স্থিতিশক্তির সঙ্গে জড়িত।

শিলা চক্র : শিলা চক্র ভূ-চক্রেরই একটি অঙ্গ এবং এটি শিলামণ্ডলের বিভিন্ন শিলাগুলির উৎপত্তি বিষয়ে ধারণা দেয়। এক ধরনের শিলা থেকে পর্যায়ক্রমে অন্য শিলায় রূপান্তরের ঘটনাকে শিলা চক্র (rock cycle) বলে। ভূ-গর্ভ থেকে

বেরিয়ে আসা ম্যাগমা বা গলিত লাভা শীতল হবার ফলে ভূ-ত্বকে প্রাথমিকভাবে আগ্নেয় বা প্রাথমিক শিলার সূচনা হয়। এই আগ্নেয় শিলাগুলি ভূ-পৃষ্ঠে উন্মুক্ত হলে দীর্ঘ সময়ের জন্য তা আবহবিকার ও ক্ষয়ীভবনের শিকার হয়। এর ফলে প্রচুর পরিমাণে পলির উদ্ভব হয় এবং সেগুলি নদী, বাতাস ইত্যাদির দ্বারা বাহিত হয়ে অগভীর সমুদ্র বা হ্রদে গিয়ে জমা হয়। এই সঞ্চিত পলিরাশি সংযুক্ত ও সংঘবদ্ধ হয়ে পাললিক শিলার জন্ম দেয়। অবশ্য এটাও মনে রাখা দরকার যে এই পাললিক শিলাগুলিও পরবর্তীকালে ক্ষয়ের ফলে পলিরাশির সৃষ্টি করে এবং তা থেকেও একইভাবে পাললিক শিলার উদ্ভব হয়। আবার আগ্নেয় এবং পাললিক শিলাগুলি প্রচণ্ড চাপ ও তাপের প্রভাবে রূপান্তরিত শিলায় পরিণত হতে পারে। পর্বত গঠনকারী (orogenic) ভূ-আন্দোলনের ফলে প্রবল চাপ ও পীড়নের সৃষ্টি হয়। আগ্নেয় (volcanic) গঠন সংক্রান্ত ভূ-আন্দোলনে উচ্চ-তাপের সৃষ্টি হয়। রূপান্তরিত শিলাগুলি আবার ভূ-গর্ভের দিকে অনুপ্রবিষ্ট হলে সেখানকার উচ্চ তাপের প্রভাবে গলে যায়। এই গলনের ফলে ম্যাগমার সৃষ্টি হয়, যা আবার ঠাণ্ডা হয়ে আগ্নেয় শিলায় রূপান্তরিত হয়। এই পদ্ধতির পুনরাবৃত্তির ফলে চক্রটি সম্পূর্ণ হয়। যেহেতু এটি ভূ-তাত্ত্বিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে সম্পর্কিত, তাই একে ভূ-তাত্ত্বিক চক্রও বলা হয়।

2.4.3. জীব-ভূ-রাসায়নিক চক্রসমূহ

সকল সজীব প্রজাতিই পদার্থ দিয়ে গড়া এবং সকল জীবের জীবন ধারণ ও বৃদ্ধির জন্য মোটামুটি 40টি রাসায়নিক পদার্থের প্রয়োজন হয়। এদের মধ্যে যে পদার্থগুলির বেশী প্রয়োজন হয় সেগুলিকে অতিপুষ্টি পদার্থ (macronutrients), এবং যেগুলি খুব কম পরিমাণে কাজে লাগে সেগুলিকে অণুপুষ্টি পদার্থ (micronutrients) বলা হয়। অতিপুষ্টি পদার্থগুলিকে দুটি দলে ভাগ করা যায়—(ক) যে পুষ্টি পদার্থগুলি শুষ্ক জৈব ভরের 1 শতাংশের বেশী থাকে, যেমন কার্বন, অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন এবং ফসফরাস; এবং (খ) যে পুষ্টিপদার্থগুলি শুষ্ক জৈবভরের 0.2 থেকে 1 শতাংশের মধ্যে থাকে, যেমন সালফার, ক্লোরিন, পটাশিয়াম, সোডিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, লোহা এবং তামা। অণুপুষ্টিপদার্থগুলি সাধারণতঃ শুষ্ক জৈব ভরের 0.2 শতাংশের নীচে থাকে। কিন্তু অনেক অণুপুষ্টি পদার্থ আবার সকল প্রজাতির মধ্যে উপস্থিত নাও থাকতে পারে, যেমন হল-অ্যালুমিনিয়াম, বোরোন, ব্রোমিন, ক্রোমিয়াম, কোবাল্ট, ফ্লুওরিন, গ্যালিয়াম, আয়োডিন, ম্যাঙ্গানিজ, মলিবডেনাম, সেলেনিয়াম, সিলিকন, ষ্ট্রনটিয়াম, টিন, টাইটানিয়াম, ভ্যানাডিয়াম এবং জিঙ্ক। বাস্তুতন্ত্রে পুষ্টি-পদার্থের প্রবাহ চক্রাকার এবং একটি ভোজন স্তর থেকে অন্যটিতে স্থানান্তরিত হয় এবং পরিশেষে বাস্তুতন্ত্রে নির্গত হয়ে পুনরায় ব্যবহৃত হতে থাকে। এই ধরনের রাসায়নিক পদার্থের চক্র জীব এবং তাদের ভৌগোলিক পরিবেশকে (বায়ুমণ্ডল বা শিলামণ্ডল) কাজে লাগায়। এইজন্য এই চক্রকে জীব-ভূ-রাসায়নিক চক্র আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

জীব-ভূ-রাসায়নিক চক্রগুলি দু'রকমের—(ক) গ্যাসীয় চক্র, এবং (খ) পাললিক চক্র। গ্যাসীয় চক্র দেখা যায় যেখানে বায়ুমণ্ডল পদার্থগুলির একটি প্রধান আধার হিসেবে কাজ করে এবং পদার্থগুলি গ্যাসীয় অবস্থায় থাকে। কার্বন, নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন চক্র গ্যাসীয় জীব-ভূ-রাসায়নিক চক্রের উদাহরণ। অন্যদিকে, পাললিক চক্রে শিলামণ্ডলের পাললিক পদার্থগুলি প্রধান আধার হিসাবে কাজ করে এবং পদার্থগুলি আবহবিকারের ফলে উন্মুক্ত হয়। বিভিন্ন পাললিক চক্রগুলির মধ্যে সালফার ও ফসফরাস চক্র জীবমণ্ডলে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

2.4.3.1. কার্বন চক্র

বিকিরিত শক্তি রাসায়নিক শক্তিতে (কার্বহাইড্রেট) পরিণত হবার জন্য কার্বন চক্রের অবদান যথেষ্ট। এই কাজটি সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় সবুজ গাছপালার মধ্যে ঘটে। এই প্রক্রিয়ায় বায়ুমণ্ডল থেকে গাছগুলিতে কার্বন ডাইঅক্সাইড গৃহীত হয়। এখানে বায়ুমণ্ডলকে কার্বন ডাইঅক্সাইডের গুদাম ঘর হিসেবে ভাবা যেতে পারে। বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাইঅক্সাইড বিভিন্নভাবে নির্গত হতে পারে, যেমন উদ্ভিদ ও প্রাণীদের শ্বসনের ফলে এবং জীবাশ্ম জ্বালানীর দহনের ফলে। উদ্ভিদ ও প্রাণীদের শ্বসনের ফলে প্রায় 6000 কোটি টন কার্বন ডাইঅক্সাইড বায়ুমণ্ডলে এসে পড়ে। কিন্তু তা সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় পুরোপুরি

উদ্ভিদগুলির দ্বারা শোষিত হয়। জীবাশ্ম শিলাগুলিতে বিপুল পরিমাণ (4 লক্ষ কোটি টন) কার্বন জমা হয়ে আছে। জীবাশ্ম জ্বালানীর দহনের ফলে প্রতি বছর প্রায় 600 কোটি টন কার্বন ডাইঅক্সাইড বায়ুমণ্ডলে এসে মিশেছে। বায়ুমণ্ডলের মাত্র 0.035 শতাংশ আয়তন কার্বন ডাইঅক্সাইড নিয়ে গঠিত, কিন্তু মোট ভরের দিক থেকে এর পরিমাণ প্রায় 2300 কোটি টনের কাছাকাছি। অনুজীবেরা যখন কিছু কার্বন-যৌগের বিয়োজন ঘটায়, তখনও কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস বায়ুমণ্ডলে নির্গত হতে পারে।

কার্বন ডাইঅক্সাইডের নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে মহাসাগরগুলির ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ। মহাসাগরগুলিকে কার্বন ডাইঅক্সাইডের সর্ববৃহৎ আধার হিসাবে ভাবা হয়, কারণ এখানে প্রায় 13 লক্ষ কোটি টন বা বায়ুমণ্ডলের চেয়ে 50 গুণ বেশী কার্বন ডাইঅক্সাইড জমা হয়ে আছে। প্রতি বছর 20 হাজার কোটি টন কার্বন ডাইঅক্সাইড বায়ুমণ্ডল ও মহাসাগরগুলির মধ্যে বিনিময় হয়। মহাসাগর জলে কার্বন ডাইঅক্সাইড দ্রবীভূত হয়ে কার্বনিক অ্যাসিড (carbonic acid) তৈরি করে, যা কার্বনেটগুলিকে বাই-কার্বনেট (bicarbonate)-এ পরিণত করে। এই বাইকার্বনেটগুলি সালোকসংশ্লেষের সময় বিযুক্ত হয়ে কার্বনেট হিসাবে অধঃক্ষিপ্ত হয়। শিলামণ্ডলের কার্বনেট-শিলাগুলিতেও কিছু পরিমাণে কার্বন ডাইঅক্সাইড রয়েছে, যার পরিমাণ মাত্র 10 কোটি টন। আবহবিকার প্রক্রিয়ায় এই পরিমাণ কার্বন ডাইঅক্সাইড শিলাগুলিতে শোষিত হয়।

বাতাসে কার্বন ডাইঅক্সাইড
জল
উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষ
অক্সিজেন
উদ্ভিদের জৈব পদার্থে কার্বন (শর্করা ইত্যাদি)
প্রানীর দেহে জৈব যৌগের আকারে কার্বন
উদ্ভিদ ও অন্যান্য জীবজন্তুর শ্বসন, জ্বালানীর দহন, জৈব বস্তুর পচন ইত্যাদিতে নিঃসৃত কার্বন ডাইঅক্সাইড
মহাসাগর সমুদ্র, হ্রদ, নদী ইত্যাদি জলাশয়ে দ্রবীভূত কার্বন ডাইঅক্সাইড

চিত্র 2.3. কার্বন চক্র

নীচের সারণীতে দেখা যাবে যে বিভিন্ন উৎস থেকে বায়ুমণ্ডলের স্বাভাবিকভাবে অর্জিত কার্বন ডাইঅক্সাইড প্রাকৃতিক নিয়মেই বর্জিত হয়, এবং সমতা বজায় থাকে। কিন্তু মানুষের কাজের ফলে যে জীবাশ্ম জ্বালানীর দহন ও মৃত্তিকার কর্ষনের জন্য কার্বন ডাইঅক্সাইডের উৎপত্তি ও বায়ুমণ্ডলে তার নির্গমন ঘটে, তার সমতা বজায় রাখার বিশেষ কোন ব্যবস্থা নেই।

বায়ুমণ্ডলের অর্জন (শত কোটি টনে)	পদ্ধতি সমূহ
2	মৃত্তিকা কর্ষনের ফলে উদ্ভূত
6	জীবাশ্ম জ্বালানীর দহন
0.1	উষ্ণ প্রস্রবণ ও আগ্নেয়গিরির নির্গমন
60	(নিঃ) শ্বসন ও জৈব বিয়োজন
100	মহাসাগরগুলি থেকে নির্গমন

বায়ুমণ্ডল থেকে বর্জন (শত কোটি টনে)	পদ্ধতিসমূহ
0.1	শিলার আবহবিকার
60	উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষ
100	মহাসাগরগুলি দ্বারা শোষণ

কাজেই বায়ুমণ্ডলের নীট কার্বন ডাইঅক্সাইড অর্জনের পরিমাণ প্রায় 800 কোটি টন (600 কোটি টন জীবাশ্ম জ্বালানীর দহন থেকে এবং 200 কোটি টন ভূমি/মৃত্তিকা কর্ষনের ফলে)। এর ফলে বায়ুমণ্ডলের কার্বন ডাইঅক্সাইডের সমতা নষ্ট হয়, যা গ্রীনহাউস প্রভাব এবং বিশ্বের তাপমান বৃদ্ধি, তৎসহ জলবায়ুর পরিবর্তনের জন্য দায়ী।

2.4.3.2. নাইট্রোজেন চক্র

কার্বন চক্রের সঙ্গে নাইট্রোজেন চক্রের মোটামুটি মিল রয়েছে, কেবল কয়েকটি দিক থেকে কিছু পার্থক্য দেখা যায়। নাইট্রোজেন চক্র কার্বন চক্রের তুলনায় বেশ জটিল। নাইট্রোজেন প্রোটিন এবং নিউক্লিক অ্যাসিডের (nucleic acids) উৎস, এবং সেজন্য ইহা জীবনের পক্ষে অপরিহার্য। বায়ুমণ্ডল মুক্ত নাইট্রোজেনের আধার এবং আয়তনের দিক থেকে তা বায়ুমণ্ডলের প্রায় শতকরা 78 ভাগ দখল করেছে। বিভিন্ন যৌগের আকারে নাইট্রোজেন জীবদেহ এবং মৃত্তিকার মধ্যে অবস্থান করে। কিন্তু মুক্ত নাইট্রোজেন জীবেরা সরাসরি ব্যবহার করতে পারে না। অবশ্য কিছু ব্যাক্টেরিয়া ও নীল সবুজ শৈবাল (blue green algae) এর ব্যতিক্রম।

আগেই বলা হয়েছে নাইট্রোজেন চক্র কিছুটা জটিল। বায়ুমণ্ডলের মুক্ত গ্যাসীয় নাইট্রোজেন বিভিন্ন পর্যায়ে অ্যামোনিয়ায় (NH_3) পরিনত হয় বা জারিত হয়ে নাইট্রেটে (NO_3) পরিনত হয়। কিছু নাইট্রোজেন-প্রতিস্থাপনকারী (fixing) ব্যাক্টেরিয়া ও নীল সবুজ শৈবাল গ্যাসীয় নাইট্রোজেনকে জৈব যৌগে এবং পরিশেষে জলে দ্রাব্য নাইট্রেটে পরিণত করতে পারে। উদ্ভিদ অ্যামাইনো অ্যাসিড (amaino acids) ও প্রোটিন সংশ্লেষের জন্য নাইট্রেট ব্যবহার করে। উদ্ভিদ-প্রোটিন শাকাশীরা গ্রহণ করে এবং তাদের কলায় পরিণত করে। যখন উদ্ভিদ ও প্রাণীরা মারা যায় বা তাদের বর্জ্য-পদার্থ বিভিন্ন অনুজীবের দ্বারা বিয়োজিত হয়, তখন নাইট্রোজেন আবার বায়ুমণ্ডলে নির্গত হয়। কাজেই নাইট্রোজেন চক্রের বিভিন্ন পর্যায়গুলি হল : মুক্ত নাইট্রোজেনের প্রতিস্থাপন→অ্যামোনিফিকেশান→নাইট্রিফিকেশান→ডি-নাইট্রিফিকেশান→গ্যাসীয় নাইট্রোজেনের মুক্তি।

নাইট্রোজেন প্রতিস্থাপন দু'ভাবে হতে পারে—(ক) অজৈব বা বৈদ্যুতিক পদ্ধতিতে, এবং (খ) জৈব পদ্ধতিতে। পূর্বোক্ত পদ্ধতিতে নাইট্রেট উৎপাদনের জন্য বজ্রপাতের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। দ্বিতীয় পদ্ধতিতে নীল সবুজ শৈবাল, যেমন

অ্যানাবীনা (*Anabaena*), নস্টক (*Nostoc*) এবং অসিলেটোরিয়া (*Oscillatoria*) নাইট্রোজেন প্রতিস্থাপনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। বিভিন্ন মুক্ত-বাসী ব্যাক্টেরিয়া অ-মিথোজীবী বা মিথোজীবী (non-symbiotically or symbiotically) অবস্থায় নাইট্রোজেন প্রতিস্থাপন করতে পারে। অ-মিথোজীবী এই ধরনের ব্যাক্টেরিয়ার মধ্যে ক্লসট্রিডিয়াম (*Clostridium*), অ্যাজোটোব্যাক্টর (*Azotobacter*) এবং ডারক্সিয়া (*Derxia*) প্রধান। শিম্বগোত্রীয়/গুটিমূলযুক্ত (leguminous) উদ্ভিদের, যেমন মটর মূলে বাসকারী মিথোজীবী ব্যাক্টেরিয়া রাইজোবিয়াম (Rhizobium) বায়ুমণ্ডলের নাইট্রোজেন সরাসরি প্রতিস্থাপনে সক্ষম।

মৃত উদ্ভিদ ও প্রাণীর জৈব দেহাবশেষের নাইট্রোজেন অ্যামোনিয়া ও অ্যামাইনো অ্যাসিডে পরিণত হবার পদ্ধতিকে অ্যামোনিফিকেশান বলে। নাইট্রিফিকেশান পদ্ধতিতে অ্যামোনিয়া প্রথমে কতকগুলি অনুজীব, যেমন নাইট্রোসোমোনাস (*Nitrosomonas*), নাইট্রোস্পিরা (*Nitrospira*), নাইট্রোসোগ্লিয়া (*Nitrosogloea*) এবং নাইট্রোকক্কাস (*Nitrococcus*)-এর দ্বারা নাইট্রাইট-এ পরিণত হয়। নাইট্রাইট বেশীরভাগ ক্ষেত্রে নাইট্রোব্যাক্টর (*Nitrobacter*) ও নাইট্রোসিসটিস (*Nitrocystis*)-এর দ্বারা নাইট্রেটে পরিণত হয়।

বাতাসে নাইট্রোজেন

বাতাসের মুক্ত নাইট্রোজেন ভৌতিক, রাসায়নিক এবং জৈবিক প্রক্রিয়ায় মৃত্তিকায় সংযুক্তি

উদ্ভিদের জৈব পদার্থে নাইট্রোজেন

প্রাণীদেহে জৈব সংযুক্তি হিসাবে নাইট্রোজেন

উদ্ভিদ ও অন্যান্য জীবের ক্ষয়, পচন এবং নাইট্রিফিকেশান বিক্রিয়ায় অ্যামোনিয়া ও নাইট্রাইটে এবং সবশেষে নাইট্রেটে রূপান্তর

ডিনাইট্রিফিকেশান বিক্রিয়ায় নাইট্রেটের নাইট্রাইট ও অ্যামোনিয়া হবার পর অবশেষে মৃত্তিকায় মুক্ত নাইট্রোজেনের প্রত্যাবর্তন
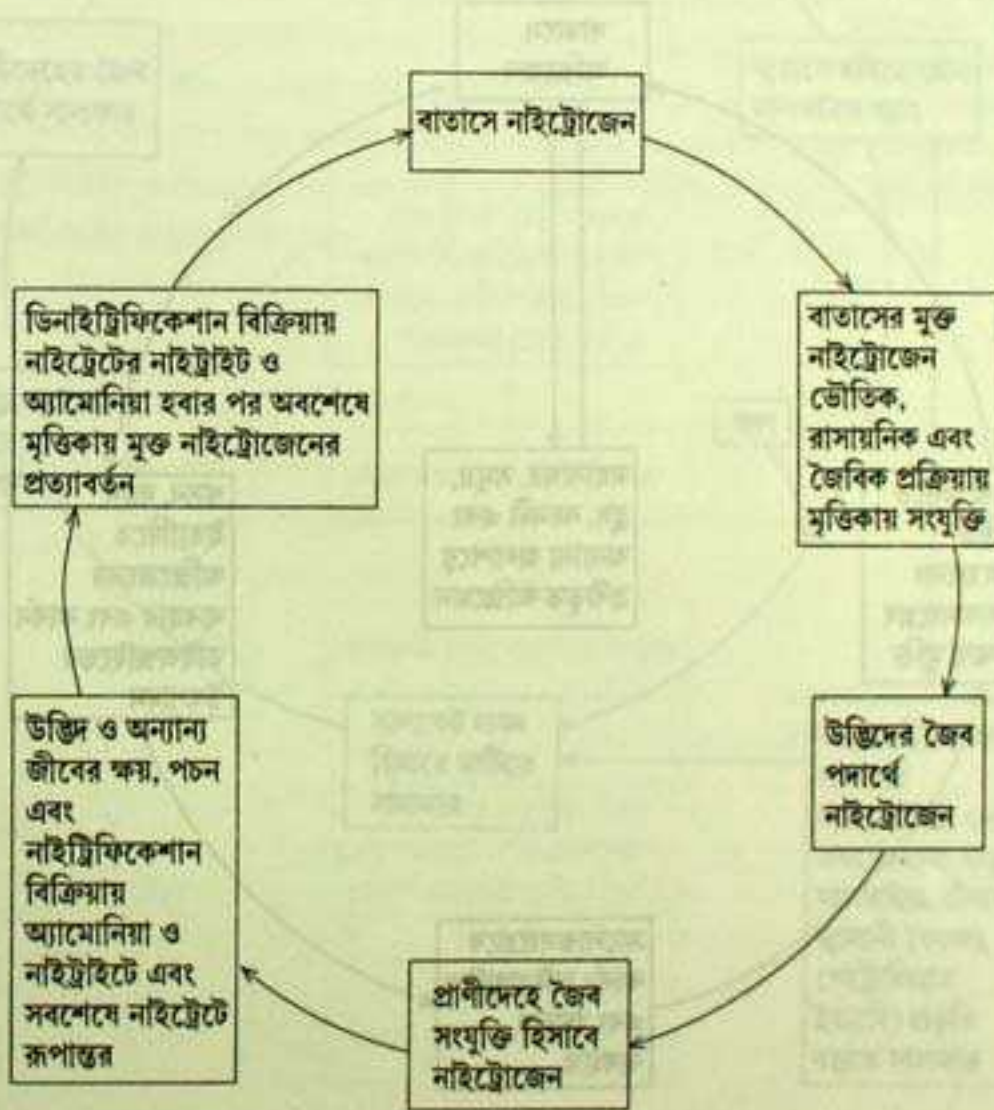
চিত্র 2.4. নাইট্রোজেন চক্র

ডি-নাইট্রিফিকেশান পদ্ধতিতে অ্যামোনিয়া ও নাইট্রোজেনের অক্সাইডগুলি বিভিন্ন ব্যাক্টেরিয়ার সাহায্যে, যেমন ব্যাসিলিয়াম সিরিয়াস *(Bacillium cereus)*, বি. লাইকেনিফরমিস *(B. licheniformis)* এবং পি. ডিনাইট্রিফিকানস *(P. denitrificans)* পুনরায় নাইট্রোজেনে পরিণত হয়। এই গ্যাসীয় নাইট্রোজেন বায়ুমণ্ডলে ফিরে যায় এবং চক্রটি সম্পূর্ণ হয়।

2.4.3.3. অক্সিজেন চক্র

অক্সিজেন চক্রটি তুলনামূলকভাবে সরল। আয়তন অনুসারে বায়ুমণ্ডলের শতকরা 21 ভাগ অক্সিজেন নিয়ে গঠিত। যৌগের আকারে অক্সিজেন জল ও শিলার মধ্যেও উপস্থিত রয়েছে। প্রাণীদের প্রশ্বাসের জন্য মুক্ত অক্সিজেন অপরিহার্য এবং একান্তভাবে প্রয়োজনীয়, পক্ষান্তরে জলস্থ প্রাণীরা তাদের বেঁচে থাকার জন্য জলে দ্রবীভূত অক্সিজেন গ্রহণ করে। সবুজ গাছপালা সালোকসংশ্লেষ পদ্ধতিতে কার্বন ডাইঅক্সাইডের আত্তীকরণ ঘটায় এবং বায়ুমণ্ডলে উদ্ভিদের জল থেকে অক্সিজেন নির্গত করে। তাই বায়ু প্রাণীদের বাসযোগ্য হয়ে ওঠে। উদ্ভিদ ও প্রাণীরা শ্বাসকার্য চালাবার জন্য অক্সিজেন গ্রহণ করে এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড ত্যাগ করে। কিন্তু সবুজ উদ্ভিদ যে পরিমাণ কার্বন ডাইঅক্সাইড সালোকসংশ্লেষের কাজে ব্যবহার করে তাতে এর সমতা বজায় থাকে।
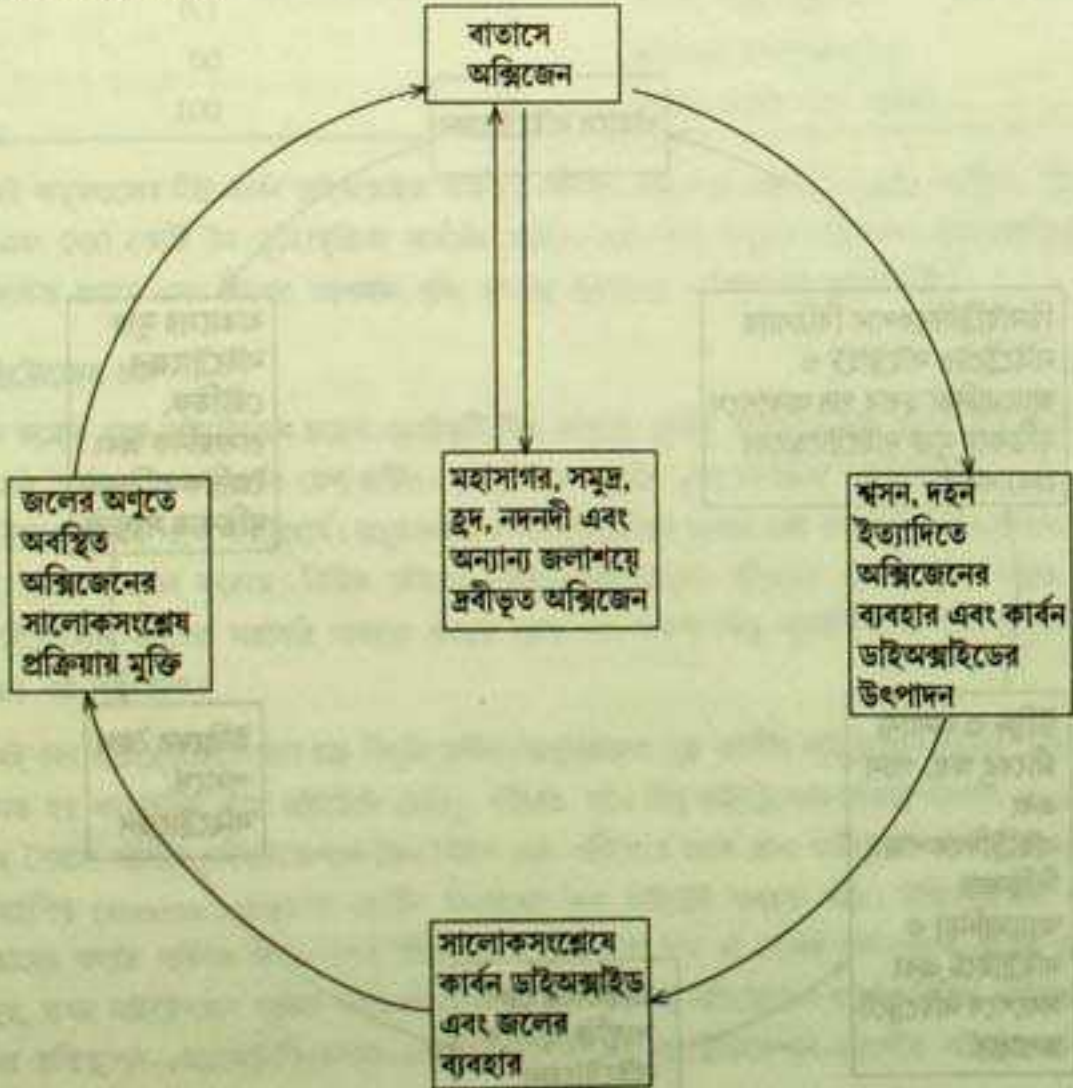
চিত্র 2.5. অক্সিজেন চক্র

2.4.3.4. সালফার চক্র

সালফার, বায়ুমণ্ডলে সালফার ডাইঅক্সাইড ও হাইড্রোজেন সালফাইডের আকারে পাওয়া যায়। তবে এই দশাগুলি বিশেষ স্থায়ী নয়। সালফার বেশীরভাগ ক্ষেত্রে জৈব পদার্থ থেকে পাওয়া যায়, বিশেষতঃ যখন জৈব পদার্থের বিয়োজন ও খনিজকরণ (mineralization) হয়, তখন অজৈব সালফেট-এর সৃষ্টি হয়। সজীব বা মৃত জৈব পদার্থের দহনের ফলেও বায়ুমণ্ডলে সালফার ডাইঅক্সাইড নির্গত হতে পারে। তবে সালফারের গুরুত্বপূর্ণ জৈব উৎস হিসেবে অজৈব সালফেট-এর ভূমিকাই প্রধান। জৈব পদ্ধতিতে গঠিত সালফাহাইড্রিল সালফার (–SH) ব্যাক্টেরিয়া ও ছত্রাক [যেমন অ্যাসপারজিলাস

উদ্ভিদ ও প্রাণীদেহের ক্ষয় ও পচন এবং হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাসের সৃষ্টি

বাতাসে হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাস

জল

আগ্নেয়গিরির লাভা, সালফার ডাইঅক্সাইড, লোহা এবং অন্যান্য ধাতুর সালফাইড, জীবাশ্ম জ্বালানী (কয়লা, পেট্রোলিয়াম ইত্যাদি) প্রভৃতি বস্তুতে সালফার

সালফেট লবন হিসাবে মাটিতে সালফার

উদ্ভিদের জৈব পদার্থে সালফার

প্রাণীদেহের জৈব পদার্থে সালফার
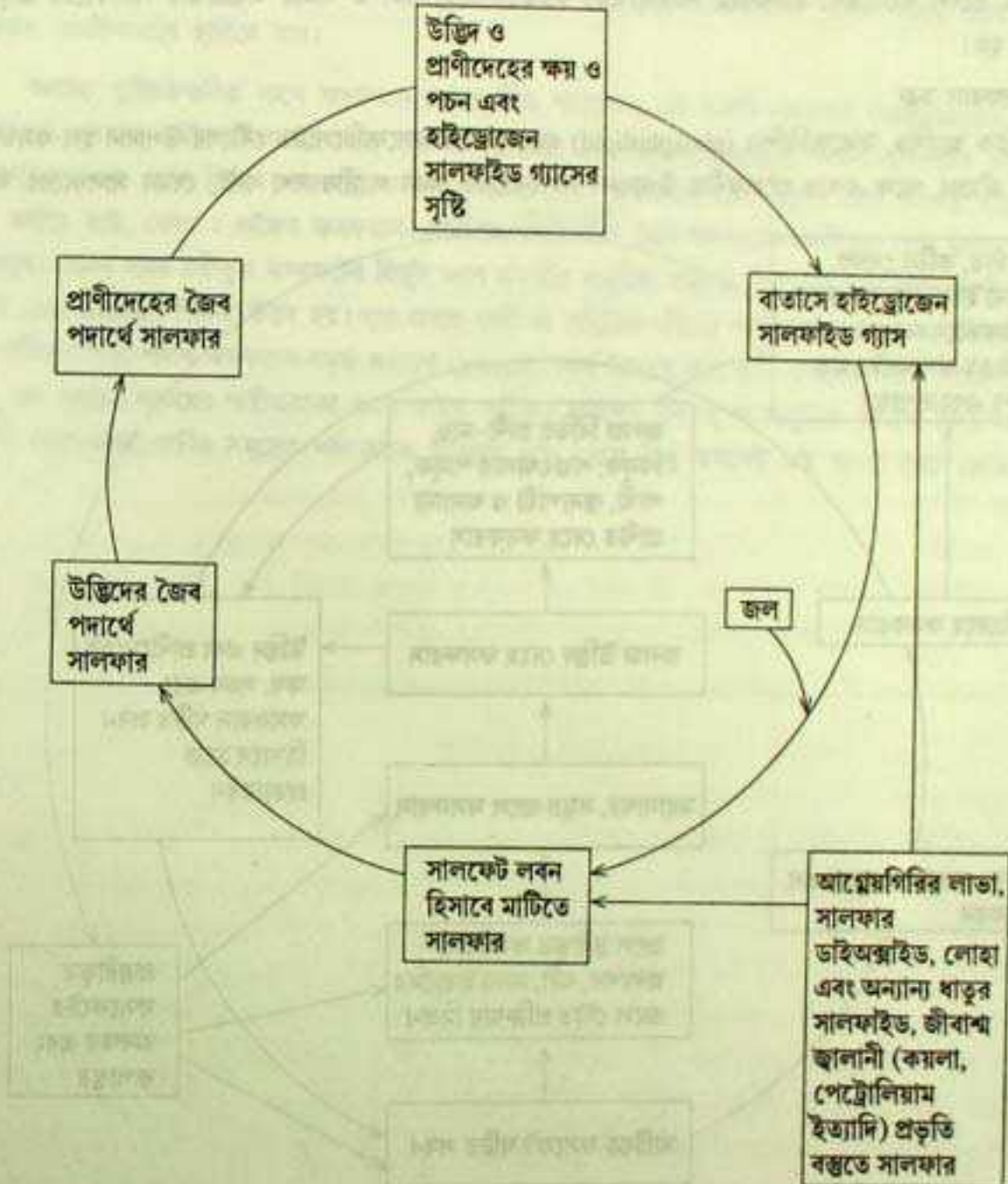
চিত্র 2.6. সালফার চক্র

(Aspergillus), নিউরোসপোরা *(Neurospora)*]-এর দ্বারা খনিজায়িত হয়। অবার্ত অবস্থায় এদের কিছুটা, বিভিন্ন ব্যাক্টেরিয়া যেমন ঈসচেরিসিয়া *(Escherichia)* এবং প্রোটিয়াস *(Proteus)*-এর দ্বারা হাইড্রোজেন সালফাইডসহ বিভিন্ন সালফাইডে বিজারিত হয়। সালফাইড এবং সালফার অজৈব সালফেট-এ রূপান্তরিত হতে পারে। এইভাবে সালফারের পলল-চক্র সম্পূর্ণ হয়। অন্যদিকে অজৈব সালফেটগুলি উদ্ভিদের মূল দ্বারা আত্তীকৃত হয় এবং কোষীয় জৈব-পদার্থে পরিবাহিত হয়। জৈব-পদার্থের দহনের ফলে সালফার ডাইঅক্সাইড আবার বায়ুমণ্ডলে ফিরে যায়। বায়ুমণ্ডলীয় সালফাইড হাইড্রোজেন সালফাইড-সহ বিভিন্ন সালফাইড থেকে আসে। বৃষ্টির সময় বায়ুমণ্ডলীয় সালফার ডাইঅক্সাইড ও সালফাইড ভূমিতলে পতিত হয়ে মৃত্তিকায় প্রবেশ করে এবং চক্রপ্রবাহে সামিল হয়। এইভাবে বায়ু, জল ও পলির অন্তর্ক্রিয়ায় সালফারের প্রাকৃতিক চক্রটি সম্ভব হয়।

2.4.3.5. ফসফরাস চক্র

নিউক্লিক অ্যাসিড, ফসফোলিপিড (phospholipid) এবং অসংখ্য ফসফোরিলেটেড যৌগের উপাদান হল ফসফরাস। কাজেই এটি জীবের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় উপাদান। ফসফরাসের কোন গ্যাসীয় দশা নেই, যেমন সালফারের আছে।

হাড়, দাঁত, কঠিন খোলা, গুয়ানো ইত্যাদিতে ফসফরাস সাময়িকভাবে অবরুদ্ধ – পরে প্রস্তরীভূত ফসফেটের মত অবক্ষয় এবং রূপান্তর
জলজ বিভিন্ন প্রাণী–মাছ, ঝিনুক, শক্তখোলার শামুক, পাখী, স্তন্যপায়ী ও অন্যান্য প্রাণীর দেহে ফসফরাস
প্রাণীদেহে ফসফরাস
জলজ উদ্ভিদ দেহে ফসফরাস
উদ্ভিদ এবং প্রাণীদেহের ক্ষয়, পচন এবং ফসফরাস ঘটিত লবণ হিসাবে চক্রে প্রত্যাবর্তন
মহাসাগর, সমুদ্র জলে ফসফরাস
উদ্ভিদের দেহে ফসফরাস এর আত্তীকরণ
জলে দ্রবীভূত ফসফরাস– জলাশয়, নদী, নালা ইত্যাদির জলে ধৌত প্রক্রিয়ায় মিশ্রণ
প্রস্তরীভূত ফসফেটের অবক্ষয় এবং রূপান্তর
মাটিতে ফসফেট ঘটিত লবণ
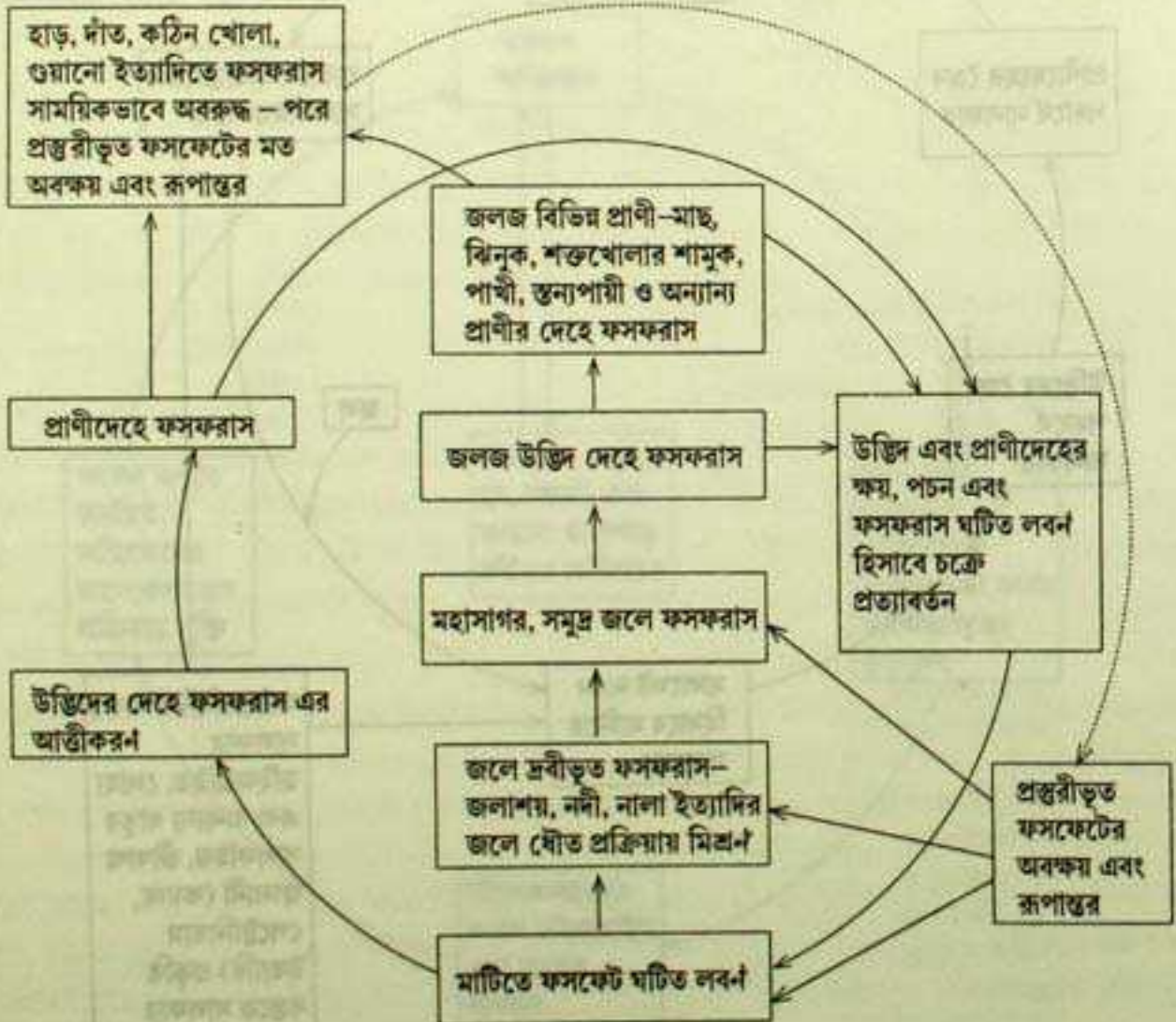
চিত্র 2.7. ফসফরাস চক্র

অনেক সময় অবশ্য ক্ষুদ্র কণার আকারে বায়ুমণ্ডলে একে দেখা যায়। উদ্ভিদ তাদের পুষ্টির জন্য অজৈব ফসফেট গ্রহণ করে, অতঃপর ফসফেট জৈব আকারে খাদক ও বিয়োজকের কাছে স্থানান্তরিত হয়। পরবর্তীকালে বিয়োজনজনিত খনিজায়নের ফলে এটি পুনরায় অজৈব ফসফেট-এ পরিণত হয়। কিছু ফসফেট জলে দ্রবীভূত অবস্থায় পাওয়া যায়।

ভৌত এবং অনেক সময় জৈব প্রক্রিয়ায় ফসফরাস সাময়িকভাবে চক্র থেকে উধাও হয়ে যায়। পলি ও মৃত্তিকায় ফসফরাস অধিশোষিত (adsorbed) হয়। পলিগুলি পরে হ্রদ বা অন্য কোন জলীয় ব্যবস্থায় কেন্দ্রীভূত হয়। প্রাণীদের দাঁত ও হাড়ের গঠনের জন্য ফসফরাসের প্রয়োজন পড়ে। কিন্তু যেহেতু এগুলি আবহবিকারের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন/বাধাদায়ক, তাই আপাতভাবে ফসফরাস চক্র থেকে উধাও হয়। একইভাবে বর্জ্য-পদার্থের নির্গমনের ফলেও চক্রের জৈব অংশ থেকে ফসফরাস সাময়িকভাবে হারিয়ে যায়।

অন্যান্য পুষ্টিচক্রগুলির সাথে ফসফরাস চক্রের মিল থাকলেও, এই চক্রটি বদ্ধদশার (stagnation) জন্য বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। সেজন্য ভৌগোলিক চক্রপ্রবাহ পদ্ধতির (global circulation pattern) বদলে ফসফরাস চক্রটিকে এবং ফসফরাসের সঞ্চয় কোন বিশেষ বাস্তুতন্ত্রে ভালভাবে বোঝা যায়। ফসফরাস চক্র, বিশেষ করে উদকস্থ বাস্তুতন্ত্রে তিনটি স্বতন্ত্র পর্যায়ে ঘটে, যেমন : অজৈব ফসফরাস→দানাদার/কণাজাতীয় জৈব ফসফরাস→দ্রবীভূত জৈব ফসফরাস→অজৈব ফসফরাস। অনেক সময় দ্রবীভূত ফসফেটের কিছুটা অংশ অগভীর সামুদ্রিক পলি হিসেবে জমা হয়। এই পলি দিয়েই ফসফেট জাতীয় (phosphatic) শিলার উদ্ভব হয়। মৃত জলস্থ প্রাণী বা সামুদ্রিক জীবের অবশেষ অনেক সময় জীবাশ্ম হাড়-সঞ্চয় এবং পাখীদের বর্জ্য-পদার্থ ফসফরাস-সমৃদ্ধ গুয়ানো (guano)-সঞ্চয় হিসাবে জমা হয়। ফসফেটজাতীয় শিলা, জীবাশ্ম-হাড়-সঞ্চয় এবং গুয়ানো-সঞ্চয়ের ক্ষয়ীভবনের ফলে আবার দ্রবীভূত ফসফেট উদকস্থ বা সামুদ্রিক ব্যবস্থায় ফিরে আসে। অবশ্য অগভীর সমুদ্র-সঞ্চয় গভীর সমুদ্রের পলি-সঞ্চয় আকারে চলে গেলে কিছু ফসফেট এই ব্যবস্থা থেকে হারিয়ে যায়।

তৃতীয় অধ্যায়

পৃথিবীর ভূমি ও জল সম্পদ

অধ্যায় সূচী

ভূমিকা

সাধারণভাবে ভূমি, জল এবং বায়ু নিয়ে অজৈব পরিবেশ গঠিত। ভূমি শিলামণ্ডলের, জল বারিমণ্ডলের এবং বায়ু বায়ুমণ্ডলের অন্তর্গত। ভূ-পৃষ্ঠের জীবমণ্ডল বা জীব-রাজ্য এই তিন মণ্ডলের মধ্যে ছড়িয়ে রয়েছে। তবে বায়ুমণ্ডলে কোন জীবের স্থায়ী বসবাসের সুযোগ নেই। যেকোন জীব-প্রজাতির প্রাকৃতিক বাসভূমি (habitat) সংশ্লিষ্ট ভূমি, জল এবং বায়ুর সামগ্রিক বৈশিষ্ট্যের ওপর নির্ভরশীল। জীব-প্রজাতিগুলিকে আমরা সচরাচর ভূমির ওপর অথবা জলের মধ্যে দেখি। কাজেই, বাস্তুতন্ত্রগুলিকে (ecosystem) দুটি স্বতন্ত্র শ্রেণীভুক্ত করা যায়, যেমন—(ক) স্থলজ বাস্তুতন্ত্র, ও (খ) উদজ (aquatic) বাস্তুতন্ত্র। অবশ্য, এই দুয়ের অন্তর্বর্তী অপর একটি বাস্তুতন্ত্রের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া সম্ভব। একে বলা হয় জলাভূমির (wetland) বাস্তুতন্ত্র। বায়ুমণ্ডল বিভিন্ন গ্যাস, যেমন নাইট্রোজেন, অক্সিজেন, কার্বন ডাইঅক্সাইড, আরগন এবং জলীয় বাষ্প ও অন্যান্য উপাদানের মিশ্রণে গঠিত। এগুলির প্রভাবে পৃথিবীতে বিশেষ বিশেষ আবহাওয়া ও জলবায়ুর সৃষ্টি হয় এবং জলবায়ুগত পরিবেশ (climatic environment)-এর উৎপত্তি ঘটে। স্থলজ বাস্তুতন্ত্রের বিভিন্ন বায়োমগুলি (biomes) যেমন—তুন্দ্রা, সাভানা, বৃষ্টি-অরণ্য, মরুভূমি ইত্যাদি এই জলবায়ুগত পরিবেশের দ্বারা অনেকাংশে নিয়ন্ত্রিত হয়।

3.1. পৃথিবীর ভূমি সম্পদ

ভূপৃষ্ঠের তিনের-এক ভাগেরও কম (প্রায় 29%) অংশ নিয়ে স্থলভাগ গঠিত। কিন্তু স্থলভাগের পরিবেশ মানুষ এবং অন্যান্য স্থলবাসী জীবের পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভূমির গুণগত মানের ওপর এদের টিঁকে থাকা নির্ভর করে। মানুষের বেশীরভাগ কাজকর্ম, যেমন—কৃষি, খনন, শিল্প প্রভৃতি ভূমিকেন্দ্রীক। এমনকি আদিম মানুষেরাও তাদের খাদ্য-সংগ্রহ ও শিকারের জন্য প্রধানত ভূ-সম্পদের ওপর নির্ভর করত। সভ্যতার অগ্রগতি এবং প্রযুক্তি উদ্ভাবনের মাধ্যমে মানুষ ভূমির ওপর আঘাত হেনেছে। মানুষের প্রয়োজনে অনেক বনাঞ্চল ধ্বংস হয়েছে ; অনেক জীব-প্রজাতি বিলুপ্ত হয়েছে ; এবং বেশীরভাগ সম্পদের যথেষ্ট অবনমন ঘটেছে। পৃথিবীতে জীবনের অস্তিত্ব রক্ষার ক্ষেত্রে আজকের দিনে ভূমির অবনমন একটি সঙ্কটময় বিষয়। বর্তমান বিশ্বে ভূমির অবস্থাসংক্রান্ত কয়েকটি দিক নিচের সারণী থেকে এক নজরে দেখে নেওয়া যেতে পারে। যদিও পৃথিবীতে সামগ্রিকভাবে কর্ষিত জমির পরিমাণ বেশ কম, দক্ষিণ এশিয়ায় (45%) এর শতকরা পরিমাণ খুব বেশী। যুক্তরাজ্য (25%), আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র (21%), জার্মানী (35%), ফ্রান্স (35%) এবং অন্যান্য উন্নত দেশগুলিতে এই হার মাঝারি। আবার সাহারাবর্তী (Sub-Saharan) আফ্রিকা (7%) ও অস্ট্রেলিয়ায় (6%) মোট জমির খুব সামান্য অংশই কৃষিজমি।

সারণী 3.1 : ভূ-পৃষ্ঠে জমি বণ্টনের প্রকৃতি (বিলিয়ন হেক্টর-এ ; 1 বিলিয়ন = 100 কোটি)

মোট জমি	কৃষিযোগ্য জমি	স্থায়ী তৃণভূমি ও পশুচারণ ভূমি	বনাঞ্চল ও বৃক্ষভূমি	অন্যান্য জমি (নিষ্ফলা ও অকৃষিযোগ্য জমি)
13 (100%)	1.44 (11%)	3.66 (26%)	3.89 (30%)	4.31 (33%)

ভূমির পরিসর (spatial) বৈশিষ্ট্যের জন্য মনে করা হয় মোট জমির পরিমাণ স্থির (fixed) এবং অফুরন্ত (inexhaustible), কেননা স্থান (space)-এর সৃষ্টি বা ধ্বংস করা সম্ভব নয়। আবার একভাবে জমি পুনর্নবীকরণযোগ্য, কিন্তু তা যথেষ্ট নয়। তাছাড়াও ভূমি প্রকৃতিরই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, এবং সেজন্য প্রাকৃতিক পরিবেশের উপাদানগুলি, যেমন সৌরকিরণ, বৃষ্টিপাত ইত্যাদি ভূমির ধারণার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

ভূমিতে খাদ্য উৎপাদিত হয়, গড়ে ওঠে আশ্রয়স্থল—এমনকি ভোগ্যপণ্যের যোগানের জন্যও মানুষকে ভূমির ওপর নির্ভর করতে হয়। এই ধারণাটি ভূমিকে ভোগ্যবস্তু হিসেবে চিহ্নিত করেছে, এবং এর মাধ্যমে ভূমির প্রতি মানুষের লোলুপ আচরণের দিকটি প্রকাশ পেয়েছে। মানুষ ভূমিকে প্রাকৃতিক সম্পদ অপেক্ষা ভোগ্যবস্তু হিসেবেই বেশী করে ভেবেছে। তাই প্রাকৃতিক ব্যবস্থাগুলি (natural systems) মানুষের লোভজনিত অত্যধিক ব্যবহারের কারণে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

3.1.1. ভূমির এলাকাভিত্তিক বণ্টন

পৃথিবীতে ভূমির মোট এলাকা ধরা হয় 148,429 হাজার বর্গ কিমি। এই মোট এলাকার মধ্যে 30 শতাংশ (44,579,000 বর্গ কিমি.) এশিয়ার অন্তর্গত, এবং এটিই পৃথিবীর সবচেয়ে বড় এলাকা। এর পরেই রয়েছে আফ্রিকা, যার মোট এলাকার পরিমাণ 30,065,000 বর্গ কিমি.—পৃথিবীর মোট এলাকার 20 শতাংশ। উত্তর আমেরিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, আন্টার্কটিকা ও ইউরোপ পৃথিবীর মোট এলাকার যথাক্রমে 16.3, 8.9, 8.9 ও 6.7 শতাংশ জুড়ে রয়েছে। অস্ট্রেলিয়ার ভূমিভাগের পরিমাণ (7,687,000 বর্গ কিমি. বা 5.7 শতাংশ) পৃথিবীতে সবচেয়ে কম।

3.1.2. ভূ-সংস্থান

আকার, আকৃতি, উচ্চতা ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যের পরিপ্রেক্ষিতে কোন ভূমিভাগকে পর্বত, মালভূমি, ক্ষয়জাত সমভূমি, মরুভূমি, বরফাবৃত উচ্চভূমি, নিম্নভূমি প্রভৃতিরূপে চিহ্নিত করা হয়। ভূমির এইসব বৈশিষ্ট্যগুলি ভূ-সংস্থান-এর (topography) অন্তর্ভুক্ত। ভূ-সাংস্থানিক রূপবৈচিত্র্য বিশেষ বিশেষ পরিবেশ এবং অনুরূপ পরিবেশের পক্ষে অনুকূল প্রাকৃতিক বাসভূমি গড়ে তোলে। সাধারণভাবে দেখা যায় যে, রূঢ় পার্বত্য পরিবেশে অত্যধিক ঠাণ্ডা এবং খাড়া ঢালের জন্য জীব-প্রজাতির বিশেষ সমাবেশ ঘটে না। কিন্তু, ক্রান্তীয় নিম্নভূমিগুলিতে উষ্ণ-আর্দ্র জলবায়ু ও সমতল ভূমি জীবের বিকাশের পক্ষে বিশেষ সহায়ক হয়েছে। পক্ষান্তরে মরুভূমিতে বৃষ্টিপাত কম, এবং জলের অভাবে জীবের বিকাশ সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে। পৃথিবীর মানচিত্রে দেখা যায় যে, প্রায় প্রতিটি মহাদেশেই মালভূমি অঞ্চলের প্রাধান্য রয়েছে। এর কারণ মহাদেশগুলি অতীতে আগ্নেয় শিলা দ্বারা গঠিত হয় এবং পরবর্তীকালে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে মালভূমিতে পরিণত হয়। সাহারা মরুভূমি-এলাকা বাদ দিলে আফ্রিকা মহাদেশের প্রায় পুরোটাই ভূ-প্রকৃতিগতভাবে মালভূমি বা সপাট ভূমি (table land)। এখানকার মরু উপকূল বরাবর সমভূমির সৃষ্টি হয়েছে এবং এখানে ঘন জনবসতি গড়ে উঠেছে। নিরক্ষীয় আফ্রিকার কেন্দ্রীয় এলাকাগুলি ঘন ক্রান্তীয় বৃষ্টি-অরণ্যে আবৃত রয়েছে ; তবে তার মধ্যেও কোথাও কোথাও বিচ্ছিন্নভাবে জনবসতি গড়ে উঠেছে দেখা যায়। এছাড়া ব্রাজিল মালভূমির আমাজন উপত্যকায় বিস্তীর্ণ বৃষ্টি-অরণ্য দেখা যায়। এই বৃষ্টি-অরণ্যগুলি বায়ুমণ্ডলের কার্বন ডাইঅক্সাইড কমাতে এবং অক্সিজেনের পরিমাণ বাড়াতে সাহায্য করে বলে, এদের অপরিসীম গুরুত্ব রয়েছে। ইউরেশিয়া (ইউরোপ + এশিয়া) মহাদেশের নাতিশীতোষ্ণ মালভূমিগুলি শীতকালে রূঢ় শীতল, এবং অপেক্ষাকৃত শুষ্ক গ্রীষ্মকালের জন্য উদ্ভিদ ও অন্যান্য জীব-প্রজাতিগুলির বিকাশকে ব্যাহত করে। এখানে জনঘনত্ব অত্যন্ত কম। মধ্য এশিয়ার পর্বতমালাগুলি যে উচ্চভূমির সৃষ্টি করেছে, সেখানেও পরিবেশ জীবনের পক্ষে সহায়ক নয়। কিন্তু দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার নদীসমভূমিগুলিতে জনসংখ্যা ও জনবসতির বৃদ্ধি মাত্রাতিরিক্তভাবে বেশী। একইভাবে, উত্তর আমেরিকার পূর্ব-মধ্য অংশে হিমকর্দম ও হিমবাহের অবক্ষেপণের ফলে বিস্তীর্ণ নিম্নভূমি তৈরী হয়েছে। কিন্তু এই মহাদেশের পশ্চিম অংশে রয়েছে উচ্চ মালভূমি এবং নবীন ভঙ্গিল পর্বতমালা। যদিও অস্ট্রেলিয়ার মধ্য অংশে একটি প্রায় সমতল মালভূমি অঞ্চল, শুষ্কতা এখানকার জনসংখ্যা বৃদ্ধির পক্ষে অন্তরায় হয়েছে। আন্টার্কটিকা গণ্ডোয়ানা ভূমির অংশবিশেষ এবং একটি বৃহৎ মালভূমি অঞ্চল যেখানে চরম শীতলাবস্থা (উষ্ণতামান সারাবছর হিমাঙ্কের নিচে থাকে) এটিকে শীতল মরুভূমিতে পরিণত করেছে। এজন্যই এখানে জীব-প্রজাতির সংখ্যা খুবই কম।

3.1.3. মৃত্তিকা

ভূ-তলের পাতলা আবরণ মৃত্তিকা জীবজগতের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মৃত্তিকা জল ধরে রাখতে পারে এবং উদ্ভিদ ও অসংখ্য অণুজীবের (microorganisms) বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। বেশীরভাগ উদ্ভিদ তাদের বেঁচে থাকার জন্য মাটি থেকে পুষ্টি-পদার্থ সংগ্রহ করে। কাজেই, পরিবেশগতভাবে মৃত্তিকার যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। শিলার আবহবিকারের ফলে উৎপন্ন রেগোলিথ (regolith)-এর ওপর জলবায়ু, উদ্ভিদ, ভূ-সংস্থান ইত্যাদির অন্তর্ক্রিয়ার জন্য মৃত্তিকার উদ্ভব ঘটে। মৃত্তিকার তিনটি স্বতন্ত্র হরাইজন (horizon) বা অনুভূমিক স্তর দেখা যায়, যথাক্রমে A, B, ও C হরাইজন। এদের মধ্যে সবচেয়ে ওপরের A স্তর থেকে ধৌত-প্রক্রিয়ায় (leaching) পদার্থের অপসারণ, মধ্যবর্তী B স্তরে A স্তর থেকে চুঁইয়ে আসা পদার্থের সঞ্চয়; এবং সবচেয়ে নিচের C স্তরটিতে আদি শিলা (parent rock) দেখা যায়। মৃত্তিকার বৈশিষ্ট্যগুলি, যেমন উর্বরতা মান, বিশেষ ধরনের জলবায়ুগত ও স্বাভাবিক উদ্ভিদ সম্পর্কিত পরিবেশে ধৌত-প্রক্রিয়ায় অপসারিত এবং সঞ্চিত পদার্থের পরিমাণের ওপর নির্ভরশীল।

মৃত্তিকাগুলিকে দুটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। এগুলি হল, পেডলফারস (pedalfers) এবং পেডোক্যালস (pedocals)—যথাক্রমে আর্দ্র ও শুষ্ক-প্রায় অঞ্চলের মৃত্তিকা। পেডলফারগুলির A স্তরের বুনন (texture) হালকা, কিন্তু

কদর্মযুক্ত জৈবমিশ্রণ (clay-humus complex) ও লোহাযুক্ত (ferrugenous) পদার্থের আধিক্য থাকার জন্য B স্তর ভারী হয়। পেডোক্যালগুলির A স্তরে ধৌতকরণ কম হয়, তাই এগুলি খনিজ পুষ্টি-পদার্থ ও ক্ষার সমৃদ্ধ (বিশেষত ক্যালসিয়াম কার্বোনেট) হয়। পডসল (podsol) পেডলফারের এবং চারনোজেম (chernozem) বা কৃষ্ণ-মৃত্তিকা পেডোক্যালস-এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ক্রান্তীয় জলবায়ুতে ক্রমাগত শুষ্ক ও আর্দ্র ঋতুর সমাবেশে ল্যাটেরাইটের উৎপত্তি ঘটে। পাললিক মৃত্তিকা নদী, বাতাস, সমুদ্রতরঙ্গ ও হিমবাহের ক্ষয়জাত পদার্থের পরিবহণ ও সঞ্চয়ের ফলে গড়ে ওঠে, তাই একে অপসারিত (transported) মৃত্তিকাও বলা হয়। যেখানে পলির সঞ্চয় হয়, সেখানে এই মৃত্তিকায় পরিষ্কারভাবে স্তরতল দেখা যায়।

সকল কৃষিকাজের জন্য মৃত্তিকার উর্বরতামান বিশেষ ভূমিকা পালন করে, কাজেই জমির গুণগতমান মৃত্তিকার উর্বরতামানের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। কিন্তু অত্যধিক ব্যবহার ও অবিবেচনাপ্রসূত কৃষিপদ্ধতি অবলম্বনের জন্য মৃত্তিকার মানের অবনমন ঘটে। প্রতিবছর শত শত কোটি টন উপরি-মৃত্তিকার (top soil) ক্ষয়/অপসারণ টেকসই (sustainable) ধারণক্ষম কৃষিকাজের পক্ষে গভীর ভাবনার বিষয়।

3.1.4. ভূমির গুণগতমান

ভূমির গুণগতমান পরিবেশের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক। বিগত কয়েক দশকে জনসংখ্যার বিস্ফোরণ ভূমির ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। আগেই বলা হয়েছে, ভূমি একটি স্থির সম্পদ, তাই জনসংখ্যার মাত্রাতিরিক্ত চাপ প্রান্তিক জমিগুলিতে কৃষিজমির প্রসার ঘটাতে বাধ্য করেছে। যদিও দেখা যাচ্ছে যে পৃথিবীর মোট ভূমিভাগের মাত্র 11 শতাংশ বর্তমানে কৃষির অধীন, তবে দীর্ঘকালীন ভিত্তিতে আর খুব সামান্য বাড়তি জমি কৃষির অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব। উদাহরণস্বরূপ, বাংলাদেশ ও ভারতে মোট এলাকার যথাক্রমে 67 ও 57 শতাংশ কৃষির অধীন। এই দুই দেশে কৃষিজমির আর প্রসার ঘটানো প্রায় অসম্ভব। তাই ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার জন্য খাদ্যের যোগান অব্যাহত রাখতে বিকল্প একমাত্র পন্থা হিসেবে নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও তার সাহায্যে কৃষিতে উৎপাদনশীলতা বাড়ানো দরকার।

3.1.5. ভূমির অবনমন

অত্যধিক ব্যবহারের জন্য টেকসই কৃষিযোগ্য উর্বর ভূমির প্রতিনিয়ত অবনতি ঘটছে। মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন (Human Development Report), 1998-এ প্রকাশ, 1945 খ্রীষ্টাব্দ থেকে অদ্যাবধি প্রায় 200 কোটি হেক্টর সুফলা জমির অবনমন ঘটেছে। এই পরিমাণ ভূমি পৃথিবীর মোট সুফলা জমির প্রায় ছয়ের-এক ভাগ। কাজেই সামগ্রিকভাবে পৃথিবীর মোট জমির বহনক্ষমতা (carrying capacity) যথেষ্ট কমে গেছে। উদ্বেগের কথা এই যে, উৎকৃষ্ট কৃষিযোগ্য জমির হ্রাস উন্নয়নশীল দেশগুলিতেই সবচেয়ে বেশী। পৃথিবীর মোট অবনমিত ভূমির প্রায় অর্ধেক এশিয়ায় এবং অধিক অবনমিত মোট ভূমির প্রায় চারের-এক ভাগ আফ্রিকায় অবস্থিত। বিশ্বের এইসব এলাকাগুলিতে ক্রমবর্ধমান ক্ষুধার্ত মানুষের জন্য খাদ্যের যোগান সুনিশ্চিত করা প্রয়োজন। কারণ এখানে খাদ্যের ঘাটতি এবং দুর্ভিক্ষ দুটি আবৃত্ত ঘটনা। এইসব এলাকায় বিশ্বের মোট দরিদ্রতম মানুষের তিনের-দুই ভাগ বাস করে। অতএব ভূমির অবনমন বিশ্বের মানুষের কাছে অত্যন্ত ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

3.2. ভূমির ব্যবহার

ভূমির মোট পরিমাণ নির্দিষ্ট—এর বৃদ্ধি বা হ্রাস ঘটে না। আবার, ভূমি অফুরন্তও বটে, কেননা সুব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এর পুনঃপুনঃ ব্যবহার করা সম্ভব। মানব সমাজের ক্রমবর্দ্ধমান বিবিধ চাহিদা মেটাতে বিভিন্ন কাজে ভূমির ব্যবহার হয়ে থাকে। তবে দেখা গেছে যে, অতীতে অনেক উন্নত সমাজ ব্যবস্থাও ভূমির অবনমনের কারণে প্রচণ্ডভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এই অবনমন প্রধানত ভূমির অপব্যবহারের ফল। কাজেই কোন দেশের সামগ্রিক বিকাশের জন্য ভূমির বিচক্ষণ ব্যবহার একান্ত জরুরী। ভূমির ব্যবহার সংক্রান্ত পরিকল্পনায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলির গুরুত্ব আবশ্যিক।

(ক) প্রথমত, ভূমি হল কোন জাতির সর্বশেষ সম্পত্তি এবং সকল ধারণায় ও কাজে জমির এলাকা ও সীমানা মোটামুটিভাবে স্থির। অবশ্য জলাজমি বা এই ধরনের কোন ভূমির পুনরুদ্ধারের ফলে সামান্য কিছু এলাকা দেশের ব্যবহারযোগ্য মোট এলাকার সঙ্গে সংযোজিত হতে পারে। কিন্তু বিগত কয়েক বছরের অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে, দীর্ঘকালীন সময়ে এইসব জমি বিশেষ কাজে আসে না। ভূমির যথোপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণ না-হলে মৃত্তিকা-ক্ষয়ের মাধ্যমে ভূমির লোকসান ঘটে।

(খ) দ্বিতীয়ত, ভূমি প্রকৃতিরই অংশবিশেষ। ভূমির সার্বিক ভৌতিক বৈশিষ্ট্য সহজে বা সুবিধামত বদলানো সম্ভব নয়। মানুষের প্রচেষ্টায় ভূমির ঢাল খুব বেশী পাল্টায় না। একভাবে ভূমির এইসব বৈশিষ্ট্যগুলি মোটামুটি স্থায়ী ও অপরিবর্তনীয়। উঁচু এলাকাগুলি উচ্চভূমিরূপে, এবং নিচু এলাকাগুলি নিম্নভূমির আকারে থাকতেই দেখা যায়। অসংখ্য ঢালে বিভক্ত ভূমি, তার এই নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বজায় রাখে। বিস্তীর্ণ এলাকা সমতল করার যেকোন প্রচেষ্টাই তাই অর্থহীন হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু যোগাযোগের পরিকাঠামো গড়ে তুলতে সুড়ঙ্গপথ, ছেদনপথ (cutting) ও রাস্তার পর্যায়ণের মাধ্যমে এরূপ অনেক বাধাই অতিক্রম করা গেছে। তবু এই প্রচেষ্টাগুলি ভূমির ভৌতিক অবস্থার দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়েছে বেশী। কেবল মানুষের প্রচেষ্টাতেই কোন বিস্তীর্ণ ভূমিভাগ সহজেই উৎকৃষ্ট কৃষিজমিতে রূপান্তরিত হবে না। ভূমির ভৌতিক চরিত্র অবশ্যই কতকগুলি নিজস্ব নিয়ম এই পরিবর্তনের পথে খাড়া করবে। ভূমির নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের জন্য বেশীরভাগ ভূমির একটি নির্দিষ্ট স্তরের পর আর উন্নয়ন করা সম্ভব হয় না। তাছাড়া এও মনে রাখা দরকার যে, ভূমির এই ধরনের উন্নতিসাধন অত্যন্ত ব্যয়বহুল। আমাদের তাই ভূমির ব্যবহারের ওপর ভূমির ভৌতিক চরিত্রের নিয়ত প্রভাব খেয়াল রাখতে হবে।

অধিকন্তু ভূতাত্ত্বিক গঠন এবং আর্থিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ খনিজ সম্পদের সঞ্চয় তুলনামূলকভাবে কম পরিবর্তনীয়। জলবায়ু সংক্রান্ত বিষয়গুলিও অনেকাংশে স্থায়ী ও অপরিবর্তনশীল বলে মনে করা হয় ও বৃষ্টিপাতের অভাব সেচের মাধ্যমে সহজেই পূরণ করা যায়। অত্যধিক বারিপাতের মোকাবিলা করা অনেক কঠিন, সেজন্য অধিক বৃষ্টিযুক্ত এলাকা সমস্যাকীর্ণ থেকে যায়। যেসব ক্ষেত্রে কম উষ্ণতামান শস্য উৎপাদনের পক্ষে অন্তরায়, যেমন মধ্য ও উচ্চ অক্ষাংশের অঞ্চলগুলিতে, কাঁচঘর বা সবুজ-ঘর (greenhouse)-এর সাহায্যে এই বাধা দূর করা সম্ভব হয়। অবশ্য এক্ষেত্রে উৎপাদিত শস্যের মূল্য খরচের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হওয়া চাই। কৃষিপদ্ধতির ধরন সাধারণভাবে জলবায়ুর বৈচিত্র্যের ওপর নির্ভরশীল। অবশ্য বিশেষ ধরনের কৃষিসংক্রান্ত ভূমির ব্যবহার, যেমন ফলের বাগান, নার্সারী ও বাজারভিত্তিক বাগিচার (market gardens) জন্য অণু-জলবায়ু (micro-climatic) গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে।

ভূমি পরিকল্পনা (land planning) বস্তুতপক্ষে কোন দেশের প্রতি হেক্টর ভূমির কাম্য ব্যবহারকেই নির্দেশ করে। স্পষ্টতঃই এই কাম্য ব্যবহার যুদ্ধ বা শান্তির সময়ে একই হবে না, এবং তা অতি অবশ্যই সমকালীন আর্থিক ব্যবস্থার সাথে তাল রেখে বিভিন্ন কালে ভিন্ন রকমের হবে। যেকোন ধরনের ভূমি-ব্যবহার সংক্রান্ত পরিকল্পনা তাই স্থিতিশীলের বদলে হবে গতিময়; অনমনীয় না হয়ে হবে নমনীয়, এবং পরিবর্তনশীল ব্যবস্থাপনা ও মানুষের আচার-আচরণের দিকটিকেও গুরুত্ব দিতে হবে। কিন্তু সমাজের বিশেষ কয়েকটি সুবিধাভোগী গোষ্ঠীর প্রয়োজন মত মাপকাঠি তৈরী করা একেবারেই উচিত হবে না। এই মাপকাঠি তৈরী করতে হবে জাতীয় স্বার্থের দিকে নজর রেখে। সামগ্রিকভাবে জাতীয় স্বার্থ অক্ষুন্ন রেখে ভূমির ব্যবহারকে যতবেশী সম্ভব মানুষের চাহিদা ও বৈধ আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে হবে।

কাম্য ব্যবহারের ধারণাটি ভূমির বহুবিধ (multiple) ব্যবহারের নীতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এককথায় সমগ্র দেশ একটি জাতীয় সম্পত্তি, যা মানুষের কল্যাণ ও উপভোগের কাজে লাগা দরকার। দেশের উচ্চভূমিগুলির জন্য এমনভাবে পরিকল্পনা করতে হবে যাতে তা অরণ্যায়ন ও পাহাড়ী মেষ পালনের কাজে আসে এবং যুগপৎ গার্হস্থ্য ও শিল্পের প্রয়োজনীয় জলের সংগ্রহ-ক্ষেত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

মানব সমাজে সবচেয়ে দরকারী চাহিদা হল খাবারের, যা কৃষকেরা উৎপাদন করে থাকেন। কাজেই কৃষককে জমির উর্বরতামান বজায় রাখা ও তার উন্নতি সাধনের দিকে নজর দিতে হবে। অবশ্য এজন্য তার ভূমি-স্বত্বের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত থাকতে হবে। কোন কৃষি প্রকল্পের পরিকল্পনা ও তার রূপায়ণের জন্য অন্ততঃ পাঁচ-ছয় বছর লেগে যায়; যে সময়ের আগে কৃষক কোনরূপ অন্তিম ফেরত লাভ (final return) করেন না। যেসব অন্যান্য ক্ষেত্রে ভূমিকে কাজে লাগালে ভূমি-ক্ষয়ের বিপদ অনিবার্য, সেক্ষেত্রে এই ধরনের পরিকল্পনা অসম্ভব হয়ে পড়ে। কাজেই সুষ্ঠু ভূমি-ব্যবহার পরিকল্পনা কৃষিজমির মধ্যে যেসব এলাকা অ-কৃষি ব্যবহারের আওতায় আসবে তার সুনির্দিষ্ট সীমারেখা ঠিক করে নেবে।

মানুষের দ্বিতীয় প্রাথমিক চাহিদা হল আশ্রয়ের—একটি নীরোগ ও আরামপ্রদ গৃহ/আবাস। কাজেই ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার জন্য বাসভূমির উল্লেখযোগ্য চাহিদা রয়েছে। উন্নত দেশগুলিতে বার্ষিক জনসংখ্যা বৃদ্ধি বর্তমানে অনেক কম হলেও, জনসংখ্যার বয়সভিত্তিক গঠন এমনই যে, পরিবারের সংখ্যা এখনও বেড়ে চলেছে। ফলতঃ একই সংখ্যক মানুষের জন্য অধিক সংখ্যায় আবাসস্থলের প্রয়োজন পড়েছে। পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে ওঠে যখন দেখা যায় পুরাতন বাড়িগুলি ব্যবহারোপযোগী থাকছে না, পরন্ত যৌথ পরিবারের ভাঙ্গন বাড়তি গৃহের চাহিদা সৃষ্টি করছে। নতুন শিল্প স্থাপনের ফলে বা পুরাতন শিল্পের ক্ষেত্রে পুনর্বাসনের জন্যও নতুন করে বাসগৃহের সংস্থান করতে হয়। গ্রামীণ আবাসের ক্ষেত্রে বলা যায় যে, জোতের পুনর্বিভাজন এবং গ্রামীণ কুঁড়েঘর ও কাঁচা ঘর-বাড়ি নির্মাণের জন্য মূল্যবান কৃষিজমির ব্যবহার ঠেকানো সম্ভব হবে না।

কাজ বেশীরভাগ মানুষের একটি মৌলিক চাহিদা, কাজেই শিল্পের অবস্থান একান্তভাবে সঠিক হওয়া দরকার। শিল্পের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য এবং আধুনিক জীবনযাপনের সহায়ক অন্যান্য সামগ্রীকেও যুক্ত করতে হবে। শিল্পের অবস্থান যাতে দেশের সর্বত্র সুষমভাবে গড়ে উঠতে পারে, বিশেষত পুরাতন ও নতুন শিল্পাঞ্চলগুলিতে, এবং আধুনিক কারখানাগুলির জন্য যাতে প্রয়োজনীয় জমির বরাদ্দ হয়, সেদিকে গুরুত্ব দিতে হবে। কোন এলাকায় শিল্পের প্রকৃত অবস্থান নির্ধারণ পরিকল্পনার একটি প্রয়োজনীয় দিক। শিল্প-কারখানা স্থাপন এবং সহযোগী গৃহনির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় জমি যাতে উর্বর কৃষিজমি নষ্ট না করে বা আর্থিক দিক দিয়ে উত্তম কৃষিক্ষেত্রগুলির বিভাজন না ঘটায় সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া দরকার।

চতুর্থত, রেলপথ, সড়কপথ এবং বায়ুপথের মাধ্যমে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্যও ভূমির গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহার হয়ে থাকে। সার্থক যোগাযোগ ব্যবস্থার ফলে কোন একটি এলাকা অপর কোন এলাকার সুযোগ সুবিধা ভোগ করতে পারে, এবং দ্রব্যের চলাচলও অনেক সহজ হয়। সার্বিক নিরাপত্তা ছাড়া কোন জাতি অত্যন্ত ব্যাপক ও সুচারুভাবে গড়ে তোলা ভূমির ব্যবহারও ভোগ করতে পারে না। তাই জাতীয় নিরাপত্তার দিকটিও সুনিশ্চিত করতে হবে। সেজন্য প্রতিরক্ষা পরিষেবা, যেমন আকাশ, স্থল ও নৌবাহিনীর জন্য প্রয়োজনীয় জমি বরাদ্দ করতে হয়। আধুনিক সমরাস্ত্রের আকার বৃদ্ধি পাবার ফলে প্রতিরক্ষাখাতেও জমির চাহিদা বাড়া স্বাভাবিক। তবে অতীতের তুলনায় এ ব্যাপারে অনেক শিথিলতা আশা করা যায়।

মানুষের অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ চাহিদা হল বিনোদনের। দুর্ভাগ্যবশত, সেকেলে চিন্তাধারায় অনেকসময় ভাবা হয় যে অবকাশ বা অবসর যাপন কিছু মানুষের বিলাসিতা মাত্র, সকল মানুষের কাছে এর কোন প্রয়োজন নেই। শহর পরিকল্পনায় আজকের দিনে পার্ক ও খেলার মাঠ একান্ত প্রয়োজনের জিনিস, বিলাসের বস্তু নয়। বিনোদনের ক্ষেত্রে একই নীতি দেশের সুদৃশ্য স্থানগুলি এবং বন্যভূমিগুলির কাম্য ব্যবহারের ব্যাপারেও প্রযোজ্য। এই দৃষ্টিভঙ্গী যাঁরা জাতীয় পার্ক (national parks) এর পক্ষে সওয়াল করেছিলেন, তাঁদের দ্বারা বহুকাল আগেই গৃহীত হয়েছিল। আর এর ফলেই জাতীয় পার্কের চাহিদা 1945-46-এ সরকারী নীতির অংশ হিসেবে সরকারীভাবে স্বীকৃতি লাভ করে। কিন্তু ভূমির ব্যবহারের বহুত্বের নীতিটিও ভোলা উচিত নয়। এর দ্বারা এই বোঝায় যে, সাধারণ গ্রামীণ এলাকায় রাস্তা, গো-ডহর বা পায়ে হাঁটা পথের গুরুত্ব কিছু বিশেষ

অবকাশ ক্ষেত্রের (holiday areas) সীমানা নির্ধারণের চেয়ে বেশী। যদিবা দেশের কোন একটি ক্ষুদ্র জায়গার জন্য কারও গভীর আকাঙ্ক্ষা থেকে থাকে, তাহলে দেখা যায় যে এই ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষা এবং মুক্ত সুন্দর কোন এলাকাকে নষ্ট হওয়া থেকে বাঁচাবার চাহিদার মধ্যে সংঘাত সৃষ্টি হচ্ছে। ব্যক্তিগত বৈধ আকাঙ্ক্ষা অবশ্য গ্রামীণ বসতির সযত্ন অবস্থান ও সুচারু কাঠামো (design) পরিকল্পনার মাধ্যমে মেটানো সম্ভব।

3.2.1. ভূমির ব্যবহার নির্ধারক কারণসমূহ

বিশেষ শ্রেণীভুক্ত ভূমির ব্যবহারের প্রকৃতি বিভিন্ন কারণের ওপর নির্ভরশীল। এই কারণগুলিকে মোটামুটিভাবে তিনটি গোষ্ঠীতে ভাগ করা যেতে পারে। এগুলি হল (ক) প্রাকৃতিক, যেমন—স্থান, ভূ-প্রকৃতি, মৃত্তিকা, জলবায়ু প্রভৃতি; (খ) অর্থনৈতিক, যেমন—অর্থব্যবস্থা, ঋণ ও মূলধন, ব্যবসা ও বাণিজ্য, পরিবহণ ও প্রযুক্তি ইত্যাদি; এবং (গ) প্রাতিষ্ঠানিক, যেমন—সাংস্কৃতিক পরিবেশ, সামাজিক ও সংগঠিত কার্যকলাপ, চিরাচরিত নিয়ম-নীতি, আচরণ, মূল্যবোধ এবং আইনী-ব্যবস্থা প্রভৃতি। এগুলি একক বা সামগ্রিকভাবে কোন বিশেষ পরিকাঠামোয় ভূমির ব্যবহারের প্রকৃতির পরিবর্তনে যথেষ্ট ভূমিকা পালন করে। যেহেতু কোন অঞ্চলের ভূমির ব্যবহার অনেকগুলি বিষয়ের দ্বারা নির্ধারিত হয়, তাই যখনই এই বিষয়গুলির পরিবর্তন ঘটে, তখন তা ভূমির ব্যবহারে প্রতিফলিত হয়। বিশেষ বিশেষ ভূমির ব্যবহারের ক্ষেত্রে এই পরিবর্তনগুলিকে নিম্নলিখিত উপায়ে বুঝে নেওয়া যেতে পারে।

(ক) প্রাকৃতিক : ভূমির ব্যবহার নিয়ন্ত্রণকারী বিভিন্ন প্রাকৃতিক বা ভৌতিক কারণগুলি হল—মৃত্তিকার বৈশিষ্ট্যসমূহ, ভূ-সংস্থান, জলবায়ু ইত্যাদি। ভূমির ব্যবহারের ক্ষেত্রে মৃত্তিকার বৈশিষ্ট্য একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারক। কোন বিশেষ ধরনের মৃত্তিকা নির্দিষ্ট ব্যবহারের ক্ষেত্রে ভূমির বহনক্ষমতা নির্ধারিত করে, এবং তা মৃত্তিকার উর্বরতামান, বুনন, জলধারণ ক্ষমতা, P^H মান (অম্লত্ব-ক্ষারত্ব) ইত্যাদির দ্বারা পরিচালিত হয়। মানের অবনতি ঘটলে মৃত্তিকার উৎপাদনশীলতা কমে যায়, তখন কাম্য উৎপাদনের জন্য অপর কোন উদ্দেশ্যে ভূমিকে কাজে লাগানো হয়। ভূ-সংস্থান বা ভূ-প্রকৃতিও বিশেষ ধরনের ভূমির ব্যবহারের জন্য দায়ী। বিভিন্ন ভৌতিক পরিবেশে ভূ-প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য ভূমিরূপের প্রকৃতির নিয়ন্ত্রক। জলবায়ুর পরিবর্তনও একইভাবে শস্য উৎপাদন ও ভূমির ব্যবহার পদ্ধতিকে প্রভাবিত করে। এমনকি আর্দ্রতা বা উষ্ণতার সামান্য পরিবর্তনের জন্য সাময়িক ভিত্তিতে ভূমির ব্যবহারের পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়।

(খ) অর্থনৈতিক : বিভিন্ন বিষয়ের দ্বারা অর্থনৈতিক কারণগুলি রূপায়িত হয়। কোন বিশেষ ধরনের ভূমির ব্যবহারের প্রকৃতি বাজারের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়। বাজারে কোন বিশেষ শস্যের চাহিদা সেই শস্যের চাষে উৎসাহ যোগায়, কিন্তু মন্দার বাজার ঐ শস্যের চাষে বাধা হয়ে দাঁড়ায় এবং এই ধরনের ভূমির ব্যবহার তুলনামূলকভাবে অধিক চাহিদাযুক্ত অন্য কোন শস্যের দ্বারা উৎখাত হয়ে পড়ে। উদাহরণস্বরূপ, বঙ্গভঙ্গের পর পাটের চাহিদার জন্য পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন এলাকায় পাট চাষের প্রসার ঘটে। বহু কৃষক বাণিজ্যিক ফসল হিসেবে পাটের চাষ করতে থাকেন এবং এর ফলে খাদ্যশস্যের উৎপাদন কমে যায়। কিন্তু পরবর্তীকালে পাটের বাজার পড়ে যাবার ফলে পাটজমিগুলিতে পুনরায় ধানের চাষ করা হতে থাকে। ভূমির ব্যবহারের পরিবর্তনের মাধ্যমে ভূমির মূল্যমানের পরিবর্তনটিও ধরা পড়ে। ক্রমবর্ধমান নগরায়নের ফলে অকৃষি জমির চাহিদা ক্রমশঃ বাড়ছে এবং জমির দামও বেড়ে চলেছে। ফলতঃ, প্রচুর পরিমাণে উর্বর কৃষিজমি অধিক ফেরত-লাভের উদ্দেশ্যে বসতি, শিল্প ও বাণিজ্যিক ব্যবহারের জন্য রূপান্তরিত হচ্ছে। অনেক সময় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনগুলিও ভূমি-ব্যবহারের প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটায়। উচ্চফলনশীল জাতের (High Yielding Variety বা HYV) বীজের আমদানী হবার পরে পশ্চিমবঙ্গসহ ভারতের বিভিন্ন অংশে কৃষিতে ভূমির ব্যবহার-এ দর্শনীয় পরিবর্তন ঘটেছে এবং এসব জায়গায় বিস্তীর্ণ এলাকা বহু-কর্ষণের (multiple cropping) আওতায় এসেছে। বর্ধিত জনঘনত্ব একান্তভাবে ভূমির প্রগাঢ় (intensive) ব্যবহার দাবী

করে। দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কিছু অংশে প্রগাঢ় কৃষির ফলে দেখা যায় যে, এখানে হেক্টর প্রতি শস্যের উৎপাদন অনেক উন্নত দেশের চেয়ে বেশী।

(গ) প্রাতিষ্ঠানিক : এই ধরনের কারণের সংখ্যা অনেক এবং এগুলি বিবিধ বিষয়ের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এই বিষয়গুলি হল সামাজিক, সাংস্কৃতিক, আচরণগত, রাজনৈতিক ও আইনসংক্রান্ত। এই বিষয়গুলির কোনরূপ পরিবর্তন ভূমির ব্যবহারের পরিবর্তন ঘটাতে পারে। জোত ব্যবস্থা (land tenure system) ভূমি-ব্যবহারের একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারক বলে মনে করা হয়। পশ্চিমবঙ্গে ভূমি-সংস্কার আইন ভূমি-ব্যবহারের প্রকৃতির যথেষ্ট ইতিবাচক পরিবর্তনে সাহায্য করেছে। অতীতে জমিদারী ব্যবস্থায় অনেক প্রান্তিক জমি কম ফেরত-লাভের জন্য চাষ করা হত না। কিন্তু বর্তমান ব্যবস্থায় এইসব জমি প্রান্তিক চাষীদের মধ্যে বিলি বণ্টনের ফলে সেগুলিকে বেশ সুদক্ষতার সঙ্গে উৎপাদনের কাজে লাগানো সম্ভব হচ্ছে। মানুষের দক্ষতার পরিবর্তন জমিগুলিকে আরও অধিক উৎপাদনশীল করে তোলে এবং এইভাবে ভূমির ব্যবহারেও পরিবর্তন ঘটায়। বিশেষ ধরনের মূল্যবোধ ও আচরণ এবং সেইসাথে সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল মানুষকে কোন বিশেষ ধরনের ভূমির ব্যবহার গ্রহণ করতে বা বর্জন করতে সচেষ্ট করে।

3.2.2. ভূমির প্রকারভেদ ও ভূমির ব্যবহার

মানুষের বিভিন্ন চাহিদা পূরণের জন্য ভূমির ব্যবহারের যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। ভূমির প্রাথমিক ব্যবহার হয় কৃষিকাজে, বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে, যেখানে মানুষের প্রধান জীবিকা হল কৃষিকাজ। উন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশগুলিতেও জমির ওপর প্রচণ্ড চাপ মানুষকে অন্য ধরনের জীবিকায়, যেমন শিল্প, খনি, ব্যবসা ইত্যাদিতে কাজ খুঁজে নিতে বাধ্য করেছে। এছাড়াও আশ্রয়ের জন্যও বসতিস্থাপনের কাজে মানুষ ভূমির ব্যবহার করে থাকে। বেশ প্রাচীনকাল থেকেই অধিক জনঘনত্ব এবং উচ্চস্তরের পেশা মানুষকে নগরায়নে উৎসাহিত করেছে। আমরা দেখি, বেশীরভাগ নদীভিত্তিক প্রাচীন সভ্যতাগুলি, যেমন ব্যাবীলনীয়, সিন্ধু ও মিশরীয় সভ্যতা, নগরকেন্দ্রিক ছিল। বিংশ শতাব্দীতে শিল্পের প্রয়োজনে ভূমির ব্যবহার শহরগুলির বৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করেছে, কারণ শিল্পাঞ্চলে ও তার আশপাশে শিল্পকর্মীদের বসবাসের জন্য প্রচুর আবাস নির্মাণের প্রয়োজন হয়েছে। রাস্তা ও রেলপথও ভূ-তলের অনেকখানি জায়গা দখল করে। যেহেতু অর্থনীতির বৃদ্ধি ও বিকাশের জন্য আধুনিক পরিবহণ ব্যবস্থা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, তাই ইদানিংকালে সুদক্ষ যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য অনেক বেশী ভূমির চাহিদা সৃষ্টি হয়েছে। আজকের ভোগবাদী সমাজে ভূমির ওপর অত্যধিক চাপ পৃথিবীর অনেকাংশে ভূমির অপব্যবহার ও অবনমন ঘটিয়েছে। কিন্তু পরিবেশের সুরক্ষার স্বার্থে বনভূমি সৃজন ও তার বিজ্ঞানসম্মত রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ভূমির প্রয়োজন রয়েছে।

কোন স্থানের ভূমির ব্যবহার কৃষি বা অকৃষিভুক্ত হতে পারে। গ্রামীণ সমাজে কৃষিই প্রধান অবলম্বন; পক্ষান্তরে নগর ভূ-দৃশ্যে ভূমির অকৃষি ব্যবহারই মুখ্য। এই অকৃষি ব্যবহারগুলি, যেমন নগর জনবসতি, শিল্প-স্থান, যোগাযোগ ব্যবস্থা, এবং খনি ও খাতের নির্মাণকার্যে জমির ব্যবহার ঠেকানো যাবে না। কিন্তু এগুলির বিচক্ষণ পরিকল্পনা ভূমির ফলবতী ব্যবহারকে সুনিশ্চিত করবে।

3.2.2.1. কৃষি

দক্ষিণ এশিয়ায় কৃষিই হল সর্বাপেক্ষা বিস্তৃত ভূ-আবরণ (land cover)। দক্ষিণ-এশীয় দেশগুলির মোট এলাকার প্রায় 45 শতাংশ কৃষিকাজে ব্যবহৃত হয়। ভারতের প্রায় 57 শতাংশ ভূমি কৃষির অন্তর্ভুক্ত। বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার। এই পরিমাপগুলি বিশ্বের গড় (11 শতাংশ মাত্র) কৃষিভুক্ত জমির সাপেক্ষে অনেক বেশী। অন্যদিকে, চিনে মোট ভূমির মাত্র 10 শতাংশে কৃষিজমি, যা বিশ্বের গড় কৃষিজমির সঙ্গে সমতুল। এক্ষেত্রে জনসংখ্যার চাপের চেয়েও ভৌগোলিক

পরিবেশ ভূমির ব্যবহারে বেশী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ভারত ও বাংলাদেশে কৃষিজমির প্রাধান্য বিস্তীর্ণ নদী সমভূমির সঙ্গে সম্পর্কিত। পক্ষান্তরে, চিনের বেশীরভাগ অংশ পর্বতময় ও শুষ্ক। চিনে প্রায় 43 শতাংশে ভূমি-এলাকা স্থায়ী তৃণভূমি হিসেবে ফেলে রাখা হয়, অন্যদিকে ভারত ও বাংলাদেশে এর পরিমাণ যথাক্রমে মোট জমির 4 ও 5 শতাংশ। অনেক উন্নত দেশ, যেমন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও অস্ট্রেলিয়া শস্য উৎপাদনের জন্য মোট জমির চেয়ে বেশী জমি তৃণভূমির জন্য বরাদ্দ করে।

3.2.2.2. আবাস

আশ্রয় মানুষের একটি মৌলিক চাহিদা। জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাবার সঙ্গে সঙ্গে এই চাহিদা বাড়তে থাকে এবং অধিক ভূমির প্রয়োজন হয়। যদিও গ্রামীণ এলাকার মানুষের ঠাঁই পাবার জন্য ভূমির ওপর চাপ তুলনামূলকভাবে কম, শহরাঞ্চলে এরূপ ভূমি প্রায় নিঃশেষিত। শহর ও নগরগুলির প্রসারের ফলে প্রতিনিয়ত অধিক পরিমাণে কৃষিজমি বাসভূমি ও অন্যান্য অকৃষি ব্যবহারের আওতায় আসছে। বাড়ন্ত মহানগরগুলিতে এই সমস্যা অত্যন্ত প্রবল আকার নিয়েছে। জমির এই অতিরিক্ত চাহিদা জমির দাম বহুগুণ বাড়িয়ে দিচ্ছে এবং তা আকাশচুম্বী হয়ে উঠছে। জমির ফাটকাবাজ ও প্রমোটাররা এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে প্রান্তদেশীয় উৎকৃষ্ট কৃষিজমিগুলিকে গ্রাস করে নিচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ, কোলকাতা শহরের উপকণ্ঠে জলাভূমিগুলি জনবসতির জন্য মানুষের হস্তক্ষেপের ফলে বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। আইনগত সুরক্ষা থাকা সত্ত্বেও জনবসতি ও অন্যান্য ব্যবহারের জন্য অনেক জলাভূমি বুজিয়ে ফেলা হচ্ছে।

3.2.2.3. রাস্তাঘাট

নগর জীবনে রাস্তাঘাটকে জীবনরেখা (life lines) বলে মনে করা হয়। যোগাযোগ ব্যবস্থা কোন শহরের উন্নয়নের নির্দেশক হিসেবে গণ্য হয়। প্রতিটি শহরের একটি কেন্দ্রীয় ব্যবসা এলাকা (Central Business District বা CBD) থাকে, যা শহরের বিভিন্ন অংশ এবং প্রান্তবর্তী এলাকাগুলির সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থাকে। রাস্তাঘাট তাই শহরের সচলতার ক্ষেত্রে ভূমির ব্যবহার পরিকল্পনার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। আধুনিক শহরগুলিতে রাস্তাঘাটের পরিকল্পনা করা হয় এবং প্রায় 10 শতাংশ ভূমি এর জন্য বরাদ্দ করা হয়। কিন্তু কোলকাতার মত শহরগুলিতে মোট এলাকার মাত্র 6 শতাংশে রাস্তা, যা এর বিকাশমুখী কর্মসূচীর পক্ষে একেবারেই অপর্যাপ্ত। শহরের বৃদ্ধি ও ব্যাপ্তির জন্য গণপরিবহণ (mass transit) সুবিধা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এটি রাস্তার প্রকৃতির ওপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। অতএব যেকোন ধরনের ভূমির ব্যবহার পরিকল্পনার ক্ষেত্রে রাস্তাঘাটের অবস্থান ও বণ্টনের বিষয়ে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া দরকার।

3.2.2.4. বনাঞ্চল

যেকোন ভূমির ব্যবহারে বনাচ্ছাদনের পরিমাণ কৃষিজমির সাথে বিপরীতভাবে সম্পর্কযুক্ত হতে দেখা যায়। সাধারণভাবে দক্ষিণ এশিয়ায় অন্যান্য অনেক উন্নয়নশীল দেশের চেয়ে কম বনাঞ্চল রয়েছে। ভারতে 650 হাজার বর্গকিমি ভূমি বনভূমির অন্তর্গত, এবং এই পরিমাণ দেশের মোট এলাকার প্রায় 25 শতাংশে। পশ্চিমবঙ্গে বনভূমি এলাকা খুবই কম, মাথাপিছু মাত্র 0.01 হেক্টর। বাস্তুতন্ত্রে বনভূমির ভূমিকা সর্বজনবিদিত। পৃথিবীর যেকোন এলাকায় ভূমির ব্যবহার পরিকল্পনার ক্ষেত্রে বনসৃজনের জন্য উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। ইদানিংকালে অনেক ক্রান্তীয় দেশে কৃষির প্রসারের জন্য, বিশেষতঃ বহুজাতিক কোম্পানীগুলির দ্বারা বাগিচা-কৃষি ও বাণিজ্যিক খামারের জন্য বনভূমি ধ্বংস করা হচ্ছে। এই ধরনের হঠকারিতার ফলে ভূমির অবনমন ঘটেছে, কমে গেছে ভূমির উর্বরতা, এবং মৃত্তিকার ক্ষয় বেড়ে গেছে। বন্যা ও খরার মত পরিবেশের অনেক বিপর্যয় হল এইসব কাজকর্মের পরিণতি।

3.2.2.5. খনিজ সম্পদ ও খনন শিল্প

খনিজ সম্পদ শিল্পায়নের পক্ষে অপরিহার্য এবং তা মানুষকে বিভিন্ন উপযোগিতা প্রদান করে। ভোগবাদী সমাজে খনিজ সম্পদগুলিকে অবিবেচনাপ্রসূত কাজে লাগানোর ফলে আগামীদিনে খনিজ সম্পদের সঙ্কট দেখা দিতে পারে, কারণ এগুলি পুনর্ভব সম্পদ নয়। অবশ্য, প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন ও বস্তুর পুনর্ব্যবহারের ফলে এই সমস্যার কিছুটা সমাধান করা সম্ভব হয়েছে। খনন সংক্রান্ত কাজকর্ম ভূমিতলের ব্যাপক বিকৃতি ঘটায়; এবং যেহেতু ভবিষ্যতে অফেরতযোগ্য পদার্থের বলপূর্বক হরণ করা হয়, তাই খনন শিল্পকে অনেকে দস্যুবৃত্তি বলে আখ্যা দেন। বহুক্ষেত্রে এর ফলে উর্বর কৃষিভূমি, অক্ষত বনভূমি ও মূল্যবান জলসম্পদের বিনাশ ঘটে, এবং খননকার্য প্রভূত পরিমাণে বিবিধ অবস্থায় বর্জ্য পদার্থ উৎপন্ন ক'রে পরিবেশ দূষণ ঘটায়। তাই পরিবেশের সুরক্ষার জন্য একাধিক আইনানুগ নিয়মের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের খনন কার্য হয় সীমিত করা হয়েছে, নয়তো নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। অতএব কোন অঞ্চলের ভূমির ব্যবহার পরিকল্পনা খননকার্যে ভূমির বিজ্ঞানসম্মত ও বিচক্ষণ ব্যবহারের সুপারিশ করে।

3.3. পৃথিবীর জল সম্পদ

সকল জীবের পক্ষে জল অপরিহার্য। জলের প্রয়োজন বহুবিধ, যেমন মানুষসহ অন্যান্য জীবজন্তুর পানীয় জল, সকল উদ্ভিদ ও শস্য উৎপাদনের জন্য জল, শিল্পের ও অন্যান্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজে প্রয়োজনীয় জল। প্রাকৃতিক বারিপাত (precipitation) ছাড়াও বিশ্বের 40 শতাংশ খাদ্যশস্য উৎপাদনের জন্য জলসেচের প্রয়োজন হয়, এবং উপযোগী দ্রব্য উৎপাদনের জন্য বেশীরভাগ শিল্প কারখানায় প্রচুর পরিমাণে জল লাগে। মানব সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল নদীর প্লাবনভূমিগুলিতে, কেননা এখানে মানুষের প্রয়োজনে বিশেষতঃ কৃষির জন্য সহজে পর্যাপ্ত জল পাওয়া যেত। সিন্ধুসভ্যতা, মেসোপটেমীয় সভ্যতা, চিন সভ্যতা—সবই প্রধান প্রধান নদীর ধার বরাবর গড়ে ওঠে এবং বিকাশের শিখরে পৌঁছায়। এমনকি আজকের দিনেও সব ধরনের জনবসতি জলের উৎস, যেমন নদী, হ্রদ, ঝরনা ইত্যাদির কাছাকাছি দেখা যায়। বিগত কয়েক দশকে বিশ্বের অনেক জায়গায় অনিয়ন্ত্রিত জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং তার পরিপূরক দ্রুত নগরায়ন ও শিল্পায়ন জলের চাহিদা প্রভূতভাবে বাড়িয়ে দিয়েছে। আমাদের মনে রাখা দরকার যে, মানুষ বিভিন্ন উদ্দেশ্যে মোট ভূ-তল জলপ্রবাহের 50 শতাংশের বেশী ব্যবহার করে থাকে। 2025 সাল নাগাদ জলের চাহিদা মোট ভূ-পৃষ্ঠ জল সম্পদের 70 শতাংশে পৌঁছাবে। স্বাভাবিকভাবেই এর ফলে নদী ও হ্রদের জল নিঃশেষিত হবে। তাছাড়া ভূ-পৃষ্ঠের জলাশয়গুলি উত্তরোত্তর দূষিত হয়ে পড়ছে। মানুষের এই ধরনের ক্রিয়াকলাপ অদূর ভবিষ্যতে উদজ বাস্তুতন্ত্রের সাংঘাতিক বিপদ ঘটাবে, কারণ জলের মোট যোগান যেমন কমবে তেমনি অতিমাত্রায় জল-দূষণও ঘটতে থাকবে। কিন্তু, জীবনের উদবর্তনে এবং তাছাড়াও জলের নিজস্ব পরিচ্ছন্নতা ও পুনর্শুদ্ধির (recycling) জন্য উদজ বাস্তুতন্ত্রের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। জলাভূমির বাস্তুতন্ত্র পৃথিবীর সর্বাধিক উৎপাদনশীল বাস্তুতন্ত্রগুলির মধ্যে অন্যতম, এবং সেজন্য পৃথিবীতে জীবনের টিকে থাকার ব্যাপারে এগুলি সুরক্ষা ও সংরক্ষণের দাবী রাখে।

3.3.1. ভূ-পৃষ্ঠের জল সম্পদ

সাগর ও মহাসাগরগুলি বিস্তীর্ণ জলাধারস্বরূপ এবং এগুলি ভূ-পৃষ্ঠের মোট জলের 97 শতাংশ ধারণ করে রয়েছে। মোট জলের মাত্র 3 শতাংশ ভূ-তলে নদী, হ্রদ, পুকুর ইত্যাদির আকারে এবং ভৌমজল হিসেবে মাটির তলায় রয়েছে। নদীতে প্রবাহিত জলকে বলা হয় প্রবহমান জল বা 'লোটিক' (lotic) জল। এই প্রবহমান ও স্থির—উভয় জলই স্বাদুজল (fresh water), তবে তাদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের বাস্তুতন্ত্রের উদ্ভব ঘটে। সাগর ও মহাসাগরের জল লবণাক্ত এবং এখানে স্বতন্ত্র ধরনের বাস্তুতন্ত্র দেখা যায়। এই ধরনের বাস্তুতন্ত্রকে সামুদ্রিক বাস্তুতন্ত্র বলে। খাঁড়ি অঞ্চলগুলিতে সাধারণতঃ নোনাভাব দেখা যায়, তবে এই লবণতার মান সমুদ্রের জল ও অন্তর্দেশীয় স্বাদুজলের মাঝামাঝি হয়। কাজেই খাঁড়ি অঞ্চলগুলিতে

ভিন্ন ধরনের বাস্তুতন্ত্র দেখা যায়, এবং এখানকার জীব প্রজাতিগুলির অনেকের সামুদ্রিক ও স্বাদু জলের প্রজাতিগুলির সঙ্গে প্রভূত মিল থাকে।

আমরা জানি যে পৃথিবীর মোট জল সম্পদের 97 শতাংশে লবণাক্ত এবং তা সরাসরি মানুষের ব্যবহারের উপযোগী নয়। কিন্তু এই নোনাজল যখন বাষ্পীভূত ও ঘনীভূত হয়ে উদকচক্রের মাধ্যমে অধঃক্ষেপণের আকারে ভূ-পৃষ্ঠে এসে পড়ে, তখন তা অত্যন্ত মূল্যবান স্বাদুজলের উৎস হয়ে দাঁড়ায়। তবে, স্বাদু জলের আধার ও যোগান সংকটজনকভাবে অপ্রতুল। নীচের সারণী থেকে পৃথিবীর জলের বণ্টন সংক্রান্ত দিকগুলি সহজেই বোঝা সম্ভব হবে।

সারণী 3.2 : পৃথিবীতে জলের গুণগতমান ও তাদের বণ্টন (মোটের শতকরা হিসেবে)*

সব ধরনের জল (মোট পরিমাণ)	**100.00**
সাগর ও মহাসাগর (লবণাক্ত জল)	97.00
অন্তর্দেশীয় (স্বাদু জল)	3.00
স্বাদু জল (মোট স্বাদু জলের শতকরা হিসেবে)	**100.00**
বায়ুমণ্ডলে	0.035
নদীতে	0.030
হ্রদে	0.300
মৃত্তিকার আর্দ্রতা (soil moisture) হিসেবে	0.060
ভৌম-জল (770 মিটারের কম গভীরতা পর্যন্ত)	11.00
ভৌম-জল (770-3850 মিটার গভীরতার মধ্যে)	14.00
বরফের আচ্ছাদন ও হিমবাহের আকারে	75.00

* *পৃথিবীর মোট জলের পরিমাণ আনুমানিক* প্রায় 1.37 বিলিয়ন *ঘন কিমি. (1 বিলিয়ন = একশো কোটি)*

অতএব দেখা যাচ্ছে যে, মানুষের ব্যবহারের জন্য জলের পরিমাণ অত্যন্ত নগন্য, কেননা 99.7 শতাংশ জল মানুষের ব্যবহারের কাজে লাগে না। মাত্র 0.3 শতাংশ জল মানুষের ব্যবহারোপযোগী। আবার এই ব্যবহারোপযোগী জলের প্রায় 97 শতাংশ ভৌম-জল হিসেবে ভূ-অভ্যন্তরে জমা থাকে এবং অত্যন্ত কম পরিমাণ জলই নদীতে প্রবাহিত হয়। তবুও মানুষের ব্যবহারের জন্য বেশীরভাগ নদীগুলিই ভূ-পৃষ্ঠে জলের প্রধান উৎস হিসেবে কাজ করে।

3.3.2. জলের বাজেট তথা আয়-ব্যয়ের হিসেব

আমরা জানি যে, বিভিন্ন অবস্থায়, যেমন—বরফ (কঠিন), জল (তরল) ও জলীয় বাষ্প (গ্যাস)-এর আকারে জল বারিমণ্ডল, শিলামণ্ডল এবং বায়ুমণ্ডলের মধ্যে অবস্থান করে। বাষ্পীভবন প্রক্রিয়ায় বারিমণ্ডলের তরল জল অবস্থার পরিবর্তনের ফলে জলীয়বাষ্পে পরিণত হয়। পরবর্তীকালে জলীয় বাষ্প ঘনীভবন ও অধঃক্ষেপণ প্রক্রিয়ায় তরল জলে রূপান্তরিত হয়। ভূ-পৃষ্ঠে অতি শীতল অবস্থায় জল জমে বরফে পরিণত হয় এবং তা গলনের ফলে পুনরায় জলে পরিণত হয়।

বহুযুগ ধরেই পৃথিবীর মোট জলের পরিমাণ স্থির রয়েছে, এর কোনরূপ হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটেনি। মনে করা হয় যে, কয়েক লক্ষ বছর আগে পৃথিবীতে জলের পরিমাণ যা ছিল এখনও তাই রয়েছে। প্রতিবছর সমুদ্রগুলি থেকে যে 0.36×10^{14} ঘনমিটার জলের হ্রাস ঘটে, তা সমপরিমাণ অধঃক্ষেপণের মাধ্যমে পুনরায় ভূ-পৃষ্ঠের স্থলভাগে ফিরে আসে। জলের এই আয়-ব্যয়ের হিসেব সারণী 3-এ দেখান হল।

সারণী 3 : পৃথিবীর জলের বাজেট

উৎস	পরিমাণ (ঘনমিটার প্রতি বছরে)
মহাসাগরগুলিতে অধঃক্ষেপণ	3.24×10^{14}
মহাসাগরগুলি থেকে বাষ্পীভবন	3.60×10^{14}
মহাসাগরগুলি থেকে নীট হ্রাস	0.36×10^{14}
মহাদেশগুলিতে অধঃক্ষেপণ	0.98×10^{14}
মহাদেশগুলি থেকে বাষ্পীভবন	0.62×10^{14}
মহাদেশগুলিতে নীট বৃদ্ধি	0.36×10^{14}

মহাদেশগুলির বাড়তি জল নদী-নালার মাধ্যমে সাগর ও মহাসাগরগুলিতে এসে পড়ে। অতএব মহাদেশগুলিতে যেমন জলের পরিমাণ ক্রমাগত বাড়তে থাকে না, তেমনি মহাসাগরগুলি শুকিয়েও যায় না। তবে মনে রাখা দরকার, যেহেতু স্থলভাগের জল সাগর ও মহাসাগরগুলিতে এসে জমা হয়, তাই স্থলভাগের জল কোন কারণে দূষিত হয়ে পড়লে তা সমুদ্রজলকেও কালক্রমে দূষিত করে তুলবে।

3.3.3. ভূ-পৃষ্ঠে জল সম্পদ ব্যবহারের ধরন

আগেই দেখা গেছে যে, ভূ-পৃষ্ঠে স্বাদু জলের পরিমাণ নেহাতই কম। মোট জলের মাত্র 3 শতাংশে স্বাদু জল। পূর্বেই বলা হয়েছে, এই জলের (অর্থাৎ 0.3 শতাংশের) মাত্র দশের-এক ভাগ মানুষের ব্যবহারোপযোগী। বিশ্বের সর্বত্র জনসংখ্যার প্রবল চাপ, দ্রুতগতিসম্পন্ন নগরায়ন ও শিল্পায়নের জন্য স্বাদু জলের চাহিদা বিস্ময়করভাবে বেড়েছে। 1950 থেকে 1995 সালের মধ্যে জলের ব্যবহার বেড়েছে প্রায় তিনগুণ (প্রতি বছরে 1365 ঘনকিমি. থেকে বেড়ে 3760 ঘনকিমি.)। ফলস্বরূপ ভূ-পৃষ্ঠে স্বাদু জলের প্রাপ্যতার হ্রাস ঘটেছে। অতিরিক্ত উত্তোলনের ফলে ভৌম-জলের হ্রাস ঘটেছে সবচেয়ে বেশী। অনেক শহরে ভৌম-জলস্তর সঙ্কটজনকভাবে নেমে গেছে। বিগত 40 বছরে কোন কোন ক্ষেত্রে এই নামার পরিমাণ 30 মিটার।

চতুর্থ অধ্যায়

বাস্তুতন্ত্র

অধ্যায় সূচী

4.1. বাস্তুসংস্থান ও বাস্তুতন্ত্রের ধারণা

'ইকোলজি' (ecology) বা বাস্তুসংস্থান শব্দটি বর্তমানে বহুল প্রচলিত। গ্রীক শব্দ 'ওইকোস' (oikos) এবং 'লোগোস' (logos) থেকে ইকোলজি শব্দটি উদ্ভূত হয়েছে। ওইকোস কথাটির অর্থ ঘর বা বসতিস্থান এবং লোগোস কথাটির অর্থ অধ্যয়ন। আক্ষরিক অর্থে ইকোলজি হচ্ছে 'পৃথিবী' বাসগৃহের জীবগোষ্ঠীর সঙ্গে পরিবেশের সম্পর্ক সম্বন্ধে অধ্যয়ন। এই শব্দটি প্রথম কবে ব্যবহৃত হয়েছিল, তা নিয়ে কিছুটা অনিশ্চয়তা রয়েছে। সম্ভবত 1858 খ্রীষ্টাব্দে হেনরি ডেভিড থরো (Henry David Thoreau) ইকোলজি শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন। এরপর 1865 খ্রীষ্টাব্দে জার্মান জীববিজ্ঞানী হান্স রাইটার (Hanns Reiter) কোন সংজ্ঞা ছাড়াই এই শব্দটি প্রয়োগ করেন। অবশ্য ইকোলজি শব্দটির সঠিক সংজ্ঞা দেওয়ার কৃতিত্ব অপর একজন বিশিষ্ট জীব বিজ্ঞানী আর্নস্ট হেকেল (Ernst Haeckel) দাবী করতে পারেন। 1870 খ্রীষ্টাব্দে তিনি বলেন যে প্রকৃত অর্থে ইকোলজি বা বাস্তুসংস্থান হচ্ছে পৃথিবীতে বসবাসকারী জীবগোষ্ঠীর মধ্যে পারস্পরিক এবং পরিবেশের সঙ্গে সম্পর্ক সম্বন্ধে বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা।

একই প্রজাতির জীবগোষ্ঠীর বসবাসের ফলে সৃষ্টি হয় জনসংখ্যা। আবার বিভিন্ন প্রজাতির জীব যখন একটি এলাকায় বাস করে, তখন তাকে বলা হয় জীবগোষ্ঠী বা সম্প্রদায় (community)। বৃটিশ বিজ্ঞানী ট্যান্সলে (Tansley) 1935 খ্রীষ্টাব্দে সর্বপ্রথম 'ইকোসিস্টেম' (ecosystem) শব্দটি ব্যবহার করেন যাকে আমরা বাস্তুতন্ত্র বা বাস্তব্যতন্ত্র বলে থাকি। সজীব উপাদান বা জীবগোষ্ঠী (biotic) এবং তাদের অজীব বা জড় পরিবেশ (abiotic) উভয়ে একত্রে বাস্তুতন্ত্র গঠন করে। কাজেই বাস্তুতন্ত্র

এমনই একটি কার্যকরী একক যেখানে সজীব ও অজীব উপাদান পারস্পরিক আন্তঃক্রিয়া করে এবং এর ফলে এদের মধ্য দিয়ে শক্তি ও বস্তুর প্রবাহ ঘটে। উদ্ভিদ ও প্রাণী নিয়ে গঠিত জীবগোষ্ঠী হল বাস্তুতন্ত্রের সজীব উপাদান এবং জৈব ও অজৈব পদার্থগুলি বিভিন্ন পরিবেশীয় শর্তসাপেক্ষে জড় উপাদান গঠন করেছে।

4.1.1. বাস্তুতন্ত্রের সজীব ও জড় উপাদান

আমাদের বাসস্থান এই পৃথিবী একটি সুবিশাল বাস্তুতন্ত্র। পৃথিবীপৃষ্ঠের যে অঞ্চলে জীবগোষ্ঠী সৌরশক্তি আহরণ করে বসবাস করে, তাকে 'বাস্তুমণ্ডল' বা 'জীবমণ্ডল' (ecosphere or biosphere) বলা হয়। পৃথিবীর বুকে মাটি, জল, বাতাস প্রভৃতি অজীব বা জড় পদার্থগুলির সাহায্যে বিভিন্ন সজীব উপাদানগুলি আশ্রিত ও প্রতিপালিত হয়।

পুষ্টিগত বিবেচনায় জীবমণ্ডলের জীবসমূহকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—(ক) উৎপাদক বা স্বভোজী জীব যারা সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ার সাহায্যে অজৈব পদার্থ যথা কার্বন ডাইঅক্সাইড ও জল থেকে খাদ্য উৎপাদন করতে সক্ষম। (খ) পরভোজী জীব—এরা খাদ্য উৎপাদনে অক্ষম খাদক জীব যারা উৎপাদক জীব (উদ্ভিদ)-কে খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে।

গঠনগত বিবেচনায় বাস্তুতন্ত্রকে ছয়টি উপাদানে ভাগ করা যায়। এগুলি হল—(ক) অজৈব বস্তুসমূহ যথা কার্বন, নাইট্রোজেন, কার্বন ডাইঅক্সাইড, জল ইত্যাদি, (খ) জৈব পদার্থ যথা প্রোটিন, শর্করা, স্নেহপদার্থ, পচাপাতা ইত্যাদি, (গ) প্রাকৃতিক পরিবেশ যথা তাপ, মাটি ও অন্যান্য ভৌত পদার্থ। এই তিনটি উপাদান নিয়ে বাস্তুতন্ত্রের অজৈব অংশ গঠিত। এছাড়া অন্য তিনটি উপাদান নিয়ে জৈব অংশ গঠিত, এগুলি হল—(ঘ) উৎপাদক জীবসমূহ—এরা স্বভোজী সবুজ উদ্ভিদ, কার্বন ডাইঅক্সাইড, নাইট্রোজেন, জল প্রভৃতি অজৈব উপাদানের সাহায্যে খাদ্য প্রস্তুত করে, (ঙ) বড় মাপের খাদক—এরা পরভোজী প্রাণী, এরা অপর প্রাণীদের খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে অথবা উৎপাদকের দ্বারা প্রস্তুত খাদ্য গ্রহণ করে। (চ) ছোট মাপের খাদক—এরাও পরভোজী জীব যথা ব্যাকটিরিয়া ও ছত্রাক। এরা মৃত প্রাণীর দেহে অবস্থিত জটিল পদার্থগুলি থেকে পুষ্টি গ্রহণ করে এবং অজৈব পদার্থ বর্জন করে যা উৎপাদকের ব্যবহারে লাগে।

বাস্তুতন্ত্রের গুরুত্ব অপরিসীম কারণ জীবগোষ্ঠী এবং তাদের জড় পরিবেশ পারস্পরিক আন্তঃক্রিয়া ক'রে এবং একে অন্যের ধর্মকে প্রভাবিত ক'রে পরিবেশের সমতা রক্ষা করে। পরিবেশের স্থায়ী অবস্থাকে কোনভাবে আঘাত ঘটালে অস্বাভাবিক অবস্থা দেখা দেয় এবং এর ফলে মনুষ্য সমাজের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া ঘটে। মানুষের হস্তক্ষেপ না ঘটলে তবেই বাস্তুতন্ত্রের স্থিতাবস্থা বজায় রাখা সম্ভব।

বাস্তুতন্ত্রের অপরিসীম গুরুত্বের কথা আগেই বলা হয়েছে। এর সত্যিকারের আর্থিক মূল্যায়ন প্রায় অসম্ভব। তবুও বাস্তুতন্ত্রের পরিষেবামূলক কার্যাবলীর আর্থিক মূল্য নির্ণয়ের কিছু প্রচেষ্টা চলছে। একটি প্রবন্ধে[ক] পৃথিবীর বাস্তুতন্ত্রের যে আনুমানিক আর্থিক মূল্যায়ন করা হয়েছে তার গড় পরিমাণ 33 ট্রিলিয়ন ডলার (33×10^{12} ডলার) যা সারা বিশ্বের সবগুলি দেশের সর্বমোট বার্ষিক জাতীয় আয়ের প্রায় দ্বিগুণ। তবে এই মূল্য সাধারণ বাজার অর্থনীতির আওতার বাইরে। যেসব পরিষেবা এই হিসেবে আনা হয়েছে তাদের মধ্যে আছে বাতাসের গ্যাসীয় পদার্থের নিয়ন্ত্রণ, আবহাওয়া ও তার প্রতিকূলতা নিয়ন্ত্রণ , জলবায়ু ও জলসম্পদ নিয়ন্ত্রণ, ভূমিক্ষয় নিবারণ, ভূমি সংরক্ষণ ও মৃত্তিকা গঠন, খাদ্য প্রস্তুতীকরণ ও কাঁচামাল সরবরাহ, পুষ্টিচক্রের চলন, বর্জ্য পদার্থের পরিশোধন, জীবকুলকে আশ্রয়দান এবং সংরক্ষণ, পরাগ সংযোজন, দৃষ্টিনান্দনিক আবেদন ইত্যাদি।

(ক) Costanza R. *et al.* 1997. The value of world's ecosystem services and natural capital. *Nature*, volume 387, 15 May 1997, pp. 253–60.

4.1.1.1. বাস্তুতন্ত্রের শক্তিপ্রবাহ

শক্তি ছাড়া পৃথিবীতে কোন কিছুই চলতে পারে না। আর পারমাণবিক শক্তিকে বাদ দিলে সূর্যই সকল শক্তির উৎস। সূর্যের নিজের শক্তির উৎস তার অভ্যন্তরে প্রচণ্ড তাপের প্রভাবে তাপ পরমাণুকেন্দ্রিক (থার্মোনিউক্লিয়ার, thermonuclear) বিক্রিয়া যে সম্বন্ধে দ্বিতীয় ও ষষ্ঠ অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে। সূর্যের সেই শক্তি সমগ্র সৌরমণ্ডলে ছড়িয়ে পড়ছে অদৃশ্য মহাকাশ রশ্মি (cosmic rays), গামা রশ্মি (gamma rays), রঞ্জন রশ্মি (X-rays), অতিবেগুনী রশ্মি (ultraviolet rays), দৃশ্যমান রশ্মি (visible rays), তাপরশ্মি (heat rays), বেতার তরঙ্গ (radio waves) ইত্যাদি রূপে। তবে বর্তমান পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল ক্ষতিকারক বহু রশ্মিকে আটকে দিয়ে বাস্তুতন্ত্র ও জীবজগতকে রক্ষা করছে। আদিম পৃথিবীতে এই আলো ও তাপ অবলম্বন করেই হয়তো আকস্মিকভাবেই জড় বস্তুতে এসেছিল প্রাণের প্রথম স্পন্দন। সেই থেকে আরো বহু কোটি বৎসরের প্রচেষ্টায় দীর্ঘ পথ পরিক্রমার শেষে গড়ে উঠেছে জীব বৈচিত্র্যেভরা আমাদের এই অসাধারণ সৌর গ্রহটি।

বাস্তুতন্ত্র ও জীবজগতকে চলমান রাখতে শক্তির অফুরন্ত এবং নিরবিচ্ছিন্ন সরবরাহ অবশ্যই প্রয়োজনীয়। তবে বাস্তুতন্ত্রের সবুজ উদ্ভিদ ছাড়া আর কোন জীব সূর্যালোক শোষণ করে তাকে রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরিত করতে পারে না। উদ্ভিদের সবুজ কণিকা (chloroplasts) আলোর শক্তিকে কাজে লাগিয়ে কার্বন ডাইঅক্সাইড ও জলের মিলন ঘটিয়ে আলোকশক্তিকে (light energy) শর্করার মধ্যে কার্বনের সাথে কার্বনের রাসায়নিক বন্ধন শক্তিতে (C–C bond energy) রূপান্তরিত ক'রে বাকি জীবকুলের শক্তি সংগ্রহের অনতিক্রম্য সোপানটি পার হওয়া সম্ভবপর করেছে। সালোকসংশ্লেষকারী (photosynthetic) উদ্ভিদই তাই বাস্তুতন্ত্রে প্রধান উৎপাদক (producer) হিসাবে চিহ্নিত। উৎপাদক হিসাবে রাসায়নিক সংশ্লেষকারী কতকগুলি ব্যাক্টেরিয়ার (chemosynthetic bacteria) সামান্য কিছু অবদান আছে, সালোকসংশ্লেষকারী উদ্ভিদের তুলনায় যা নিতান্তই অপ্রতুল। তবে উদ্ভিদ নিজের প্রয়োজনেই সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় খাদ্য উৎপাদন করে—এই উদ্ভিদকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে থাকে অন্যান্য প্রাণীরা, যারা বাস্তুতন্ত্রে খাদক (consumer) হিসাবে পরিচিত। গরু, মহিষ, ভেড়া, ছাগল, খরগোশ ইত্যাদি যারা শুধুমাত্র উদ্ভিদই খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে তাদের বলা হয় প্রাথমিক বা প্রথম সারির খাদক (primary consumer, অথবা first order consumer)। আবার যেসব প্রাণী এই প্রাথমিক নিরামিষাশী খাদককে খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে তারা হল দ্বিতীয় সারির খাদক (secondary consumer বা second order consumer) যাদের মধ্যে রয়েছে পতঙ্গভুক ছোট প্রাণী যেমন ব্যাঙ, গিরগিটি, বেশ কিছু ধরনের পাখি, মাছ ইত্যাদি, অথবা বাঘ, সিংহ, সাপ ইত্যাদি। নেউল, বেজি, বাজপাখি বা গোসাপ (মনিটর লিজার্ড)-এর মত বেশ কিছু প্রাণী আছে যারা এই দ্বিতীয় সারির প্রাণীদের খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে যেমন বাজপাখি ও গোসাপ সাপ ধরে খায় এরা তাই তৃতীয় শ্রেণীর খাদক (tertiary consumer বা third order consumer)। ক্ষেত্রবিশেষে এরা চতুর্থ সারির খাদক (fourth order consumer) হিসাবেও চিহ্নিত হয়, যেমন উদ্ভিদ—ফড়িং—ব্যাঙ—সাপ—বাজপাখি অথবা গোসাপ বা নেউল (বেজি) ইত্যাদি।

তাই একই খাদক দ্বিতীয়, তৃতীয় বা চতুর্থ সারির খাদক হিসাবে বাস্তুতন্ত্রে থাকতে পারে তবে সাধারণতঃ বাস্তুতন্ত্রে তার প্রধান খাদ্যবস্তুর উপরই নির্ভর করবে তার শ্রেণীবিভাগ। খাদক হিসাবে মানুষের স্থান প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় বা চতুর্থ—যে কোন সারির হ'তে পারে কারণ সে সর্বভুক (omnivorous)।

উৎপাদক থেকে বিভিন্ন সারির খাদকের মধ্য দিয়ে হস্তান্তরিত খাদ্যশক্তির চলনকে বাস্তুতন্ত্রে শক্তি প্রবাহ (energy flow) বলা হয়। বাস্তুতন্ত্রে শক্তিপ্রবাহ চলমান হয় পর্যায়ক্রমে খাদ্য-খাদক সম্পর্ক ও নির্ভরতার মধ্য দিয়ে যাকে বলা হয় খাদ্যশৃঙ্খল (food chain) যেমন উপরোক্ত উদ্ভিদ থেকে বাজপাখির উদাহরণ। বাস্তুতন্ত্রের জীবগোষ্ঠীর মধ্যে এভাবে একাধিক খাদ্যশৃঙ্খল সৃষ্টি হয়ে খাদ্য-জালক (food web) হিসাবে দেখা দিতে পারে যে পরিস্থিতিতে ঐ বাস্তুতন্ত্রের সমগ্র জীবকুল একটি জটিল পারস্পরিক সম্পর্ক ও নির্ভরতা (complex mutual interrelationship and interdependence) সূত্রে বাঁধা থাকে।

শক্তিপ্রবাহের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল প্রতিধাপে এর প্রভূত হ্রাস হয়ে যাওয়া। রেমন্ড লিন্ডেম্যানের (Raymond Lindeman) সূত্র অনুযায়ী একটি স্তর (trophic level) থেকে পরবর্তী স্তরে খাদ্যশক্তির সরবরাহ গড়ে 10 শতাংশের কাছাকাছি। উদ্ভিদ সূর্য শক্তির মাত্র 1% (এক শতাংশ) ব্যবহার করতে পারে। উদ্ভিদের অর্জিত শক্তির 10% (দশ শতাংশ) এর মত প্রাথমিক নিরামিষভোজী প্রাণীরা ব্যবহার করতে পারে। দ্বিতীয় সারির খাদক প্রাথমিক খাদকের কাছ থেকে গড়ে 10% (দশ শতাংশ) শক্তি সংগ্রহ করতে পারে। এইভাবে দেখা গেছে যে সংগৃহীত শক্তির অনধিক এক শতাংশ মাত্র দ্বিতীয় সারির খাদকদের লভ্য। বেশিরভাগ শক্তিই (99%) উদ্ভিদের নিজের এবং মধ্যবর্তী প্রথম সারির খাদক জীবকুলের রক্ষণাবেক্ষণের কাজে লেগে যায়। একটি হিসাবে বলা হয়েছে একটি বাঘের সুস্থ স্বাভাবিক জীবনের জন্যে প্রায় 70–75 বর্গ কিলোমিটার জায়গা লাগে—তার কারণ এই পরিমাণ বনভূমিই তার খাদ্যের জোগান ধারাবাহিকভাবে দিতে পারে। একই কারণে জীবভর পিরামিড (biomass pyramid)–এ, যেখানে জ্যামিতিক পদ্ধতিতে ভূমি থেকে শীর্ষ অবধি খাদ্যশৃঙ্খলের অংশীদারদের মোট শুষ্ক ভর (total dry matter) অনুযায়ী সাজানো হয়, সেখানে সবচেয়ে উপরে থাকে সবথেকে কম পরিমাণ জীবভরের (সর্বমোট ভর) শীর্ষ খাদক (top consumer predator)।

এই প্রসঙ্গে বাস্তুতত্ত্ববিদেরা পৃথিবীর জীবভরের (জলীয় অংশ বাদ দিয়ে জীবমণ্ডলের ভর) যে হিসেবে দিয়েছেন সেটা উল্লেখ করা যেতে পারে। মোট 1200–1800 বিলিয়ন টন (এক বিলিয়ন = 100 কোটি) জীবভরের 99 শতাংশেরও বেশি উদ্ভিদ জীবভর[খ]। বাকি এক শতাংশেরও কিছু কম ওজনের মধ্যে রয়েছে মানুষসমেত অন্যান্য সমস্ত জীবকুল। প্রতি বর্গ মিটারে উদ্ভিদ জীবভর গড়ে 10–12 কিলোগ্রাম, মানুষ সমেত বাকিরা 0.1 কিলোগ্রাম প্রতি বর্গমিটারে। পুরোপুরি বরফে আবৃত অংশ বাদ দিলে মনুষ্য জীবভরের পরিমাপ 0.5 গ্রাম প্রতি বর্গ মিটারে।

যেহেতু বাস্তুতন্ত্রের শক্তি সংগ্রহের মূল ভূমিকায় রয়েছে উদ্ভিদ তাই তাদের জীবভর (biomass) হতে হবে বহুগুণ বেশি—বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে (wildlife conservation) এই সত্যের অনুধাবন ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ একান্ত জরুরী। শক্তিপ্রবাহ বাস্তুতন্ত্রের প্রধান ভিত্তি। এই প্রবাহ বিঘ্নিত হ'লে বাস্তুতন্ত্র তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলবে—এমনকি বাস্তুতন্ত্রের অবলুপ্তিও ঘটতে পারে।

4.1.2. বায়োম (Biome)

একটি বায়োম জীবমণ্ডলের বৃহত্তম একক। একটি নির্দিষ্ট বায়োমে আঞ্চলিক জলবায়ুর শর্ত অনুযায়ী জীবসমূহের গঠন ও আকার একই রকম হয়। যেমন তৃণভূমি বায়োমের উদ্ভিদসমূহের আকৃতি একই ধরনের। প্রকৃতপক্ষে বায়োমের ভিত্তিতেই বাস্তুসংস্থানগত শ্রেণীবিন্যাস করা হয়েছে, কারণ কোন একটি অঞ্চলের উদ্ভিদকুলের প্রকৃতি থেকে সেই অঞ্চলের জলবায়ু ও বাসভূমির পরিচয় পাওয়া যায়।

পৃথিবীতে প্রধানতঃ সাতটি বায়োমের উপস্থিতি দেখা যায়। এগুলি হল—তুন্দ্রা, নাতিশীতোষ্ণমণ্ডলের কনিফার অরণ্য, নাতিশীতোষ্ণমণ্ডলের পর্ণমোচী অরণ্য, নাতিশীতোষ্ণমণ্ডলের তৃণভূমি, ক্রান্তীয় সাভানা অঞ্চল, মরুভূমি অঞ্চল এবং ক্রান্তীয় বৃষ্টি অরণ্য।

(i) তুন্দ্রা বায়োম ঃ তুন্দ্রা অঞ্চল 60° উত্তর অক্ষাংশের উত্তরে অবস্থিত (উত্তর মহাসাগর ও তুষারাবৃত মেরু প্রদেশের মধ্যবর্তী)। এই অঞ্চলে বড় উদ্ভিদ অনুপস্থিত, তার বদলে খর্বাকৃতি উদ্ভিদ দেখা যায়। বরফ জমা এবং বরফ গলার ফলে

(খ) Piel, G. 1992. The Biosphere. *In* Only One World : Our Own to Make and to Keep. New York: W. H. Freeman, 1992.

সুষ্ঠু জলনিকাশের অভাবে জমির উপরিভাগ আর্দ্র, নরম ও অসমতল। তুন্দ্রা অঞ্চলের প্রধান উদ্ভিদ একরকম লাইকেন যা রাইনডিয়ার মস্ (*Cladonia* sp.) নামে পরিচিত। প্রাণী জগতের মধ্যে রাইনডিয়ার, মেরুপ্রদেশের খরগোশ, শেয়াল, ভালুক, নেকড়ে এবং নানা ধরনের পরিযায়ী (migratory) পাখীর দেখা মেলে।

(ii) নাতিশীতোষ্ণমণ্ডলের কনিফার অরণ্য : তুন্দ্রা অঞ্চলের সন্নিহিত জায়গায় নাতিশীতোষ্ণমণ্ডলের কনিফার অরণ্য দেখা যায়। আন্তর্মহাদেশীয় এই শীতল অঞ্চলে দীর্ঘ শীতকাল ও হ্রস্ব গ্রীষ্মকাল। কনিফার অরণ্যই এই অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য। এই অঞ্চলে প্রধানতঃ স্প্রুস (spruce), ফার ও পাইন গাছ পাওয়া যায়। এছাড়া খরগোশ, নেকড়ে, ভালুক, শেয়াল, কাঠবেড়ালি প্রভৃতি স্তন্যপায়ী প্রাণী এবং হাইলা (Hyla), রানা (Rana) প্রভৃতি উভচর প্রাণী দেখা যায়।

(iii) নাতিশীতোষ্ণমণ্ডলের পর্ণমোচী অরণ্য : এখানকার আবহাওয়া অনেকটা নিয়ন্ত্রিত। এখানে চওড়া পাতাযুক্ত পর্ণমোচী উদ্ভিদ জন্মায়, যাদের শরৎকালে পাতা ঝরে যাওয়ার ফলে সারা শীতকালে কোন পাতা থাকে না, যতক্ষণ না আবার শীতকালের শেষে নতুন পাতা জন্মায়। ভারতবর্ষে হিমালয় পর্বতে 2700–3700 মিটার উচ্চতায় পাইন, ফার ও জুনিপার গাছের পর্ণমোচী অরণ্য দেখা যায়। আবার তারই নীচের দিকে রডোডেনড্রন গাছের উপস্থিতি। এই অরণ্যে হরিণ, ভালুক, শেয়াল, পার্বত্য সিংহ, কচ্ছপ, সরীসৃপজাতীয় প্রাণী, পালকের শিংযুক্ত পেঁচা (horned owl) ও বাজপাখী দেখা যায়।

(iv) নাতিশীতোষ্ণমণ্ডলের তৃণভূমি : বার্ষিক 25 থেকে 75 সেমি বৃষ্টিপাত তৃণভূমির বৈশিষ্ট্য। এই পরিমাণ বৃষ্টিপাত বনভূমি বজায় রাখার পক্ষে কম, অথচ প্রকৃত মরুভূমির বৃষ্টিপাতের থেকে বেশী। মহাদেশের অভ্যন্তরভাগে এই জাতীয় তৃণভূমি দেখা যায়, যেমন উত্তর আমেরিকার প্রেয়রি (prairie), দক্ষিণ রাশিয়া, সাইবেরিয়া ও এশিয়ার স্টেপ (steppe), আফ্রিকার ভেল্ড (veldt), দক্ষিণ আমেরিকার প্যাম্পাস (pampas)। এখানে লম্বা ও ছোট দুরকমের ঘাস জন্মায়। ছোট ছোট প্রাণী যেমন বুনো কুকুর, কাঠবেড়ালি ও খরগোশ সচরাচর দেখা যায়। তৃণভূমিতে উপস্থিত পাখীর মধ্যে বন মুরগী, মেডো লার্ক (meadow lark) এবং বাজপাখী উল্লেখযোগ্য। এখানে উইপোকা, পঙ্গপাল ও মৌমাছি দেখা যায়। তাছাড়াও প্রচুর সংখ্যায় গিরগিটি ও সাপের দেখা মেলে।

(v) ক্রান্তীয় সাভানা অঞ্চল : ক্রান্তীয় তৃণভূমি অঞ্চলকে সাভানা বলা হয়। এখানে গাছপালা কিছুটা বিক্ষিপ্তভাবে জন্মায়। শুষ্কতা-প্রতিরোধী এই গাছগুলির উচ্চতা সাধারণতঃ 10 মিটারের কম এবং এরা কোনরকম আচ্ছাদন তৈরী করতে পারে না। কাজেই সাভানাকে বনভূমি ও তৃণভূমির মধ্যবর্তী মনে করা চলে। পূর্ব আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া এবং দক্ষিণ আমেরিকার বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে সাভানার উপস্থিতি দেখা যায় এবং এখানে নানাপ্রকার তৃণভোজী স্তন্যপায়ী জীব পাওয়া যায়। বিশেষ করে এখানে নীলগাই, বুনোমোষ, সিংহ, জিরাফ এবং হাতি দেখা যায়।

(vi) মরুভূমি অঞ্চল : অতিরিক্ত শুষ্ক পরিবেশের ফলে মরুভূমির উৎপত্তি হয়। উষ্ণ মরুভূমিতে তাপমাত্রা খুব বেশী, আবার শীতল মরুভূমিতে তাপমাত্রা খুব কম থাকে। পৃথিবীর প্রধান প্রধান মরুভূমিগুলি কর্কটক্রান্তি ও মকরক্রান্তি অঞ্চলে অবস্থিত। এখানে বাৎসরিক বৃষ্টিপাতের মাত্রা 10 মিমিরও কম। লাদাখ অঞ্চলে অনাবৃষ্টির কারণে শীতল মরুভূমি সৃষ্টি হয়েছে। এখানকার গাছপালার পাতাগুলি ছোট মাপের ও রসাল হয়। পতঙ্গ, সরীসৃপ ও ধারালো দাঁতযুক্ত ইঁদুর মরুভূমিতে পাওয়া যায়।

(vii) ক্রান্তীয় বৃষ্টি অরণ্য : বিষুবরেখার কাছাকাছি ক্রান্তীয় বৃষ্টি অরণ্যে সর্বাধিক বিভিন্ন ধরনের জীবসম্প্রদায় দেখা যায়। এখানে বার্ষিক 200 থেকে 225 সেমি বৃষ্টিপাত সারা বছর ধরে মোটামুটি সমানভাবে হয়। ক্রান্তীয় বৃষ্টি অঞ্চল অত্যন্ত ঘন জঙ্গলে পরিপূর্ণ। এখানকার লম্বা লম্বা গাছগুলি সাধারণত লতাগাছ, পরাশ্রয়ী অর্কিড এবং ব্রমেলিয়াড (bromeliad)–এ ঢাকা থাকে। লম্বা গাছের তলায় ছোট ছোট গাছগুলি যেন বিস্তীর্ণ চিরসবুজ গালিচা বিছিয়ে রাখে। এইসব অঞ্চলে প্রচুর সংখ্যায় বিভিন্ন ধরনের অমেরুদণ্ডী ও মেরুদণ্ডী প্রাণীর দেখা মেলে।

সম্প্রতি মোট 16টি বায়োমকে চিহ্নিত করা হয়েছে যার মধ্যে 5টি সমুদ্রভিত্তিক (উন্মুক্ত মহাসাগরসহ) এবং 11টি ভূমিভিত্তিক। ভূমিভিত্তিক বায়োমগুলির মধ্যে উপরে যেগুলি বলা হয়েছে সেগুলি ছাড়াও রয়েছে ভূমিভিত্তিক জলাভূমি (ম্যানগ্রোভ এবং বাদাবন), হ্রদ ও নদী, তুষার পর্বত, মনুষ্যসৃষ্ট কৃষিভূমি অঞ্চল এমন কি নগরাঞ্চলও আলাদা বায়োমের স্বীকৃতি পেয়েছে।

4.2. পৃথিবীর বাস্তুতন্ত্র

পৃথিবীর বাস্তুতন্ত্র অধ্যয়নের জন্য যে বিভিন্ন আবাসে জীবগোষ্ঠীর প্রাধান্য দেখা যায় তার সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা দরকার। এর সাহায্যে আমরা কোন একটি বিশেষ বাস্তুতন্ত্রের অন্তর্গত জীবগোষ্ঠী ও তাদের ভৌত প্রভাবকগুলি সম্বন্ধে ধারণা করতে পারি। পৃথিবীর পৃষ্ঠে তিনটি প্রধান আবাস লক্ষ্য করা যায়। এগুলি হল ভূস্তর বা মৃত্তিকা, জল (নোনাজল, মিঠাজল এবং জলাভূমি) এবং বায়ু। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা ভাল যে বায়ুমণ্ডলে কোন জীব স্থায়ীভাবে বসবাস করে না। এক কথায় বলা যায় যে ভূস্তরে এবং জলেই সর্বাধিক সংখ্যক উদ্ভিদ ও জীবজন্তু পাওয়া যায়।

4.2.1. ভূমিভিত্তিক বাস্তুতন্ত্র

প্রধান প্রধান পরিবেশগত উপাদানের মধ্যে ভূমিকেই তার বয়স, স্থানবিবরণ ও গঠনের দিক থেকে সবচেয়ে বেশী পরিবর্তনশীল মনে হয়। ভূমিভিত্তিক বাস্তুতন্ত্রকে তার আবহমণ্ডল (তাপ, জল, আলো) এবং ভূমির প্রকৃতি বিশেষভাবে প্রভাবিত করে।

উচ্চশ্রেণীর উদ্ভিদ ও জীবজন্তু ভূ-স্তর আশ্রয় করে বেড়ে উঠে। আজকের দিনে সবীজ উদ্ভিদ, পতঙ্গ, উষ্ণরক্তসম্পন্ন মেরুদণ্ডী প্রাণী ভূস্তরের প্রধান জীবগোষ্ঠী। এছাড়া ভূমিভিত্তিক বাস্তুতন্ত্রের উপর ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপ লক্ষ্য করা যায়। বিবর্তনের নিরিখে নিম্নশ্রেণীর জীবগোষ্ঠীর অন্তর্গত জীবাণুসমূহও বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করে।

বড় মূলযুক্ত সবুজ উদ্ভিদ ভূমিতে জন্মায়। এইসব সবুজ উদ্ভিদ অন্য জীবের জন্য খাদ্য ও আশ্রয়ের যোগান দেয়। পৃথিবীর ভূ-স্তর সংরক্ষণ ও পরিবর্তনের ক্ষেত্রে এরা অত্যাবশ্যক ভূমিকা পালন করে। এরাই জমির প্রধান উৎপাদক শক্তি, কারণ কেবল সূর্যের আলো এবং ভূমি থেকে পুষ্টি নিয়ে খাদ্য তৈরী করে। অর্থাৎ এরা স্বভোজী। ভূমির উদ্ভিদকে অবশ্য তার পুষ্টির জন্য অন্য অণুজীবের উপর নির্ভর করতে দেখা যায়। যেমন দেখা যায় মিথোজীবী মাইকোরাইজার (mycorrhiza) ক্ষেত্রে। ছত্রাক ও উদ্ভিদের মূলের মধ্যে ঘটিত পারস্পরিক সম্পর্কের নাম মাইকোরাইজা। এখানে ছত্রাকটি উদ্ভিদের প্রয়োজনীয় ভূমির খনিজ পদার্থ যোগান দেয়, এর পরিবর্তে ছত্রাকটি উদ্ভিদের দেহ থেকে প্রয়োজনীয় শর্করা জাতীয় খাদ্য গ্রহণ করে। ভূমিজ উদ্ভিদ সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রধান হল তৃণ, গুল্ম, বিরুৎ এবং কাষ্ঠলজাতীয় উদ্ভিদ। পরিবেশের তারতম্যের উপর নির্ভর করেও উদ্ভিদ সম্প্রদায়ের শ্রেণীবিভাগ করা যায় যেমন জলজ উদ্ভিদ (hydrophyte), সাধারণ উদ্ভিদ (mesophyte), জাঙ্গল উদ্ভিদ (xerophyte) এবং লবণ জলের উদ্ভিদ (halophyte)। ভূমিতে বসবাসকারী জীব সম্প্রদায়ের আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এখানকার অসংখ্য বিচিত্র ধরনের পতঙ্গ, কঠিন খোলাযুক্ত প্রাণী (shelled animals) এবং পাখীর উপস্থিতি।

4.2.2. সামুদ্রিক বাস্তুতন্ত্র

আমাদের পৃথিবীর চার ভাগের তিন ভাগ সমুদ্রে ঢাকা। এখানে বহু বিচিত্র ধরনের উদ্ভিদ (প্রধানত শেওলা), ছোট ছোট আণুবীক্ষণিক প্রাণী থেকে শুরু করে ছোট চিংড়ি, কাঁকড়া, ঝিনুক, শামুক, মাছ, সরীসৃপ, পাখী ও নানারকম স্তন্যপায়ী প্রাণী দেখা যায়। প্রত্যক্ষভাবে সমুদ্রতীরবর্তী অঞ্চল থেকে এবং পরোক্ষভাবে দূরবর্তী অন্তর্দেশীয় অঞ্চল থেকে নদীবাহিত হয়ে প্রচুর পরিমাণে বর্জ্য পদার্থ সমুদ্রে মেশে।

সমুদ্রের জলে লবণের পরিমাণ খুব বেশী, প্রায় শতকরা 3.5 ভাগের মত। সমুদ্রের জলের উর্বরতা শক্তি মিষ্টজলের তুলনায় খুবই কম। কারণ মিষ্ট জলে নাইট্রেট ও ফসফেট দ্রবীভূত থাকার ফলে তা অনেক বেশী উর্বর।

সামুদ্রিক বাস্তুতন্ত্র বলতে উপকূলভূমি থেকে শুরু করে উন্মুক্ত সাগরের গভীরতম অঞ্চল, এই সব কিছুই বোঝায়। একে কয়েকটি অংশে ভাগ করা যায়—

(i) ভরা জোয়ার অঞ্চল : এটি সমুদ্র উপকূলের সেই এলাকা যেখানে জোয়ারের জল এসে ভূমি ও উদ্ভিদ সবকিছু ঢেকে দেয়।

(ii) মধ্যবর্তী অঞ্চল : এটি হল মরা জোয়ার ও ভরা জোয়ারের মধ্যবর্তী অঞ্চল। এই অঞ্চল কেবল সাময়িকভাবে সমুদ্রের জলে ঢাকা পড়ে।

(iii) উপকূলবর্তী স্থলভাগ অঞ্চল : এটি অগভীর উপকূল অঞ্চল যা প্রধানত সমতলাকার কিন্তু হঠাৎ ঢালু হয়ে গভীর সমুদ্রে ঢাকা পড়ে যায়। এই অঞ্চলে প্রচুর আলো পড়ে এবং সেই কারণে এখানে নানারকম সামুদ্রিক উদ্ভিদ জন্মায়। যেসব উদ্ভিদ সমুদ্রের তলায় পাথরের উপর জন্মায়, তাদের বেন্থিক (benthic) বলা হয় এবং যেগুলি জলের উপরে থাকে, তাদের পেলাজিক (pelagic) বলে। সমুদ্রের এই অঞ্চলকে তীরভূমি অঞ্চল বলা হয়।

(iv) আলোকিত অঞ্চল : অগভীর সমুদ্রতীরবর্তীরেখা থেকে শুরু করে দূরবর্তী সমুদ্র পর্যন্ত এলাকা, যেখানে প্রচুর আলো পড়ে।

(v) স্বল্পালোকিত এবং আলোহীন অঞ্চল : স্বল্পালোকিত এলাকায় আলোর অভাব দেখা যায় এবং আলোবিহীন অঞ্চলে প্রকৃতপক্ষে আলো মোটেই পৌঁছায় না।

(vi) মহাসাগরীয় অঞ্চল : মহাসাগরীয় অঞ্চল বলতে উপকূল থেকে অনেক দূরে অবস্থিত সমুদ্র এলাকাকে বোঝায়। এই এলাকার উপরের দিকে 100–200 মি পর্যন্ত জলের স্তরটি আলোকিত অঞ্চল। 200 মি থেকে প্রায় 2000 মি পর্যন্ত গভীর অঞ্চলকে bathyal অঞ্চল বলে। সমুদ্রের খুব গভীর 2000 মি এর বেশী গভীর অঞ্চলে সালোকসংশ্লেষকারী উদ্ভিদ বাস করতে পারে না, একে অন্তহীন (abyssal) অঞ্চল বলে। আলোর অভাবের ফলে প্রাথমিক উৎপাদক এবং অবশ্যই তৃণভোজী এখানে অনুপস্থিত।

মহাসাগরীয় অঞ্চলে কেবল আলোকিত এলাকায় জীবের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। এখানে আণুবীক্ষণিক জীবসমূহ প্রধান মৌলিক উৎপাদক এবং সেই সঙ্গে এরা বড় মাছের খাদ্য। সমুদ্রতীরে অথবা বেলাভূমিতে সামুদ্রিক জীবগোষ্ঠী অধিক সংখ্যায় দেখা যায় এবং এখানে উদ্ভিদ ও প্রাণীর বৈচিত্র্য সবচেয়ে বেশী। কোন কোন জীব সমুদ্রের তলায় সূক্ষ্ম ছিদ্র তৈরী করে, তাদের বলে ইনফনা (infauna)। আবার কোন কোন জীব সমুদ্রের উপরতলে আবদ্ধ হয়ে বা মুক্ত অবস্থায় বসবাস করে, এদের বলা হয় এপিফনা (epifauna)। অনেক রকম বাণিজ্যিক মাছ এই অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। তিমি ও ডলফিনের মত বড় আকারের স্তন্যপায়ী সামুদ্রিক প্রাণী এবং হাঙর এই অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য। মুক্তাচাষ ও মুক্তাসংগ্রহের মত বাণিজ্যিক বিষয় সামুদ্রিক বাস্তুতন্ত্রের উপর নির্ভরশীল।

4.2.3. মিষ্টজলের বাস্তুতন্ত্র

পৃথিবীর সমগ্র জলময় অঞ্চলের অত্যন্ত ছোট অংশ (মাত্র 3%) জুড়ে মিষ্ট জলের এলাকা রয়েছে। তবে মানুষের ব্যবহারিক প্রয়োজনের দিক থেকে এগুলিই প্রধান স্বাভাবিক জলের উৎস। এইসব জলাশয়গুলির মাপ ও গভীরতা বিভিন্ন রকমের। এগুলি যখন ভূমির সাহায্যে সবদিক থেকে বেষ্টিত থাকে, তখন এদের জল থাকে স্থির, যেমন পুকুর, হ্রদ। নদী বা খালের বেলায় যখন দুদিকে খোলা আর দুদিকে বন্ধ থাকে, তখন তাকে বহতা জল বলা হয়। এই দুই রকম জলাশয়ের বাস্তুসংস্থানগত প্রকৃতি আলাদা, কারণ বহতা নদীর জল প্রবহমান, কিন্তু পুকুর বা হ্রদের মত বদ্ধ জলাশয়ের জল স্থির।

সামুদ্রিক বাস্তুতন্ত্রের মতই গভীরতা, আলোর প্রাবল্য ও তাপের তারতম্যের উপর নির্ভর করে মিষ্ট জলের বাস্তুতন্ত্রকে কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে।

(i) আলোকমণ্ডলের স্তরবিন্যাস ঃ জলের গভীরতা ও স্বচ্ছতার উপর জলাশয়ের আলোকপাতের পরিমাণ নির্ভরশীল। আলোকপাতের তারতম্য অনুসারে মিষ্ট জলের বাস্তুতন্ত্রকে তিনভাগে ভাগ করা যায়—উপকূলভূমি (littoral), লিমনেটিক (limnetic) এবং সুগভীর (profundal) অঞ্চল। হ্রদের কিনারায় থাকে অগভীর উপকূলভূমি। হোগলা, মুথাঘাস, এলিওক্যারিস *(Eliocharis)* এখানে জন্মায়। এছাড়া ভাসমান খুদিপানা, পোস্তপানা, শিকড়যুক্ত শালুক ও পদ্ম কিনারা থেকে দূরে জলের ভিতর দেখা যায়। এই অঞ্চলে পাটশেওলা *(Vallisnaria)*, ওটেলিয়া *(Ottelia)* ও পোটামোগেটন *(Potamogeton)* প্রভৃতি উদ্ভিদ জলে ডুবে থাকে। এখানে আণুবীক্ষণিক উদ্ভিদ ও প্রাণীরও দেখা মেলে। সালোকসংশ্লেষের পক্ষে উপযুক্ত আলো জলের উপরিভাগ থেকে যতটা গভীরে পৌঁছাতে পারে, সেই অংশটিকে লিমনেটিক (limnetic) অঞ্চল বলে। এই অঞ্চলে প্রচুর আণুবীক্ষণিক উদ্ভিদ, বড় বড় ভাসমান শেওলা এবং অন্যান্য বড় মাপের উদ্ভিদ পাওয়া যায়। এগুলিতে সালোকসংশ্লেষের মাধ্যমে উৎপন্ন প্রচুর অক্সিজেন গ্যাস বড় বড় মাছের প্রয়োজন মেটায়। আলোকপাতের পরিমাণ অনুযায়ী বেলাভূমি ও limnetic অঞ্চল আলোকিত এলাকা। গভীর হ্রদের তলদেশকে সুগভীর (profundal) অঞ্চল বলে। এখানে আলোকপাত হয় খুবই অল্প (dysphotic) নয়তো একেবারে অনুপস্থিত (aphotic)। সবুজ উদ্ভিদ বা মৌল উৎপাদক এখানে বাঁচতে পারে না, কারণ এখানে সালোকসংশ্লেষের পক্ষে উপযুক্ত আলোর একান্তই অভাব। বরং এখানে মৃত উদ্ভিদ ও প্রাণীদেহ জলের নীচে প্রবেশ করে ব্যাকটিরিয়া ও ছত্রাকের মত বিয়োজনকারী (decomposer) জীবগোষ্ঠীকে খাদ্যের যোগান দেয়। মাছেরাও এইসব মৃতদেহাবশিষ্ট গ্রহণ করে বেঁচে থাকে।

(ii) তাপের স্তরবিন্যাস ঃ জলস্তরের বিভিন্ন অংশে তাপের তারতম্য অনুসারে একটি হ্রদের বাস্তুতন্ত্রকে তিনভাগে ভাগ করা হয় (i) উপরিভাগের গরম অঞ্চল (epilimnion), (ii) তাপের পরিবর্তনশীল মধ্যবর্তী অঞ্চল (thermocline), এবং (iii) তলদেশের শীতল জলের এলাকা (hypolimnion)।

4.2.4. জলাভূমি বাস্তুতন্ত্র

জলাভূমি এমনই একটি মূল্যবান স্বাভাবিক বাস্তুতন্ত্র যা মানুষের উপকারে লাগে। এখানে বিভিন্ন ধরনের জীবাণু, উদ্ভিদ ও প্রাণীর বাস। জলাভূমি অঞ্চলগুলি ভূমি ও জলাশয়ের মধ্যবর্তী এলাকা। এর উপরিভাগ অল্প জলে ঢাকা থাকে এবং এই অবস্থায় এখানে সাময়িকভাবে জলজ উদ্ভিদ জন্মায়।

যে সব অঞ্চল বছরের অন্তত কিছু সময় 2.5 সেমি থেকে 300 সেমি পর্যন্ত জলে ঢাকা থাকে, তাকেই জলাভূমি বলা হয়। Asian Wetland Bureau-র প্রতিবেদন অনুসারে জলাভূমি বলতে এগুলিকে বোঝায় যেমন খাঁড়ি, ব-দ্বীপ, লবণাক্ত জলাভূমি, ম্যানগ্রোভ অঞ্চল, সমুদ্র তীরবর্তী এলাকা, মিষ্ট জলাভূমি, বাদাবন, নদীনালা, মানুষের তৈরী ধানের ক্ষেত, মাছের পুকুর ইত্যাদি।

জলাভূমি আমাদের অনেক কাজে লাগে, যেমন বন্যা নিয়ন্ত্রণ, জলাশয়ে জলের যোগান, অপরিষ্কার জল পরিষ্কার করে তাতে মাছ চাষের ব্যবস্থা ইত্যাদি। জলাভূমি হল সমৃদ্ধ প্রাণী বৈচিত্র্যের আধার। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে উত্তরোত্তর নগরায়ন ও অন্যান্য কাজকর্মের ফলে জলাভূমিগুলি আজ লোপ পাচ্ছে।

4.2.5. ম্যানগ্রোভ ঃ স্থলভূমি ও সমুদ্রের মধ্যবর্তী বনাঞ্চল

বিষুবরেখা অক্ষাংশে এবং ক্রান্তীয় সমুদ্রতীরে যে অনুপম বনরাজি দেখা যায়, তার নাম ম্যানগ্রোভ। 1977 খ্রীষ্টাব্দে চ্যাপম্যান (Chapman) এই উদ্ভিদ সম্প্রদায়ের নাম দেন ম্যাঙ্গাল (mangal) এবং এই লবণাক্ত বাস্তুতন্ত্রে বসবাসকারী বিশেষ ধরনের উদ্ভিদগুলি ম্যানগ্রোভ (mangrove) নামে পরিচিত। এই লবণাক্ত জমিতে স্থায়ীভাবে বেড়ে উঠা এইসব উদ্ভিদকে পরিবেশের কঠিন পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হয়। এই জাতীয় লবণাম্বু উদ্ভিদ প্রধানত বঙ্গোপসাগরের কাছে গাঙ্গেয়

ব-দ্বীপ অঞ্চলে লবণযুক্ত জমিতে দেখা যায়। এছাড়া পশ্চিমভারতে মুম্বাই এবং কেরলের সমুদ্রতীরে, দক্ষিণ ভারতে গোদাবরী নদীর মোহনায়ও এগুলি দেখা যায়। আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জেও ম্যানগ্রোভ অরণ্য আছে। বিভিন্ন গোত্রের অন্তর্গত প্রধান উদ্ভিদগুলি হল বাইন (*Avicennia*), কাঁকড় (*Bruguiera*), গরান (*Ceriops*), গর্জন (*Rhizophora*), খলসি (*Aegiceros*), তরা (*Aegialitis*), গেঁও (*Excoecaria*), লগানকুলারিয়া (*Laguncularia*), গোলপাতা (*Nipa*), লুমনিটজেরা (*Lumnitzera*), গরিয়া (*Kandelia*), ধুঁধুল (*Xylocarpus*), কেওড়া (*Sonneratia*), হেঁতাল (*Phoenix*), সুন্দরী (*Heritiera*)। সম্ভবতঃ সুন্দরী থেকেই আমাদের সুন্দরবনের নামকরণ হয়েছিল, তবে সুন্দরবনে এদের সংখ্যা এখন খুবই কম।

চিত্র 4.1. সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ অরণ্যে ভিজে কাদামাটি থেকে উপরে উঠে এসেছে উদ্ভিদের শ্বাসমূল (নিউম্যাটোফোর – pneumatophore)। (ডঃ কুমুদরঞ্জন নস্করের সৌজন্যে প্রাপ্ত)।

ম্যানগ্রোভের অভিযোজনগত বৈশিষ্ট্য এই রকম—

1. কেওড়া ও বাইন ইত্যাদির শ্বাসমূল থাকে। একে নিউম্যাটোফোর (pneumatophore) বলে এবং এর সাহায্যে এরা কর্দমাক্ত ও জলমগ্ন জমিতে অক্সিজেন গ্রহণ করে।

2. গর্জন, বাইন এবং গরিয়া প্রভৃতি ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদের বিশেষ আকারের ফল হয় এবং ফলের মধ্যেই এর বীজগুলির জরায়ুজ অঙ্কুরোদ্গম (viviparous germination) হয়। এইভাবে এরা শৈশবদশা সংক্ষিপ্ত করে শীঘ্র জমিতে আশ্রয় নেয় এবং স্বাভাবিকভাবে বড় হয়।

3. ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদের আর একটি অভিযোজন হল ঠেসমূল যেগুলি উদ্ভিদের প্রধান কাণ্ড থেকে উৎপন্ন হয়ে তাকে নরম জমিতে সুষ্ঠুভাবে নিবদ্ধ থাকতে সাহায্য করে।

4.3. পরিবেশে উদ্ভিদ ও প্রাণীর বসবাস : পারস্পরিক সম্পর্ক ও আন্তঃক্রিয়া

জীবগোষ্ঠীর জীবনকে প্রভাবিত করে এমন পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে সামগ্রিকভাবে পরিবেশ বলা হয়। একেবারে নিম্নশ্রেণীর জীব থেকে শুরু করে মানুষের মত উচ্চশ্রেণীর জীব, সবকিছুরই নিজস্ব পরিবেশ রয়েছে। ভারতবর্ষ ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার অঞ্চলগুলি উদ্ভিদসম্পদে সমৃদ্ধ এবং এগুলি নানারকম চাষযোগ্য উদ্ভিদের জন্মস্থান। এই সব অঞ্চলে নিম্নলিখিত প্রয়োজনীয় উদ্ভিদ চাষবাস করা হয়—ধান, গম, বাজরা, সয়াবিন, মটর প্রভৃতি শিম্বজাতীয় উদ্ভিদ, শসা, বেগুন, কলা, লেবু,

আম, মরিচ, সুপারী, খয়ের, সাগু, নারিকেল, দারচিনি, জায়ফল, চা, তুলা, পাট, চুপড়ি আলু, মানকচু, কচু, ওল, অর্কিড, রডোডেনড্রন, জুঁই এবং কিছু বহিরাগত গাছ যেমন রবার গাছ ও তৈল পাম (oil palm)।

এইসব অঞ্চল প্রাণীবৈচিত্রেও সমৃদ্ধ। হাজার হাজার প্রজাতির পতঙ্গ, কঠিন খোলাযুক্ত প্রাণী (চিংড়ি, কাঁকড়া) এবং শামুক জাতীয় অমেরুদণ্ডী প্রাণী, এছাড়া মাছ, উভচরপ্রাণী, সরীসৃপ, পাখী ও স্তন্যপায়ী প্রাণী পাওয়া যায়। এরই সঙ্গে বিচিত্র রকমের গৃহপালিত প্রাণী যেমন গরু, মোষ ও ছাগলের দেখা মেলে। এছাড়া জীবগুলের অতি প্রয়োজনীয় অংশ ব্যাকটিরিয়া ও ছত্রাক মৃত জীবদেহের পচনকাজ এবং উদ্ভিদ ও প্রাণীদেহে পুষ্টি যোগানের ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

পরিবেশের প্রায় সব দশারই উদ্ভিদ ও প্রাণীর জীবনে কার্যকর প্রভাব রয়েছে একথা ঠিক, তবে এর সবগুলি কিন্তু একযোগে প্রভাব ফেলে না। কোন একটি প্রভাব খুব বেশী পরিমাণে থাকলে যখন তা কোন জীবের পক্ষে সহ্যের মাত্রা ছাড়িয়ে যায়, তখন তা ক্ষতিকর মনে হতে পারে, আবার তা প্রয়োজনের তুলনায় কম হলেও ক্ষতিকারক হয় কারণ তখন কোন জীব বেঁচে থাকতে পারে না। যেমন প্রতিটি উদ্ভিদের পক্ষে সহনীয় সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমান রয়েছে এবং সেই দুটি সীমার মধ্যে একটি অংশে জীবন ধারণের পক্ষে সব থেকে সন্তোষজনক। পরিবেশের শর্তগুলির মিলিত প্রভাব নির্ভর করে উদ্ভিদের জীবনচক্রের বিভিন্ন দশার উপর। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় যে জলাভূমিতে যেসব উদ্ভিদ জন্মায় তাদের বীজের অঙ্কুরোদ্গমের জন্য যা জলের প্রয়োজন তা একটি বয়স্ক উদ্ভিদের প্রয়োজনীয় জলের তুলনায় অনেক বেশী। বাস্তুসংস্থান অধ্যয়ন করতে গিয়ে আমরা দেখি যে কোন একটি প্রভাবক যদি তীব্র হয়, তবেই তা অন্য একটির অভাব পূরণ করতে পারে। জলের প্রাচুর্যই হোক বা কুয়াশা বা কম উত্তাপই হোক, এর প্রতিটিই কিন্তু কম বৃষ্টিপাতের পরিপূরক। আবার এও প্রমাণিত সত্য যে জমির একটি পুষ্টি পদার্থের গুণাগুণ জমিতে উপস্থিত অন্যান্য পদার্থের পরিমাণের উপর নির্ভর করে। কাজেই উদ্ভিদের বেলায় বিভিন্ন ধরনের পরিবেশ সহ্য করার ক্ষমতা থাকে, কারণ একটি প্রভাবকের অভাব অন্যগুলি পূরণ করে দেয়।

প্রাণীজগতের উপস্থিতি ও প্রাচুর্য পরিবেশের বিভিন্ন শর্ত যথা উত্তাপ, জলীয় বাষ্পের পরিমাণ, অম্লতা, লবণের পরিমাণ এবং অক্সিজেনের চাহিদার উপর নির্ভর করে। দেখা গেছে যে প্রধান চারটি উপায়ে জীবগোষ্ঠী পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নেয়—শারীরিক গঠনের অভিযোজন, শারীরবিদ্যা বিষয়ের সমন্বয়, আচরণের প্রকৃতি এবং সম্প্রদায়ের মধ্যে পরস্পরের সম্পর্ক। একথাও সত্য যে দুটি জীব বিভিন্ন উপায়ে আন্তঃক্রিয়া সম্পন্ন করে যেমন খাদ্য খাদক সম্পর্ক, পরভোজী অবস্থা, পারস্পরিক সুবিধাজনক সম্পর্ক এবং দাতাগ্রহীতার সম্পর্ক।

4.4. অরণ্য বাস্তুসংস্থান

অরণ্যের সঙ্গে পরিবেশের পারস্পরিক আদানপ্রদানের বিষয়ে অধ্যয়নের নাম অরণ্য বাস্তুসংস্থান বা অরণ্য বাস্তব্যবিজ্ঞান। অরণ্য বাস্তুসংস্থান বলতে অরণ্যের সঙ্গে পরিবেশের আদানপ্রদানের সম্পর্ককে বোঝায়। যেহেতু বনভূমি পৃথিবীর জনসমষ্টির ব্যক্তিগত ও অর্থনৈতিক প্রয়োজন মেটায় সেজন্য অরণ্য বাস্তুসংস্থান অধ্যয়নের জন্য অরণ্যের স্বাভাবিক ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব নির্ণয়কারী সবগুলি শর্তের সম্যক জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। সেই কারণে বনভূমি রক্ষণাবেক্ষণের কাজটি অরণ্য বাস্তুসংস্থানের একটি প্রয়োজনীয় শর্ত। কাজেই অরণ্য বাস্তুসংস্থানকে উদ্ভিদ বাস্তুসংস্থানেরই একটি ব্যবহারিক রূপ হিসাবে মনে করা হয়।

4.4.1. অরণ্যের প্রয়োজনীয়তা

অরণ্যই হল সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ জীবিত সম্পদের আধার এবং এটি সারা পৃথিবী জুড়ে জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে উঠেছে। পৃথিবীর বনাঞ্চলগুলি মানুষের কাছে অশেষ মূল্যবান কারণ এগুলি দেশের অর্থনৈতিক বিকাশ, পরিবেশের সঠিক মান সংরক্ষণ, দেশের দরিদ্রতর অংশের জীবিকার ব্যবস্থা নিশ্চিত করে এবং গ্রামের মানুষের মৌলিক

প্রয়োজন মেটায়। বনভূমি কেবল কাঠ, সুতো, জ্বালানি এবং আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে তাই নয়, সেইসঙ্গে ভূমি সংরক্ষণ, আবহাওয়া ও পরিবেশের স্থায়িত্বও বজায় রাখে।

4.4.2. বনভূমি রক্ষণাবেক্ষণ

বিভিন্ন কারণে আজ বনভূমি হ্রাস পাচ্ছে। নগরায়নের প্রয়োজনে অবাধে বৃক্ষচ্ছেদন, শিল্প স্থাপন, খনি পত্তন, সাংসারিক ও অন্যান্য কাজে জ্বালানি কাঠের যথেচ্ছ ব্যবহার এ সবকিছুই বনভূমি ধ্বংসের কারণ। বন দপ্তরের সরকারী পরিসংখ্যান অনুযায়ী 1952 থেকে 1972-এর মধ্যে ভারতবর্ষে প্রায় 3.4 মিলিয়ন হেক্টর বনভূমি নদীবাঁধ তৈরী, নতুন চাষের জমি, রাস্তা ও শিল্প স্থাপনের জন্য নষ্ট হয়েছে। এর অর্থ দাঁড়ায় যে এক বছরে প্রায় 0.15 মিলিয়ন (দেড় লক্ষ) হেক্টর বনভূমি হ্রাস পাচ্ছে। বনভূমি হ্রাসের এই হার যদি অব্যাহত থাকে, তাহলে 20 বছরের মধ্যে এর সম্পূর্ণ বিনাশের আশঙ্কা রয়েছে।

বনভূমি নিয়ন্ত্রণ ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল ভূমি সংরক্ষণ ও উন্নয়ন, বিশেষ করে যখন কোন কারণে ভূমিক্ষয়ের সম্ভাবনা দেখা দেয়। এছাড়া বনভূমি এমনভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা দরকার যাতে বনজ পণ্য নিয়মিত সরিয়ে নিলেও যেন আগামী দিনে বনজ উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। সঠিকভাবে বন নিয়ন্ত্রণের জন্য চাই যথেষ্ট পরিমাণে নতুন বনসৃজন। বীজের সাহায্যে বা কপিসের (coppice) মাধ্যমে বনসৃজন করা যায়। কপিস প্রথায় গাছের নীচের দিকে প্রায় এক মিটার অংশ রেখে উপরের অংশ কেটে নেওয়া হয় এবং সেখান থেকে নতুন গাছ উৎপন্ন হয়। বন সৃজন ও রক্ষণাবেক্ষণ বলতে গৃহ নির্মাণের এবং অন্যান্য কাজের উপযোগী কাঠ পাওয়া যায় এমন গাছের চাষ ও উৎপাদন করা বোঝায় এবং এরই অপর নাম বনবিদ্যা। বনবিদ্যার মাধ্যমে বন রক্ষণাবেক্ষণ করতে গেলে সেখানকার আবহাওয়ার খোঁজ খবর, জলনিকাশী ব্যবস্থা, গুরুত্বপূর্ণ উদ্ভিদ প্রজাতির বাস্তুসংস্থানগত জীবনচক্রের সম্যক ধারণা এবং এদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক এ সবকিছুরই জ্ঞান থাকা দরকার।

4.4.3. বনভূমি সংরক্ষণ

বনসম্পদের যথাযথ সংরক্ষণ ও পালন বনভূমি পরিচালনার অন্তর্গত। ভারতবর্ষে 1972 খ্রীষ্টাব্দে 'গাছ বাঁচাও' এই উদ্দেশ্যে সংঘবদ্ধ আন্দোলন আরম্ভ হয় যা পরবর্তীকালে "চিপ্‌কো আন্দোলন" (Chipko movement) নামে খ্যাতিলাভ করেছে। এই আন্দোলনের ফলে বনভূমি ও বনজ উদ্ভিদ সংরক্ষণের ব্যাপারে সারাদেশ জুড়ে চিন্তাভাবনা শুরু হয়েছে। জীবগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য ও সম্পদের সঙ্গে বনভূমির অখণ্ডতা ও স্বাভাবিক ধর্ম ওতপ্রোতভাবে জড়িত। মানুষের ব্যক্তিগত জমিতেই হোক বা রেললাইনের ধারে, নদী বাঁধ বা পুকুর পাড়ের খালি জমিতেই হোক, সর্বত্রই বৃক্ষরোপণ করা যেতে পারে। বনসৃজনের উদ্দেশ্য দুরকমের—(1) সুপরিকল্পিত উপায়ে সবুজ বেষ্টনী সৃষ্টি করে প্রাকৃতিক দৃশ্যের পরিবর্তন এবং (2) বিশেষ ধরনের বৃক্ষরোপণের সাহায্যে সাধারণ মানুষের জীবিকা নির্বাহ ও অর্থকরী সম্পদের ব্যবস্থা।

4.5 স্থায়ী বাস্তুতন্ত্র বজায় রাখার সমস্যা

স্বাভাবিক অবস্থায় কোনও একটি বাস্তুতন্ত্রের স্থায়ীভাবে থাকারই প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু কোনভাবে যদি বাস্তুতন্ত্রের উপাদানগুলির প্রকৃতিগত বা পরিমাণগত পরিবর্তন হয়, তাহলে এর স্থায়িত্ব বজায় রাখা সম্ভব হয় না। এক কথায় বলতে গেলে এর ফলে বাস্তুতন্ত্রের স্বরক্ষণ ও স্বনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বিপন্ন হয় যা পরিবেশের সুরক্ষার পক্ষে হানিকারক। পরিবেশের এই অবস্থা শেষ পর্যন্ত মানুষের জীবনে দুঃখকষ্ট ডেকে আনে। সেইজন্য পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখতে গেলে পরিবেশের গতি প্রকৃতির উপর যতটা কম হস্তক্ষেপ হয় ততটাই মঙ্গল। কিন্তু একথা সত্য যে স্বাভাবিক বাস্তুতন্ত্রের উপাদানগুলির মধ্যে যে সূক্ষ্ম যোগাযোগ রয়েছে, তা না বুঝে এবং সঠিক বিচার না করে মানুষ প্রায়ই এর গঠন ও প্রকৃতির ব্যাঘাত ঘটায়।

পঞ্চম অধ্যায়

জনসংখ্যা ও পরিবেশ

অধ্যায় সূচী

5.1. ধারণ ক্ষমতা : জনসংখ্যা বৃদ্ধির সীমা

বিশ্বে মনুষ্যকুলকে অপেক্ষাকৃত নবাগত বলা যেতে পারে। এদের কোন বিশেষ প্রতিরোধ ক্ষমতা নেই। অন্যান্য জীবকুলের সঙ্গে তারাও বিলুপ্তি প্রক্রিয়ার অংশীদার। আশঙ্কা করা হচ্ছে যে, পৃথিবীতে জীবন-পোষক বাস্তুতন্ত্র বিঘ্নিত হবার কারণে বেশ কয়েক প্রজন্মের মধ্যেই মানুষ নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে। বাস্তুতন্ত্রের সংজ্ঞা হল বিভিন্ন জীবের মধ্যে এবং তাদের শারীরবৃত্তীয় ও জৈবিক পরিবেশের মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরশীলতা ও পারস্পরিক সম্পর্কের জাল।

মানুষ প্রকৃতি ছাড়া বাঁচতে পারে না। জীবজগতের পরিমণ্ডল থেকে খুব দূরেও তারা বাঁচতে পারে না। প্রাকৃতিক অবস্থা বিপর্যস্ত হবার দরুন মানুষের স্বাস্থ্যহানির সূচনা হচ্ছে। এর কারণ আমরা জীবমণ্ডলের ধারণ বা বহন ক্ষমতা অতিক্রম করে যাচ্ছি। ধারণক্ষমতা বলতে আমরা বুঝি পৃথিবীর আত্তীকরণ, পূরণ ও পুনরুদ্ধারের ক্ষমতা। সাম্প্রতিক কয়েক দশক ধরে মানুষের কর্মকাণ্ডের ফলে পৃথিবী ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছে। এর ফলে কয়েকটি মুখ্যসমস্যার সৃষ্টি হয়েছে যেমন—গ্রীণহাউস গ্যাসের বর্ধিত নিঃসরণ, আন্তর্আকাশ ওজোনস্তরে ক্ষতি, ভূগর্ভস্থ জলস্তরের সংকোচন ও বর্ষণ অরণ্যের (rain forest) ধ্বংস। তারা পৃথিবীর উৎপাদনশীলতা (মাটি, বন, মহাসাগর ও জীববৈচিত্র্যের) অথবা স্থায়িত্ব (আবহাওয়া, সমুদ্রস্তর, অতি বেগুনী রশ্মির পরিশ্রুতির) ইত্যাদি ব্যাহত করছে। পরিবেশের ধারণক্ষমতা একটি প্রয়োজনীয় উপাদান কিন্তু এটি যথাযথভাবে বর্ণিত একটি ধারণা নয়। কোন একটি জনসংখ্যাকে পোষণ করার জন্য যে একটি ক্ষমতা প্রয়োজন এটি তারই ইঙ্গিত বহন করে। ধরা যাক, কোন একটি প্রচলিত কৃষিব্যবস্থা x ক্যালোরি উৎপন্ন করে এবং প্রতিটি মানুষের জীবনধারণের জন্য ন্যূনতম প্রয়োজন y ক্যালোরি। তাহলে ঐ ব্যবস্থার ধারণক্ষমতাকে নির্ণয় করা যাবে x/y অর্থাৎ প্রতি বর্গ কিলোমিটার জমিতে কতজন মানুষ বসবাস করতে পারেন। কোন নির্দিষ্ট অঞ্চলের ধারণক্ষমতা বলতে সেখানকার অভিপ্রেত জনসংখ্যার পরিমাণকে বোঝায়

না। কারণ ঐ অঞ্চলের সর্বাধিক জনসংখ্যাকে জীবনযাত্রার ন্যূনতম পর্যায়ে বাঁচিয়ে রাখার জন্য যে ক্ষমতা দরকার তাকেই ধারণক্ষমতা বলে। সর্বাধিক জনসংখ্যাকে ন্যূনতম জীবনযাত্রার পর্যায়ে শুধুমাত্র বাঁচিয়ে রাখাই কোন ব্যবস্থার অভিপ্রেত লক্ষ্য হতে পারে না।

রাষ্ট্রসংঘের খাদ্য এবং কৃষি সংক্রান্ত সংস্থা (FAO) সারা বিশ্বের ধারণক্ষমতার উপর বিস্তারিত পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালায়। 117টি দেশের প্রত্যেকটির সম্ভাব্য খাদ্য উৎপাদনকে বিবেচনা করা হয়। যেহেতু সম্ভাব্য খাদ্য উৎপাদন কৃষিতে কি প্রকার প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে তার উপর নির্ভরশীল এবং যেহেতু প্রযুক্তি প্রয়োগ বিভিন্ন স্তরের হতে পারে, FAO নিম্নলিখিত তিনধরণের স্তরবিন্যাসের কথা বিবেচনা করেছে—

(ক) নীচুস্তর : চিরাচরিত শস্য উৎপাদনে যে প্রযুক্তি সার, কীটনাশক অথবা আগাছানাশক ব্যবহার করে না, যে প্রযুক্তির নিজস্ব কোন দীর্ঘমেয়াদী সংরক্ষণ ব্যবস্থা নেই।

(খ) মধ্যবর্তী স্তর : যে প্রযুক্তিতে কিছু পরিমাণ সার, ছত্রাক নাশক, কীট বা আগাছানাশকের এবং কিছু উন্নতমানের শস্যের ব্যবহার আছে এবং যার নিজস্ব মৌলিক সংরক্ষণ পদ্ধতি আছে।

(গ) উচ্চ স্তর : যে প্রযুক্তিতে পুরোমাত্রায় সার ও ছত্রাক নাশক, কীট ও আগাছানাশকের এবং উন্নত মানের শস্যের ব্যবহার হয়, তাছাড়া উপযুক্ত সংরক্ষণের ব্যবস্থা এবং সবথেকে ভালো কৃষি ব্যবস্থাপনা আছে।

এই বিভিন্ন ধরনের প্রযুক্তির স্তরবিন্যাসের প্রেক্ষাপটে শস্যের সম্ভাব্য ক্যালোরির উৎপাদন নির্ণয় করা হয়। শস্যের এই সম্ভাব্য ক্যালোরি উৎপাদনকে FAO ও WHO অনুমোদিত প্রতিটি দেশে মাথাপিছু ক্যালোরি গ্রহণ দ্বারা ভাগ করে 1975 ও 2000 সালের জন্য প্রতিটি দেশে কি আয়তনের জনসংখ্যা বাঁচিয়ে রাখা যায়—তার সম্ভাব্য হিসাব করা হয়েছে।

নীচের সারণীতে এই ফলাফল উপযুক্তভাবে বিবৃত হল। এখানে 2000 সালে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের প্রযুক্তির বিভিন্ন স্তরে সম্ভাব্য যে জনসংখ্যাকে বাঁচিয়ে রাখা যাবে তাকে প্রত্যাশিত জনসংখ্যার অনুপাত হিসাবে দেখানো হয়েছে।

সারণী 5.1. বিশ্বের নানা অঞ্চলের ধারণক্ষমতা (জনসংখ্যা প্রতি বর্গ কিলোমিটার) তিনপ্রকার প্রযুক্তিস্তরে

প্রযুক্তি স্তর	আফ্রিকা	দ. প. এশিয়া	দ. আমেরিকা	মধ্য আমেরিকা	দ.পু. এশিয়া	গড়
নীচু	1.6	0.7	3.5	1.4	1.3	1.6
মধ্যবর্তী	5.8	0.9	13.3	2.6	2.3	4.2
উচ্চ	16.5	1.2	31.5	6.0	3.3	9.3

উপরোক্ত সারণীতে দেখা যাচ্ছে যে দক্ষিণ পশ্চিম এশিয়াকে বাদ দিলে সর্বনিম্ন প্রযুক্তি স্তরেও অন্য সব অঞ্চলগুলি তাদের প্রত্যাশিত জনসংখ্যার থেকেও বেশী জনসংখ্যাকে 2000 সালের মধ্যে ধারণ করতে সক্ষম। একটু বেশী উঁচু প্রযুক্তিস্তরে উন্নতশীল পৃথিবী সামগ্রিকভাবে 2000 সালে তার প্রত্যাশিত জনসংখ্যার তুলনায় 9.3 গুণ বৃহৎ জনসংখ্যাকে ধারণ করতে সক্ষম। অর্থাৎ প্রযুক্তি স্তর যত উন্নত হয় অঞ্চলগুলির ধারণক্ষমতাও উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। এই সারণীতে তাই আশাবাদী চিত্র পাওয়া যায়। ধারণক্ষমতার প্রভূত উন্নতি বিধানের ব্যাপারে প্রযুক্তির উৎকর্ষসাধন যে গুরুত্বপূর্ণ তা স্পষ্ট। কিন্তু এই চিত্র যতটা আশানুরূপ বলে মনে হচ্ছে ততটা আশানুরূপ নয়।

এটা প্রথমেই বলা প্রয়োজন যে ধারণক্ষমতা বলতে শুধুমাত্র সর্বাধিক যে পরিমাণ জনসংখ্যাকে কোন নির্দিষ্ট সম্পদ ধারণ করতে পারে তাকে বোঝায়, তা কখনোই অভিপ্রেত জনসংখ্যাকে ধারণ করার কথা বলে না।

দ্বিতীয়তঃ ধারণক্ষমতা সবসময় ন্যূনতম ক্যালোরি গ্রহণের সঙ্গে সংযুক্ত এবং সেই কারণে এই ধরনের প্রক্রিয়াতে পুষ্টির মাত্রা বাড়ানোর কোন অবকাশই নেই।

তৃতীয়তঃ 2000 সালের সময়সীমার মধ্যে প্রযুক্তি প্রয়োগের প্রক্রিয়াতে এমন কিছু উন্নতি ঘটানো সম্ভব নয় যার ফলে উচ্চ প্রযুক্তির বাস্তবে কোন প্রাসঙ্গিকতা থাকতে পারে।

চতুর্থতঃ এই প্রক্রিয়াতে ধরে নেওয়া হয়েছে যে যাবতীয় চাষযোগ্য জমি শুধুমাত্র খাদ্যশস্য উৎপাদনের জন্যই ব্যবহৃত হয় যা স্পষ্টতঃই সম্ভাব্য প্রক্রিয়ার অতিরঞ্জন।

প্রকৃতপক্ষে পরিস্থিতি আরও খারাপও হতে পারে। FAO-র পর্যালোচনা শুধুমাত্র খাদ্যশস্য সম্পর্কিত ধারণক্ষমতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। অন্যান্য সম্পদের অভাব সম্পর্কিত কোন আলোচনা এতে নেই অথচ তার যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে, যে প্রভাব জমির অভাবে পৌঁছবার আগেই কার্যকরী হতে পারে।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, জ্বালানী কাঠের লভ্যতা সম্পর্কে কোন তথ্য নেই। পশ্চিম আফ্রিকার সাহেলিয়ান ও সুদানীয় অঞ্চলের উপর একটি পর্যালোচনা থেকে দেখা যায় যে সেখানকার বিভিন্ন অঞ্চলের শস্য, পশুশক্তি ও জ্বালানী কাঠের সীমা দ্বারা ধারণক্ষমতা নির্ধারিত হয়। নিম্নে এর ফলাফলগুলি প্রদত্ত হল।

সারণী 5.2. পশ্চিম আফ্রিকার সাহেলিয়ান ও সুদানীয়ান অঞ্চলের ধারণক্ষমতা (প্রতি বর্গ কিমি-তে জনসংখ্যা)

অঞ্চল	পোষণ সম্ভব জনসংখ্যা			প্রকৃত গ্রামীণ জনসংখ্যা	পোষণসম্ভব জনসংখ্যা : জ্বালানী কাঠ	প্রকৃত মোট জনসংখ্যা
	শস্য	গৃহপালিত পশু	মোট			
সাহারাণ	—	0.3	0.3	0.3	—	0.3
সহেলো-সাহারাণ	—	0.3	0.3	2	—	2
সাহেলিয়ান	5	2	7	7	1	7
সহেলো-সুদনীয়ান	10	5	15	20	10	23
সুদানীয়ান	15	7	22	17	20	21
সুদানো-গিনিয়ান	25	10	35	9	20	10

এখানে দেখা যাচ্ছে যে জ্বালানী কাঠের ধারণক্ষমতা চিরাচরিত প্রযুক্তি দ্বারা উৎপন্ন শস্যের ধারণক্ষমতা থেকে কম। আবার তিনটি অঞ্চলের জ্বালানী কাঠের ধারণক্ষমতা ইতিমধ্যেই অতিক্রান্ত হয়েছে। তুলনামূলকভাবে অন্য তিনটি অঞ্চলে খাদ্যশস্য ও পশুশক্তির ধারণক্ষমতা অতিক্রান্ত হয়েছে। সুতরাং ধারণক্ষমতা সম্পর্কে সারা বিশ্বের বিভিন্ন এলাকার সাধারণ চিত্র সম্পদের সামগ্রিক ধারণক্ষমতার সমস্যাকে লঘু করে দেখায়। আসল কথা হল কোন্ সম্পদের অভাব প্রথমে সংকট সৃষ্টি করে, সেটা দেখা।

5.1.1. বিশ্বে জনসংখ্যার বন্টন (বিশেষতঃ উন্নয়নশীল দেশসমূহে জনসংখ্যার গতিশীলতা)

এটি উপলব্ধি করার বিশেষ প্রয়োজন আছে যে 1700 সালের কাছাকাছি সময় থেকে শুরু করে বর্তমান শতাব্দী পর্যন্ত ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার জনসংখ্যা (আধুনিক উন্নত জগতের অধিকাংশই) শুধু যে চরমভাবেই বৃদ্ধি (absolute increase) পেয়েছে তা নয়, উন্নয়নশীল জগতের জনসংখ্যার তুলনায় আপেক্ষিক ভাবেও বৃদ্ধি (relative increase) পেয়েছে। জনসংখ্যার এ পরিবর্তন লক্ষ্য করার জন্য একটি দীর্ঘমেয়াদী প্রেক্ষাপট থাকা দরকার। নিম্নে প্রদত্ত সারণীটি নেওয়া হয়েছে গত কয়েক দশকের বিশ্ব জনসংখ্যার সংশোধিত গণনা থেকে। রাষ্ট্রসংঘের ডেমোগ্রাফিক ইয়ার বুকে 1995 সালের জনসংখ্যার হিসাবটি এটির সাথে যুক্ত করা হয়েছে।

সারণী 5.3. বিভিন্ন মহাদেশে বিশ্ব জনসংখ্যার ভৌগোলিক বন্টন

	1650	1750	1800	1850	1900	1933	1995
বিশ্ব জনসংখ্যা (মিলিয়ন)	545	728	906	1171	1608	2057	5716
শতকরা বন্টন							
ইউরোপ	18.3	19.2	20.7	22.7	24.9	25.2	12.7
উ. আমেরিকা	0.2	0.1	0.7	2.3	5.1	6.7	5.1
ওসিয়ানিয়া	0.4	0.3	0.2	0.2	0.4	0.5	0.5
লাতিন আমেরিকা	2.2	1.5	2.1	2.8	3.9	6.1	8.4
আফ্রিকা	18.3	13.1	9.9	8.1	7.4	7.0	12.8
এশিয়া	60.6	65.8	66.4	63.9	58.3	54.5	60.5

উৎস : Carr-Saunders, A. M. World Population : Past Growth and Present Trends (1936), and Demographic Year Book (United Nations, 1995).

এই সারণীটি কয়েক শতাব্দী আগের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ধারণা দেয়। 1995 সালের পরিসংখ্যাটি আলাদা করলে 1650 থেকে 1933 সাল পর্যন্ত জনসংখ্যার শতাংশের বিন্যাস পর্যালোচনা করা যায়। দেখা যায় যে আফ্রিকাতে এই শতাংশে ক্রমশঃ

হ্রাস পেয়েছে। এর কারণ একটি বিশাল সংখ্যক জনসংখ্যার দেশান্তরগমন। আরও লক্ষ্য করা যায় যে উত্তর আমেরিকাতে এই শতাংশের ক্রমশঃ বৃদ্ধি ঘটেছে। কারণ উত্তর আমেরিকাতে অন্যান্য বহু দেশ থেকে জনসংখ্যার আগমন ঘটেছে। আবার অন্যদিকে ইউরোপ থেকে জনসংখ্যা অন্য দেশে গমন করলেও বিশ্বের জনসংখ্যায় তার জনসংখ্যার অনুপাত ঐ একই সময়ে বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশেষতঃ, প্রথম স্তম্ভ ও ষষ্ঠ স্তম্ভ লক্ষ্য করলে দেখা যায় 1650 থেকে 1933 সালের মধ্যে পরিস্থিতির কিভাবে পরিবর্তন ঘটেছে। এখানে আমরা যা লক্ষ্য করছি তা হল যে সময়ে ইউরোপের জনসংখ্যার পরিবর্তন ঘটতে শুরু হয়েছে, সেই একই সময়ে উন্নয়নশীল জগতের একটি বিরাট অংশ জনবিন্যাস ইতিহাসের প্রাথমিক পর্যায়েই সীমাবদ্ধ। 1650 সালে ইউরোপের জনসংখ্যা ছিল প্রায় দশকোটি। 1933 সালে দেশান্তরে গমন সত্ত্বেও জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হয় 50 কোটি।

সারণীর শেষ স্তম্ভটি 1995 সাল সম্পর্কিত। সেখানে একটি বিপরীত চিত্র লক্ষ্য করা যাচ্ছে। 1650 থেকে 1933 সালের মধ্যে এশিয়ায় জনসংখ্যা বণ্টন যে 6 শতাংশ পয়েন্ট হ্রাস পেয়েছিল তা প্রায় 1650 সালের অবস্থায় ফিরে গেছে। আফ্রিকাও ফিরে গেছে। কিন্তু এখনও 1650 সালের অবস্থায় ফিরে যায় নি। উন্নতি ঘটেছে উত্তর আমেরিকা ও লাতিন আমেরিকার ক্ষেত্রে। উন্নয়নশীল জগতের সামগ্রিক অবস্থানের পরিবর্তনেরও একটি মোটামুটি ব্যাখ্যা দেওয়া যেতে পারে।

1650 সালে এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকা সম্মিলিত জনসংখ্যার শতাংশ ছিল 81.1। 1933 সালে তা কমে দাঁড়ায় 67.6 এ। 1995 সালে এটি হয় 81.7। অর্থাৎ চাকা পুরো ঘুরে এসেছে। উন্নত দেশের সরকারগুলির যা উদ্বেগের কারণ তা শুধু জনসংখ্যা বৃদ্ধি নয়, আপেক্ষিক জনসংখ্যার বৃদ্ধি। একটি বিশাল জনসংখ্যার অর্থ হল অধিকতর দারিদ্র্য এবং মাথাপিছু স্বল্প সম্পদের অধিকার। কিন্তু আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এর অর্থ হল অধিকতর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা। যে উন্নত দেশগুলির সরকার উন্নয়নশীল দেশগুলিতে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের পক্ষপাতী, সেই দেশগুলির সরকারই নিজেদের দেশে জন্মমুখী নীতি অনুসরণে আগ্রহী।

অথচ আমরা ভবিষ্যতের গতিপ্রকৃতি নিয়ে উদাসীন হতে পারি না। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সুফল উপলব্ধি করতে ইউরোপ ও আমেরিকার 282 বছর লেগেছে আর মাত্র 62 বছরেই সেই সুফল তাদের হাতছাড়া হয়েছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির এই প্রবণতাগুলি যদি ভবিষ্যতে বজায় থাকে তাহলে আমরা ভয়াবহ জনসংখ্যা বিস্ফোরণের সম্মুখীন হব এবং এর একটি বড় অংশ উন্নয়নশীল দেশগুলির ক্ষেত্রে ঘটবে।

অবশ্যম্ভাবী এই ভবিষ্যতের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে উন্নত দেশ ও উন্নয়নশীল দেশগুলির জনসংখ্যাবিন্যাসের পর্যায়ান্তরের মধ্যে পার্থক্য সম্পর্কে আমাদের সজাগ হতে হবে। উন্নয়নশীল দেশগুলির জনসংখ্যা বিন্যাসের পর্যায়ান্তর ঘটছে উন্নত দেশগুলির তুলনায় অনেক বেশী দ্রুত গতিতে। উন্নয়নশীল দেশগুলির জনসংখ্যা বিন্যাসের ইতিহাসের দ্বিতীয় পর্যায়ে পরিবর্তনের গতির তীব্রতা অধুনা উন্নত দেশগুলির অভিজ্ঞতায় কোনদিন ঘটেনি।

উন্নত দেশগুলিতে মৃত্যুর হার হ্রাস পেয়েছে অপেক্ষাকৃত ধীর গতিতে। সেখানে এই হার উদ্ভাবনের ভুল-ভ্রান্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। অপরপক্ষে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে মৃত্যু হারের অবনতি ব্যাপক ও আচমকা। উন্নত দেশগুলিতে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি, উৎকৃষ্ট পরিচ্ছন্ন বন্দোবস্ত ও চিকিৎসার উন্নতির ফলে রোগের অধিকতর নিয়ন্ত্রণ—এসবই সম্ভব হয়েছে আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের জন্য, পুরানো জ্ঞান ভাণ্ডার ব্যবহার করে নয়। পক্ষান্তরে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে নানাবিধ রোগ নিরাময়ের জন্য অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহারের চল ছিল, তার পুনরুদ্ভাবনের প্রয়োজন হয়নি ; ডি. ডি. টির ন্যায় কীটনাশক ব্যবহারের ফলে সস্তায় ম্যালেরিয়া রোগের প্রাদুর্ভাব কমানো সম্ভব হয়েছে। পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্য বিধানের প্রাসঙ্গিক পদ্ধতিগুলির ব্যাপক প্রয়োগ ছিল। যা বাস্তব তা হল নতুন প্রযুক্তির সহজ ও সার্বজনীন প্রয়োগের ফলে মৃত্যুহারের দ্রুত অবনতি ঘটানো সম্ভব হয়েছে।

যে দ্রুত গতিতে এই অবনতি ঘটানো সম্ভব হয়েছে তা উত্তর ও পশ্চিম ইউরোপের অভিজ্ঞতাকে অতিক্রম করেছে। সুতরাং সবকিছুই এখন জন্মহারের উপর নির্ভরশীল। কত দ্রুত এই জন্মহার মৃত্যুহারের ন্যায় হ্রাসপ্রাপ্ত হবে তা লক্ষণীয়। এই বিষয়টির উপর বিশ্বের জনসংখ্যার ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে।

5.2.1. জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও প্রাকৃতিক সম্পদ

বিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে বিশ্বজনসংখ্যার আয়তন অনুমান করা হয়েছে বছরে দশকোটি করে বৃদ্ধির হারকে স্পর্শ করবে। এটি একটি নজিরবিহীন বৃদ্ধির হার এবং দীর্ঘদিন ধরে এটি চলতে থাকলে বিপর্যয় অবশ্যম্ভাবী। প্রকৃতপক্ষে আমরা জনসংখ্যাতত্ত্বের একটি ব্যতিক্রম পর্যায়ের মধ্যে দিয়ে চলেছি। উনবিংশ শতকের বার্ষিক বৃদ্ধির হার ছিল এক কোটি। তার পূর্ববর্তী পাঁচ শতাব্দীতে এই হার ছিল বছরে দশ লক্ষ। বর্তমানে বিশ্ব জনসংখ্যার এক বিরাট বিস্ফোরণ সংঘটিত হচ্ছে এবং আশঙ্কা করা হচ্ছে যে এর প্রভাবে পরিবেশের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হবে। কতকগুলি পরিণতি মূলতঃ জনসংখ্যার আধিক্যজনিত। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ কর যেতে পারে ; বিপুল হারে কয়লা পোড়ানো, ধানক্ষেত থেকে বর্ধিত হারে মিথেন গ্যাসের নির্গমন এবং ব্যাপক হারে বনজ সম্পদের ধ্বংস। অন্যান্য ফলাফল মূলতঃ দারিদ্র্যজনিত যেমন—নিম্নমানের পরিচ্ছন্নতার ব্যবস্থা, প্রান্তিক খামারের ব্যবহার। নিবিড় শস্যোৎপাদনের ফলে ভূমির গুণমানের অবনমন, বৃক্ষরাজির অত্যধিক ধ্বংসসাধন, দাহন এবং বেপরোয়া শিল্পদূষণ ঘটেছে। পি. আর. এরলিচ্ এবং এ. এরলিচ্ (P. R. Ehrlich and A. Ehrlich) তাঁদের 'পপুলেশন এক্সপ্লোসন' (The Population Explosion) বইতে সংক্ষেপে প্রাকৃতিক ভারসাম্যহীনতার নির্ণায়কগুলি একটি বীজগাণিতিক সমীকরণের সাহায্যে ব্যাখ্যা করেছেন। মানবসমাজের উপর প্রাকৃতিক পরিবেশের সামগ্রিক প্রভাব (I) হচ্ছে জনসংখ্যা (P) × তাদের জীবনযাত্রার স্বাচ্ছন্দ্য (A) × প্রযুক্তির ধরন ও বর্জনীয় পদার্থের অপসারণ (T), অর্থাৎ $I = P \times A \times T$.

এই মূল সূত্রটি সহজেই ধনী দেশগুলির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। গরীব দেশগুলি সম্পর্কে এই সূত্রের প্রয়োগ সাবধানে করা উচিত কারণ A এখানে খুবই কম এবং এর ফলেই বর্জ্যপদার্থের অপসারণ (T) পরিবেশ ধ্বংসকারী রূপ পরিগ্রহ করে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় ইথিওপিয়ায় উপায়ান্তরবিহীন দরিদ্র চাষীরা পাহাড়ের পার্শ্ববর্তী পাথুরে এলাকা পরিষ্কার করে চাষবাস করে এবং এর প্রভাবে অচিরেই মাটি জলের তোড়ে ভেসে যায়। চীন শতকোটির বেশী জনসংখ্যার জীবনযাত্রায় স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করার প্রচেষ্টা শুরু করেছে এবং এই কারণে শীঘ্রই কয়লা দহনের হার দ্বিগুণ করতে চাইছে। উপরের সূত্রটিতে একটি পৌনঃপুনিক গুনিতক অর্থাৎ স্ফীতিমান জনসংখ্যার দ্যোতক P আছে এবং এর ফলে বায়ুমণ্ডলের ধারণক্ষমতার উপর চাপ পড়ে। জনসংখ্যাবিদ্‌দের মতে বিশ্বের জন্মহার এক্ষুনি যদি প্রতিস্থাপনের স্তরে (replacement level) নামিয়ে আনা যেত তাহলেও 2030 সালের মধ্যে আসন্ন প্রাক্-বয়স্ক জনসংখ্যার গতিবেগে বিশ্ব জনসংখ্যার বৃদ্ধি 60 শতাংশ বেড়ে 550 কোটি থেকে ঐ জনসংখ্যাকে 900 কোটিতে নিয়ে যাবে। জনসংখ্যা যত বৃদ্ধি পাবে ততই অর্থনৈতিক কার্যাবলী বৃদ্ধি পেতে শুরু করবে। এসকল কার্যাবলী সম্পাদনের অর্থ পদার্থ ও শক্তির একধরনের রূপান্তর প্রক্রিয়া যার ফলশ্রুতি হিসাবে উৎপন্ন হবে বর্জ্যপদার্থ এবং যা অবশেষে পরিবেশেই পরিত্যক্ত হবে। এর প্রভাবে বলা যায় যে যত আর্থব্যবস্থার প্রসার ঘটাবে ততবেশী বর্জ্য পদার্থের সৃষ্টি হবে। যে সমস্ত পরিবেশ বর্জ্য পদার্থের মোকাবিলা করে যেমন, নদী, আবর্জনা ফেলার জমি, সমুদ্র, বায়ুমণ্ডল—তাদের গ্রহণ ও শোষণ করার ক্ষমতার একটা সীমা আছে, এটা ভাবলে একটা বাস্তব সম্ভাবনা দেখা দেয় যে আর্থব্যবস্থার প্রসারণেরও একটা সীমা আছে। আমরা বৃদ্ধির এই প্রথম সীমাবদ্ধতাকে বৃদ্ধির বর্জ্য পদার্থ গ্রহণের সীমাবদ্ধতা বলতে পারি। কিন্তু এটাই উন্নয়নের একমাত্র সম্ভাব্য সীমা নয়। আর্থব্যবস্থায় যে পদার্থ ও শক্তির রূপান্তর ঘটে তাদের কোন উৎস থেকে আসতে হয়েছে। এক্ষেত্রে মূলতঃ দুটি উৎস আছে ঃ পুনরুৎপাদনযোগ্য সম্পদ যেমন—অরণ্যসম্পদ, মৎস্যশিকার ক্ষেত্রেরসম্পদ ইত্যাদি এবং ক্ষয়শীল সম্পদ যেমন—ধাতব আকরিক, কয়লা, তেল প্রভৃতি। যদি পুনরুৎপাদনযোগ্য সম্পদ যত্নসহকারে ব্যবহৃত হয় তাহলে এগুলির কিছু অংশ প্রতি বছর আলাদা করে সরিয়ে রাখলে পুনরায় তাদের উৎপাদন সম্ভব।

একটি গাছ কাটা হলে সে জায়গায় অপর একটি গাছ গজানো যেতে পারে। মাছের মজুতেরও এইভাবে স্বাভাবিক পুনরুৎপাদন হতে পারে। এইভাবে অন্যান্য এমন ধরনের সম্পদেরও বৃদ্ধিসাধন সম্ভব।

সুতরাং আমরা যদি পুনরুৎপাদনযোগ্য সম্পদকে সহনীয়ভাবে ব্যবহার করি তাহলে এই ধরনের সম্পদ থেকে বৃদ্ধির সীমাবদ্ধতার কোন কারণ থাকে না। কিন্তু ক্ষয়শীল সম্পদের ক্ষেত্রে আমরা এই একই ধরনের কথা বলতে পারি না কারণ সংজ্ঞানুযায়ী এই সম্পদের পরিমাণ নির্দিষ্ট এবং এর পুনরুৎপাদন সম্ভব নয়। সুতরাং উদাহরণস্বরূপ, অর্থনৈতিক বৃদ্ধির অর্থ যদি হয় আরও বেশী তেল ব্যবহার, তাহলে সেই অর্থনৈতিক বৃদ্ধিরও সীমা নির্ধারিত হবে ভূগর্ভস্থ তেলের মজুতের সীমাবদ্ধতা দিয়ে। এটিকে বৃদ্ধির সম্পদ লভ্যতার সীমাবদ্ধতা বলতে পারি।

5.2.2. পরিবেশ এবং তৃতীয় বিশ্বের জনবহুল দেশসমূহের আর্থিক উন্নয়ন

সব অর্থনৈতিক ক্রিয়াকর্মই প্রাকৃতিক বিশ্বকে রূপান্তরিত করে। কিন্তু এই রূপান্তর কখন কখন পরিবেশের অত্যধিক অবক্ষয় ঘটায়। এর কারণ হল বহু প্রাকৃতিক সম্পদই ভাগাভাগি করে ব্যবহৃত হয় এবং যারা এই ব্যবহার করেন তারা পরিবেশ প্রসূত দ্রব্য বা পরিষেবার জন্য উচিত মূল্য দেন না। কিছু প্রাকৃতিক সম্পদ ভাগাভাগি করে ব্যবহৃত হয় কেননা সম্পত্তির অধিকার বলবৎ করার কোন পন্থা নেই। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় সীমান্তবর্তী জমি ও বায়ুমণ্ডল ভাগাভাগি করে ব্যবহৃত হয়। কারণ এক্ষেত্রে সম্পদের অধিকার বলবৎ করা অসম্ভব। যা প্রয়োজন তা হল এ ধরনের সম্পদকে অবক্ষয়ের কবল থেকে রক্ষা করার জন্য ব্যবহারকারীদের মধ্যে একটি স্পষ্ট চুক্তি করা। কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যাপক অবক্ষয় ব্যতীত আর কোনপ্রকার বিকল্প থাকে না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় দারিদ্র্যের কথা। দারিদ্র্য কিছু মানুষকে বেপরোয়াভাবে ভূমি, জল এবং অন্যান্য সম্পদকে স্বল্পকালীন ভিত্তিতে ব্যবহার করতে বাধ্য করে। এই অত্যধিক ব্যবহার পরিবেশের ভঙ্গুর ও সীমিত ভিত্তিকে মেরামতি ও পুনর্নবীকরণের অযোগ্য করে তোলে।

অর্থনীতিবিদ্‌গণ কখন কখন অর্থনৈতিক বৃদ্ধি ও পরিবেশগত গুণাগুণের মধ্যে U আকারের সম্পর্কের কথা বলেছেন। এর অর্থ হল মাথাপিছু আয় যত বৃদ্ধি পায়, পরিবেশের গুণমানের প্রথমে অবনতি ও পরে উন্নতি হয়। এর কারণ হল উৎপাদনের দূষণ-নিবিড়তায় পরিবর্তন আসে যখন দেশের পণ্যবিন্যাস প্রথমে কৃষি থেকে শিল্পে এবং পরে পরিষেবায় বদলে যায়। এর অপর একটি কারণ হল যত কোন দেশ ধনবান হতে থাকে এবং বৃদ্ধির প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত ক্রমবর্ধমান দূষণকে প্রতিরোধ করতে সক্ষম হয় তত তার দূষণ প্রশমনের ব্যাপারে প্রযুক্তিগত এবং সংগঠনগত ক্ষমতা বাড়তে থাকে। কিন্তু এই 'U' আকারের সম্পর্কের জন্য দরিদ্র দেশগুলির পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়ে আত্মতুষ্ট থাকার কোন যুক্তি নেই। প্রথমতঃ এই সম্পর্ক শুধুমাত্র কিছু জল ও বায়ুদূষণকারী পদার্থের নির্গমনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য (কার্বন ডাইঅক্সাইডের ন্যায় বিচ্ছুরিত ও দীর্ঘমেয়াদী দূষণকারী পদার্থের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়)। সাধারণভাবে এই সম্পর্ক সম্পদের মজুত যেমন স্থানীয় জনসাধারণের ব্যবহৃত জমি অথবা বর্জ্য পদার্থের মজুত-এর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য নয়। দ্বিতীয়তঃ এই সম্পর্ক একই সময়ের বিভিন্ন পরিসংখ্যান দ্বারা গঠিত। সুতরাং এটি একটি নির্দিষ্ট গরীব দেশে বাড়তে থাকলে পরিবেশ কিভাবে আর কালক্রমিক স্বয়ংক্রিয় ভাবে উন্নত হবে সে কথা বোঝায় না। তৃতীয়তঃ পরিবেশের ক্ষতির ক্ষেত্রে কিছু নির্দিষ্ট পরিবর্তন অসাধ্য হতে পারে। পৃথিবী তার সম্পদের ভিত্তিকে পুনরুদ্ধার করতে অসমর্থ হবে যদি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার শিল্পায়নের প্রাথমিক পর্যায়ে যে হারে সম্পদের ক্ষতিসাধন এবং দূষণক্রিয়া ঘটিয়েছিল এবং যা এখনও পর্যন্ত অব্যাহত আছে সেই হারে চীন বা ভারত সম্পদ ব্যবহার ও দূষণ ঘটায়।

পরিবেশগত সমস্যার ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা জরুরি বিষয় হল সম্পদকে পুনরুৎপাদনযোগ্য করা। সমস্যা হল এজাতীয় সম্পদের মূল্য সত্যিকার মূল্যের চেয়ে কমে স্থিরীকৃত হয়, ফলে নিঃশেষিত হওয়ার বিপদ থাকে। বায়ু এবং জল হল

পুনরুৎপাদনযোগ্য সম্পদ। কিন্তু সেগুলিরও নির্গমন ও অপচয় শুধরে নেবার একটি নির্দিষ্ট ক্ষমতা আছে। যদি দূষণ এই ক্ষমতাকে অতিক্রম করে, বাস্তুতন্ত্র তাহলে দ্রুত অবনতির পথে এগোয়, যখন মৎস্যসম্পদ ও বনাঞ্চল অত্যন্ত দ্রুতগতিতে মানুষের প্রয়োজন মেটানোর তাগিদে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, তখন এই ক্ষমতার চূড়ান্ত সীমা অতিক্রান্ত হয় এবং বাস্তুতন্ত্র ও প্রজাতির ক্ষতিসাধিত হয়। পুনরুৎপাদনযোগ্য নয় এমন সম্পদ যেমন ধাতু, খনিজ পদার্থ, শক্তি ইত্যাদির ব্যাপারে দুশ্চিন্তার তেমন কারণ নেই। এমন তথ্য বর্তমান যাতে বোঝা যায় যে যখন পুনরুৎপাদন অযোগ্য সম্পদের প্রকৃত মূল্য বাজারশক্তির মাধ্যমে নির্ধারিত হয় তখন তার অতিরিক্ত দুষ্প্রাপ্যতার লক্ষণ দেখা যায় না। পুনরুৎপাদন-অযোগ্য সম্পদ সম্পর্কে উদ্বেগের যে প্রসঙ্গ সূচিত করা হল সে সম্পর্কে বিশদভাবে বলার প্রয়োজন আছে। জল একটি পুনরুৎপাদনযোগ্য সম্পদের দৃষ্টান্ত যার মূল্য সত্যিকার মূল্যের চেয়ে কম এবং যার দুষ্প্রাপ্যতার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। পূর্ব আফ্রিকার 6টি দেশে ও সমগ্র উত্তর আফ্রিকার দেশগুলিতে তাদের বার্ষিক পুনরুৎপাদনযোগ্য জলের যোগান সেই সীমার নীচে চলে গেছে যে সীমা সমাজের কাছে স্বল্পতার ইঙ্গিতবাহী। চীনে 50টি শহরে তীব্র জলসংকট রয়েছে, সেখানে প্রতি বছর ভূগর্ভস্থ জল 1 থেকে 2 মিটার নেমে যাচ্ছে। মেক্সিকো শহরে ভূগর্ভস্থ জলোত্তোলন যে হারে হচ্ছে তা প্রাকৃতিক পূরণের হার থেকে বেশী। বহু দেশে দুষ্প্রাপ্য জলকে নিম্ন মূল্যের কৃষি শস্য উৎপাদনে ব্যবহার করা হয় এবং কৃষকদের এই জলের জন্য কোন মূল্য দিতে হয় না। মধ্য এশিয়ায় এরাল সাগরের জলের অপব্যবহার প্রাকৃতিক সম্পদের মূল্য সম্পর্কে আমাদের সজাগ করে।

প্রাকৃতিক সম্পদের যেগুলি পুনরুৎপাদনযোগ্য নয় সেগুলির ব্যবহার বৃদ্ধি অবশ্যই লভ্য মজুতের হ্রাস সূচিত করে। তথাপি কোন প্রমাণ নেই যে বাজারজাত পুনরুৎপাদনযোগ্য নয় এমন সম্পদ যেমন ধাতু, খনিজ সম্পদ ও শক্তি অর্থনৈতিক অর্থে দুষ্প্রাপ্য হয়ে পড়ছে। এর কারণ হল প্রচ্ছন্ন বা প্রকট স্বল্পতা প্রতিফলিত হয় বাজারে উর্ধ্বমুখী দামের মাধ্যমে যা প্রকারান্তরে নতুন আবিষ্কারকে প্রণোদিত করে, দক্ষতার উন্নতি ঘটায়, বিকল্পের সম্ভাব্যতার সৃষ্টি করে এবং প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করে। সত্তরের দশকে ধাতু ও শক্তির মূল্যবৃদ্ধি দক্ষতাজনিত লাভ সম্ভব করে এবং বিকল্প সৃষ্টির মধ্য দিয়ে চাহিদাবৃদ্ধিকে মন্দীভূত করে। এই ধরণের বিকল্পের উদাহরণস্বরূপ বলা যায় টেলি যোগাযোগের ক্ষেত্রে তামার বদলে তন্তুর প্রতিস্থাপন বহু শিল্পে টিন, নিকেল ও দস্তার সূক্ষ্মতর আচ্ছাদনের ব্যবহার, প্লাস্টিক ও পলিমার জাতীয় সংশ্লেষী বিকল্প এবং অ্যালুমিনিয়াম ও অন্যান্য পদার্থের পুনর্ব্যবহার। অনুরূপ দক্ষতাজনিত লাভ শক্তির ক্ষেত্রেও অর্জন করা গেছে। উৎপাদনের প্রতি এককে ধাতু ও শক্তির ব্যবহার শিল্পোন্নত দেশগুলিতে ধারাবাহিকভাবে হ্রাস পেয়েছে। বহু খনিজ ও শক্তি সম্পদের ক্ষেত্রে মজুতের তুলনায় চলতি ভোগের অনুপাত কমে গেছে। দামের নিম্নমুখী প্রবণতা বহু পুনরুৎপাদন-অযোগ্য সম্পদের স্বল্পতা নয় প্রাচুর্যেরই ইঙ্গিত দিচ্ছে।

বর্তমানে বাজারে বিক্রীত পুনরুৎপাদনযোগ্য নয় এমন শক্তি ও কাঁচামাল বিশ্বে এখনও নিঃশেষ হয়ে যায়নি। কিন্তু এদের নিষ্কাশন ও ভোগের সঙ্গে যুক্ত অবাজারজাত পার্শ্বক্রিয়াগুলি বিশেষ উদ্বেগের কারণ। জীবাশ্ম জ্বালানীগুলির ক্ষেত্রে তাদের সম্ভাব্য স্বল্পতাই প্রকৃত সমস্যা নয়, কিন্তু সমস্যা হলো তাদের ব্যবহারের ফলে পরিবেশের ওপর প্রভাব। বিশেষ করে স্থানীয় বায়ুদূষণ এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড নির্গমন। একইভাবে খনিজ পদার্থ নিষ্কাশনের ক্ষেত্রে সমস্যা হলো স্বাভাবিক আবাস ভূমির দূষণ ও অবক্ষয়। পৃথিবী থেকে অপসারিত পদার্থের 95 শতাংশ বর্জ্যপদার্থ। এই বর্জ্যপদার্থে পারদ, তামা প্রভৃতি ভারী ধাতু মিশে থাকে এবং এগুলো সাধারণতঃ নদী, ভূগর্ভস্থ জল ও মাটির সঙ্গে গিয়ে মিশতে থাকে।

5.3.1. ভারতের পরিবেশের উপর অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রভাব

এক শতাব্দী পূর্বেও ভারতের প্রাকৃতিক সম্পদ—চাষযোগ্য জমি, বনাঞ্চল, চারণভূমি, খনিজসম্পদ, নির্মল বাতাস ও বিশুদ্ধ জল তো বটেই—বর্তমানের তুলনায় অতীতে পর্যাপ্ত পরিমাণে ছিল। বর্তমানের তুলনায় জনসংখ্যা ছিল

এক চতুর্থাংশে এবং মাথাপিছু আয় ছিল বর্তমানের তুলনায় অর্ধেক। এই প্রাচুর্যের কিছু কিছু ক্ষেত্রে তাদের অধিকার স্বীকৃত থাকায় জনসাধারণ জ্বালানী, গৃহ নির্মাণসামগ্রী, পশুখাদ্য, কারিগরী পদার্থ প্রভৃতির মৌলিক প্রয়োজন মেটাত শুধুমাত্র শ্রমের ব্যবহারে। জনসংখ্যার একটি বৃহৎ অংশ তাদের প্রয়োজন মেটাত মৎস্যশিকার, ফলমূল সংগ্রহ, পশুশিকার, পশুচারণ ও শস্যাবর্তনের মধ্য দিয়ে।

1865 সালের পর থেকে ঔপনিবেশিক শাসককুল সাধারণ ভূমি সম্পদ, সমস্ত জলোৎস এবং অরণ্যায়িত অঞ্চলের বেশ কিছু অংশকে এক গুচ্ছ আইন পাশ করে রাজ্যের সম্পত্তিতে রূপান্তরিত করে। এর ফলে রাজস্ব সংগ্রহ সম্ভব হয় এবং এই রাজস্ব দিয়ে সাম্রাজ্যের ব্যয়নির্বাহ এবং বৃটেনের চলতি শিল্পায়নের রসদ যোগায় কাঁচামাল সরবরাহ করে। কিন্তু রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি এবং একচেটিয়া ব্যবসায়ের আড়ালে ব্যক্তিগত মালিক ও বিশেষ সুবিধাভোগীরা সম্পদ আত্মসাৎ করার সুবিধা পায়। 1951 সালের পর পরিকল্পিত উন্নয়নের পন্থা গ্রহণ করে পরিকাঠামোতে প্রচুর বিনিয়োগ করা হয়। ফলে মোট আভ্যন্তরীণ উৎপাদন (GDP) এবং মাথাপিছু মোট আভ্যন্তরীণ উৎপাদন পরবর্তী সময়ে বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। এর ফলশ্রুতিতে বিপুল সম্প্রসারণ, প্রাকৃতিক সম্পদের তীব্রতর নিষ্কাশন, সম্পদের অবক্ষয় এবং দূষণের ঘটনা ঘটতে থাকে।

5.3.1.1. ভূমি

শ্রমজীবী মানুষের দুই-তৃতীয়াংশ তাদের জীবিকা ও বিভিন্ন প্রকার মৌলিক চাহিদার জন্য কৃষির উপর নির্ভরশীল। কৃষি-ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে কাজের সুযোগ লাভের গতি মন্থর হবার জন্য ভূমির উপর জনসংখ্যার চাপ হ্রাস পায়নি। জমির ব্যবহার বহু পূর্ব থেকেই নিজস্ব সীমায় পৌঁছে গেছে। ফলে প্রায় অনুর্বর ও ক্ষণভঙ্গুর জমির অধিকাংশই ইতিমধ্যে কৃষির আওতায় এসেছে এবং প্রায় 60 শতাংশ কৃষিজমি ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে।

জল ও বায়ুর স্বাভাবিক ক্রিয়াকর্ম থেকে সম্পূর্ণ পৃথক হল জমির ক্ষয়। এই ক্ষয়ের জন্য দায়ী বনাঞ্চলের উপর অপরিমিত জৈবিক চাপ, জমা জল অপসারণ না হওয়া, ভূমি ও জল সংরক্ষণে অপর্যাপ্ত ব্যবস্থার জন্য ভূমিক্ষয়, অপরিমিত সেচ ব্যবস্থা ও বনাঞ্চল ধ্বংসের জন্য দায়ী জমির লবণাক্ততা। ভারতের ভূমিক্ষয়ের হার বিপজ্জনক হারে বেশী। তা হল প্রতি বছর হেক্টর প্রতি 16.35 টন। 1987-89 সালে উপগ্রহ সমীক্ষায় দেখানো হয়েছে যে কেবলমাত্র 64 মিলিয়ন হেক্টর (সমগ্র এলাকার 19.5 শতাংশে) বনাঞ্চল রয়েছে ; কিন্তু বনাঞ্চলের সরকারী লক্ষ্যমাত্রা হল সমগ্র এলাকার 33 শতাংশে। এর মধ্যে 7.36 মিলিয়ন হেক্টর বনাঞ্চল হওয়া উচিত সবুজ গাছের আস্তরণ দিয়ে ঘেরা। কৃষির জাতীয় কমিশনের মতে প্রায় 6 মিলিয়ন হেক্টর কৃষিজমি জলবন্দী হবার জন্য অসুবিধায় ভোগে এবং 7 মিলিয়ন হেক্টর জমি লবণাক্ততা ও ক্ষারকীয়তার জন্য অসুবিধায় ভোগে। উভয়ে মিলে সেচ সমৃদ্ধ জমির এক চতুর্থাংশ (আবাদী জমির একের এগারো অংশ)। বন্যাপ্রবণ নামে চিহ্নিত এলাকা মোট এলাকার 18 শতাংশ বলে অনুমান করা যায় এবং এই পরিমাণ 1960-এর দশক থেকে বছরে 4 শতাংশ হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। সম্ভবতঃ এর কারণ হল অধিক পরিমাণে জমি আবাদী করা, একই জমি থেকে ঘন ঘন শস্য উৎপাদন করা ও ব্যাপক হারে বনাঞ্চল ধ্বংস করা।

জল এবং অন্যান্য উপাদান ব্যবহারের প্রবণতা বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও ভূমি ব্যবহারের ধরন ও প্রযুক্তির কারণেই কৃষিতে এখনও কম উৎপাদন দেখা যায়। একই ভাবে কৃষি ব্যতীত অন্যান্য জমির দুই-তৃতীয়াংশ হল অনুর্বর ও বিনষ্ট হয়ে যাওয়া বনজ জমির অংশ। ভারতীয় বনভূমির উৎপাদনশীলতা খুবই কম, তা বিশ্বের গড় পরিমাপের এক-তৃতীয়াংশ মাত্র। ভূমি এবং বনজ সম্পদের উপর বর্ধিত চাপ গ্রামীণ জনসমাজের উপর এক ক্রমবর্ধমান বোঝা, বিশেষতঃ গরীব মানুষের উপর। একে যথার্থ ভাবেই বেঁচে থাকার সংকট নামে অভিহিত করা যায়, যার এক বিশেষ প্রতিফলন হচ্ছে সার্বজনীন ব্যবহারের উপযোগী সম্পদের (CPR) দ্রুত ক্ষয়, এমনকি গোচারণভূমি, বনসম্পদ ও জলসম্পদেরও ক্ষয়। সার্বজনীন ব্যবহারের উপযোগী

সম্পদগুলি জীবনধারণের জন্য ন্যূনতম প্রয়োজনীয় কৃষিজ সম্পদ এবং একই সঙ্গে কৃষিতে ব্যবহার্য প্রাণীজ সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয়। এ সত্ত্বেও গত চারদশক ধরে দেখা যায় যে এই সম্পদের আয়তন 30-50 শতাংশের মধ্যে কমে এসেছে। এমনকি তাদের ফলন জনসংখ্যার দ্বিগুণ হবার ফলে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে।

5.3.1.2. জল

এটি খুবই উদ্বেগজনক যে বাৎসরিক গড় মাথাপিছু জলের লভ্যতা 1951 সনের 5236 কিউবিক মিটার থেকে নেমে 1991 সনে 2227 কিউবিক মিটার হয়েছে। আশংকা করা হচ্ছে যে জনসংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধির জন্য এই পরিস্থিতির আরো অবনতি ঘটে 2013 সনে তা নেমে দাঁড়াবে 1555 কিউবিক মিটার। যদি সামগ্রিকভাবে জল সরবরাহের পরিমাণ যথেষ্ট থাকে, আঞ্চলিক বৈষম্য অধিক হবার ফলে জলের লভ্যতা জলবণ্টনের ক্ষেত্রে এক সমস্যা সৃষ্টি করবে এবং সামাজিক রাজনৈতিক সংকটগুলিকে আরও ঘনীভূত করবে। শক্তি এবং শিল্পের জন্য সেচের জলের চাহিদা 2025 সালের মধ্যে অতিরিক্ত বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও এরজন্য 73 শতাংশ জলের প্রয়োজন হবে ; বর্তমানে এই প্রয়োজনীয় সেচের জলের চাহিদা 83 শতাংশ। একটি পর্যালোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে যে যদি বর্তমানের জল ব্যবহারের পদ্ধতি একই থাকে, ভূমি নয়, সর্বাপেক্ষা অধিক সীমাবদ্ধতা আসবে জলের ক্ষেত্রে। বিভিন্ন ধরনের উৎপাদনশীলতার ভিত্তিতে হিসাব করে দেখানো যায় যে জলের ঘাটতি 21 থেকে 63 শতাংশের মধ্যে থাকবে।

5.3.1.3. বায়ু

বায়ু দূষণ বড় বড় শহরে স্বাস্থ্য ও স্বাচ্ছন্দ্যের কাছে একটি ক্রমবর্ধমান সমস্যা। দিল্লির মতো শহরে বর্ধিত সংখ্যায় শ্বাসজনিত অসুস্থতা বিশেষ করে শিশুদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়েছে। চারটি মহানগরীতে বাতাসে মিশে থাকা দূষিত কণা (suspended particulate matter, SPM) প্রতি কিউবিক মিটারে 360 মিলিগ্রাম, যেখানে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পরিমাপ অনুযায়ী এটি হওয়া উচিত ছিল 150। তা ছাড়াও শিল্পগত নির্গমন ও যানবাহনজনিত নির্গমনের কারণে দূষণ বাড়ছে। যদিও 23টি শিল্পের জন্য নির্গমনের মাত্রা এবং 21টি আরও শিল্পের জন্য এই মাত্রা ন্যূনতম জাতীয় মাত্রা প্রকল্পে (MINAS) ধার্য্য করা হয়েছে। এটি কার্যকরী করা খুবই কঠিন হয়ে পড়েছে এবং দোষী নয় এমন শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে বাঁচানো কঠিন হয়ে যাচ্ছে। নবীন প্রযুক্তির জন্য, দূষণরোধে অর্থনীতির আকারের সুবিধার জন্য এবং নিয়ন্ত্রণের অসুবিধার জন্য অনেক সময়ই বড় প্রতিষ্ঠানের চেয়ে ছোট প্রতিষ্ঠানে উৎপাদনের একক পিছু দূষণ অনেক বেশী হয়।

দেশের বিশাল অংশের জনসংখ্যা, বিশেষ করে দরিদ্র শ্রেণীর জন্য বায়ু দূষণের কারণ হল ধোঁয়া এবং রান্নার জন্য প্রয়োজনীয় জৈবিক জ্বালানী থেকে উৎপন্ন ধোঁয়া (কাঠ, কৃষিজ পণ্য ও গোবর)। মহিলা এবং শিশুরাই এতে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়। গ্রামে মহিলা এবং শিশুরাই এই জৈবিক জ্বালানী সংগ্রহ করতে অনেক ঘণ্টা সময় ব্যয় করেন আর এই জৈবিক জ্বালানী রান্নার জন্য প্রয়োজনীয় জ্বালানীর 87 শতাংশ, জৈবিক জ্বালানী অপ্রতুল হয়ে যাওয়ায় তার খরচ বাড়ছে। কিন্তু অন্যান্য বিকল্পের তুলনায় এখনো তা সস্তা। জৈবিক জ্বালানী প্রাথমিক শক্তির 34% যোগান দেয় এবং পরিবারে যে শক্তির প্রয়োজন হয় তার 70% থেকে 90% যোগান দেয়। কিন্তু এ সত্ত্বেও এগুলির কার্যকারিতা কম। গরীব মানুষ তরল পেট্রোলিয়াম গ্যাস এবং অন্যান্য বিকল্প জ্বালানীর প্রাথমিক বিনিয়োগের ব্যয় বহন করতে অসমর্থ। এর ফলে গরীবের পক্ষে প্রকৃত শক্তির জন্য ব্যয় বড়লোকদের ব্যয়ের দ্বিগুণ।

5.3.1.4. জনবসতি

উৎপাদন পদ্ধতি প্রাণীর পরিবেশ অথবা জনবসতিকে প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত করে। বেঁচে থাকা ও কাজ করার জন্য তাদের প্রয়োজন পানীয় জল, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য বায়ু এবং নানা জৈবিক সুযোগ-সুবিধা (রান্নার জন্য কয়লা, গৃহব্যবস্থা,

পয়ঃপ্রণালী, শক্তি, বিভিন্ন যানবাহন ইত্যাদি)। জনগণের স্বাস্থ্য ও তাদের জীবনধারণের উপর এর আনুষঙ্গিক প্রভাব বর্তমান যার প্রতিফলন উৎপাদন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয়। আশংকা করা হয় যে এই ফলাফলগুলি ভারতবর্ষের মত দেশে যেখানে ব্যাপক দারিদ্র্য বর্তমান এবং খাদ্য, জল, পয়ঃপ্রণালী, স্বাস্থ্য পরিষেবা ও গৃহের ন্যায় মৌলিক চাহিদাগুলি অত্যন্ত নিম্নমানের, সেখানে এগুলি গুরুতর আকার ধারণ করবে। সাক্ষরতার হার কম থাকার ফলে অনেক মানুষই সচেতন নয় কিভাবে পরিবেশ তাদের জীবনযাত্রাকে ব্যাহত করছে এবং এই সমস্যা সমাধানের সামাজিক পদ্ধতিগুলিকেও প্রতিকূলতার সম্মুখীন করছে।

সমস্ত পানীয় জলের দুই তৃতীয়াংশের বেশী সংগৃহীত হয় ভূমিজ জল থেকে যেমন—নদী, ঝিল, পুকুর ও খোলা কূপ। জনসংখ্যার আশি শতাংশ মানুষ বিশুদ্ধ পানীয় জলের খোঁজ পান না। মুম্বই এর যশোবন্ত রাও চাবন প্রতিষ্ঠানের (YCP) মতে প্রায় এক লক্ষ পঁচাত্তরটি গ্রামে কোন পানীয় জলের বন্দোবস্ত নেই। শহরের গরীব মানুষও পানীয় জল থেকে বঞ্চিত কারণ তাদের মধ্যে কেবলমাত্র এক-তৃতীয়াংশের নাগালে কিছু পানীয় জল আছে। এর পরিণতিতে গরীব মানুষেরা অপরিশুদ্ধ ভূমিজ জল ব্যবহার করেত বাধ্য হয়। অনেক শহরে এক-চতুর্থাংশের বেশী জল অব্যবহৃত থেকে যায়। পানীয় জলের উপর যে কর চাপানো হয়, তা উৎপাদন ব্যয়ের থেকে অনেক কম হবার ফলে জল-সংরক্ষণ ও জল পুনর্নবীকরণের বিষয়টি কম গুরুত্ব পায়।

শুধুমাত্র জলের লভ্যতা নয়, ভূগর্ভস্থ জলের অতিরিক্ত ব্যবহার ও ভূমিজ জলের দূষণ হল মূল সমস্যা। YCP-র মতে ভূমিজ জলের 90 শতাংশ সম্পূর্ণ দূষিত কারণ শিল্পের বর্জ্যপদার্থ ও পয়ঃপ্রণালীর জল অর্থাৎ অশোধিত জল এই জলের সাথে মিশে যায়। শহরে শিল্পগুলিতে ক্রমবর্ধমান জলের চাহিদা জলের উৎস সম্বন্ধে আশার কথা বলে না। গ্রামে ভূগর্ভস্থ জলের উপর নির্ভরশীল সেচ ব্যবস্থাও এক সমস্যার সৃষ্টি করেছে।

ভারতবর্ষে শহরের অধিবাসীদের এক তৃতীয়াংশ বাস করে বস্তিতে। জমির মূল্য অত্যন্ত বেশী হওয়ায় এবং জীবনধারণের মান অত্যন্ত নিম্নমানের হওয়ায় লক্ষ লক্ষ মানুষ শহরেও এই অবস্থায় রয়েছে। এই ধরণের জনবসতির সংখ্যা 1901 সালে 1 থেকে 1991 সালে 23-এ দাঁড়িয়েছে। জমির মূল্যের উর্ধ্বগতির জন্য গরীবের আবাসনের সুযোগসুবিধা ক্রমশ সংকুচিত হচ্ছে, শহরগুলি ঘিঞ্জি হচ্ছে ও শহরে পরিবহন সমস্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। শহরের পরিবারগুলির প্রায় এক তৃতীয়াংশের যথেষ্ট পয়ঃপ্রণালীর ব্যবস্থা নেই। তাদের মধ্যে মাত্র 15 শতাংশের নিজস্ব শৌচাগারের ব্যবস্থা আছে ও 60 শতাংশ উন্মুক্ত প্রান্তরকেই শৌচাগার হিসাবে ব্যবহার করে। ব্যবহৃত জল অর্ধেকের কম সংগৃহীত হয় এবং তারও অর্ধেকের কম বিশুদ্ধ করা হয়। জল ও পয়ঃপ্রণালীর সংযুক্ত অসুস্থতা যেমন—কলেরা, আমাশা, আন্ত্রিকজনিত মৃত্যুই শহরের 60 শতাংশ মৃত্যুর কারণ।

ষষ্ঠ অধ্যায়

শক্তির উৎসসমূহ

অধ্যায় সূচী

ভূমিকা

অর্থনৈতিক উন্নয়নের ফল হিসাবে আমাদের জীবনযাপনে পদ্ধতিগত পরিবর্তন আসে; এবং তার ফলে শক্তির চাহিদা বাড়ে। বর্তমান পৃথিবীতে শক্তি যোগানের সিংহভাগই আসে জীবাশ্ম জ্বালানী থেকে। কিন্তু এই জ্বালানীর ভাণ্ডার সীমিত এবং সেই কারণেই সঙ্কট। শক্তির কোনও বিকল্প উৎস বার ক'রতে না পারলে আগামী একশ বছরের মধ্যেই জীবাশ্ম জ্বালানী প্রায় শেষ হ'য়ে যাবে—এমনটাই বলছেন বিশেষজ্ঞরা। এ ছাড়াও সমস্যা আছে; জীবাশ্ম জ্বালানী একদিকে যেমন প্রয়োজনীয় শক্তি যোগানের মূল ভিত্তি, তেমনই এই জ্বালানী ব্যবহারের ফলে পরিবেশ দূষিত হ'য়ে পৃথিবীতে মানুষের অস্তিত্বকেই বিপন্ন ক'রে তুলছে। এই জটিল এবং গভীর সমস্যা সমাধানের চেষ্টায় একদিকে দরকার লাগামহীন চাহিদাকে সংযত করা এবং অন্যদিকে নতুন নতুন শক্তি-উৎসের সন্ধান করা দরকার জরুরী ভিত্তিতে। কিছু কিছু বিকল্প উৎসের সন্ধান পাওয়া গেছে

এবং জীবাশ্ম জ্বালানীর দূষণমুক্ত ব্যবহারের উপায় সম্বন্ধেও গবেষণা চলছে। প্রস্তাবিত সমাধানের প্রথম অংশ—যেটা মূলতঃ দৃষ্টিভঙ্গীগত তা নিয়ে খুব বেশী এগোনো যায়নি। এই অধ্যায়ে আমরা এই সবকিছু নিয়ে তথ্যভিত্তিক সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব। আলোচনার সুবিধার্থে পৃথিবীতে শক্তির উৎসগত ব্যবহার, বিভিন্ন কাজে শক্তির বাণিজ্যিক ব্যবহার, ভারতসহ কিছু দেশে শক্তির মাথাপিছু যোগান, এদেশে বিদ্যুৎ উৎপাদনে বিভিন্ন পদ্ধতির অবদান, পারমাণবিক তথা নবায়নযোগ্য উৎস থেকে শক্তি আহরণ সম্পর্কে সারণী 6.1–6.8-এ প্রয়োজনীয় সীমিত তথ্য দেওয়া হয়েছে।

6.1 সূর্য—সকল শক্তির উৎস

সূর্যকে সাধারণতঃ সকল শক্তির আধার বলা হয়ে থাকে। পারমাণবিক শক্তি বাদ দিলে আমাদের সবরকম শক্তির উৎসই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সূর্যের শক্তি থেকেই নিজেদের শক্তি পেয়ে থাকে। জীবাশ্ম জ্বালানী ও জৈব-ভর থেকে যে শক্তি আমরা পাই তা সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মূলতঃ সূর্যেরই দান। জল-বিদ্যুৎ উৎপাদন নির্ভর করে বারিচক্রের উপর যার মূল চালিকাশক্তি হ'লো সূর্য। একইভাবে বায়ু-শক্তি, জোয়ার-ভাঁটার শক্তি, তরঙ্গ-শক্তি ইত্যাদি সবই কম-বেশী সূর্য-নির্ভর। সূর্য একটি অত্যন্ত গরম গ্যাসের পিণ্ড। এর ভেতরে সর্বক্ষণ তাপ-পারমাণবিক বিক্রিয়া ঘটে চলেছে। এর ফলে সূর্য থেকে চতুর্দিকে প্রচুর পরিমাণ তাপ ও আলো বিকীর্ণ হচ্ছে। এই বিকীর্ণ শক্তির একটি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ এসে পড়ে পৃথিবীতে। এর প্রায় 30% প্রতিফলিত হয়ে মহাশূন্যে ফিরে যায়, 19% বায়ুমণ্ডলে শোষিত হয় এবং বাকী 51% এসে ভূপৃষ্ঠে পড়ে। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের উপর আপতিত সৌর শক্তির গড় মাত্রা প্রতি বর্গমিটারে 1.2 KW (কিলোওয়াট)। এর থেকে প্রতি বর্গমিটারে 0.9 KW মাত্রার শক্তি এসে ভূ-পৃষ্ঠে পড়ে।

সূর্যের আলো বা তাপ আসলে তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গ। তরঙ্গ দৈর্ঘ্য (wave length, λ) অনুযায়ী আমরা একে তিনভাগে ভাগ ক'রে থাকি। বায়ুমণ্ডলের উপরে যে সূর্যরশ্মি এসে পড়ে তা হ'লো (i) অতিবেগুনী রশ্মি ($\lambda \leq 400$ ন্যানোমিটার nm) ; (ii) দৃশ্যমান আলো (400 থেকে 750 nm) এবং (iii) অবলোহিত রশ্মি (750 থেকে 2500 nm)। অতিবেগুনী রশ্মি মানুষের শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর। তবে বায়ুমণ্ডলের উপরিভাগে (স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার) অবস্থিত "ওজোন স্তর" অতিবেগুনী রশ্মির অধিকাংশকে শোষণ ক'রে নেয়। ফলে খুব সামান্য পরিমাণ অতিবেগুনী রশ্মিই ভূ-পৃষ্ঠে আসে। ভূ-পৃষ্ঠে আপতিত সূর্যরশ্মির অধিকাংশই হ'লো আলোক এবং তাপতরঙ্গ। এরা উভয়েই আমাদের শক্তিতন্ত্রে অংশ নেয়।

সালোকসংশ্লেষ : যে বিশিষ্ট রাসায়নিক যৌগটির জন্য গাছের পাতার রং সবুজ তার নাম হ'লো "ক্লোরোফিল"। গাছের খাবার তৈরীর জন্যে বেশ কিছু জটিল প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে বাতাসের কার্বন ডাইঅক্সাইড এবং মাটি থেকে শুষে নেওয়া জল ক্লোরোফিলের মাধ্যমে জটিল বিক্রিয়ায় শর্করা (গ্লুকোজ) তৈরী ক'রে গাছকে প্রয়োজনীয় শক্তির যোগান দেয়। এই বিক্রিয়ায় সূর্যালোকের উপস্থিতি একান্ত জরুরী; তাই এর নাম সালোকসংশ্লেষ। এই প্রক্রিয়ার শেষে অক্সিজেন নির্গত

সালোকসংশ্লেষের সারাংশ :

$$\text{কার্বন ডাইঅক্সাইড} + \text{জল} \xrightarrow[\text{ক্লোরোফিল}]{\text{আলো}} \text{শর্করা} + \text{অক্সিজেন}$$
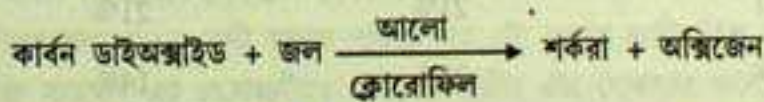
হয়ে বাতাসে গিয়ে মেশে। অর্থাৎ এই জটিল প্রক্রিয়াটি বাতাসের কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ কমিয়ে অক্সিজেনের পরিমাণ বাড়াচ্ছে, অর্থাৎ দূষিত বায়ু শোধন করছে। সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়াটিতে অবশ্য শতাধিক জটিল ধাপ রয়েছে। এই প্রক্রিয়ার দ্বারা উদ্ভিদ সূর্যের শক্তিকে খাদ্যশক্তিতে পরিণত ক'রে খাদ্যশৃঙ্খলের প্রথম ধাপটি তৈরী করে। দুঃখের কথা হ'লো যে ব্যাপক অরণ্য হননের ফলে বাতাসের কার্বন ডাইঅক্সাইডকে নিয়ন্ত্রণে রাখার এই প্রাকৃতিক উপায়টি ক্রমশঃ দুর্বল হয়ে পড়ছে। এটা ঠেকাবার উপায় হিসেবে 'বনসৃজন' করা দরকার অতি জরুরী ভিত্তিতে।

বাষ্পীভবন : দিনের বেলা সূর্যের তাপে সমুদ্র এবং পৃথিবীর অন্যান্য জলাশয় থেকে জল বাষ্পে পরিণত হয়। এরই ফলে বায়ুর আর্দ্রতা, মেঘ, বৃষ্টি, বরফ ইত্যাদি পেয়ে থাকি আমরা এবং এইভাবে বারিচক্র (water cycle) প্রবহমান থাকে। বারিচক্রের সাহায্যে জলমণ্ডলের জল সর্বত্র পৌঁছায় এবং পৃথিবীর আবহাওয়া রক্ষার ব্যাপারে এর একটি সুনির্দিষ্ট ভূমিকা রয়েছে। বারিচক্রের মাধ্যমে জলের নিয়মিত ও সুনির্দিষ্ট যোগানের বিষয়টি বাস্তুতন্ত্রের রক্ষার জন্য খুব জরুরী। কোন কারণে বারিচক্র ব্যাহত হ'লে সমগ্র পরিবেশের উপরেই তার প্রভাব পড়বে।

6.2. শক্তি ও সমাজ

বেঁচে থাকার জন্যে আমাদের শক্তির প্রয়োজন একথাটা আমরা সবাই বুঝি। তবে আজকের মানবসমাজ বড়ই বেশী পরিমাণে শক্তি-নির্ভর (সারণী 6.1, 6.2 দ্রষ্টব্য)। মানুষের ভাল-মন্দের নিরিখে এত বেশী শক্তি-নির্ভরতা যথেষ্ট স্বাস্থ্যকর কিনা এ-কথা আজ গভীরভাবে বিচার্য। যে মাত্রাতিরিক্ত শক্তি-নির্ভর সমাজ আমরা গড়ে তুলেছি তার ধ্বংসের বীজ কিন্তু লুকিয়ে রয়েছে এই 'শক্তি'—বেশী আরও বেশী 'শক্তি' রূপ সর্বগ্রাসী চাহিদার মধ্যে। এই ফ্রাঙ্কেনস্টাইনের যূপকাষ্ঠে বলি হয়ে চলেছে আমাদের সমস্ত মাত্রাজ্ঞান, মূল্যবোধ এবং সমাজের উন্নয়নসংক্রান্ত সমস্ত অগ্রাধিকারের চেতনা। 'শক্তি' নামক

সারণী 6.1. পৃথিবীর শক্তি উৎসের ব্যবহার (1987 সালের হিসাব)

শক্তি-উৎস	শিল্পোন্নত দেশ	উন্নয়নশীল দেশ
খনিজ তেল	37%	23%
কয়লা	25%	28%
প্রাকৃতিক গ্যাস	23%	7%
জল-শক্তি	6%	6%
জৈব-ভর শক্তি	3%	35%
পারমাণবিক শক্তি	5%	1%

উৎস সূত্র : World Development Report 1992

সারণী 6.2. বিশ্বব্যাপী বাণিজ্যিক শক্তির ব্যবহার (1988 সালের হিসাব)

শক্তি ব্যবহারের স্থান	শিল্পোন্নত দেশ	8টি উন্নয়নশীল দেশ †
গৃহস্থালী	21%	21%
যানবাহন	22%	14%
শিল্প	19%	34%
বিদ্যুৎ উৎপাদন	38%	31%

† ব্রাজিল, চীন, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, পাকিস্তান, ফিলিপাইনস্ ও থাইল্যান্ড। (পৃথিবীর সমস্ত উন্নয়নশীল দেশের মোট শক্তির 50% এবং খনিজ তেলের 35% ব্যবহার করে এই 8টি উন্নয়নশীল দেশ)।

মায়া হরিণের পিছনে ছুটতে গিয়ে আমরা আমাদের একমাত্র বাসস্থান যে পৃথিবী তাকেই করে তুলেছি বিষবাষ্পে জর্জর। আধুনিক উন্নয়নের এই সব কুফল দেখে একেবারে 'উন্নয়ন' সম্পর্কেই বীতশ্রদ্ধ হ'য়ে আজকাল কেউ কেউ বলেন—এর চাইতে বনে থাকাই ভাল ছিল। এই প্রতিক্রিয়াটাও আবার শুধুই আবেগপ্রসূত। ঘড়ির কাঁটা পিছন দিকে যায় না। তা ছাড়া প্রকৃতির কোলে ফিরে যাওয়ার মানে হ'লো সেই আদিম অসহায়তায় ফেরা—মানুষ যখন ছিল খাদ্য-সংগ্রাহক মাত্র, খাদ্য-উৎপাদক নয়। চাষবাসের মাধ্যমে চাল-গম ফলানোর পদ্ধতি আয়ত্ত ক'রতে আমাদের পূর্ব-পুরুষদের লেগেছিল বেশ কয়েক হাজার বছর। আজ যদি মানুষ চাষ আবাদ বন্ধ ক'রে দেয় তাহ'লে শুধু প্রকৃতির স্বভাব-দাক্ষিণ্যে এই সব ফসল পাওয়া যাবে না—আমরা স্রেফ না খেতে পেয়ে মারা যাব। সুতরাং প্রকৃতির কোলে ফিরে গেলে আমাদের মূল সমস্যার কোনও সমাধান হবে না। আসলে 'শক্তি' সংক্রান্ত পুরো ব্যাপারটার বিচার ক'রতে হবে যথাসম্ভব আবেগবর্জিত হয়ে। শক্তি ব্যাপারটা কী? কী ভাবেই বা এর যোগান আসে; আর সে যোগান বন্ধ হবার উপক্রম কেন হচ্ছে ইত্যাদি সমস্ত প্রশ্নের মুখোমুখি হয়ে উত্তর খুঁজতে হবে আমাদের। এই অনুসন্ধানে আগ্রহী সব শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষকে আজ 'শক্তি', 'উন্নয়ন', 'সামাজিক অগ্রাধিকার' ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে এক নতুন নৈতিক অবস্থান নিতে হবে। এর বিকল্প পথ কিছু নেই।

আদিম মানুষ নিজের এবং পোষা জীবজন্তুর পেশীশক্তির সাহায্যে প্রয়োজনীয় কাজ ক'রতো। সভ্যতার অগ্রগতির সাথে সাথে মানুষ বিভিন্ন রকমের শক্তির ব্যবহার শিখেছে। যান্ত্রিক শক্তি, তাপ শক্তি, রাসায়নিক শক্তি, আলোক শক্তি, চৌম্বক শক্তি, বিদ্যুৎ শক্তি এবং পারমাণবিক শক্তি—এই সাত ধরনের শক্তির ব্যবহার আজ মানুষের করায়ত্ত। প্রকৃতির উপর মানুষের অধিকার আজ প্রতিষ্ঠিত; কিন্তু অধিকারের সাথে অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কে সম্পর্কিত যে দায়িত্ববোধ তা মানুষ অর্জন করেছে একথা জোর ক'রে বলা শক্ত।

6.2.1. শক্তি ও তার সংরক্ষণ

একটা বিষয়ে আমরা সবাই একমত যে দেশের মানুষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতিবিধান ক'রতে গেলে শক্তির যোগান বাড়াতে হবে। কিন্তু এতাবৎ জানা শক্তির উৎসগুলি অফুরন্ত নয়। ফলে শক্তির নতুন উৎসসন্ধান যেমন জোরদার করা দরকার তেমনই দরকার শক্তি ব্যবহারের অপচয় নিবারণের লক্ষ্যে কিছু নির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ এবং জরুরী ভিত্তিতে 'শক্তি সংরক্ষণ'।

ঘরে কোনও লোক নেই অথচ আলোটা জ্বলছে বা পাখাটা চলছে—এ রকম ঘটনা আমরা হামেশাই দেখে থাকি। এই হ'লো অপচয়। বাড়ীতে বিদ্যুতের বিল যেহেতু আমাদের নিজেদেরই মেটাতে হয়, তাই সেখানে এই ধরণের অপচয় কমানোর দিকে হয়তো আমাদের লক্ষ্য থাকে। কিন্তু স্কুল-কলেজ-অফিস-ক্লাব ইত্যাদি জায়গায় আমাদের সজাগ দৃষ্টি থাকে না এবং সেখানে এই ধরনের অপচয় ঘটে। বিদ্যুৎ সঙ্কটে বিপর্যস্ত হওয়া সত্ত্বেও উৎসবের সময়ে অতিরিক্ত আলোকসজ্জা বড়ই চোখে লাগে। শক্তি সংরক্ষণের মূল কথাটি নেহাৎই সাদামাটা। মোমবাতি দু-দিকে জ্বালালে সেটি যে তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে যাবে এই সুভাষিতটি আমরা সবাই জানি, কিন্তু বাস্তবে প্রয়োগের ক্ষেত্রে এটাকে মনে রাখি না। বাল্বের বদলে টিউব লাইট ব্যবহার ক'রলে কম বিদ্যুৎ খরচ ক'রে বেশী আলো পাওয়া যায় এটা আমরা জানি; কিন্তু বাড়ীতে ব্যবহারের ক্ষেত্রে সর্বদা খেয়াল রাখি কি? 'শক্তি সংরক্ষণ'-এর প্রয়োজনীয়তা যে কত গভীর এটা বোঝাবার জন্যে একটা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। 1970 সালে আমেরিকায় করা একটা সমীক্ষায় দেখা গিয়েছিল যে ঐ বছর আমেরিকানরা যদি বাজারে চালু বিভিন্ন রঙিন টেলিভিশন সেটের মধ্যে সবচেয়ে শক্তি-দক্ষ (energy efficient) সেটটি কিনত, তাহ'লে সে-বছর 10 কোটি ইউনিট বিদ্যুৎ সাশ্রয় হ'তো, এবং এর ফলে কয়লা বাঁচতো প্রায় 50 কোটি মেট্রিক টন। এই হিসেবের মধ্যে ধরা পড়ে না এমন সামাজিক কল্যাণও এর ফলে হ'তো অনেক; যেমন কয়লাখনির মজুরদের 'কালো ফুসফুস' (black lung) রোগে মৃত্যু কম হ'তো। দুঃখের বিষয় শক্তি সংরক্ষণের এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। 1970 এর পরে কেটে গেছে 30 বছর; কিন্তু আজও

আমাদের এই বোধটাই তৈরী হয়নি যে গত একশো বছর ধ'রে শক্তি ব্যবহারের নামে আমরা, বিশেষতঃ শিল্পে উন্নত দেশগুলি (সারণী 6.3), শক্তির অপচয়ই ক'রে চলেছি। বোধ যে তৈরী হয়নি তা বোঝাবার জন্যে নীচের উদাহরণটিই যথেষ্ট হবে। আমাদের দেশে মোট উৎপাদিত বিদ্যুতের প্রায় 20 শতাংশ নষ্ট হয় পরিবহনের সময়। বড় বড় বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলি সাধারণতঃ লোকালয় থেকে দূরে হয়ে থাকে। ব্যবহারের জায়গায় পরিবাহী তারের মাধ্যমে বিদ্যুৎ নিয়ে যেতে হয় বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে। এতে পরিবাহী তার গরম হয়ে যাবার ফলে কিছু পরিমাণ বিদ্যুতের অপচয় হয়। একেই বলে পরিবহন জনিত ক্ষতি (transmission loss)। এই ক্ষতি কমানোর একটা উপায় হ'লো বড় বিদ্যুৎকেন্দ্রের বদলে এলাকাভিত্তিক ছোট ছোট অনেক স্বয়ংসম্পূর্ণ বিদ্যুৎকেন্দ্র গ'ড়ে তোলা। দুঃখের বিষয় মোট উৎপাদনের মাত্র 2.5 শতাংশ যে পারমাণবিক বিদ্যুৎ তা নিয়ে যত চীৎকার চেঁচামেচি কানে আসে তার একাংশও কিন্তু শোনা যায় না এই 20 শতাংশ পরিবহন ক্ষতি কমানোর ব্যাপারে (সারণী 6.5 দ্রষ্টব্য)। বোধের অভাবের এও আর এক স্তর।

সারণী 6.3. বিভিন্ন দেশে উন্নয়নের সূচক (জি. এন্. পি.) ও শক্তির মাথাপিছু যোগান

দেশ	জি.এন্.পি. (মাথাপিছু মার্কিন ডলার)	শক্তির মাথাপিছু যোগান (বছরে 10 লক্ষ বি.টি.ইউ এককে)
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	2700	212
বৃটেন	1650	152
জার্মানী	1400	120
রাশিয়া	900	88
ফ্রান্স	1550	80
জাপান	700	32
ভারত	130	26

শক্তি সংরক্ষণের আর একটা গভীর তাৎপর্য রয়েছে। বিজ্ঞানের কিছু মূলনীতি জড়িয়ে আছে এর সাথে।

এই নীতি অনুযায়ী ব্যবহারের জন্য প্রাথমিক শক্তির (জীবাশ্ম জ্বালানীর) যখনই রূপান্তর ঘটানো হয় তখন কিছুটা শক্তি অপচয় অনিবার্য। কয়লা পুড়িয়ে তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে যখন বিদ্যুৎ তৈরী হয় তখন বড়জোর 40% কয়লার শক্তি বিদ্যুতে রূপান্তরিত হয়; নষ্ট হয় 60%। পেট্রল ব্যবহার ক'রে গাড়ী চালানোর সময় পেট্রলের সঞ্চিত শক্তির 20% যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরিত হ'য়ে গাড়ী চালায়—80% শক্তি হয় নষ্ট। বিভিন্ন দেশেই এই নষ্ট হওয়া শক্তি কমানো অর্থাৎ রূপান্তর-দক্ষতা বাড়ানোর লক্ষ্যে গবেষণা চালানো হচ্ছে। এই চেষ্টাও সংরক্ষণ সচেতনতার ফলশ্রুতি। 'শক্তি সংরক্ষণ' মানে কিন্তু জীবনের সুখস্বাচ্ছন্দ্য ছেঁটে দেওয়া নয়। বাল্বের বদলে টিউবলাইট ব্যবহার ক'রলে ঘরে আলো বরং বেশীই হয়; কিন্তু বিদ্যুতের সাশ্রয় হয় অনেকটাই।

6.2.2. উন্নয়নের জন্যে শক্তি

দেশের মানুষের যে কোনও রকমের উন্নয়ন ক'রতে গেলেই শক্তির দরকার। কৃষিতে শক্তি লাগে, শিল্পে শক্তি লাগে—শিক্ষার জন্যে স্কুল-কলেজ চালাতেও শক্তির প্রয়োজন। মানব সভ্যতার অগ্রগতি শক্তি ব্যবহারের নৈপুণ্য এবং দক্ষতার

উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। আমাদের সমাজ ও অর্থনীতি আজ এতটাই শক্তি-নির্ভর যে শক্তি ও জ্বালানীর কিছুমাত্র হেরফের হলেই বিরাট হৈ-চৈ শুরু হ'য়ে যায়। 1972-73 সালের 'তৈল সংকট'-এর সময়ে আমাদের এই অভিজ্ঞতা হয়েছে। অনেকেই উন্নয়নের অন্যতম সূচক হিসেবে মাথাপিছু শক্তি ও জ্বালানীর যোগানকে চিহ্নিত ক'রে থাকেন। জি. এন. পি. (Gross National Product)-র সাথে মাথাপিছু শক্তি যোগানের নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে (সারণী : 6.3)।

শক্তিকে আমরা দু-ভাগে ভাগ ক'রতে পারি—জৈব শক্তি আর জড় শক্তি। মানুষ বা পশুর পেশী শক্তি হ'লো জৈব-শক্তি আর জীবাশ্ম জ্বালানীর শক্তি, জলের শক্তি ; বাতাসের শক্তি ইত্যাদি হ'লো জড় শক্তি। আমাদের আলোচনায় শক্তি বলতে আমরা মূলতঃ জড় শক্তিকেই বুঝব। শিল্প বিপ্লবের সময় থেকে জড়শক্তির ব্যাপক ব্যবহারে মানব সভ্যতার ইতিহাসই বদলে গেছে। নতুন নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবনের সাথে সাথে খনি থেকে জ্বালানী উত্তোলন এবং তার ব্যবহার ক্রমশঃ বেড়েছে। এই ক্রমবর্দ্ধমান শক্তি ব্যবহারের প্রভাব পড়েছে শ্রমশিল্পে, কৃষিতে, যানবাহন চলাচলে—এক কথায় মানুষের জীবনের প্রতিটি দিকেই। শক্তি ব্যবহারের ফলে মানুষের জীবনযাপনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য-আরাম বেড়েছে এতে কোনও দ্বিমত নেই। কিন্তু মাত্রাতিরিক্ত জীবাশ্ম জ্বালানীর ব্যবহারে পরিবেশের ভারসাম্য বিঘ্নিত হচ্ছে। উন্নত দেশগুলিই এ-ব্যাপারে বেশী দোষী—কারণ তারাই শক্তির ব্যবহার বেশী করে (সারণী 6.1 দ্রষ্টব্য)। শক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে মূলতঃ তিনটি বিষয়ে আমাদের মনোযোগ দেওয়া জরুরী :

(ক) জানা উৎসগুলি থেকে দক্ষতা বাড়িয়ে বেশী শক্তি আহরণ;

(খ) নতুন শক্তি-উৎসের সন্ধান;

(গ) উৎপাদিত শক্তির যথাসম্ভব সংরক্ষণ।

6.2.3. শক্তি-উৎসের ক্রমবিকাশ—যুগে যুগে

আমরা আগের আলোচনায় দেখেছি যে শক্তি ছাড়া মানুষের চলে না। আদিম যুগে নিজের এবং পোষ মানানো পশুর পেশী শক্তিই ছিল মানুষের প্রায় একমাত্র সম্বল। এ-ছাড়া দিনের বেলা সূর্য থেকে পাওয়া যেত তাপ ও আলো। পৃথিবীর সব প্রাচীন সভ্যতাতেই সম্ভবতঃ এই কারণে 'সূর্য' দেবতাজ্ঞানে পূজিত হ'তো। প্রস্তর যুগের সম্ভবতঃ সবচেয়ে জরুরী আবিষ্কার ছিল দুটি পাথর বা কাঠের টুকরো ঘষে আগুন জ্বালানোর ব্যাপারটি। দাবানল, উল্কাপাত ইত্যাদির মাধ্যমে আগুনের বিধ্বংসী রূপের সাথে মানুষের পরিচয় ঘটেছে আগেই। সেই বিধ্বংসী শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ ক'রে মানুষের কাজে (শীত নিবারণ বা মাংস ঝলসানো) লাগানোতেই আগুন আবিষ্কারের মূল সার্থকতা। সভ্যতার অগ্রগতিতে এই আবিষ্কারটির গুরুত্ব যে কি অপরিসীম তা বোঝা যায় যখন আমরা লক্ষ্য করি যে সব জাতির পুরাণেই আগুন এক দেবকল্প শক্তির দ্যোতক। 'আগুন' হাতে পেয়ে মানব সভ্যতা যেন একলাফে বেশ কয়েক ধাপ এগিয়ে গেল। গুহাবাসী মানুষ এখন রাতের বেলাতেও (আকাশে যখন সূর্য নেই) কাঠকুটো, শুকনো লতাপাতা পুড়িয়ে আগুন জ্বালিয়ে রেখে শীতের হাত থেকে বা হিংস্র জীবজন্তুর আক্রমণের হাত থেকে নিশ্চিন্ত হ'তে পারে। আগুন আবিষ্কারের পরে, অর্থাৎ নব্যপ্রস্তর (Neolithic) যুগ থেকে শুরু ক'রে সভ্যতার ঊষাকাল পর্যন্ত মানব সমাজ দ্রুত এগিয়ে চ'লল। এই সময়কালে মানুষ প্রথমে পশুপালন ও পরে কৃষিপ্রযুক্তি উদ্ভাবনও আয়ত্ত ক'রল। ফলে যাযাবর অবস্থা থেকে সে উঠে এল গৃহস্থ স্তরে। সমাজে শক্তির ব্যবহার তখনও প্রাকৃতিক। গাছ-পালা-শস্য সূর্যের আলো কাজে লাগিয়ে সালোকসংশ্লেষের সাহায্যে বেড়ে উঠত ; গৃহপালিত পশুকুল সেগুলি খেয়ে জীবন ধারণ ক'রতো; আর মানুষ মাংস এবং শস্য দুইই খাদ্য হিসেবে গ্রহণ ক'রে প্রয়োজনীয় শক্তি সংগ্রহ ক'রতো। অর্থাৎ শক্তির উৎস ব'লতে এই সময়ে মানুষের হাতে ছিল—(i) পেশী শক্তি, (ii) সৌর শক্তি এবং (iii) জৈব-ভর থেকে প্রাপ্ত শক্তি।

নব্যপ্রস্তর যুগের মানুষের প্রযুক্তিগত এবং সামাজিক উন্নতির ফলশ্রুতিতেই আমরা পেলাম আধুনিক সভ্যতার প্রথম পর্যায়—আজ থেকে হাজার পাঁচেক বছর আগে। বিভিন্ন অঞ্চলে নদীমাতৃক সভ্যতা গড়ে উঠল। মিশরে নীল নদের ধারে, মেসোপটেমিয়ায় (আজকের ইরাক) টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিসের অববাহিকায়, ভারতে সিন্ধুর তীরে এবং চীনে হোয়াংহো ও ইয়াংসিকিয়াং নদীর উপকূলে। আবিষ্কার হ'লো তুলো থেকে সুতো এবং তা থেকে কাপড় বানানোর প্রযুক্তি—তাঁতের ব্যবহার শিখল মানুষ। ক্রমশঃ খনি থেকে আকরিক উত্তোলন এবং তার থেকে 'ধাতু' নিষ্কাশনের কৌশল আয়ত্ত ক'রল মানুষ। সেই ধাতু আগুনে গলিয়ে সে শিখল অস্ত্রশস্ত্র এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতি বানাতে। প্রথমে তামা, তারপরে ব্রোঞ্জ এবং অবশেষে এল লৌহযুগ। প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে আফ্রিকা কিংবা এশিয়ার মানুষ প্রথম লোহার ব্যবহার শেখে বলে পণ্ডিতেরা অনুমান করেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে এই নতুন প্রযুক্তির সিংহভাগই ব্যবহৃত হ'লো অস্ত্র উৎপাদনে। ফলে বড় বড় যুদ্ধ—আরও বেশী ক'রে জীবন ধ্বংসে—হ'তে লাগল। এদিকে চাষের কাজে, সেচের কাজে প্রয়োজন হচ্ছে অনেক মানুষের সম্মিলিত পেশী শক্তির এবং এর মূল যোগানটা আসছে যুদ্ধজয়ের মাধ্যমে প্রাপ্ত বন্দী 'দাস'দের থেকে। রোমক সভ্যতায় এই দাসপ্রথা তুঙ্গে উঠেছিল। সম্রাট অগাস্টাসের সময়ে (63 B.C.—14 A.D.) শুধুমাত্র রোম শহরেই প্রায় 4 লক্ষ দাস ছিল। দাস-শ্রম সহজলভ্য হওয়ায় রোমক সমাজের যারা মাথা তাদের কাছে উৎপাদনে নতুন প্রযুক্তি ব্যবহারের কোনও তাগিদই অনুভূত হয়নি। এই সম্পর্কে দূরদৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায় উনবিংশ শতাব্দীতে অস্কার ওয়াইল্ড (1856—1900)-এর লেখায়, যখন তিনি বলেন যে পৃথিবীর ভবিষ্যৎ নির্ভর করবে যন্ত্রদাসের উপর।

সারণী 6.4. জীবাশ্ম জ্বালানীর প্রমাণিত ভাণ্ডার, আয়ু ও দূষণ ক্ষমতা

জ্বালানী	বিশ্বের চিত্র		ভারতের চিত্র		দূষণ ক্ষমতা
	পরিমাণ	আয়ু (বছর)	পরিমাণ	আয়ু (বছর)	(আপেক্ষিক)
কয়লা	1,12,000 কোটি টন	280	6700 কোটি টন	150	সবচেয়ে বেশী
খনিজ তেল	13,600 কোটি টন	84	76 কোটি টন	17	অপেক্ষাকৃত কম
প্রাকৃতিক গ্যাস	138 লক্ষ কোটি ঘনমিটার	66	71000 কোটি ঘনমিটার	60	খুব কম

সারণী 6.5. ভারতের মোট বিদ্যুৎ উৎপাদনে বিভিন্ন পদ্ধতির শতকরা অবদান : (2000 সালের হিসাব)

তাপবিদ্যুৎ	জলবিদ্যুৎ	পারমাণবিক বিদ্যুৎ	বিকল্প শক্তি সৌর/বায়ু/জৈব-ভর/ক্ষুদ্র জলবিদ্যুৎ
70%	23%	2.5%	4.5%

"......The fact is that civilisation requires slaves. The Greeks were quite right there. ......Human slavery is wrong, insecure and demoralising. On mechanical slavery, on the slavery of the machine, the future of the world depends."

শিল্প বিপ্লবের আগে পর্যন্ত এই 'যন্ত্র-দাস' (mechanical slave) ব'লতে কিছুই ছিল না। কয়েক শতাব্দী ধ'রেই অবশ্য প্রাকৃতিক শক্তি রূপান্তরের যন্ত্র হিসেবে 'বায়ুকল' (wind mill) এবং 'জলচক্র' (water wheel) ব্যবহার হয়ে আসছিল। ত্রয়োদশ শতকের ইউরোপে প্রচুর বায়ুকল ব্যবহৃত হ'তো। ভৌগোলিক অবস্থানগত সুবিধের জন্য হল্যান্ড এবং ইংল্যান্ডের লোকেরা প্রচুর সংখ্যায় এই যন্ত্র ব্যবহার ক'রতো। জলচক্রের ব্যবহারও ছিল খুবই ব্যাপক—শিল্পে, কৃষিতে, জলসেচে এবং শস্য মাড়াইয়ের কাজে। 1066 খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যান্ডে প্রায় 4 হাজার জলচক্র ছিল।

একথা অবশ্য স্বীকার্য যে যন্ত্র ব্যবহার ক'রে তাপশক্তিকে কাজে লাগানো (তাপীয় ইঞ্জিন)-র চিন্তা মানুষের মনে প্রাচীন যুগ থেকেই ছিল। 75 খ্রীষ্টাব্দে 'হিরো' নামক একজন গ্রীক আবিষ্কারক একটি খেলনা 'বাষ্প ইঞ্জিন' তৈরী ক'রেছিলেন। অবশ্য এটা ছিল নেহাৎই একটা খেলনা; এর থেকে কোনও কাজ (work) পাওয়া যেত না। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সমাজ বিকাশের স্তর সুসমঞ্জস না হ'লে প্রযুক্তির ক্ষেত্রে অগ্রগামী চিন্তাও বাস্তবায়িত হ'তে পারে না। এ সময়ে কায়িক পরিশ্রম ক'রতো দাসেরা আর চিন্তা করতেন সমাজের অভিজাত গোষ্ঠী। বস্তুজগৎ সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান অর্জন ক'রতে গেলে যে হাতে-কলমে পরীক্ষা করা দরকার এই বোধোদয় তখনও মানুষের হয়নি। এই ধরনের সমাজ ব্যবস্থায় যান্ত্রিক শক্তি ব্যবহারের কোনও চাহিদা ছিল না। একটা উদাহরণ দিয়ে ব্যাপারটা পরিষ্কার ক'রে বুঝে নেওয়া যাক্। 'বারুদ' আবিষ্কার হয়েছিল সামন্ততান্ত্রিক চীন দেশে। চীনারা বারুদ ব্যবহার ক'রলো আতসবাজী পুড়িয়ে। চীনাদের কাছ থেকে বারুদ ব্যবহারের কৌশল শিখে নিয়ে ইংল্যান্ড তৈরী ক'রলো বন্দুক—সেখানে তখন ধনতন্ত্রের বিকাশ হচ্ছে। এই বন্দুক তাদের সাহায্য করল কাঁচা মালের যোগান এবং উৎপন্ন পণ্যের বাজার হিসেবে উপনিবেশ গ'ড়ে তুলতে।

রোম সাম্রাজ্যের পতন থেকে শুরু ক'রে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত প্রযুক্তির উন্নতি হ'লো বেশ ঢিমে তালে। এই সময়ে 'ঘড়ি' ও মুদ্রণ-যন্ত্রের আবিষ্কার হ'য়েছিল। এই সময়কালের মধ্যেই ইতালীর নবজাগরণের যুগে লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি (1452—1519) অনেক যন্ত্রপাতির নকশা বানিয়েছিলেন। কিন্তু সেগুলি চালাবার মতো উপযুক্ত শক্তি-উৎস মানুষের জানা না থাকায় আবিষ্কারগুলির বাস্তব প্রয়োগ খুব একটা হয়নি। ষোড়শ এবং সপ্তদশ শতাব্দী ছিল ইউরোপে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের স্বর্ণযুগ। গ্যালিলিও (1564—1642), কেপলার (1571—1630), লাইবনিৎস্ (1646—1717), স্পিনোজা (1632—1677), দেকার্ত (1596-1650), হায়গেন্স্ (1629—1695), এবং সর্বোপরি নিউটন (1642—1727)। এই সব বিজ্ঞানীদের আবিষ্কারের ফলে মানুষের পুরো জীবনবীক্ষাই গেল পাল্টে। এ-যুগের মূল সূত্রটিই ছিল নতুন পথে, নতুনভাবে জগৎ ও জীবনকে জানা। অনেক ধরনের যন্ত্রপাতি ছাড়াও প্রকৃতিকে বোঝবার জন্যে প্রয়োজনীয় তত্ত্বকাঠামোও এই সময়েই আবিষ্কৃত হয়।

এত নতুন আবিষ্কার সত্ত্বেও শক্তির কোনও নতুন উৎসের সন্ধান কিন্তু পাওয়া গেল না। সে সময়ে দরকার ছিল একটি নতুন আবিষ্কারের, এমন একটি যন্ত্রের যা শক্তিকে কাজে রূপান্তরিত ক'রবে এবং 'জলচক্র' বা 'বায়ুকল'-এর চেয়ে যার 'দক্ষতা' বেশী হবে। 'জলচক্র' এবং বায়ুকল-এর সমস্যা হ'লো যে এগুলিতে শক্তির পরিবহন (transmission) সম্ভব নয়। তা ছাড়া এদের জন্যে বেগবতী নদী বা ঝোড়ো হাওয়ার দরকার। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ প্রহরের ঘণ্টা বাজবার আগেই বাষ্পশক্তি মানুষের করায়ত্ত হ'লো 'স্টীম ইঞ্জিন' আবিষ্কারের মাধ্যমে।

সপ্তদশ শতকের সাত বা আটের দশকে ইংল্যান্ডে কয়লাখনিগুলি চালু হয়। খাদে জল জমে গিয়ে গভীর স্তরে কয়লা খোঁড়ার অসুবিধে হ'তো। 1698 খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যান্ডের টমাস সাভেরী 'আগুন যন্ত্র' (fire engine) এর পেটেন্ট নিলেন। এই

যন্ত্রে আগুনে জল ফুটিয়ে বাষ্প তৈরী করা হ'তো এবং এর কাজ ছিল খনিতে জমে থাকা জল তুলে আনা। টমাস নিউকোমেন বাষ্পশক্তি ব্যবহার ক'রে একটি উন্নততর যন্ত্র বানালেন যেটা 156 ফুট গভীর খনিগর্ভ থেকে প্রতি মিনিটে 50 গ্যালন জল তুলে আনতে পারতো। এই সব যন্ত্র আবিষ্কারের ফলে ইংল্যাণ্ডের কয়লা ও লৌহ শিল্পের প্রভূত উন্নতি হ'লো। সামাজিক উপযোগিতা থাকার জন্যে 'স্টীম ইঞ্জিন'-এর প্রযুক্তিগত উন্নতি ঘটতে থাকলো জেমস্ ওয়াট, রিচার্ড ট্রেভিথিক, অলিভার ইভানস্ প্রভৃতি প্রযুক্তিবিদ্দের হাতে। 'বাষ্প যুগ' শুরু হ'য়ে গেল। 1807 খ্রীষ্টাব্দে হাডসন নদীতে চলল প্রথম বাষ্পচালিত জাহাজ "CLERMONT"। 1827 সালে জর্জ স্টিভেনসন তাঁর বাষ্পচালিত লোকোমোটিভ 'রকেট'-এ চেপে 12 মাইল দূরত্ব অতিক্রম ক'রলেন মাত্র 53 মিনিটে! লাইনের দুধারে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষ অবাক বিস্ময়ে দেখল যে তেজী ওয়েলার ঘোড়ায় টানা গাড়ীকে পিছনে ফেলে এগিয়ে যাচ্ছে স্টিভেনসনের বাষ্পগাড়ী। পেশী শক্তির সাথে প্রতিযোগিতায় জয় হ'লো মানুষের উদ্ভাবিত যন্ত্রের—আমাদের জীবনধারাই গেল বদল হয়ে। গত দেড়শ বছরের কিছু বেশী সময় ধ'রে যান্ত্রিক শক্তির বিজয়রথ এগিয়ে চ'লছে অপ্রতিহত গতিতে।

বাষ্পশক্তি এলো ঠিকই ; কিন্তু শক্তির পরিবহনগত সমস্যা এতে মিটল না। বাষ্পশক্তির পরিবহন দুরূহ এবং একে সঞ্চয় ক'রেও রাখা যায় না। এই সমস্যা দুটির কোনওটিই কিন্তু বিদ্যুতের ক্ষেত্রে নেই। পরিবাহী তারের মাধ্যমে বিদ্যুতের পরিবহন সম্ভব এবং বড় বড় ব্যাটারীতে বিদ্যুৎ সঞ্চয় ক'রেও রাখা যায়। বর্তমানে মানুষ যে পরিমাণ শক্তি ব্যবহার ক'রে তার সিংহভাগই বিদ্যুৎশক্তি (সারণী : 6.2 দ্রষ্টব্য)।

সারণী 6.6. বিভিন্ন দেশের পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা (1998 সালের হিসাবে)

দেশ	উৎপাদনরত চুল্লী		নির্মাণরত চুল্লী		মোট বিদ্যুৎ
	সংখ্যা	উৎপাদন ক্ষমতা (Mw)	সংখ্যা	ক্ষমতা (Mw)	উৎপাদনের শতাংশ
ফ্রান্স	58	61653	1	1450	75.8
বেলজিয়াম	7	5712	—	—	55.2
লিথুয়ানিয়া	2	2370	—	—	77.2
সুইডেন	12	10040	—	—	45.8
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	104	96423	—	—	18.7
রাশিয়া	29	19843	4	3375	13.1
জার্মানী	20	22282	—	—	28.3
কানাডা	14	9998	—	—	12.4
বৃটেন	35	12968	—	—	27.1
জাপান	53	43691	2	1863	35.9
ভারত	10	1696	4	808	2.5
পাকিস্তান	1	125	1	300	0.7

মাইকেল ফ্যারাডে (1791—1867) প্রথম 'ডায়নামো' যন্ত্র আবিষ্কার ক'রেছিলেন। এই যন্ত্রে যান্ত্রিক শক্তি রূপান্তরিত হয় বিদ্যুতে। ফ্যারাডের সুবিখ্যাত 'তড়িৎ-চুম্বকীয় আবেশের সূত্র'-এর মূল কথা হ'লো এই যে, কোনও চৌম্বক ক্ষেত্রে পরিবাহী কুণ্ডলী গতিশীল থাকলে কুণ্ডলীর দুই প্রান্তে বিভব প্রভেদ উৎপন্ন হবে এবং কুণ্ডলীর প্রান্তদ্বয় বহির্বর্তনীতে যুক্ত থাকলে বিদ্যুৎপ্রবাহ পাওয়া যাবে। পরিবাহী কুণ্ডলীকে বলা হয় 'আর্মেচার' (armature)। অর্থাৎ বিদ্যুৎ উৎপাদনের মূলনীতি হ'লো চৌম্বক ক্ষেত্রের মধ্যে আর্মেচারের ঘূর্ণন। ফ্যারাডে তাঁর যন্ত্রে জলপ্রবাহের শক্তি ব্যবহার ক'রে আর্মেচার ঘুরিয়েছিলেন। কী দিয়ে আর্মেচার ঘোরানো হচ্ছে তার ওপর নির্ভর ক'রে আমরা বিভিন্ন ধরনের বিদ্যুতের কথা ব'লে থাকি—তাপবিদ্যুৎ, জলবিদ্যুৎ, পারমাণবিক বিদ্যুৎ ইত্যাদি; বহির্বর্তনীতে প্রাপ্ত বিদ্যুতের প্রকৃতি সব ক্ষেত্রেই এক।

'অন্তর্দহন ইঞ্জিন' (internal combustion engine) আবিষ্কারের সাথে সাথে পেট্রোলিয়াম বা খনিজ তেলের চাহিদা বাড়তে থাকে—বিশেষতঃ যানবাহন চলাচলের ক্ষেত্রে। এইভাবে এগোতে এগোতে বিংশ শতাব্দীর শুরুতে এসে আমাদের ব্যবহার্য শক্তি-উৎসগুলি সংখ্যায় কিছুটা বেড়ে দাঁড়াল এইরকম : (i) পেশী শক্তি, (ii) সৌর শক্তি (iii) জৈব-ভর শক্তি (iv) বায়ু শক্তি (v) জলশক্তি (vi) কয়লা (vii) খনিজ তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস এবং (viii) বিদ্যুৎ শক্তি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে এর সাথে যোগ হয়েছে 'পারমাণবিক শক্তি'। 1950 সালের পর থেকে বিভিন্ন দেশে পরমাণু কেন্দ্র গ'ড়ে তোলা হয়েছে। অনেক দেশেই মোট বিদ্যুৎ উৎপাদনের একটা বড় অংশ আসে পরমাণু বিদ্যুৎ থেকে (সারণী 6.6 দ্রষ্টব্য)।

1970 সাল থেকে এ-কথটা পরিষ্কার বোঝা যেতে থাকে যে মানুষের প্রয়োজনীয় শক্তির যোগান শুধুমাত্র প্রচলিত শক্তি-উৎস ব্যবহার করে বজায় রাখা সম্ভব হবে না—বিশেষতঃ পরিবেশের স্বাস্থ্য রক্ষার খাতিরে। এরই ফলশ্রুতিতে নবায়নযোগ্য (renewable) এবং দূষণহীন বিকল্প শক্তি-উৎসের সন্ধান শুরু হয় পরিবেশ সংরক্ষণ এবং সহনশীল উন্নয়ন (sustainable development) এর স্বার্থে। বিংশ শতাব্দীর অন্তিম লগ্নে আজ বেশ কয়েকটি বিকল্প শক্তি-উৎসের সন্ধান পাওয়া গেছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'লো (i) সৌর তাপীয় শক্তি, (ii) সৌর আলো-বৈদ্যুতিক শক্তি (solar photo voltaic) (iii) বায়ু-বিদ্যুৎ শক্তি, (iv) কোটাল শক্তি (tidal power), (v) ক্ষুদ্র/অতি ক্ষুদ্র জল-বিদ্যুৎ (mini/micro hydel), (vi) ভূ-তাপীয় শক্তি, (vii) তরঙ্গ শক্তি, (viii) চৌম্বক উদ্-গতীয় (এম্. এইচ্. ডি) শক্তি, (ix) ও.টি.ই.সি. শক্তি এবং (x) পরমাণু-সংযোজন লব্ধ শক্তি। এরমধ্যে শেষ তিনটি এখনও গবেষণার স্তরে। পৃথিবীতে বর্তমানে উৎপন্ন নবায়নযোগ্য বিদ্যুতের পরিমাণ ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার একটা হিসেব সারণী 6.7 ও 6.8-এ দেখানো হ'লো।

সারণী 6.7. নবায়নযোগ্য উৎস থেকে পৃথিবীর বিদ্যুৎ উৎপাদনের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ (আনুমানিক) পরিমাণ (মেগাওয়াট এককে)

প্রযুক্তি	প্রযুক্তি উন্নয়নের স্তর	1990	1995	2000	2005	2010
ক্ষুদ্র/অতিক্ষুদ্র জলবিদ্যুৎ	প্রয়োগ	650	760	900	1060	1250
বায়ু-বিদ্যুৎ	প্রয়োগ	300	727	1761	3861	8465
জৈব-ভর বিদ্যুৎ	উন্নয়ন ও প্রয়োগ	500	900	2400	2900	3400
সৌর তাপীয় বিদ্যুৎ	উন্নয়ন	—	—	450	1120	4158
সৌর ফোটোভোল্টীয় বিদ্যুৎ	গবেষণা, উন্নয়ন এবং প্রয়োগ	47	96	215	550	1530

উৎস সূত্র : Report of World Energy Council—1993.

জীবাশ্ম জ্বালানী ঃ জীবাশ্ম জ্বালানী ব'লতে আমরা কয়লা, পেট্রোলিয়াম এবং প্রাকৃতিক গ্যাস বুঝি। জ্বালানী হিসেবে কয়লা বিদ্যুৎ উৎপাদনে ও বিভিন্ন ধাতুশিল্পে ব্যবহৃত হয়। আজকের পৃথিবীতে কয়লা ও পেট্রোলিয়ামই হ'লো মূল বাণিজ্যিক জ্বালানী। সারণী 6.1-এ পৃথিবী জুড়ে কোন্ জ্বালানী তুলনা মূলক বিচারে কী পরিমাণ ব্যবহার হচ্ছে তা দেখানো হয়েছে। আমরা দেখছি যে বিশ্বব্যাপী ব্যয়িত মোট শক্তির 90% এর বেশী আসে জীবাশ্ম জ্বালানী থেকে। কিছু উদ্বায়ী পদার্থ এবং জলীয় বাষ্প ছাড়া কয়লার মূল উপাদান হ'লো 'কার্বন'। কার্বনের পরিমাণ অনুযায়ী চার রকমের কয়লা প্রকৃতিতে পাওয়া যায়। এগুলি হ'লো অ্যানথ্রাসাইট, বিটুমেন, লিগনাইট এবং পীট্। অ্যানথ্রাসাইটে সবচেয়ে বেশী কার্বন থাকে—এটি মূলতঃ ব্যবহার হয় ধাতুশিল্পে। বিটুমেন কয়লা সাধারণতঃ জ্বালানী হিসেবে তাপ উৎপাদনে ব্যবহার হয়। কিন্তু এর মধ্যে ভেজাল হিসাবে কিছু ম্যাগনেসিয়াম, সালফার, নাইট্রোজেন ইত্যাদি মিশ্রিত থাকে। লিগনাইট আর পীট্ হ'লো খুবই নিম্নস্তরের কয়লা। এতে প্রচুর কাদামাটি এবং অন্যান্য জিনিস মিশে থাকে।

সারণী 6.8. পৃথিবীর কোটাল শক্তির সম্ভাবনাময় অঞ্চল ও তাদের সম্ভাব্য উৎপাদন ক্ষমতা (মেগাওয়াট এককে)

অবস্থান	দেশ	সম্ভাব্য উৎপাদন ক্ষমতা (মেগাওয়াট)
মুরমানস্ক	রাশিয়া	800
গাল্‌ফ অব্ সেজান	"	1,57,000
লু মড বে	"	1,00,000
মিনাস্ বেসিন্	কানাডা	4028
কাম্বারল্যাণ্ড বেসিন্	"	1147
সেপডি বে	"	1643
ইলেস্ চৌসে	ফ্রান্স	15,000
সেভার্ন এসচ্যুয়ারী	বৃটেন	4560
কুক ইনলেট	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	5,000
গাল্‌ফ অব্ ক্যাম্বে	ভারত	5500
গাল্‌ফ অব্ কচ্ছ	"	600
সান জোস্	আর্জেন্টিনা	6800
আসান বে	দক্ষিণ কোরিয়া	4500

কোনও নির্দিষ্ট পরিমাণ কয়লা পুড়িয়ে যে পরিমাণ তাপশক্তি পাওয়া যায় তাকে ঐ কয়লার ক্যালরিগত মান (calorific value) বলে। আগে তাপশক্তির একক হিসেবে 'ক্যালরি' ব্যবহৃত হ'তো, তবে আজকাল ব্যবহৃত হয় 'জুল' একক। নামটা কিন্তু আগের মতোই রয়ে গেছে। অ্যানথ্রাসাইটের ক্যালরিগত মান সবচেয়ে বেশী—তারপরেই বিটুমেন কয়লা। আমাদের

আগ্রহ বিটুমেন কয়লাতে, যা আমাদের দেশে তুলনামূলকভাবে বেশী পাওয়া যায়। এই কয়লা পোড়ালে প্রচুর তাপ ছাড়াও তৈরী হয় কার্বন ডাইঅক্সাইড, সালফার ডাইঅক্সাইড, নাইট্রাস অক্সাইড এবং কিছু পরিমাণ ছাই। বাতাসে মিশে গিয়ে এরা বায়ুদূষণ ঘটায়।

সবরকম জীবাশ্ম জ্বালানীই তৈরী হয় উদ্ভিদ বা জীবজন্তুর দেহাবশেষ থেকে। নানা ধরনের ভূ-তাত্ত্বিক পরিবর্তন ঘটে পৃথিবীর অভ্যন্তরে কোটি কোটি বছর সময় ধরে। অবশেষে দেহাবশেষগুলি পরিণত হয় জীবাশ্মে (fossil)। সংক্ষেপে বলতে গেলে প্রক্রিয়াটি এইরকম—মৃত উদ্ভিদ বা প্রাণীর দেহ মাটির নীচে বা জলাভূমির গভীরে গিয়ে পড়লে তাদের স্বাভাবিক পচন রুদ্ধ হয় অক্সিজেনের অভাবে। মৃত দেহাবশেষ তখন এ্যানিরোবিক (বাঁচার জন্যে যাদের অক্সিজেন লাগে না) ব্যাকটিরিয়া দ্বারা আক্রান্ত হয়। এর ফলে দেহাবশেষ থেকে ক্রমশঃ হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন বেরিয়ে যায় এবং মৃত জীবদেহে কার্বন-এর শতাংশ বাড়তে থাকে। উপরের ধুলো-বালি এবং পাথরের চাপে দেহাবশেষ ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হ'য়ে স্পঞ্জ-এর মতো পীট্-এ পরিণত হয়। প্রায় 25 কোটি বছর ধ'রে সঙ্কোচন চলতে থাকলে একে একে তৈরী হয় লিগনাইট, বিটুমেন এবং সবশেষে অ্যানথ্রাসাইট। পেট্রোলিয়াম এবং প্রাকৃতিক গ্যাসও মোটামুটি একই পদ্ধতিতে তৈরী হয়। মূল জীবিত জীব কী ছিল (প্রাণী বা উদ্ভিদ), অতিবাহিত সময় এবং পারিপার্শ্বিক ভূ-তাত্ত্বিক পরিস্থিতির উপর নির্ভর ক'রে এক এক ধরনের জীবাশ্ম জ্বালানী তৈরী হয়। এগুলি তৈরী হ'তে এত দীর্ঘ সময় লাগে ব'লেই জীবাশ্ম জ্বালানী নবায়নযোগ্য নয় ব'লে ধরা হয়। একথা নিশ্চিত যে এখনও পৃথিবীর অভ্যন্তরে জীবাশ্ম জ্বালানী তৈরী হয়ে চ'লেছে। কিন্তু সেই তৈরীর হার, খরচের হারের এক নগণ্য ভগ্নাংশ মাত্র। সারণী 6.4-এ জীবাশ্ম জ্বালানীর প্রমাণিত ভাণ্ডার ও তাদের আনুমানিক আয়ু দেওয়া হ'লো। এটা লক্ষণীয় যে প্রতিটি জীবাশ্ম জ্বালানী ব্যবহারের সাথে বায়ুদূষণের প্রত্যক্ষ যোগ রয়েছে। তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে কয়লা পোড়ানোর ফলে বাতাসে কার্বন ডাইঅক্সাইড এসে মিশছে। এই গ্যাস গ্রীণহাউস এফেক্টের অন্যতম আসামী। পেট্রল বা ডিজেলের দহনেও বাতাসে কার্বন ডাইঅক্সাইড বাড়ছে। এ ছাড়াও বেরোচ্ছে স্বাস্থ্য-হানিকর কার্বন মনোঅক্সাইড এবং সীসার যৌগ। প্রাকৃতিক গ্যাস বা কাঠ পোড়ালেও প্রচুর কার্বন ডাইঅক্সাইড বাতাসে গিয়ে জমে। জীবাশ্ম জ্বালানীর এই সব ক্ষতিকর ভূমিকার জন্যেই আজকাল এদের ব্যবহার কমিয়ে বিকল্প নবায়নযোগ্য শক্তি-উৎসের সন্ধান ও ব্যবহারের ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে।

6.3. শক্তির প্রচলিত উৎসসমূহ

শক্তির প্রচলিত উৎসগুলির উল্লেখ আমরা আগের অনুচ্ছেদে ক'রেছি। গত দেড়শ বছরের সময়কালকে যদি মূল ব্যবহৃত জ্বালানী অনুযায়ী ভাগ করা যায় তাহ'লে সেটা দাঁড়াবে এইরকম :

সময়কাল	জ্বালানী
খ্রীঃ 1850—1900	কাঠ
খ্রীঃ 1900—1950	কয়লা
খ্রীঃ 1950—2000	খনিজ তেল

আমাদের দেশের গ্রামীণ অর্থনীতিতে জ্বালানী হিসেবে কাঠের প্রচুর ব্যবহার রয়েছে ঠিকই, তবে বিভিন্ন শক্তি-উৎপাদন কেন্দ্রে আজকাল আর কাঠ ব্যবহার করা হয় না। তা ছাড়া পরিবেশ সংরক্ষণের খাতিরে আজকাল বনসৃজনকে উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে এবং অহেতুক বড় বড় গাছ কাটার বিরুদ্ধে আইন প্রণয়ন করা হয়েছে।

বিদ্যুৎশক্তি আজ প্রগতির মূল স্তম্ভ স্বরূপ। বিদ্যুৎশক্তি ব্যবহারের সুবিধাগুলো আমরা সবাই জানি :—প্রচুর পরিমাণে তৈরী করা যায় ; একে অনেক দূরে নিয়ে যাওয়া যায় "হাই টেনশন" লাইনের মাধ্যমে। ভোল্টেজ ও কারেন্টকে প্রয়োজন অনুযায়ী বাড়ানো বা কমানোর প্রযুক্তি আজ আমাদের করায়ত্ত। এ. সি. বিদ্যুতের দশা ও কম্পাঙ্কও আজ আমাদের নিয়ন্ত্রণাধীন।

ঘরে ঘরে কী পরিমাণ বিদ্যুৎ ব্যবহার করা হচ্ছে তা স্বয়ংক্রিয় মিটারের সাহায্যে হিসেব রাখার ব্যবস্থাও আমাদের রয়েছে। এইসব কারণে আজ বিদ্যুৎ হ'লো সর্বাধিক প্রচলিত বাণিজ্যিক শক্তি। প্রচলিত প্রথায় বিদ্যুৎ উৎপাদনের পদ্ধতি মূলতঃ তিনটি। সেগুলিকে আমরা বলি (i) তাপবিদ্যুৎ, (ii) জলবিদ্যুৎ এবং (iii) পারমাণবিক বিদ্যুৎ। আগেই বলা হয়েছে যে এগুলির মধ্যে পার্থক্য হ'লো আর্মেচার ঘোরানোর পদ্ধতিতে। আর্মেচার সাধারণতঃ ঘোরানো হয় একে টারবাইনের সাথে যুক্ত রেখে। তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে কয়লা বা অন্য জ্বালানী পুড়িয়ে জল ফুটিয়ে উচ্চচাপের বাষ্প তৈরী করা হয়। এই উচ্চচাপের বাষ্প এসে ধাক্কা মারে টারবাইনের চাকায়—টারবাইন ঘোরে এবং সাথে আর্মেচার ঘোরে। জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রে টারবাইন ঘোরে উঁচু থেকে নীচে এসে পড়া জলের তোড়ে। পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রে জল ফুটিয়ে বাষ্প তৈরী ক'রে টারবাইন ঘোরানো হয়। তবে এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় তাপশক্তি সংগৃহীত হয় কেন্দ্রক বিভাজন (nuclear fission) প্রক্রিয়া থেকে।

6.3.1. তাপবিদ্যুৎ উৎপাদন

তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে ফার্নেসে কয়লা পুড়িয়ে তাপ উৎপন্ন করা হয়। এই তাপ বয়লারে রাখা জলকে ফুটিয়ে উচ্চ চাপের বাষ্প তৈরী করে। এই উচ্চ চাপের বাষ্প স্টীম-টারবাইনকে ঘোরায়। ঘুরন্ত টারবাইন জেনারেটরের সাথে যুক্ত থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করে। এই ধরনের কেন্দ্র থেকে প্রচুর বায়ুদূষণ হয়ে থাকে।
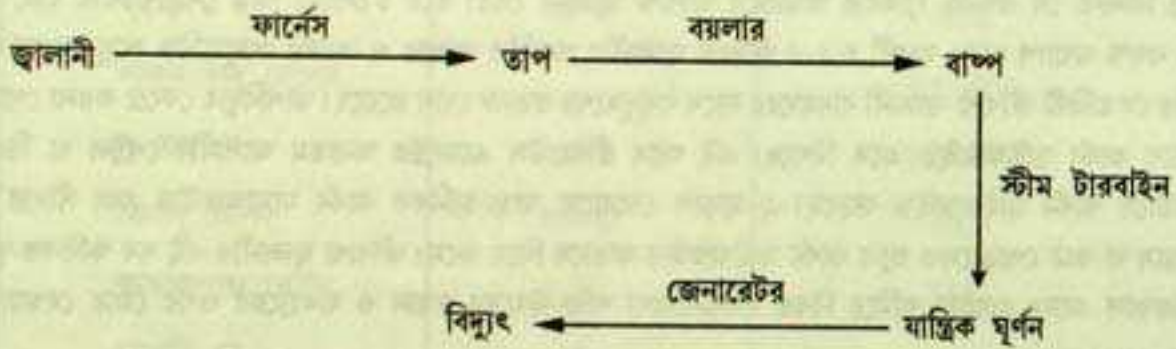
চিত্র 6.1. প্রচলিত জ্বালানী (জীবাশ্ম জ্বালানী ইত্যাদি) থেকে বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদনের বিভিন্ন ধাপ।

উত্তরপ্রদেশের সিংগ্রাউলি ও রিহান্দ, উড়িষ্যার তালচের, অন্ধ্রপ্রদেশের রামগুণ্ডম, মধ্যপ্রদেশের বিন্ধ্যাচল এবং পশ্চিমবঙ্গের ফারাক্কার তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলি জাতীয় তাপবিদ্যুৎ নিগমের আয়ত্বাধীন। আরও পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র হ'লো কোলাঘাট তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র, ব্যাণ্ডেল তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র, টিটাগড় তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র ইত্যাদি।

6.3.2. জলবিদ্যুৎ

উঁচু জায়গা থেকে জল নীচে পড়বার সময় জলের স্থিতিশক্তির কিছুটা অংশ গতিশক্তিতে রূপান্তরিত হয়। উপর থেকে নেমে আসা জলের গতিশক্তির সাহায্যে জল-টারবাইন ঘুরিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায়। একে বলে জলবিদ্যুৎ। নদীর গতিপথে উপযুক্ত ঢাল (slope) দেখে বাঁধ দেওয়া হয়। এর ফলে কৃত্রিম জলাশয় তৈরী হয়। জলাশয়ের জমা জল ঢালের অভিমুখে গতিশীল হ'য়ে জল-টারবাইন ঘোরায় এবং তারপর খাল বেয়ে আবার নদীতে গিয়ে মেশে। এই হ'লো জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের মূলনীতি। জলবিদ্যুৎ উৎপাদন সম্পূর্ণ দূষণমুক্ত এবং এটি একটি নবায়নযোগ্য শক্তি উৎস। জলবিদ্যুতের উৎপাদনে অসুবিধে হ'লো এই যে এতে প্রচুর জমি জলমগ্ন হয়; ভূমিকম্পপ্রবণ এলাকায় এটা করা যায় না এবং কৃত্রিম

জলাশয়ে পলি জমে গিয়ে উৎপাদন ক্ষমতা ক্রমশঃ হ্রাস পায়। ভারতের কয়েকটি বৃহৎ জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র হ'লো ভাক্রা নাঙ্গাল, হীরাকুঁদ, মাইথন, পাঞ্চেৎ এবং জলঢাকা।

6.3.3. পারমাণবিক বিদ্যুৎ

শক্তি উৎপাদনের ক্ষেত্রে পারমাণবিক বিদ্যুৎ নবাগত সদস্য। 1950 সাল থেকে এই প্রযুক্তি শুরু হয়েছে। একটি ভারী মৌলের কেন্দ্রক (nucleus) যখন আপনা থেকে কিংবা বাইরে থেকে আসা কোনও কণার আঘাতে দুই বা ততোধিক মাঝারি মাপের কেন্দ্রকে ভেঙে যায় তখন প্রক্রিয়াটিকে বলা হয় কেন্দ্রক বিভাজন (nuclear fission)। এই বিক্রিয়া যেখানে ঘটে তাকে বলে কেন্দ্রক চুল্লী (nuclear reactor)। এই পদ্ধতিতে প্রচুর পরিমাণ শক্তি বেরিয়ে আসে। প্রাথমিক কেন্দ্রকটির তুলনায় বিভাজনের ফলে তৈরী হওয়া কেন্দ্রকগুলির মিলিত ভর কিছুটা কম থাকে। অর্থাৎ এই প্রক্রিয়ায় কিছুটা ভর শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। ইউরেনিয়ামের একটি আইসোটোপকে (U-235) নিউট্রন দিয়ে আঘাত ক'রে প্রথম কেন্দ্রক বিভাজন ঘটানো হয়েছিল। শক্তির যোগান ছাড়াও বিভাজন বিক্রিয়ায় দুটি বা তিনটি নিউট্রন বেরিয়ে আসে। এই নিউট্রনগুলি আবার অন্য U-235 এর কেন্দ্রকে আঘাত ক'রে বিভাজন ঘটায়। এইভাবে বিভাজন বিক্রিয়া বারবার ঘটতে থাকে। একেই বলা হয় কেন্দ্রক শৃঙ্খল বিক্রিয়া (nuclear chain reaction)। 1945 সালে এই শৃঙ্খল বিক্রিয়ার নমুনা হিসেবে জাপানের হিরোসিমা শহরে ফেলা হয়েছিল প্রথম পরমাণু বোমা। তবে পারমাণবিক শক্তি উৎপাদন ব্যবস্থায় ঐ দুটি (বা তিনটি) নিউট্রনের একটি (বা দুটি)কে অন্যত্র শোষণ করে নেবার উপায় থাকে। ফলতঃ শৃঙ্খল বিক্রিয়া পরিচালিত হয় সুনিয়ন্ত্রিত উপায়ে। বোমার ক্ষেত্রে এই শোষণ ব্যবস্থা অনুপস্থিত থাকায় শক্তির অনিয়ন্ত্রিত উৎসারণ হয় এবং তারই ফলশ্রুতিতে ভয়াবহ ধ্বংস ও ক্ষতি ঘটে। নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থায় কেন্দ্রক চুল্লী থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব। বিভাজন বিক্রিয়া-নিঃসৃত শক্তি বেরিয়ে আসে মূলতঃ তাপশক্তি হিসেবে। এই তাপ ব্যবহার ক'রে তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের মতোই বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়ে থাকে।
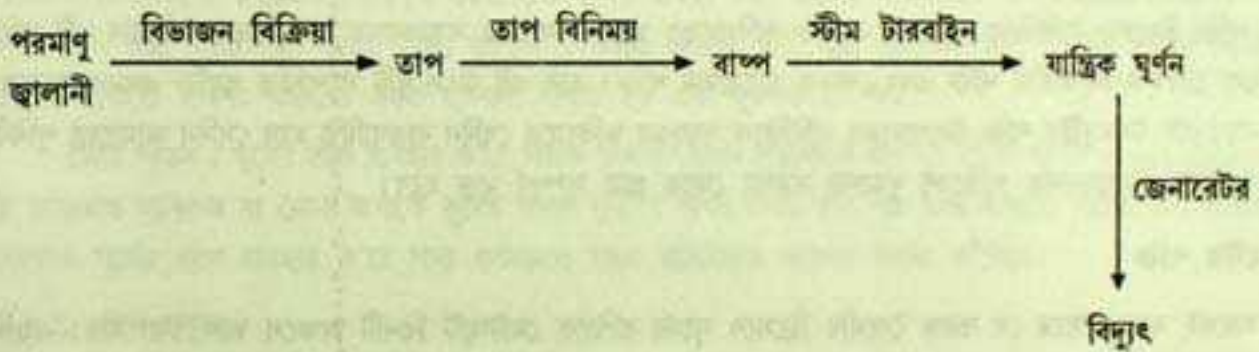
চিত্র 6.2. পারমানবিক জ্বালানী থেকে বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদনের বিভিন্ন ধাপ।

পৃথিবীতে শতাধিক পরমাণু চুল্লী বিদ্যুৎ উৎপাদন ক'রে থাকে। ভারতেও তারাপুর, রানা প্রতাপ সাগর ইত্যাদি জায়গায় পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র রয়েছে। সাধারণভাবে পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে কোনও আবহাওয়া দূষণ হয় না। কিন্তু এই প্রযুক্তির বিপদ-সম্ভাবনা খুবই বেশী, এবং এই ধরণের কেন্দ্রের কর্মচারীদের তেজস্ক্রিয়তা সম্পর্কে বিশেষভাবে সচেতন থেকে প্রয়োজনীয় সাবধানতা অবলম্বন করা আবশ্যিক। পারমাণবিক শক্তি শিল্পের ইতিহাসে এমন দুর্ঘটনার উদাহরণ রয়েছে যেখানে বিপুল পরিমাণ তেজস্ক্রিয়তা বেরিয়ে এসে বাতাসে মেশার ফলে মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটে গেছে। এইরকম দুর্ঘটনা একবার ঘটে ছিল আমেরিকার 'থ্রি মাইল আইল্যান্ডে' এবং দ্বিতীয়বার রাশিয়ার 'চের্নোবিলে'। মারাত্মক দুর্ঘটনার সম্ভাবনা ছাড়া পারমাণবিক বিদ্যুতের আরও যে সমস্যাটি রয়েছে তা হ'লো 'তেজস্ক্রিয় বর্জ্য' সংক্রান্ত। চুল্লীর পরমাণু জ্বালানী

শেষ হ'য়ে গেলে যে বর্জ্য পড়ে থাকে তা খুবই উচ্চ মাত্রায় তেজস্ক্রিয় হয়ে থাকে। এটাকে নিয়ে কী করা যায় এ সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান আজও করা যায়নি। এই দুটি সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান করা সম্ভব হলে, পরমাণু শক্তি জীবাশ্ম জ্বালানীলব্ধ শক্তির সমকক্ষ হয়ে উঠতে পারবে।

6.4. শক্তির অপ্রচলিত উৎসসমূহ

শক্তির প্রচলিত উৎসগুলির প্রত্যেকেরই কিছু কিছু সমস্যা রয়েছে এ আলোচনা আমরা আগেই ক'রেছি। জ্বালানী হিসাবে কাঠের ব্যবহার খুব ব্যাপকভাবে হওয়া উচিত নয় কারণ এতে অরণ্য হনন হয়, যেটা পরিবেশের ক্ষতি করে। তাছাড়া জীবাশ্ম জ্বালানী তো ক্রমশঃ ফুরিয়ে আসছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশী রয়েছে যে জ্বালানী অর্থাৎ কয়লা, তার বায়ুদূষণ ক্ষমতাও আবার সবচেয়ে বেশী (সারণী 6.4)। পারমাণবিক বিদ্যুতের সমস্যা হ'লো বিপদের ঝুঁকি এবং তেজস্ক্রিয় বর্জ্য। জল-বিদ্যুৎ দূষণমুক্ত এবং নবায়নযোগ্য হলেও এক্ষেত্রে সমস্যাটি সামাজিক—প্রচুর জমি জলমগ্ন হওয়া এবং এলাকায় বসবাসকারী মানুষের উদ্বাস্তু হওয়া।

1970 সাল থেকেই বিজ্ঞানীরা দূষণমুক্ত, নবায়নযোগ্য বিকল্প শক্তি উৎসের সন্ধান ক'রে চলেছেন। এই ধরনের কিছু প্রযুক্তি গত তিরিশ বছরে আমাদের আয়ত্তে এসেছে—কয়েকটা নিয়ে এখনও গবেষণা চ'লছে। নবায়নযোগ্য, দূষণমুক্ত এবং বাণিজ্যিক সম্ভাব্যতার বিচারে উল্লেখযোগ্য উৎসগুলি হ'লো—(i) সৌর শক্তি, (ii) বায়ু শক্তি (iii) ক্ষুদ্র জল-বিদ্যুৎশক্তি (iv) জৈব-ভর শক্তি, এবং (v) ভূ-তাপ শক্তি। এর মধ্যে শেষেরটি অবশ্য ঠিক নবায়নযোগ্য নয়, তবে দূষণমুক্ত নিঃসন্দেহে।

আরও কয়েকটি দূষণমুক্ত এবং নবায়নযোগ্য শক্তির উৎস আছে যেগুলি এখনও গবেষণা এবং পরীক্ষা নিরীক্ষার স্তরে রয়েছে। সবার আগে আছে "জোয়ার ভাঁটার শক্তি" (বা কোটাল শক্তি) যার বাণিজ্যিক সম্ভাব্যতা প্রায় প্রমাণিত (সারণী 6.8)। এর পরেই রয়েছে 'তরঙ্গ শক্তি' এবং সমুদ্র-তাপ-শক্তির রূপান্তর (ocean thermal energy conversion, OTEC)। এই দুই শক্তি উৎসের বাণিজ্যিক সম্ভাবনা এখনও ভবিষ্যতের গর্ভে। সবচেয়ে সম্ভাবনাময় এবং প্রভূত পরিমাণ দুটি শক্তি উৎস হ'লো চৌম্বক-উদ্‌গাতীয় শক্তি এবং কেন্দ্রক সংযোজন শক্তি। তবে এই উৎস দুটি সম্পর্কিত প্রযুক্তি এখনও মানুষের করায়ত্ত নয়। এই উৎসদুটির শক্তি উৎপাদনের বাণিজ্যিক সম্ভাবনা ভবিষ্যতে যেদিন বাস্তবায়িত হবে সেদিন আমাদের পৃথিবী শক্তি এবং তার উৎপাদনলব্ধ পরিবেশ দূষণের সমস্যা থেকে প্রায় সম্পূর্ণ মুক্ত হবে।

6.4.1. সৌর শক্তি

আগেই বলা হয়েছে যে তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের হিসেবে সূর্যের রশ্মিকে মোটামুটি তিনটি অঞ্চলে ভাগ করা যায়। এগুলি হ'লো, (i) অতিবেগুনী, (ii) দৃশ্যমান এবং (iii) অবলোহিত অঞ্চল। এছাড়া রয়েছে দীর্ঘ তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের অঞ্চল। তবে সূর্য রশ্মিতে 2.5 ন্যানোমিটারের চেয়ে বড় তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের রশ্মির পরিমাণ খুবই কম—শক্তির পরিমাণের হিসাবে 1% এর মতো। বিভিন্ন তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের অঞ্চলে সৌরশক্তির পরিমাণ নিম্নরূপ।

অতিবেগুনি অঞ্চল	:	8%
দৃশ্যমান অঞ্চল	:	45%
অবলোহিত অঞ্চল	:	46%
দীর্ঘ তরঙ্গ	:	1%

আমরা আগেই ব'লেছি যে বায়ুমণ্ডলের ঠিক উপরে যে পরিমাণ সূর্যরশ্মি পড়ে তার শক্তি-মাত্রা প্রতি বর্গমিটারে 1.2 KW। বায়ুমণ্ডলের ভিতর দিয়ে আসতে গিয়ে এর কিছুটা শোষিত হয়, কিছুটা প্রতিফলিত হয়ে মহাশূন্যে ফিরে যায়।

গড় হিসাবে ভূ-পৃষ্ঠে এসে পড়ে প্রতি বর্গমিটারে প্রায় 0.9 KW। পৃথিবীর যে দিক সূর্যের দিকে থাকে তার ক্ষেত্রফলের কথা মাথায় রাখলে এই শক্তির পরিমাণ বিশাল। এই বিপুল পরিমাণ শক্তির কিছুটা অংশ কাজে লাগে সালোকসংশ্লেষে এবং কিছু অংশ বাষ্পীভবনে। অবশিষ্ট সৌরশক্তির পরিমাণও কিছু কম নয়। মানুষের শক্তির প্রয়োজন মেটাতে এই অবশিষ্ট সৌরশক্তিকে কাজে লাগানো সম্ভব। সৌর শক্তির প্রত্যক্ষ ব্যবহারের দুটো রাস্তা আছে—(i) সৌর-তাপীয় পথ এবং (ii) সৌর ফোটো-ভোল্টীয় পথ। সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদনে পরিবেশ দূষিত হয় না।

6.4.1.1. সৌর-তাপীয় পদ্ধতি

সূর্যরশ্মিতে বর্তমান 700 থেকে 2500 ন্যানোমিটার তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের অঞ্চল হল তাপ তরঙ্গের অঞ্চল। সূর্যের তাপ কাজে লাগিয়ে বেশ কয়েকটি প্রযুক্তির উদ্ভাবন হয়েছে যা সাধারণ মানুষ সহজেই ব্যবহার ক'রতে পারে। এর ফলে কাঠ, কয়লা, তেল প্রভৃতি প্রচলিত জ্বালানীর সাশ্রয় হবে এবং সাথে সাথে পরিবেশ দূষণও কমানো যাবে।

সৌর কুকার : রান্না করার জন্যে তাপের দরকার হয়। সৌর কুকার যন্ত্রে সূর্যের তাপকে ধ'রে রেখে বা প্রতিফলকের সাহায্যে কেন্দ্রীভূত ক'রে তার মাত্রা বাড়িয়ে খাদ্যদ্রব্য জলে বা তেলে ফোটানো হয়। সৌর কুকার সাধারণতঃ দু-রকমের হয়ে থাকে : (ক) বাক্স ধরণের এবং (খ) অধিবৃত্তাকার প্রতিফলক ধরণের। বাক্স ধরনের সৌর কুকার বেশী জনপ্রিয়, যদিও অধিবৃত্তাকার প্রতিফলক ধরনের কুকারে বেশী উষ্ণতা পাওয়া যায়।

সৌর জল ও বাতাস গরম করার যন্ত্র : সূর্যের তাপ ব্যবহার ক'রে জল বা বাতাস গরম করা সম্ভব। শীতের দেশে ঘর-বাড়ী গরম রাখতে বা বাসন ও কাপড় কাচার জন্যে জল গরম ক'রতে এই যন্ত্র ব্যবহার করা যেতে পারে। আমেরিকাতে মোট ব্যবহৃত জ্বালানীর 20 থেকে 25 শতাংশ ব্যয় হয় উপরিউক্ত দুটি কাজে। অপেক্ষাকৃত কম উষ্ণতা (70—75°C) দরকার ব'লে 'সামতলিক ফলক সৌর সংগ্রাহক' (flat plate solar collector) ব্যবহার করা হয়। বেশী উষ্ণতার জন্যে অবতল দর্পন ব্যবহার ক'রে তাপশক্তিকে কেন্দ্রীভূত করার ব্যবস্থা করা থাকে। 'সামতলিক ফলক সৌর সংগ্রাহক' বানানো সহজ; ফলে এটা সস্তা দরে পাওয়া যায়। গৃহস্থালীর কাজে ছাড়াও পাট, বস্ত্র, খাদ্য সংরক্ষণ ইত্যাদি বিভিন্ন শিল্পে সৌর হিটারের ব্যবহার ক্রমশঃ বাড়ছে। এতে জ্বালানী সাশ্রয় হয় এবং দূষণও হয় কম।

সৌর পাতন : সূর্যের তাপ ব্যবহার ক'রে বিশুদ্ধ জল উৎপাদন পদ্ধতিকে বলা হয় সৌর পাতন (solar distillation)। এই প্রক্রিয়ায় অবিশুদ্ধ বা নোনা জলকে সূর্যের তাপে ফুটিয়ে বাষ্প ক'রে তার পর ঠাণ্ডা ক'রলে বিশুদ্ধ জল পাওয়া যায়। আজকাল সূর্যের তাপ ব্যবহার ক'রে শস্য শুকানোর যন্ত্রও বাণিজ্যিক সাফল্য অর্জন ক'রেছে।

6.4.1.2. সৌর পুকুর

সূর্যের তাপ-শক্তি সংগ্রহ ক'রে ধ'রে রাখার জন্যে তৈরী বিশেষ ধরনের কৃত্রিম জলাশয়কে বলে সৌর পুকুর (solar pond)। এই পুকুরে লবণ মেশানো জল রাখা হয়। লবণ হিসেবে সাধারণতঃ সোডিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইড, অ্যামোনিয়াম সালফেট বা অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এই ধরনের পুকুরে সবচেয়ে নীচের জলের উষ্ণতা সবচেয়ে বেশী হয়। এই উত্তপ্ত জল ঘর গরম রাখার কাজে বা বিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজে ব্যবহার করা যায়। পণ্ডিচেরীতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্যে দুটি সৌর পুকুর আছে। অপেক্ষাকৃত বড় পুকুরটির ক্ষেত্রফল প্রায় 6000 বর্গমিটার। এই সৌর পুকুর থেকে প্রায় 90 KW বিদ্যুৎ তৈরী হ'তে পারে।

6.4.1.3. সৌর ফোটো-ভোল্টীয় কোষ

কিছু কিছু পদার্থের ওপর সূর্যের আলো এসে পড়লে বৈদ্যুতিক বিভবপ্রভেদ তৈরী হয়। একেই বলে ফোটো-ভোল্টীয় প্রক্রিয়া। সিলিকন ধাতু এমনই একটি ফোটো-ভোল্টীয় পদার্থ। এটি একটি অর্ধ-পরিবাহী। ফোটো-ভোল্টীয় পদ্ধতিতে বিদ্যুৎ

উৎপাদনে মূলতঃ সিলিকনের সৌর কোষই ব্যবহৃত হয়। এই সিলিকনের বিশুদ্ধতার মাত্রা খুব বেশী হওয়া দরকার। এত উচ্চমানের বিশুদ্ধতা পেতে ব্যয় অনেক বেশী হয়। সারা বিশ্বেই অবশ্য এই ব্যয় কমানোর চেষ্টায় গবেষণা চ'লছে। সৌরকোষে আপতিত সূর্যরশ্মির 10% থেকে 15% মাত্র বিদ্যুতে রূপান্তরিত হয়। ফলে একটি সৌর কোষ থেকে খুবই সামান্য পরিমাণ বিদ্যুৎ পাওয়া যায়। এই কারণে অনেকগুলি সৌরকোষ একসাথে যুক্ত করে তৈরী করা হয় একটি 'মডিউল'। আমাদের দেশে ব্যবহৃত 'মডিউল'-এ সাধারণতঃ 33 থেকে 36টি সৌর কোষ সংযুক্ত থাকে। এক একটি মডিউলের গড় ক্ষমতা প্রায় 35 ওয়াটের কাছাকাছি হয়ে থাকে।

আমাদের দেশে সৌরশক্তির সম্ভাবনা খুবই উজ্জ্বল। কারণ গড় হিসেবে আমাদের দেশে বছরে রৌদ্রোজ্জ্বল দিনের সংখ্যা 250 থেকে 300; এবং ভারতের অধিকাংশে অঞ্চলই দৈনিক গড়ে 4 থেকে 7 ঘণ্টা সূর্যের আলো পায়। সৌর কোষের দক্ষতা 10% এবং ভূ-পৃষ্ঠে আপতিত সূর্যরশ্মির শক্তিমাত্রা প্রতি বর্গমিটারে 0.9 KW ধরে নিলে একটা সহজ হিসাবে ক'রলেই দেখা যাবে যে একটা ছোট বাড়ীর ছাদ (100 বর্গমিটার ক্ষেত্রফল) যদি সৌর কোষ দিয়ে ছেয়ে দেওয়া যায় এবং এই ছাদে প্রতিদিন 7 ঘণ্টা সূর্যের আলো থাকে ধ'রলে মোট প্রাপ্ত বিদ্যুৎ শক্তির পরিমাণ হবে প্রায় 60 KWH বা 60 ইউনিট। একটি বাড়ীর ছাদ থেকে তৈরী এই বিদ্যুৎ আশেপাশের প্রায় পনেরোটা ছোট বাড়ীর বিদ্যুৎ চাহিদা মেটাতে পারবে। বিজ্ঞানীরা আশা করছেন যে, একবিংশ শতকের প্রথম দিকেই ভারত সৌরশক্তি উৎপাদনে পৃথিবীতে প্রথম স্থান নিয়ে নেবে। নবম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষে ভারতের সৌর শক্তি উৎপাদন ক্ষমতা প্রায় 8000 MW হওয়ার সম্ভাবনা; অর্থাৎ ভারতের মোট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতার প্রায় এক পঞ্চমাংশ।

কৃত্রিম উপগ্রহে শক্তি উৎপাদনের জন্যে প্রথম সৌর কোষ ব্যবহার হয়েছিল। আজকাল দৈনন্দিন জীবনে বিদ্যুৎ সরবরাহ করার কাজেও সৌর কোষ ব্যবহার হয়ে থাকে। বিশেষতঃ বিদ্যুৎবিহীন এলাকার রাস্তা আলোকিত করার কাজে এবং সেচের পাম্প চালানোর কাজে সৌর বিদ্যুতের বহুল ব্যবহার রয়েছে। দিনের বেলায় কোষের মাধ্যমে উৎপন্ন বিদ্যুতের উদ্বৃত্ত অংশ ব্যবহার ক'রে ব্যাটারী চার্জ ক'রে রাখা যায়। রাত্রিবেলা, যখন সৌরবিদ্যুৎ তৈরী বন্ধ হয়ে গেছে, তখন ব্যাটারীতে সঞ্চিত শক্তিকে বিদ্যুৎ শক্তিরূপে ব্যবহার করা যেতে পারে। একটি 5KW ক্ষমতা সম্পন্ন সৌর ব্যাটারী যুক্ত পাম্প প্রায় 4 হেক্টর জমিতে সেচ দিতে পারে।

6.4.2.1. বায়ু-শক্তি

'বায়ু-চক্রে' বা 'বায়ু-কল' নামক যন্ত্রে বাতাসের গতিশক্তিকে কাজে লাগিয়ে কুয়ো থেকে জল তোলা হয়। এই প্রযুক্তি অনেক প্রাচীন। বায়ুশক্তিকে বিদ্যুতে রূপান্তরিত ক'রতে গেলে বাতাসের গতিবেগ ঘণ্টায় প্রায় 20 কিমি হওয়া দরকার। বায়ুকলের সাহায্যে বিদ্যুৎ উৎপাদনে পরিবেশের কোনও ক্ষতি হয় না। যে সব প্রান্তিক জায়গায় প্রচলিত বিদ্যুৎ পরিবহন বা বণ্টনের অসুবিধে আছে সেখানে স্থানীয় চাহিদা অনুযায়ী অনেকগুলি বায়ু-কল বসিয়ে একটি বায়ু-খামার (wind firm) প্রকল্প গ'ড়ে প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ সরবরাহ করা সম্ভব। সুইজারল্যাণ্ডের একটি সংস্থা তিন-পাখা ওয়ালা একটি বায়ু-কল তৈরী ক'রে বিক্রী করে। বাতাসের গতিবেগ ঘণ্টায় 36 কিমি. হ'লে এই বায়ু-কলটির উৎপাদন ক্ষমতা হয় 5 KW। আমাদের রাজ্যে সাগর দ্বীপ আর দীঘায় 10 KW ক্ষমতাসম্পন্ন বায়ু-বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। এছাড়া ফ্রেজারগঞ্জে 2 MW ক্ষমতা সম্পন্ন বায়ু-শক্তি খামার প্রকল্পের কাজ শেষ হওয়ার মুখে।

6.4.3. কোটাল শক্তি বা জোয়ার-ভাঁটার শক্তি

জল তোলা বা সেচের কাজে জোয়ার-ভাঁটার শক্তিকে কাজে লাগানোর অভিজ্ঞতা মানুষের অনেকদিনের। তবে এই শক্তি ব্যবহার ক'রে বিদ্যুৎ উৎপাদন নেহাৎই নতুন প্রযুক্তি। এই ধরনের প্রকল্প সর্বপ্রথম হয়েছিল ফ্রান্সে—9 MW ক্ষমতাসম্পন্ন

'সেন্ট মার্লো' এবং 240 MW ক্ষমতার র‍্যান্স বিদ্যুৎ প্রকল্প। ভারতের বিভিন্ন জায়গায় এই ধরনের প্রকল্প গড়ে তোলার চেষ্টা চ'লছে। ইউ. এন. ডি. পি.'র একটি সমীক্ষা অনুযায়ী আমাদের রাজ্যের সুন্দরবন অঞ্চলে 3.5 MW ক্ষমতার প্রকল্প তৈরী সম্ভব।

সূর্য ও চাঁদের আকর্ষণে জোয়ার-ভাঁটা হয়। জোয়ার ও ভাঁটার সময়ে নদীর জলতলের তফাৎ অনেক সময় 6 থেকে 7 মিটার হয়ে থাকে। খাঁড়ি বা অববাহিকা অঞ্চলে জোয়ার বা ভাঁটার গতিবেগ খুব বেশী হয়। এই ধরনের জায়গায় বাঁধ দিয়ে জলের তোড়ে টারবাইন ঘুরিয়ে জোয়ার-ভাঁটার শক্তিকে বিদ্যুতে রূপান্তরিত করা সম্ভব। আমাদের দেশে তিন দিকেই সমুদ্র থাকার ফলে জোয়ার-ভাঁটার শক্তি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রচুর সম্ভাবনা (সারণী 6.8)। এই ধরনের বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্পূর্ণ দূষণ-মুক্ত।

6.4.4. ভূ-তাপীয় শক্তি

পৃথিবীর ভেতরে গেলে উষ্ণতা ক্রমশঃ বাড়তে থাকে—কেন্দ্রের উষ্ণতা প্রায় 4000°C; অর্থাৎ সব পদার্থই তরল অবস্থায়। অভ্যন্তরের এই তাপ ব্যবহার ক'রে পৃথিবীর কয়েকটি দেশে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হচ্ছে।

মাটির ওপর থেকে প্রায় 30 কিমি. গভীরতা পর্যন্ত রয়েছে ভূ-ত্বক। এর তলায় রয়েছে প্রচণ্ড গরম তরল বা ম্যাগমা। পৃথিবীর যত গভীরে যাওয়া যায় উষ্ণতা ততই বাড়তে থাকে। এই উষ্ণতা বৃদ্ধির হারকে বলে ভূ-তাপীয় নতি-মাত্রা (geothermal gradient)। সাধারণভাবে এর মান প্রতি কিমিতে 10°C। কিন্তু আগ্নেয়গিরির ক্ষেত্রে এই মান প্রতি কিমিতে 100°C পর্যন্ত হ'তে পারে। কোন কোন পাহাড়ী অঞ্চলে ইউরেনিয়াম, থোরিয়াম প্রভৃতি তেজস্ক্রিয় পদার্থের উপস্থিতির জন্যও ভূ-তাপ নতিমাত্রার মান বেড়ে গিয়ে উষ্ণ প্রস্রবণের সৃষ্টি হ'তে পারে। উষ্ণ প্রস্রবণ বা আগ্নেয়গিরি আছে এমন অঞ্চলেই ভূ-তাপ শক্তি কেন্দ্র বসানো হয়। এই পদ্ধতিতে একটি বড় ও একটি ছোট ব্যাসের সমকেন্দ্রিক দুটি নল মাটির গভীরে প্রায় 3000 মিটার ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। বাইরের নল দিয়ে সাধারণ উষ্ণতার জল মাটির গভীরে পাঠানো হয়। সেই জল পৃথিবীর আভ্যন্তরীণ তাপে উচ্চ চাপের বাষ্পে পরিণত হ'য় এবং ছোট ব্যাসের নল দিয়ে উপরে উঠে আসে। এই বাষ্পের চাপে টার্বাইন ঘুরিয়ে প্রচলিত তাপীয় পদ্ধতিতেই বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়। এই পদ্ধতিতে জীবাশ্ম জ্বালানীর দহন হচ্ছে না বলে এতে দূষণ সম্ভাবনা প্রায় নেই বললেই চলে। এই ধরনের প্রকল্প প্রথম চালু হয়েছিল 1982 সালে হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জে; প্রকল্পটি ছিল 3 MW ক্ষমতাসম্পন্ন। বর্তমানে আমেরিকা, রাশিয়া, ইতালী, নিউজিল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে ভূ-তাপকে শক্তি-উৎস হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। নিউজিল্যাণ্ডে মোট ব্যবহৃত শক্তির 11% আসে ভূ-তাপ থেকে। আমাদের দেশে এই শক্তি-উৎস ব্যবহারের সম্ভাবনাময় অঞ্চল হ'লো কোঙ্কন ও মালাবারের পশ্চিমঘাট অঞ্চল। উষ্ণ-প্রস্রবণের শক্তি ব্যবহারের প্রকল্প রয়েছে লাদাখের 'পুগা' উপত্যকায়।

6.4.5. জৈব-গ্যাস

জৈব-গ্যাস—সাধারণভাবে যাকে গোবর গ্যাস বলা হয়—হ'লো একটি বিশেষ নবায়ন যোগ্য শক্তির উৎস। এই পদ্ধতিতে মানুষ বা গবাদি পশুর মলের জৈব রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটানো হয় এ্যানিরোবিক ব্যাকটিরিয়ার সাহায্যে। এই বিক্রিয়ার তিনটি ধাপ—এক এক ধাপে এক এক ধরনের ব্যাকটিরিয়া ব্যবহার করা হয়। প্রথম ধাপে সন্ধানকারী (fermentative) ব্যাকটিরিয়া; দ্বিতীয় ধাপে এ্যাসিটোজেনিক ব্যাকটিরিয়া এবং তৃতীয় ধাপে মিথানোজেনিক ব্যাকটিরিয়া ব্যবহার করা হয়। সমগ্র বিক্রিয়াটি শেষ হ'লে পাওয়া যায় গ্যাসীয় জ্বালানী ও কিছু জৈব অবশেষ। গ্যাসীয় জ্বালানীতে থাকে 60% মিথেন ও 40% কার্বন ডাইঅক্সাইড। মিথেন জ্বালানী হিসাবে ব্যবহার্য। জৈব অবশেষ জৈব সার হিসাবে খুব উপযোগী। আখের ছিবড়ে, খড় এবং অন্যান্য কৃষিজ বর্জ্য ব্যবহার ক'রেও জৈব-গ্যাস তৈরী করা যেতে পারে। কাঠের টুকরো এবং গুঁড়ো থেকে জৈব-গ্যাস প্রস্তুতির প্রযুক্তি আজ আমাদের আয়ত্তাধীন। গ্যাসিফায়ার যন্ত্রে কাঠ থেকে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহারযোগ্য

'প্রোডিউসার গ্যাস' (কার্বন মনোক্সাইড ও হাইড্রোজেনের মিশ্রণ) তৈরী করা হয়। আমাদের দেশে জৈব-গ্যাসের সম্ভাবনা খুব উজ্জ্বল। একটি হিসেবে দেখা গেছে যে শুধুমাত্র গোবর ব্যবহার ক'রেই ভারতে প্রায় তিনশ কোটি ইউনিট (KWH) শক্তি উৎপাদন সম্ভব। একটি গ্রামীণ পরিবারে 5—6টি গরু বা মোষ থাকলে তাদের গোবর থেকে উৎপন্ন জৈব-গ্যাস ব্যবহার ক'রে বাড়ীর আলো জ্বালানো এবং রান্নার কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব। আমাদের রাজ্যে বেশ কিছু জৈব-গ্যাস প্রকল্প চালু রয়েছে। গোসাবাতে একটি 500 KW গ্যাসিফায়ার প্রকল্প চ'লছে, কালিম্পং জেলার লোলেগাঁও গ্রামে একটি 30 KW ক্ষমতার গ্যাসিফায়ার প্রকল্প রয়েছে। এ ছাড়া সুন্দরবনের মোল্লাখালি দ্বীপে একটি 500 KW ক্ষমতার জৈব-গ্যাস প্রকল্প স্থাপনের কাজ চ'লছে। পুরুলিয়া জেলার অযোধ্যা পাহাড়ে একটি 100 KW গ্যাসিফায়ার প্রকল্প বসানো হচ্ছে।

6.4.6. ক্ষুদ্র/অতি ক্ষুদ্র জলবিদ্যুৎ প্রকল্প

জলবিদ্যুৎ উৎপাদন সম্পর্কে আমরা আগে আলোচনা করেছি। পাহাড়ী অঞ্চলে অনেক উঁচু থেকে নেমে আসা ঝর্ণার জলের গতিশক্তি ব্যবহার ক'রে ছোট (50 KW থেকে 500 KW) জলবিদ্যুৎ প্রকল্প গড়ে তোলা সম্ভব। বৃহৎ জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রের অসুবিধাগুলি এইসব ছোট প্রকল্পগুলিতে নেই। একই ঝর্ণার গতিপথে বিভিন্ন উচ্চতায় টারবাইন বসিয়ে একাধিক ক্ষুদ্র প্রকল্প চালানো যেতে পারে। আমাদের দেশে এই ধরনের প্রকল্পের উৎপাদন সম্ভাবনা প্রায় 10,000 MW; কিন্তু এই সম্ভাবনার খুব সামান্য অংশেই বাস্তবায়িত হয়েছে (সারণী 6.7 দ্রষ্টব্য)। ইদানীং ভারত সরকারের অপ্রচলিত শক্তি দপ্তর (MNES) এই ধরনের প্রকল্পের বহুল ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আমাদের রাজ্যে, উত্তরবঙ্গের কলখোলা, প্যারেনখোলা ও কলবনখোলাতে একটি ক'রে 15 KW ক্ষমতার অতি ক্ষুদ্র জলবিদ্যুৎ প্রকল্প চালু রয়েছে। গত তিন বছর ধ'রে 'রাংমুক' চা বাগানে একটি 500 KW ক্ষমতার ক্ষুদ্র জলবিদ্যুৎ প্রকল্প চালু রয়েছে।

6.4.7. সমুদ্র-জলের তাপীয় শক্তি পরিবর্তন প্রযুক্তি (OTEC, ওটেক)

সমুদ্রের জলের উষ্ণতা বিভিন্ন গভীরতায় বিভিন্নরকম থাকে। উপরিস্তরের উষ্ণতা সাধারণতঃ হয় 21°C থেকে 28°C। কিন্তু সমুদ্রের তলদেশের জলস্তরের উষ্ণতা থাকে 2 বা 3°C মাত্র। উষ্ণতার এই অসমতা ব্যবহার ক'রে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায়। এই প্রযুক্তিই হ'লো 'ওটেক'। আজ থেকে প্রায় 70 বছর আগে কিউবার সমুদ্রতটে 'ওটেক' পদ্ধতিতে বিদ্যুৎ উৎপাদনে সফল হয়েছিলেন মার্কিন বিজ্ঞানী জর্জ ক্লাউড। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশেই এখন 'ওটেক' পদ্ধতির বিভিন্ন প্রযুক্তিগত সমস্যা সমাধানের চেষ্টায় গবেষণা চ'লছে।

সুবিধাজনক ভৌগোলিক অবস্থান এবং উপযুক্ত উষ্ণতার তফাৎ থাকলে 'ওটেক' পদ্ধতিতে উৎপন্ন বিদ্যুৎ অন্যান্য পদ্ধতির সাথে তুলনীয় হতে পারে। বিশেষতঃ কয়লা এবং তেলের দাম যত বাড়বে, ততই অঞ্চল বিশেষে বেশী সংখ্যায় 'ওটেক' প্রকল্প চালু করার কথা ভাবতে হবে আমাদের। ওটেক প্রকল্পে প্রতি মেগাওয়াট বিদ্যুতের জন্য 1 বর্গ কিমি. মতো সমুদ্রের এলাকাই যথেষ্ট। ভারতের লাক্ষাদ্বীপে একটি 1 MW ক্ষমতার 'ওটেক' প্রকল্প বসানোর চেষ্টা চ'লছে। এই দ্বীপে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য অনুসৃত প্রচলিত পদ্ধতিগুলি খুবই ব্যয়সাধ্য।

6.4.8. শক্তি-দায়ী বনসৃজন (Energy Plantation & Power, EPP)

মানুষ প্রাচীন যুগ থেকেই শক্তির উৎস হিসেবে গাছপালা ব্যবহার ক'রে আসছে। কিন্তু অরণ্য হননের ফলে পরিবেশ ও বাস্তুতন্ত্রের ক্ষতি হচ্ছে এটাও আজ আমাদের জানা। বিকল্প হিসাবে খুব তাড়াতাড়ি বেড়ে ওঠে এমন গাছ লাগিয়ে গৃহস্থালীর জ্বালানীর প্রয়োজন মেটানো যেতে পারে। এই ধরনের গাছ সাধারণতঃ উষর (arid) এলাকায় লাগানো হয়। প্রত্যক্ষভাবে রান্নার কাজে ব্যবহার করা ছাড়াও 'গ্যাসিফায়ার' যন্ত্রে এই সব গাছের ডালপালা ব্যবহার ক'রে বিদ্যুৎ এবং কাঠকয়লা উৎপাদন করা যেতে পারে। হিসেব ক'রে দেখা গেছে যে 1000 হেক্টর এলাকার এই ধরনের বনাঞ্চল থেকে 3 MW ক্ষমতার

বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব। এ ছাড়া প্রায় দেড়শ পরিবারের জ্বালানী কাঠ এবং কাঠকয়লার চাহিদাও এই বন থেকে মিটবে। ভারতে উষর জমির মোট পরিমাণ ৪ কোটি হেক্টর। এর কুড়ি শতাংশও যদি এই ধরনের বনসৃজনে ব্যবহার করা যায় তাহ'লে প্রায় 48,000 MW বিদ্যুৎ ক্ষমতা তৈরী হ'তে পারে। এই ধরনের প্রকল্পের প্রাথমিক লগ্নী প্রতি কিলোওয়াটে প্রায় 15,000 টাকা।

6.4.9. তৈল উদ্ভিদ ও ইথানল

খড়, আখের ছিবড়ে, বীট ইত্যাদি শর্করা জাতীয় শস্য থেকে ইথাইল এ্যালকোহল বা ইথানল প্রস্তুতির প্রযুক্তি আজ আমাদের করায়ত্ত। পেট্রল/ডিজেলের বিকল্প হিসেবে যানবাহন চালাতে আজকাল ইথানল ব্যবহার করা হচ্ছে। ব্রাজিলে এর ব্যবহার খুবই ব্যাপক। গাড়ীর ইঞ্জিনে ইথানল ব্যবহার ক'রলে পরিবেশ দূষিত হয় না।

সরষে, বাদাম, সূর্যমুখী ইত্যাদি থেকে ভোজ্য তেল তৈরী হয় একথা আমরা জানি। এমন কিছু উদ্ভিদ আছে যাদের থেকে হাইড্রোকার্বন জাতীয় তেল পাওয়া যায়। এদের বলে পেট্রো ক্রপ (petro crops)। আমাদের দেশে প্রায় চারশোটি প্রজাতির উদ্ভিদ চিহ্নিত হয়েছে 'পেট্রোক্রপ' হিসেবে। এর মধ্যে 50টি উদ্ভিদ বেছে নিয়ে বাণিজ্যিকভাবে তেল সংগ্রহের চেষ্টা চ'লছে।

6.5. বায়ুদূষণ; শক্তি উৎপাদনে বর্জ্য পরিচালন, শক্তি সংরক্ষণে বর্জ্যের পুনশ্চক্রায়ন

উন্নয়নশীল দেশগুলির ক্ষেত্রে শক্তি-উৎপাদন বাড়ানো যে আবশ্যিক এ-কথাটা আমরা সবাই বুঝি। শক্তি ব্যবহারে সারা পৃথিবীর গড় যেখানে জন-প্রতি 2500 কেজি কয়লা-সমতুল (coal equivalent) সেখানে উন্নয়নশীল দেশে এই সংখ্যাটা জনপ্রতি মাত্র 600 কেজি কয়লা-সমতুল। আমাদের দেশে সমস্যাটা খুবই জটিল কারণ সব রকমের শক্তি উৎসই আমরা ব্যবহার করি। আমাদের মোট শক্তির অধিকাংশই আসে কয়লা বা তেল পুড়িয়ে এবং জল বিদ্যুৎ থেকে (সারণী 6.5)। কিন্তু জীবাশ্ম-জ্বালানী ব্যবহারে খুব বেশী বায়ুদূষণ হয়। তা ছাড়া জল-বিদ্যুৎ এবং পারমাণবিক বিদ্যুতের কিছু পরিবেশগত সমস্যা রয়েছে।

6.5.1. বায়ুদূষণ

জীবাশ্ম জ্বালানীর দহনের ফলে মূলতঃ তিন ধরনের দূষণগত সমস্যা দেখা দেয়—বায়ু দূষণ, আবহাওয়ার অম্লতাবৃদ্ধি এবং জলবায়ুর পরিবর্তন। বায়ু দূষণের মূলে আছে সালফার ডাইঅক্সাইড, নাইট্রোজেন অক্সাইড, কার্বন মনোক্সাইড, কার্বন ডাইঅক্সাইড, বিভিন্ন হাইড্রোকার্বন, উড়ন্ত ছাই এবং বাতাসে ভেসে থাকা কণা। বাতাসে এগুলি মিশে যাবার ফলে সাধারণ শারীরিক ক্ষতি, ফুসফুসের অসুখ, ক্যান্সার ইত্যাদি হয়। জলের সাথে মিশে অম্ল তৈরী ক'রে এরা ফসলের ক্ষতি করে, জমির উর্বরতা কমায় এবং ভূমিক্ষয় ও জলদূষণ ঘটায়। কয়লার দহনে উৎপন্ন কার্বন ডাইঅক্সাইড বাতাসে মিশে গ্রীন হাউস প্রক্রিয়ায় পৃথিবীর উষ্ণতা বাড়িয়ে দেয়। কার্বন ডাইঅক্সাইড এর পরিমাণ বাতাসে ক্রমশঃই বেড়ে চ'লছে—গত চল্লিশ বছরে বেড়েছে প্রায় 12%। শিল্প বিপ্লবের আগে বাতাসে এই গ্যাসের পরিমাণ ছিল 280 পি.পি.এম. (1 পি.পি.এম. হ'লো দশ লক্ষ ভাগের 1 ভাগ); আজ এটা প্রায় 400 পি.পি.এম। বিজ্ঞানীদের আশঙ্কা যে সমগ্র পৃথিবীর তাপীয় ভারসাম্য এর ফলে বিপর্যস্ত হয়ে যাবে। দূষণ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে আইন প্রবর্তন সত্ত্বেও আমরা কয়লার ব্যবহার কমাতে পারিনি (সারণী 6.5)। এ ছাড়াও বায়ু দূষণের একটি অন্যতম উৎস হ'লো যানবাহন থেকে নির্গত কালো ধোঁয়া। শহরাঞ্চলে বিদ্যুৎ চালিত যানবাহনের ব্যবহার বাড়াতে পারলে এই সমস্যার আংশিক সমাধান সম্ভব। পেট্রল বা ডিজেলের পরিবর্তে ইথানল ব্যবহারের কথাও জরুরী ভিত্তিতে চিন্তা করা দরকার। জীবাশ্ম জ্বালানীকৃত বায়ুদূষণ কমানোর উদ্দেশ্যে আমাদের অপ্রচলিত শক্তি উৎপাদনের দিকে বেশী ক'রে নজর দেওয়া প্রয়োজন। তাছাড়া জীবাশ্ম জ্বালানীর ভাণ্ডার ফুরিয়ে আসছে একথাটাও মনে রাখা জরুরী।

6.5.2. বৃহৎ জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রের সমস্যা

প্রচলিত শক্তি উৎসগুলির মধ্যে জল থেকে উৎপন্ন বিদ্যুৎ পরিবেশের ক্ষতি করে না এবং জলবিদ্যুৎ নবায়নযোগ্যও বটে। কিন্তু বৃহৎ জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপনের জন্যে বিপুল পরিমাণে জমি জলমগ্ন ক'রতে হয় জলাধার নির্মাণের জন্যে। অনেক কৃষিজমি, বনভূমি নষ্ট হয় এবং অনেক মানুষ বাস্তুচ্যুত হন; ফলে সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি হয়। উদাহরণ স্বরূপ টেহরী বাঁধ প্রকল্পের কথা ধরা যেতে পারে। উত্তরপ্রদেশে হিমালয়ের পাদদেশে ভাগীরথী নদীর ওপর এটি প্রস্তাবিত। এটা যদি রূপায়িত হয় তা'হলে প্রায় 100টি গ্রাম জলমগ্ন হবে এবং বাস্তুচ্যুত হবেন প্রায় 1 লক্ষ মানুষ। এ ছাড়া বৃহৎ জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের প্রাথমিক ব্যয়ও অত্যন্ত বেশী। বর্তমানে উপযুক্ত জলাধার নির্মাণের জায়গার অভাবে নরওয়ে এবং কানাডা ছাড়া অধিকাংশ উন্নত দেশে এবং অত্যধিক প্রাথমিক ব্যয়ের কারণে উন্নয়নশীল গরীব দেশগুলিতে বৃহৎ জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রস্থাপন সমস্যার সম্মুখীন। ক্ষুদ্র জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রে কিন্তু এইসব সমস্যা নেই। তাই এখন ক্ষুদ্র এবং অতি ক্ষুদ্র জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণে অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে। এক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে চীন। এখানে প্রায় 10,000 এই ধরনের ছোট জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে মোট প্রায় 5000 MW বিদ্যুৎ তৈরী হচ্ছে।

6.5.3. তেজস্ক্রিয় দূষণ

তেজস্ক্রিয়তা আবিষ্কারের বয়স 104 বছর। মানুষ কিন্তু তেজস্ক্রিয় বিকিরণের প্রভাবে রয়েছে প্রজাতি হিসাবে তার আবির্ভাবের সময় থেকেই। কারণ পৃথিবীতে বহিরাগত মহাজাগতিক রশ্মি এবং মাটিতে মিশে থাকা ইউরেনিয়াম, থোরিয়াম ইত্যাদি তেজস্ক্রিয় মৌল পৃথিবীর জন্ম থেকেই রয়েছে। গত 50 বছরে পারমাণবিক বোমা—বিদ্যুৎ-যুদ্ধাস্ত্র ব্যবহারের ফলে পরিবেশে তেজস্ক্রিয়তার মাত্রা বেড়ে গেছে। তেজস্ক্রিয়তার প্রভাবে উদ্ভিদ, প্রাণী ও মানুষের অপরিসীম ক্ষতি হয়—এবং এর বিষক্রিয়া চ'লতে থাকে বংশপরম্পরায়। হিরোসিমা-নাগাসাকি আর থ্রী মাইল আইল্যান্ড-চের্নোবিলের ভয়াবহতার কথা তো এখন স্কুলের ছেলেমেয়েরাও জানে।

পরিবেশে স্বাভাবিক তেজস্ক্রিয়তার বার্ষিক গড় মান 105 মিলিরেম। মহাজাগতিক রশ্মির প্রভাবে বায়ুমণ্ডলে তৈরী হয় কার্বন—14 ও ট্রিসিয়াম—3। ভূত্বকে থাকে U—238, Th—234 ইত্যাদি তেজস্ক্রিয় মৌল। এছাড়া মাটিতে K—40, Rb—87, প্রভৃতি তেজস্ক্রিয় মৌল। প্রতি বছর একটি মানুষ প্রায় 50 মিলি র‍্যাড তেজস্ক্রিয় বিকিরণ স্থল থেকেই গ্রহণ করে।

খনি থেকে তেজস্ক্রিয় আকরিক এবং তার শুদ্ধিকরণ প্রক্রিয়ায় অনেক তেজস্ক্রিয় মৌল এসে জীবমণ্ডলে মেশে। এর মধ্যে রেডিয়াম—226 তীব্র জল দূষণ এবং রেডন বায়ু দূষণ করে। বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য পারমাণবিক চুল্লীতে তেজস্ক্রিয় জ্বালানী ব্যবহার করা হয়। চুল্লী নির্গত বর্জ্য গ্যাসে থাকে ট্রিসিয়াম, কার্বন—14 প্রভৃতি তেজস্ক্রিয় মৌল। এই গ্যাস কোনও কারণে বাইরে বেরিয়ে এলে বায়ুদূষণ ঘটে। চুল্লীর তরল বর্জ্যে উপস্থিত আয়রণ—59, কোবাল্ট—60 ইত্যাদি তেজস্ক্রিয় মৌল ঘটনাক্রমে জলস্তরে মিশে গেলে মারাত্মক ক্ষতি হ'তে পারে। পারমাণবিক চুল্লীর জ্বালানী ফুরিয়ে গেলে নিঃশেষিত বর্জ্য চুল্লী থেকে বের ক'রে নেওয়া হয়। এই বর্জ্যের তেজস্ক্রিয়তার মাত্রা সাংঘাতিক। এতে আয়োডিন—131, ক্রিপ্টন—85, অব্যবহৃত ইউরেনিয়াম এবং উৎপন্ন প্লুটোনিয়াম থাকে। এই বর্জ্যের সংরক্ষণ এবং অপসারণ খুব সাবধানে করা দরকার। সামান্য ত্রুটির ফলেই মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে।

6.5.3.1. তেজস্ক্রিয় বর্জ্যের সংরক্ষণ ও পরিচালন

পারমাণবিক জ্বালানী চক্রের সব ধাপেই কিছু কিছু কঠিন, তরল বা গ্যাসীয় তেজস্ক্রিয় বর্জ্য তৈরী হয়। তেজস্ক্রিয়তার মাত্রা অনুযায়ী তেজস্ক্রিয় বর্জ্যকে সাধারণতঃ চারভাগে ভাগ করা হয়।

(i) নীচু মাত্রার বর্জ্য : এই বর্জ্য সাধারণতঃ তরল বা গ্যাসীয় হয়ে থাকে এবং এরা সরাসরি চারদিকের পরিবেশে এসে মেশে।

(ii) মাঝারি মাত্রার বর্জ্য 1 : এই বর্জ্যে স্বল্পস্থায়ী তেজস্ক্রিয় পদার্থ বেশী থাকে এবং এরা সাধারণতঃ কঠিন বা কাদার মতো হয়। এই বর্জ্য মাটির নীচে বিশেষভাবে তৈরী বিকিরণ নিরোধক ঘরে জমিয়ে রাখা হয়।

(iii) মাঝারি মাত্রার বর্জ্য 2 : এই বর্জ্যে থাকে প্লুটোনিয়ামের মতো তুলনায় দীর্ঘায়ু আলফা কণা বিকিরণকারী কিছু তেজস্ক্রিয় পদার্থ। এই শ্রেণীর বর্জ্য মাটির নীচে অতি গভীরে জমিয়ে রাখা হয়।

(iv) উচ্চ মাত্রার বর্জ্য : এই বর্জ্যের তেজস্ক্রিয়তা খুব বেশী এবং এরা কঠিন বা তরল হতে পারে।

এদের উৎস হ'লো পারমাণবিক চুল্লীর কেন্দ্রীয় অঞ্চল থেকে আসা অব্যবহৃত জ্বালানী দণ্ড কিংবা রিপ্রসেসিং-এর সময়ে পাওয়া কিছু তরল তেজস্ক্রিয়তা। এই ধরনের বর্জ্য থেকে প্রচুর তাপ বেরোয় এবং জমিয়ে রাখার সাথে সাথে তাই বর্জ্যকে ঠাণ্ডা রাখার ব্যবস্থাও ক'রতে হয়।

তেজস্ক্রিয় বর্জ্য সম্পর্কে যে সব ব্যবস্থার কথা উপরে বলা হ'লো সেগুলি সবই অবশ্য অস্থায়ী। কারণ স্থায়ী কোনও সমাধান আজও আমাদের অনায়ত্ত। অথচ বিভিন্ন পরমাণু চুল্লী কেন্দ্রে জমিয়ে রাখা তেজস্ক্রিয় বর্জ্যের পরিমাণ ক্রমশঃই বেড়ে চ'লছে। কিন্তু এর যথাযথ কোনও ব্যবস্থা না থাকায় একটি বিপজ্জনক পরিবেশ সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে।

উপসংহার : এই অধ্যায়ে আমরা শক্তি উৎপাদনের বিভিন্ন পদ্ধতি ও সেগুলির সুবিধা-অসুবিধা নিয়ে আলোচনা ক'রলাম। উপসংহারে আবার যে কথাটা বলা দরকার তা হ'লো এই যে প্রাকৃতিক সম্পদ এবং শক্তি ব্যবহারে 'সংরক্ষণ'-এর ধারণাকে অগ্রাধিকার দেওয়া ছাড়া শক্তিসম্পর্কিত সঙ্কটের হাত থেকে রেহাই পাবার আর কোনও রাস্তা আমাদের জানা নেই। একথা অনস্বীকার্য যে শিল্প ও কৃষিতে স্বনির্ভরতা ছাড়া আমরা টিকে থাকতে পারব না। এই স্বনির্ভরতা অর্জন করতে গেলে মোট শক্তির উৎপাদন বাড়াতে হবেই। কিন্তু সেই উৎপাদনবৃদ্ধি ক'রতে হবে সহনশীল উন্নয়নের লক্ষ্যে, দূষণহীন, নবায়নযোগ্য শক্তি উৎপাদনের মাধ্যমে। এটা করবার প্রযুক্তি আমাদের আছে। কিন্তু প্রযুক্তি ছাড়াও প্রয়োজন হবে সমস্যাটি সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী এবং জীবনযাত্রার পদ্ধতি পরিবর্তনের সদিচ্ছা। তাহ'লেই পৃথিবীর প্রাকৃতিক সম্পদ যথাসম্ভব রক্ষা করা যাবে এবং আগামী প্রজন্মের হাতে তুলে দেওয়া যাবে একটি বাসযোগ্য পৃথিবী।

সপ্তম অধ্যায়

বায়ু, শব্দ ও গন্ধ দূষণ

অধ্যায় সূচী

দ্বিতীয় অধ্যায়ে বায়ুর উপাদান, গ্যাসীয় উপাদানগুলির ভূমিকা এবং বিভিন্ন প্রাকৃতিক চক্রের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ গ্যাসগুলির পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়া সম্পর্কে আমরা আলোচনা করেছি। আলোচ্য অধ্যায়ে সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে

দূষক পদার্থসমূহ বায়ুতে মিশে যাবার ফলে বায়ুর উপাদান বিশেষতঃ স্থানীয় বায়ুর উপাদান পরিবর্তনের ফলাফল কেমন হতে পারে, বায়ুদূষক পদার্থসমূহের সাধারণ প্রভাব, গ্রীনহাউস এফেক্ট এবং গ্রীনহাউস গ্যাসসমূহ, ওজোন হ্রাসকারী বস্তুসমূহ এবং ওজোন স্তরের ওজোন বিভাজন নিয়ন্ত্রণে সম্ভাব্য ব্যবস্থাসমূহ সম্পর্কিত আলোচনার উপর। বায়ু যেহেতু শব্দ এবং গন্ধ বিস্তারের মাধ্যম, তাই শব্দদূষণ এবং গন্ধদূষণের বিষয়টিও এই অধ্যায়ে সংযোজিত এবং আলোচিত হয়েছে।

7.1. বায়ু : পৃথিবীর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক সম্পদ

পৃথিবীকে ঘিরে থাকা বায়ুর আবরণ আমাদের অস্তিত্ব রক্ষার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সাগর মহাসাগরে বসবাসকারী জলচর প্রাণীদের মত পৃথিবীর তাবৎ জীবকুল মানুষসহ প্রাণীজগৎ ও উদ্ভিদজগৎ ঠিক তেমনিই এই বায়ুসমুদ্রে অবস্থান করছে। কয়েকটি গ্যাসের এই বিচিত্র যান্ত্রিক মিশ্রণ (mechanical mixture) যার মধ্যে উপাদান গ্যাসগুলির নিবিড় আনুপাতিক সাম্য বর্তমান এর উপর আমাদের অস্তিত্ব নির্ভরশীল। এজন্য প্রকৃতির এই অত্যাশ্চর্য সম্পদটির উপাদানগত এবং গুণগত যে কোনও পরিবর্তন বা এর উপর আঘাত যে কেবলমাত্র মানবজাতির উপর বিরূপ প্রভাব ফেলবে তাই নয়, বিরূপ প্রভাব ফেলবে সমগ্র জীবমণ্ডলের উপরই।

একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের গড়ে প্রতিদিন প্রায় 14 কিলোগ্রাম বায়ু শ্বাসকার্যের প্রয়োজনে গ্রহণ করতে হয়। একজন সুস্থ ব্যক্তি সাধারণত কোনরকম খাদ্যগ্রহণ ব্যতিরেকে গড়ে 3 সপ্তাহ পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পারেন, জলছাড়া বেঁচে থাকতে পারেন সর্বোচ্চ 5 দিন পর্যন্ত, কিন্তু বায়ুছাড়া 5 মিনিটও তাঁর বাঁচা সম্ভব নয়। কাজেই এমন একটি অত্যাবশ্যক সম্পদ দূষিত বা অপরিচ্ছন্ন হয়ে পড়লে তার ফলাফল মারাত্মক হতে পারে। প্রকৃতপক্ষে বায়ু বিভিন্নস্থানেই দূষিত ও কলুষিত হয়ে পড়ছে মূলতঃ মানুষেরই কিছু কার্যকলাপের ফলে এবং এর মারাত্মক ফলাফল বিভিন্ন স্থানেই ক্রমশ ব্যাপকতরভাবে অনুভূত হচ্ছে, এই সমস্যা এখন আন্তর্জাতিক স্তরে ভাবনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। অনেক পরিবেশ-বিশেষজ্ঞের মতে ক্রমবর্ধমান বায়ুদূষণের বিপদ পারমাণবিক যুদ্ধের বিপদ থেকে কিছুমাত্র কম হবে না এবং এ বিষয়ে অবিলম্বে প্রতিকারমূলক ব্যবস্থাদি গ্রহণ না করতে পারলে জীবমণ্ডলে বিপর্যয়কর পরিস্থিতির সৃষ্টি অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠতে পারে।

7.1.1. বায়ুদূষণ : সংজ্ঞা এবং শ্রেণীবিভাগ

বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) সংজ্ঞা অনুযায়ী "বায়ুদূষণ হল জীবকুলকে ঘিরে থাকা বায়ুমণ্ডলে কিছু বস্তুর এমন গাঢ়ত্বে মিশে যাওয়া যার ফলে মানুষ ও তার পরিবেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে তেমন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়।"

বায়ুদূষণ সম্পর্কে এই সংজ্ঞা ছাড়াও বহুতর সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। একটি সমন্বিত সংজ্ঞা প্রদত্ত হতে পারে নিম্নোক্ত ভাবে :

বিভিন্ন কারণে বায়ুর উপাদনগুলির স্বাভাবিক আনুপাতিক পরিমাণ যদি পরিবর্তিত হয় অথবা কিছু বস্তু বা বস্তুকণা যেমন ধূলিকণা, ধোঁয়া, গ্যাস, বাষ্প, সূক্ষ্ম বা স্থূল কঠিন কণা, তরলবিন্দু কণা ইত্যাদি যদি ভূপৃষ্ঠ সংলগ্ন বাতাসে এমন গাঢ়ত্বে এবং এমন সময়কালব্যাপী মিশে যায় যার ফলে পৃথিবীর প্রাণীজগৎ এবং উদ্ভিদজগতের ক্ষতি হয় বা তাদের স্বাভাবিক জীবন ব্যাহত হয়, তবে ঐ বায়ু দূষিত হয়েছে বলা যায়।

বিভিন্ন ধরনের বায়ুদূষণ : বায়ুদূষণকে আমরা সাধারণত তিনটি শ্রেণীতে বিন্যস্ত করতে পারি।

(i) গ্যাসীয় বায়ুদূষণ (Gaseous air pollution) : কয়েকটি গ্যাসীয় পদার্থ বায়ুমণ্ডলে মিশে বায়ুকে দূষিত করে দেয়, এই ধরনের দূষণকে তাই গ্যাসীয় বায়ুদূষণ বলা হয়। প্রাথমিক বায়ুদূষক হিসেবে চারটি গ্যাসকে চিহ্নিত করা হয়। এগুলি হল কার্বন মনোক্সাইড (CO), সালফারডাই অক্সাইড (SO_2), নাইট্রোজেনের বিভিন্ন অক্সাইড (NO_x) এবং বিভিন্ন হাইড্রোকার্বন। এ গ্যাসগুলি ছাড়াও অবশ্য আরও অনেক বিষাক্ত গ্যাসই, যেমন অ্যামোনিয়া, হাইড্রোজেন সালফাইড, ক্লোরিন, ফ্লুওরিন,

ফসজিন ইত্যাদি, স্থানকাল ভেদে বায়ুমণ্ডলে মিশে গিয়ে স্থানীয়ভাবে বাতাসকে দূষিত করতে পারে। আবার প্রাথমিক বায়ু দূষকগুলির অনেকগুলির বিক্রিয়াতেও অনেক ক্ষেত্রে কোনও তৃতীয় দূষক পদার্থের সৃষ্টি হতে পারে। ঘনমণ্ডলীয় ওজোন এমন একটি বায়ুদূষকের উদাহরণ।

(ii) বায়ুতে প্রলম্বিত বা ভাসমান কণাজাতীয় পদার্থজনিত বায়ুদূষণ (Particulate air pollution) : বায়ুতে ভাসমান বিভিন্ন ধরনের সূক্ষ্ম বা স্থূল কঠিন কণা যেমন ধূলিকণা, ছাই, বিভিন্ন ধাতব বা ধাতব যৌগ কণা, বিভিন্ন রূপের কার্বন কণা, তরল বিন্দু কণা যেমন অ্যাসিড ধোঁয়াশা ইত্যাদির উপস্থিতি বায়ুকে প্রাণীজগৎ ও উদ্ভিদজগতের পক্ষে ক্ষতিকারক করে তুলতে পারে। এভাবে যে বায়ুদূষণ হয় তাকে প্রলম্বিত কণাজণিত (Suspended Particulate Matter—SPM) বায়ুদূষণ বলা হয়।

(iii) তেজস্ক্রিয় পদার্থজনিত বায়ু দূষণ (Radioactive pollution) : কয়েকটি তেজস্ক্রিয় পদার্থ বাতাসে মিশে গিয়ে একে দূষিত করতে পারে, মৃত্তিকায় বর্তমান কোনও তেজস্ক্রিয় পদার্থ থেকে নির্গত ক্ষতিকারক গামা রশ্মিও বাতাসে মিশে বাতাসকে দূষিত করতে পারে। এভাবে সংঘটিত বায়ুদূষণকে তাই তেজস্ক্রিয়তাজনিত বায়ুদূষণ বলা যায়। বায়ুদূষক এমন তেজস্ক্রিয় পদার্থের কয়েকটি উদাহরণ হল 90 ভরযুক্ত স্ট্রনসিয়াম, 137 ভরযুক্ত সিজিয়াম, 14 ভরযুক্ত কার্বন ইত্যাদি।

7.1.2. বায়ুদূষণের উৎসসমূহ এবং দূষণের জন্য দায়ী কারকসমূহ (Sources of air pollution and factors responsible for pollution)

বিভিন্ন বায়ুদূষক পদার্থ নির্গমনের উৎসসমূহকে প্রধানত প্রাকৃতিক (natural) এবং মনুষ্যসৃষ্ট বা কৃত্রিম (anthropogenic or artificial) এই দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়।

প্রাকৃতিক উৎসসমূহের মধ্যে রয়েছে দাবাগ্নি, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত, মৃত জীবদেহের পচন, ফুলের পরাগরেণুর বাতাসে মেশা, মহাজাগতিক ধূলিকণা, উল্কাপাত, ধূলিঝড়, সমুদ্রজলের বাষ্পায়ন বা সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসজনিত কারণে লবণ ইত্যাদির বাতাসে মিশে যাওয়া, উর্ধ্ব বা নিম্ন বায়ুমণ্ডলে সংঘটিত প্রাকৃতিক আলোক রাসায়নিক ক্রিয়া (photochemical reactions) ইত্যাদি।

তবে বায়ুদূষণের মনুষ্যসৃষ্ট উৎসসমূহ নিয়েই বিশেষজ্ঞরা সবিশেষ চিন্তিত। মানুষের প্রথম আগুন জ্বালানো শেখবার মুহূর্ত থেকে (আনুমানিক কয়েক লক্ষ বছর আগে) আজ পর্যন্ত যে পরিমাণ পরিবেশ দূষণ ঘটেছে তার প্রায় পঞ্চাশ শতাংশই ঘটেছে বর্তমান শতাব্দীতে অর্থাৎ, শিল্পবিপ্লবের পরবর্তীকালে বিশেষত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত মানবসভ্যতার অতিদ্রুত অগ্রগতির কালে সারা পৃথিবীতে দ্রুত শিল্পায়ন এবং নগরায়নের সাথে সাথে। কাজেই বায়ুদূষণের মনুষ্যসৃষ্ট উৎসগুলি সম্পর্কে বিশেষভাবে অবহিত হওয়া প্রয়োজন।

7.1.2.1. শিল্প, কলকারখানা থেকে বায়ুদূষণ

বিভিন্ন ধরনের শিল্প কারখানা থেকে গ্যাসীয় এবং অগ্যাসীয় দূষক পদার্থসমূহ নির্গত হয়ে বাতাসে মিশে একে দূষিত করতে পারে। যেমন, তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র (thermal power stations) থেকে সালফার ডাইঅক্সাইড, কার্বন মনোক্সাইড গ্যাস এবং উড়ন্ত ছাই (fly-ash)।

অ্যাসিড শিল্প থেকে নির্গত সালফার ডাইঅক্সাইড, সালফার ট্রাইঅক্সাইড, নাইট্রোজেনের বিভিন্ন অক্সাইড, ক্লোরিন, হাইড্রোজেন ক্লোরাইড, ফসফরাস পেন্টক্সাইড, বিভিন্ন গ্যাসীয় ফ্লুওরাইড ইত্যাদি দূষক পদার্থ।

ধাতু নিষ্কাশণ শিল্প (metallurgical industries) থেকে সালফার ডাইঅক্সাইড, কার্বন মনোক্সাইড, বিভিন্ন ধাতব অক্সাইড, ফ্লুওরিন ইত্যাদি নির্গত হয়ে বায়ুদূষণ ঘটায়।

সারপ্রস্তুতি শিল্প (fertiliser industries) বা হিমঘরগুলি থেকে নির্গত অ্যামোনিয়া গ্যাস।

পেট্রোলিয়াম শোধনাগার থেকে সালফার ডাইঅক্সাইড, কার্বন মনোক্সাইড, নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড, ফরম্যালডিহাইড, কেরোসিন ইত্যাদি।

সিমেন্ট ও অ্যাসবেসটস শিল্প থেকে সূক্ষ্ম ও স্থূল বিভিন্ন কঠিন কণা, **তড়িৎ-লেপন শিল্প** থেকে কিছু ভারী ধাতুকণা বা ধাতবযৌগকণা বাতাসে মিশতে পারে।

এসব ছাড়াও বিভিন্ন শিল্প থেকে অন্যতর বহু দূষক পদার্থ—গ্যাসীয় বা অগ্যাসীয় যেমন, হাইড্রোজেন সালফাইড, হাইড্রোজেন সায়ানাইড, সীসা বা এর যৌগ এসবও বাতাসে মিশে বাতাসকে বিষিয়ে দিতে পারে। আর যে কোনও শিল্পেই জীবাশ্ম জ্বালানী ব্যবহৃত হলে তার দহনে প্রচুর পরিমাণে কার্বন ডাইঅক্সাইড উৎপন্ন হয়ে বাতাসে মেশে। যদিও কার্বন ডাইঅক্সাইড বিষাক্ত গ্যাস নয় তবুও গ্রীনহাউস গ্যাসরূপে বাতাসে এর পরিমাণ বৃদ্ধি পরোক্ষ বায়ুদূষক।

শিল্পে সাধারণতঃ দূষণ নিয়ন্ত্রক যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ না করবার জন্যই শিল্প সম্ভূত বায়ুদূষণের সৃষ্টি হয়।

7.1.2.2. বিভিন্ন ধরনের মোটরযানজাত ধোঁয়া

বিভিন্ন ধরনের পরিবহন—বাস, ট্রাক, ট্যাক্সি, মোটরগাড়ি, স্কুটার, টেম্পো এসবের ইঞ্জিনে জ্বালানীর (পেট্রল, ডিজেল ইত্যাদির) দহনে উৎপন্ন ধোঁয়ায় যে বিভিন্ন ধরনের বায়ুদূষক পদার্থসমূহ থাকে সেগুলি হল কার্বন মনোক্সাইড, নাইট্রোজেনের বিভিন্ন অক্সাইড, সালফার ডাইঅক্সাইড, দহন না হওয়া হাইড্রোকার্বন যৌগসমূহ, পলিনিউক্লিয়ার হাইড্রোকার্বন, কার্বন কণা, সীসা বা সীসার অক্সাইড ইত্যাদি। আবার প্রাথমিকভাবে উৎপন্ন নাইট্রোজেনের অক্সাইডগুলি ও বাতাসের অক্সিজেনের পারস্পরিক বিক্রিয়ায় উৎপন্ন ওজোন গ্যাসও বায়ুদূষক। এই ওজোনের সঙ্গে হাইড্রোকার্বন যৌগগুলির সূর্যালোকের প্রভাবে বিক্রিয়ার ফলে **আলোক রাসায়নিক ধোঁয়াশার** (photochemical smog) সৃষ্টি হয় যার মধ্যে বহুতর যৌগ থাকে, যেমন বিভিন্ন অ্যালডিহাইড ও কিটোন যৌগ, পারঅক্সি অ্যাসাইল নাইট্রেট (PAN) এইসব বায়ুদূষক পদার্থ।

বায়ুদূষণের বিভিন্ন উৎসগুলির মধ্যে মোটর যানসমূহ থেকে উদ্ভূত বায়ু দূষণের পরিমাণই সাধারণতঃ সর্বাধিক আর যেহেতু শহরাঞ্চলে এইসব যান গ্রামাঞ্চলের তুলনায় অনেক বেশী সংখ্যায় চলাচল করে তাই শহরাঞ্চলেই এগুলি থেকে উদ্ভূত বায়ু দূষণের সমস্যা তুলনামূলকভাবে অনেক বেশী প্রকট। হিসেব করা হয়েছে যে ভারতের প্রধান প্রধান শহরগুলিতে যে পরিমাণ বায়ুদূষণ হয় তার প্রায় 50 শতাংশ মোটর যানজাত, প্রায় 30-35 শতাংশ বিভিন্ন শিল্পজাত এবং বাকি 15-20 শতাংশ অন্যান্য উৎসজাত।

মোটরযান দূষণের প্রধান কারণ হল ইঞ্জিনে জ্বালানীর অসম্পূর্ণ দহন এবং খুব পুরানো ইঞ্জিন ব্যবহৃত হলে বা ইঞ্জিনের রক্ষণাবেক্ষণ যথাযথ না হলে দূষণের সমস্যা প্রকট হয়। এছাড়া ইঞ্জিনে দূষণ নিরোধক কিছু ব্যবস্থা অবলম্বন না করা এবং লেডযুক্ত পেট্রল (লেড টেট্রাইথাইল মিশ্রিত) জ্বালানী হিসেবে ব্যবহারও মোটরযানজনিত দূষণের অন্যতম প্রধান কারণ।

7.1.2.3. প্রাতিষ্ঠানিক এবং গার্হস্থ্য উৎস

বাসগৃহে, হোটেল রেস্তোরাঁ এসবে জ্বালানী হিসাবে ব্যবহৃত কাঠ ও জীবাশ্ম জ্বালানীসমূহের বিশেষতঃ কয়লার ব্যাপক দহনের ফলেও বায়ু দূষণ ঘটে। তাছাড়া বাসগৃহ, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, বাজার এসব থেকে জমা আবর্জনার পচনজাত পদার্থসমূহও বায়ুদূষণ ঘটায়, বিশেষতঃ গন্ধদূষণের সমস্যা সৃষ্টি করে। আমাদের দেশে অনেক শহরেই জমা জঞ্জালের একটা অংশ সারাদিনেও অপসারিত হয় না, ঐ অংশের পচনেই মূলত সমস্যার সৃষ্টি হয়। এছাড়াও অনেকক্ষেত্রে কঠিন আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলবার ব্যবস্থা থাকলেও আবর্জনার দহনে বিভিন্ন জৈব ও অজৈব বায়ুদূষক পদার্থের সৃষ্টি হয়।

7.1.2.4. কৃষি সম্পর্কিত কার্যাবলী

কৃষি সম্পর্কিত প্রধানতঃ দুই ধরনের কার্যকলাপের জন্য বায়ুদূষণ হতে পারে। বর্ধিত জনসংখ্যার বর্ধিত খাদ্যচাহিদা মেটাবার জন্য বনভূমি বাগবাগিচা পুড়িয়ে সেই জমি চিরতরে কৃষিজমি হিসেবে ব্যবহার করতে গিয়ে বা ঝুমচাষের জন্যেও বনভূমির অংশ বিশেষ পুড়িয়ে ফেলবার ফলেও। জমি থেকে ফসল কেটে নেবার পর ফসলের অবশেষ পুড়িয়ে দিলে বাতাসে কার্বন মনোক্সাইড, কার্বন কণা, কার্বন ডাইঅক্সাইড ইত্যাদি মিশতে পারে। আবার চাষের ক্ষেতে বিভিন্ন কীটনাশক, আগাছানাশক বা রাসায়নিক সার প্রয়োগ করলেও বায়ু প্রবাহের ফলে বিশেষতঃ ধূলিঝড় ঘূর্ণিঝড় এসবের ফলে ঐসব পদার্থ উড়ে গিয়ে বায়ুতে মিশে বায়ুদূষণ ঘটাতে পারে।

এই ধরনের বায়ু দূষণ সমস্যা স্বভাবতই গ্রামাঞ্চলে বেশী প্রকট। গ্রামাঞ্চলে বায়ুদূষণের আর একটি প্রধান উৎস ইটভাঁটাগুলি, যেগুলি থেকে বিষাক্ত কার্বন মনোক্সাইড গ্যাস নির্গত হয়। সাম্প্রতিককালে অনেক গ্রামই অবশ্য আধা শহরে পরিণত হয়েছে এবং শহরে যে উৎসগুলি বায়ুদূষণের জন্য দায়ী, সেগুলির মধ্যে কয়েকটি এইসব গ্রামেও অনুপস্থিত নয়।

7.1.2.5. বনসম্পদের ব্যাপক ধ্বংসসাধন

বাতাস বিশুদ্ধ রাখতে বনভূমি, গাছপালার একটা প্রধান ভূমিকা বর্তমান, কারণ সবুজ উদ্ভিদ সালোকসংশ্লেষকালে বাতাস থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইড শোষণ ও বাতাসে অক্সিজেন মুক্ত করার মাধ্যমে বাতাসে ঐ দুটি গ্যাসের আনুপাতিক পরিমাণ যথাযথ রাখতে সহায়তা করে। তাছাড়া গাছপালা, বনভূমি বাতাসের কিছু দূষক পদার্থ অবশোষণেও সমর্থ। কিন্তু জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধির জন্য বর্ধিত জনসংখ্যার বাসস্থান সমস্যা, খাদ্যচাহিদার জন্য কৃষিজমির আয়তন বাড়াতে নির্বিচারে বনসম্পদ ধ্বংস করবার জন্য, জ্বালানী হিসেবে কাঠের ব্যাপক ব্যবহারের ফলে, বিভিন্ন শিল্পের প্রয়োজনে ও রেলের স্লিপার ইত্যাদি নির্মাণেও কাঠের ব্যাপক ব্যবহারের কারণে, দ্রুত নগরায়নের জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে বনসম্পদ দ্রুত ধ্বংস হচ্ছে। এর ফলেও বায়ুদূষণের সমস্যা বাড়ছে। প্রতিবছর গড়ে ক্রান্তীয় বনাঞ্চলের (tropical forests) প্রায় 1 কোটি 10 লক্ষ (11 million) হেক্টর বা প্রায় 2 কোটি 75 লক্ষ একর বনভূমি এভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হচ্ছে বলে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের পরিবেশ কর্মসূচীর (UNEP) প্রতিবেদনে প্রকাশ, একমাত্র আফ্রিকাতেই বছরে প্রায় 30 লক্ষ হেক্টর বনভূমি এভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে চলেছে। ভারতে বনভূমির আয়তন দেশের ভূমিসম্পদের আয়তনের 19.47 শতাংশ মাত্র, যেখানে এই আয়তন হওয়া উচিত ন্যূনতম 33 শতাংশ।

বায়ুদূষণের উৎসগুলি সম্পর্কিত আলোচনা প্রসঙ্গে দূষণের মৌলিক কারণগুলি চিহ্নিত করতে গেলে আমরা দেখতে পাই যে সামগ্রিকভাবে বিশ্বের পরিবেশ দূষণের জন্য চিহ্নিত মূল কারণগুলি এবং বায়ুদূষণের মূল কারণগুলি অভিন্ন যথা : জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি, দ্রুত ও অপরিকল্পিত ব্যাপক নগরায়ন ও শিল্পায়ন, নতুনতর প্রযুক্তির ব্যাপক প্রয়োগ।

জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধির ফলে বর্ধিত জনসংখ্যার খাদ্য বাসস্থান ও অন্যতর চাহিদা মেটাতে গিয়ে নগরায়ন ও শিল্পায়ন দ্রুত এবং অনেকক্ষেত্রেই কিছুটা অপরিকল্পিতভাবে ঘটছে এবং প্রযুক্তির ব্যাপক প্রয়োগও এজন্য অনিবার্য হয়ে উঠছে, অনেকক্ষেত্রেই পরিচ্ছন্ন প্রযুক্তির প্রয়োগ সম্ভব হচ্ছে না, এসবের জন্য পরিবেশ দূষিত হয়ে পড়ছে। আগামী শতাব্দীতে বিশ্বের 10 লক্ষ বা ততোধিক জনসংখ্যা বিশিষ্ট শহরগুলির প্রতি 5টির মধ্যে 3টি শহরই থাকবে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে আর জনসংখ্যার অত্যন্ত উচ্চ ঘনত্বের জন্য এই শহরগুলির ব্যবস্থাপনা যে সুষ্ঠু রাখা সম্ভব হবে না সে তো আমাদের বর্তমান অভিজ্ঞতাতেই আমরা দেখতে পাচ্ছি। আমাদের প্রধান প্রধান শহরগুলিতে বা শহরতলীতে জনবসতিপূর্ণ এলাকার মধ্যেই বহুতর শিল্প কলকারখানা বিদ্যমান অথবা আগে থেকে বর্তমান এমন শিল্প কলকারখানার কাছেই উচ্চ জনসংখ্যার চাপে জনবসতি গড়ে উঠেছে। ঐসব শিল্প থেকে নির্গত দূষক পদার্থ সরাসরি এসব জনবসতিতে জনস্বাস্থ্যের সমস্যা সৃষ্টি করছে। আর জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শহরগুলিতে মোটরযানের সংখ্যাও দ্রুতগতিতে বেড়ে চলেছে, নিতান্ত সীমিত আয়তনের পথগুলিতে লক্ষ লক্ষ মোটরযানের যাতায়াত দূষণসমস্যার সাথে সাথে পরিবহন সমস্যারও সৃষ্টি করছে।

7.1.3. জনস্বাস্থ্য ও জীবজগতের উপর বায়ুদূষণের ক্ষতিকারক প্রভাব

বিভিন্ন উৎস থেকে নির্গত গ্যাসীয় বা কণাজাতীয় দূষকপদার্থসমূহ ক্রমাগত বায়ুমণ্ডলে মিশতে থাকলে বায়ু মারাত্মকভাবে দূষিত হতে পারে এবং সেই বায়ুতে প্রশ্বাসগ্রহণে মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণীরাও অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে, অনেকক্ষেত্রে এজন্য জীবনহানি হওয়াও বিচিত্র নয়। দূষিত বায়ু অনেকক্ষেত্রে বহু উদ্ভিদেরও মারাত্মক ক্ষতিসাধন করতে পারে, দূষিত বায়ু অন্যতর কিছু ক্ষতিরও কারণ হয়ে উঠতে পারে যেমন কিছু ইমারৎ, স্মৃতিসৌধ এসবের দ্রুত ক্ষয়সাধন করতে পারে। কয়েকটি বায়ুদূষক পদার্থের বিভিন্ন ধরনের ক্ষতিসাধন করবার বিবরটি সারণী 7.1 এ উপস্থাপিত হল।

সারণী 7.1 বায়ুদূষক কয়েকটি পদার্থ এবং সেগুলির জনস্বাস্থ্য ও অন্যান্য ক্ষেত্রে সম্ভাব্য ক্ষতিকারক কিছু প্রভাব

বায়ুদূষক পদার্থ	জনস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে ক্ষতিকারক ফলাফল	মন্তব্য
কার্বন মনোক্সাইড গ্যাস	রক্তকোষের হিমোগ্লোবিনের অক্সিজেন-সংবহন ক্ষমতা কমিয়ে দেয়। বায়ুতে অত্যল্প পরিমাণে উপস্থিতিও মাথাধরা, শ্বাসকষ্ট, ঘুমঘুম বা বমি বমি ভাবের সৃষ্টি করতে পারে। অধিক গাঢ়ত্বে বায়ুতে উপস্থিত থাকলে অক্সিজেনের অভাবে মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে (1000 আয়তন বাতাসে 1 আয়তন কার্বনমনোক্সাইড থাকলে সেই বাতাসে শ্বাসগ্রহণে তাৎক্ষণিক মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী)। হৃদ্‌রোগীদের পক্ষে অত্যন্ত মারাত্মক এবং এদের মৃত্যু ত্বরান্বিত করতে পারে।	সিগারেটেরে ধোঁয়াতেও এই গ্যাসটি থাকে, কাজেই ধূমপায়ীদের ক্ষেত্রেও অনুরূপ বিপদের সম্ভাবনা। সারা পৃথিবীতে মনুষ্যসৃষ্ট উৎসগুলি থেকেই প্রতি বছর গড়ে প্রায় 35 কোটি টন এই গ্যাস বায়ুমণ্ডলে পরিত্যক্ত হয়।
সালফার ডাইঅক্সাইড গ্যাস	এই গ্যাস মিশ্রিত বাতাসের সংস্পর্শে চোখ জ্বালা করে, শ্বাসনালীতে প্রদাহ অনুভূত হয়। নাক ও গলার ব্যাধি, ফুসফুসের বিভিন্ন ব্যাধি, যেমন ব্রঙ্কাইটিস, হাঁপানি এসব সৃষ্টি করতে পারে এমনকি ফুসফুসের ক্যান্সারও সৃষ্টি করতে পারে। বায়ুর অক্সিজেন ও জলীয় বাষ্পের সঙ্গে দীর্ঘকালব্যাপী বিক্রিয়ায় অ্যাসিড (মূলতঃ সালফিউরিক অ্যাসিড) উৎপন্ন করে যা ঐসব রোগ সৃষ্টিতে মূল সালফার ডাইঅক্সাইড অপেক্ষা আরও অনেক বেশী শক্তিশালী। এভাবে **অ্যাসিড বৃষ্টির** (acid rain) কারক হতে পারে। সালফার ডাইঅক্সাইড বা তা থেকে সৃষ্ট অ্যাসিডবৃষ্টি ফসলের উৎপাদন মারাত্মকভাবে কমিয়ে দিতে পারে। গাছের পাতার সবুজ রঙ সালফার ডাইঅক্সাইডের সংস্পর্শে বিবর্ণ হয়ে যেতে পারে। ফলে সালোকসংশ্লেষের হার হ্রাস পেতে পারে। তুলা, গম, বার্লি, আপেল চাষ সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। শীতকালে কুয়াশার সঙ্গে মিশে মারাত্মক **ধোঁয়াশা** সৃষ্টির কারক হতে পারে।	1952 সালে (শরৎকালে) লণ্ডনে যে মারাত্মক ধোঁয়াশার সৃষ্টি হয়েছিল (যার ফলে সেখানে প্রায় 4000 মানুষের মৃত্যু হয়) তার জন্য মূলতঃ সেখানকার বাতাসে সালফার ডাই অক্সাইডের গাঢ়ত্ব কয়েকগুণ (প্রায় 6 গুণ) বেড়ে যাওয়াকেই দায়ী করা হয়েছিল। অ্যাসিড বৃষ্টির মাধ্যমে ইমারৎ, স্থাপত্যকীর্তি এসবের ক্ষতিসাধন করতে পারে।

বায়ুদূষক পদার্থ	জনস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে ক্ষতিকারক ফলাফল	মন্তব্য
নাইট্রোজেনের অক্সাইড সমূহ (গ্যাসীয়)	ফুসফুসের তন্তুতে এবং শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে প্রদাহ সৃষ্টি কারক। ব্রঙ্কাইটিস, নিউমোনিয়া এবং ফুসফুস-সংক্রান্ত বিভিন্ন ব্যাধির সৃষ্টি করতে পারে। বাতাসের অক্সিজেন এবং জলীয় বাষ্পের সঙ্গে এর বিক্রিয়ায় উৎপন্ন নাইট্রাস ও নাইট্রিক অ্যাসিড আমাদের শ্বসন, পরিপাক এবং স্নায়ুতন্ত্রের বিভিন্ন ব্যাধি সৃষ্টির কারক হতে পারে। বৃষ্টি হলে এই অ্যাসিডগুলিও অ্যাসিডবৃষ্টি সৃষ্টি করতে পারে। 10,000 আয়তন বাতাসে 5 থেকে 6 ভাগ নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড থাকলে, সেই বাতাসে 2 থেকে 10 দিন প্রশ্বাস গ্রহণে মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। কয়েকটি রোগ যেমন, ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রতিরোধ করার ক্ষমতা বিনষ্ট করে। বায়ুতে উপস্থিত নাইট্রোজেনের অক্সাইডগুলি উদ্ভিদেরও বহুতর ক্ষতিসাধন করতে পারে। উদ্ভিদের পাতার ক্ষতি হতে পারে, চারার বৃদ্ধি ব্যাহত হতে পারে, সালোকসংশ্লেষের হার কমে যেতে পারে (যেমন, সীম ও টমাটোর ক্ষেত্রে হয়)।	
অ্যামোনিয়া (গ্যাসীয়)	অ্যামোনিয়া গ্যাসের সংস্পর্শে চোখের মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে, শ্বাসনালীতে প্রদাহ সৃষ্টি করতে পারে।	
হাইড্রোজেন সালফাইড (গ্যাসীয়)	মাথাধরা ও বমি বমি ভাবের সৃষ্টি করে। চোখে জ্বালা ধরায়, গলা জ্বালা করে ; পরিপাকতন্ত্রকে আক্রমণ করে, ক্ষুধা নষ্ট করে। বাতাসে বেশী গাঢ়ত্বে উপস্থিত থাকলে সেই বাতাসে শ্বাস গ্রহণে ডায়েরিয়া, ব্রঙ্কিয়াল নিউমোনিয়া এসব হতে পারে, শ্বাসকষ্টে মৃত্যু হওয়াও বিচিত্র নয়।	হাইড্রোজেন সালফাইড মিশ্রিত বাতাসের সংস্পর্শে দীর্ঘদিন থাকলে সাদা তেলচিত্র বাদামী বা কালো হয়ে যেতে পারে।
হাইড্রোজেন সায়ানাইড (গ্যাসীয়)	এই গ্যাস মেশা বাতাসে শ্বাস নিলে গলা শুকিয়ে আসে, মাথা ধরে, চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে যায়। স্নায়ুকোষ আক্রমণ করে মৃত্যুর কারণ হতে পারে।	
আরসাইন (গ্যাসীয়)	কিড্‌নি ও লিভারের ক্ষতি করে। হেপাটাইটিস (জন্ডিস) রোগের সৃষ্টি করতে পারে। রক্তের হিমোগ্লোবিন ভেঙে দিয়ে মৃত্যু ঘটাতে পারে।	
ক্লোরিন (গ্যাসীয়)	শ্বাসনালীতে প্রদাহ সৃষ্টি করে, শ্বাসকষ্ট ঘটায়, চোখের রোগ কনজাংটিভাইটিস সৃষ্টি করতে পারে।	বৃষ্টির জলে দ্রবীভূত হয়ে অ্যাসিডবৃষ্টির কারণ হয়ে উঠতে পারে।
ওজোন (গ্যাসীয়)	মাথাধরা, চোখের অসুখ সৃষ্টি করতে পারে। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমিয়ে দেয়। ফুসফুসের ক্যান্সার সৃষ্টি করতে পারে। ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিস ঘটাতে পারে, ফুসফুসের রক্তক্ষরণ ঘটাবার কারক হতে পারে।	তুলো, নাইলন, পলি-এস্টার এসবের তন্তু ওজোন দ্বারা আক্রান্ত হয়। রবারের জিনিসপত্র ওজোনের সংস্পর্শে ভঙ্গুর হয়ে যায়।

বায়ুদূষক পদার্থ	জনস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে ক্ষতিকারক ফলাফল	মন্তব্য
	ওজোন বিভিন্ন শস্যের ক্ষতি করতে পারে। বিভিন্ন সব্জি চাষ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। গাছের সবুজ পাতা ওজোন মিশ্রিত বাতাসে হলুদ হয়ে যায় (যাকে বলা হয় ক্লোরোসিস)।	
ফসজিন বা কার্বনিল ক্লোরাইড (গ্যাসীয়)	কাশিতে আক্রান্ত করে, শ্বাসনালীতে প্রদাহ সৃষ্টিকারক, ফুসফুসের মারাত্মক ব্যাধি সৃষ্টি করে, ফুসফুসে জল জমাতে পারে।	
হাইড্রোকার্বনসমূহ (গ্যাসীয়)	অধিক গাঢ়ত্বে (high concentrations) উপস্থিত থাকলে শরীরে ক্যান্সার কোষ গঠন করতে পারে, শ্লেষ্মা বর্ধক হিসেবে শ্বাসনালী রুদ্ধ করে তীব্র শ্বাস কষ্ট ঘটাতে পারে, ফুসফুসের মারাত্মক ক্ষতি করতে পারে। বেঞ্জিন, বেঞ্জোপাইরিন ক্যান্সার কোষ সৃষ্টিকারী। হাইড্রোকার্বনের সঙ্গে নাইট্রোজেনের অক্সাইডগুলির এবং বাতাসের অক্সিজেনের আলোক রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে যে ধোঁয়াশা সৃষ্টি হয় তা চোখ নাক গলার ব্যাধির সৃষ্টিকারক। হাইড্রোকার্বনগুলির মধ্যে কয়েকটি (যেমন, ইথিলীন, অ্যাসেটিলীন, প্রোপিলীন ইত্যাদি) এবং এগুলি থেকে আলোক রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে সৃষ্ট পদার্থসমূহ উদ্ভিদের বৃদ্ধি ব্যাহত করে, সব্জি উৎপাদন হ্রাস করে, সালোকসংশ্লেষ মন্দীভূত করে।	
বায়ুতে প্রলম্বিত কণা-জাতীয় দূষক পদার্থ সমূহ (ধুলি, ধোঁয়া, ভুসা, ছাই ইত্যাদি)	চোখ, নাক, গলার ব্যাধি সৃষ্টি করে, ফুসফুসের মারাত্মক ক্ষতি করে। বিশেষ করে সূক্ষ্ম কণাগুলি অধিকতর ক্ষতিকারক, স্থূলতর কণাগুলি নাকের গহ্বরেই আটকে যায়। মোটরগাড়ির ধোঁয়া থেকে বাতাসে মেশা সবচাইতে মারাত্মক কণাজাতীয় দূষক পদার্থ সীসা (বা এর যৌগ) শিশুদের মস্তিষ্কের মারাত্মক ক্ষতিসাধন করে। স্নায়ু রোগের সৃষ্টিকারক। সীসার প্রভাবে রক্তের লোহিত কণিকার সৃষ্টি ও গঠন ব্যাহত হয়। অধিক গাঢ়ত্বে সীসা নিয়মিত গ্রহণ করলে রক্তের হিমোগ্লোবিন ভেঙ্গে গিয়ে প্রস্রাবের সঙ্গে নির্গত হতে পারে। সীসা ছাড়াও আরও অনেক ধাতব কণা (বা সেগুলির যৌগ) যেমন, ক্যাডমিয়াম, বেরিলিয়াম, কোবাল্ট ইত্যাদি বাতাসে প্রলম্বিত হলে সেই বাতাসে শ্বাস গ্রহণে ফুসফুসের বিভিন্ন ব্যাধির সৃষ্টি হতে পারে, হৃদ্‌রোগের সমস্যাও হতে পারে। পারদ স্নায়ুতন্ত্রকে ধ্বংস করে, মৃত্যু ঘটায়।	সীসা বা সীসার যৌগগুলি ভারী হওয়ায় বাতাসে মেশা এইসব পদার্থ নীচে নেমে আসে। দেখা গেছে মাটি থেকে প্রায় 1 মিটার উচ্চতায় এদের গাঢ়ত্ব সর্বাধিক হয়। এজন্য শিশুদের উপর এই বিষাক্ত পদার্থ-গুলির প্রভাব সর্বাধিক পরিমাণে পড়ে, কারণ শিশুদের নাকের উচ্চতা এই রকম স্তরে থাকে। ফলে শিশুরা প্রশ্বাসের সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে এই বিষ বাতাসের সঙ্গে শরীরে টেনে নেয়।

বায়ুদূষক পদার্থ	জনস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে ক্ষতিকারক ফলাফল	মন্তব্য
	সিলিকা (বালুকণা), অ্যাসবেসটস তন্তু বিভিন্ন রূপের কার্বন কণা ফুসফুসে জমা হয়ে এর মারাত্মক ক্ষতি করে। ভুসারূপে কার্বন শ্বাসনালীতে জমা হয়ে নাক কান গলার ব্যাধির কারক হয়। বায়ুতে ভাসমান বা প্রলম্বিত কণাজাতীয় দূষকগুলির উদ্ভিদ জীবনের উপরও প্রত্যাক্ষ ও পরোক্ষ ক্ষতিকারক প্রভাব বর্তমান। অ্যাসিডবৃষ্টির সঙ্গে মাটিতে পতিত হয়ে মাটিকে আম্লিক ও অনুর্বর করে তুলতে অনেক কণাজাতীয় বায়ুদূষকই ভূমিকা নেয়। উদ্ভিদের পাতার ছিদ্র বন্ধ করে এবং পাতার উপর আবরণী স্তর ফেলে এই কণা জাতীয় দূষকগুলি উদ্ভিদের বাষ্পমোচন এবং সালোকসংশ্লেষকে মন্দীভূত করে। এর ফলে উদ্ভিদের বৃদ্ধি এবং অনেক ফসলের (যেমন লেটুস শাক বা মুলার) উৎপাদন হ্রাস পায়।	

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO)-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী সারা বিশ্বের মোট জনসংখ্যার (প্রায় 600 কোটি) প্রায় এক দশমাংশে বর্তমানে পৃথিবীর এমন কয়েকটি নগরে বসবাস করছেন যেগুলির বাতাসে সালফার ডাইঅক্সাইড বিপজ্জনক উচ্চ মাত্রায় বর্তমান এবং বিশ্বের প্রায় 130 কোটি মানুষ যে বাতাসে শ্বাস নেন সেখানে প্রলম্বিত কণা দূষকসমূহের মাত্রা বিপজ্জনক সীমার উর্ধ্বে। আমাদের দিল্লী, মুম্বাই এবং কলকাতা বিশ্বের সর্বাধিক দূষিত 12টি নগরীর অন্তর্ভুক্ত (এগুলি হল : ব্যাঙ্কক, বেইজিং, মুম্বাই, কলকাতা, দিল্লী, করাচি, লস্ এঞ্জেলেস, ম্যানিলা, মস্কো, নিউ ইয়র্ক, রিও ডি জেনেইরো, এবং টোকিও)। আমাদের এই তিনটি নগরীতেই বাতাসে সালফার ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ বা প্রলম্বিত কণাজাতীয় দূষকের পরিমাণ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা নির্ধারিত নিরাপদ মাত্রার উর্ধ্বে। জাতীয় পরিবেশ ইঞ্জিনিয়ারিং গবেষণা সংস্থার তথ্য অনুযায়ী কলকাতা হাওড়া মহানগরী দুটিতে প্রতিদিন গড়ে প্রায় 1300 টনের মত দূষকপদার্থ বাতাসে পরিত্যক্ত হয়।

7.1.4. বায়ুদূষণ জনিত কিছু পেশাগত ব্যাধি

আমরা দেখেছি যে বিভিন্ন উৎস থেকে নির্গত গ্যাসীয় বা কণা জাতীয় দূষক পদার্থসমূহ বাতাসকে দূষিত করে। এটি সহজেই অনুমেয় যে এই উৎসগুলিতে বা সেগুলির কাছাকাছি যেসব মানুষেরা থাকেন দূষক পদার্থগুলি দ্বারা তারাই সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত হবেন (গ্যাস লিকেজের মত কিছু দুর্ঘটনাকালে অবশ্য অন্যরূপ অভিজ্ঞতা হতে পারে)। যেমন, যে সব শ্রমিক পাথর ভাঙ্গার কারখানায়, সিমেন্ট উৎপাদন শিল্পে, চালকল এসবে কাজ করেন তাঁদের দীর্ঘসময়ব্যাপী সিলিকা সমন্বিত ধূলিকণার মধ্যে থাকতে হয়। এই সিলিকা তাঁদের নাসাপথ, শ্বাসনালীতে জমে এবং ফুসফুসেও প্রবেশ করে মাথাধরা, সাইনাস, শ্বাসকষ্ট ফুসফুসের বিবিধ অসুখ সৃষ্টি করে, এমনকি রক্তের শ্বেতকণিকা ধ্বংসে করে ধীরে ধীরে মৃত্যুও ঘটাতে পারে। সিলিকা থেকে বিপত্তিজনিত ব্যাধিকে **সিলিকোসিস** বলা হয়।

অনুরূপভাবে কাপড়ের কলে কর্মরত শ্রমিকদের শরীরে দীর্ঘদিন ধরে কাপড়ের তন্তু প্রবেশ করে সাইনাস, ফুসফুসের ব্যাধি এসব ঘটাতে পারে। অ্যাসবেস্টস শিল্পে কর্মরত ব্যক্তিদের শরীরে অ্যাসবেস্টস তন্তু প্রবিষ্ট হয়ে **অ্যাসবেসটোসিস** রোগে আক্রান্ত করতে পারে।

পেট্রলপাম্প বা মোটরগ্যারেজে যেসব ব্যক্তি কাজ করেন তাঁদের দীর্ঘসময় বিষাক্ত পেট্রল বাষ্প বা ডিজেল তেলের বাষ্পের মধ্যে থাকতে হয়। এর ফলে এঁদের অনেকেই মাথাধরা, শ্বাসনালী আটকে আসা, শ্বাসকষ্ট, খিদের অভাব এসব বোধ করতে পারেন। মোটরগাড়ির ধোঁয়া থেকে যেসব বিষাক্ত পদার্থ নির্গত হয় সেসবের ক্ষতিকারক ফলাফল তো এঁদের ভোগ করতেই হয়। গ্যারেজে গাড়ি রঙ করবার কাজে যেসব দ্রাবক ব্যবহার করা হয় সেগুলি সহজেই বাষ্পায়িত হয় এবং কর্মরত শ্রমিকের চোখের ক্ষতি করতে পারে, শরীরে প্রবেশ করে ফুসফুসের ব্যাধি সৃষ্টি করতে পারে। পেট্রলে বা রঙের মধ্যে সীসা থাকলে সেই সীসার বিষে শরীর আক্রান্ত হয়ে স্নায়ুরোগ হতে পারে। ব্যাটারীর অ্যাসিড ধোঁয়া থেকেও গ্যারেজ শ্রমিক নাক কান গলার ব্যাধি বা ফুসফুস সংক্রান্ত ব্যাধিতে আক্রান্ত হতে পারেন।

কীটনাশক প্রস্তুতির কারখানায় যাঁরা কাজ করেন বা বিভিন্ন কীটনাশক কৃষিক্ষেত্রে বা অন্যত্র ছড়িয়ে দেবার কাজে যাঁরা যুক্ত থাকেন তাঁরা মাথাধরা, চোখে জ্বালা, ঘুম ঘুম ভাব, বমি বমি ভাব, পেটে যন্ত্রণা এসব অনুভব করতে পারেন. ডি. ডি. টি., গ্যামাক্সিন, ম্যালাথায়ন, ফলিডল এসব কীটনাশক শরীরে প্রবেশ করলে দীর্ঘস্থায়ী ক্ষতিকারক প্রভাব ফেলতে পারে।

হাসপাতাল, নার্সিংহোম বা ল্যাবরেটরীতে যাঁরা X-Ray মেশিন চালান বা রেডিওথেরাপী বিভাগের সঙ্গে যুক্ত তাঁদের দীর্ঘদিন ব্যাপী ক্ষতিকারক রশ্মি বা তেজস্ক্রিয়তা শরীরে গ্রহণ করতে হয় এবং এভাবে তাঁরা তেজস্ক্রিয়তা দূষণের শিকার হতে পারেন। উপযুক্ত সাবধানতা অবলম্বন অবশ্য কর্তব্য।

হাজার হাজার রাসায়নিক উৎপাদন শিল্পের সঙ্গে জড়িত অনেক ব্যক্তিই এভাবে পেশাগত ব্যাধির শিকার হতে পারেন, কারণ এই রাসায়নিকগুলি বা যেসব পদার্থ থেকে এই রাসায়নিকগুলি উৎপাদিত হয় সেগুলির মধ্যে অনেকগুলিই বিষাক্ত বা ক্ষতিকারক হতে পারে।

7.1.5. ধোঁয়াশা ও অ্যাসিডবৃষ্টি : বায়ুদূষণের দুটি অনুষঙ্গ

বায়ুদূষণের ফলে সৃষ্ট এই দুটি বিষয় প্রাণীজগৎ ও উদ্ভিদজীবনের উপর এবং অন্যত্রও কিছু মারাত্মক প্রভাব ফেলতে পারে। সুতরাং এই দুটি ঘটনা সম্পর্কে বিশেষভাবে অবহিত হওয়া প্রয়োজন।

7.1.5.1. ধোঁয়াশা

1952 সালের শরৎকাল। লণ্ডন নগরী হঠাৎ কুয়াশার ঘন আস্তরণে পর পর পাঁচদিন ঢেকে রইল। ঐ কুয়াশার আবরণে কী বিষবাষ্প জমা হয়েছিল কে জানে। লণ্ডন নগরীর বহু মানুষ—শিশু, বৃদ্ধ, নারী পুরুষ অসুস্থ হয়ে পড়তে লাগলেন। ঐ সর্বনাশা কুয়াশা প্রায় 4000 মানুষের জীবন হরণ করল। পরবর্তীকালে জানা গেল ঐ কুয়াশায় মিশে ছিল শিল্প কারখানা ও মোটরগাড়ি থেকে নিঃসৃত বিষবাষ্প যার মধ্যে মূলতঃ সালফার ডাইঅক্সাইডই বেশী পরিমাণে ছিল। কুয়াশা ও বিষধোঁয়ার এই মিশ্রণের নাম **ধোঁয়াশা** (smog = smoke + fog) দিয়েছিলেন একজন ইংরেজ চিকিৎসক।

ধোঁয়াশাজনিত দুর্ঘটনার এটিই প্রথম এবং একমাত্র উদাহরণ নয়। 1930 সালে বেলজিয়ামের ম্যাস নদী উপত্যকায় এবং 1948 সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পেনসিলভানিয়া রাজ্যের ডনোরা নগরীতে অনুরূপ দুর্ঘটনা ঘটেছিল, যদিও ক্ষয়ক্ষতি লণ্ডন দুর্ঘটনার তুলনায় অনেক কম হয়েছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লস্ এঞ্জেলেস্ নগরী এবং জাপানের কয়েকটি শহর প্রায়শ ধোঁয়াশার কালো মেঘে ঢাকা থাকে।

আমাদের শহরগুলিতেও ধোঁয়াশার অভিজ্ঞতা অজানা নয়, দিল্লী, মুম্বাই, কলকাতা মহানগরীতে শীতের সময় ধোঁয়াশার অভিজ্ঞতা আমাদের আছে।

জনস্বাস্থ্যের মারাত্মক ক্ষতি করা ছাড়াও ধোঁয়াশা উদ্ভিদ কোষের ক্ষতি করতে পারে, রবার এবং নাইলনের জিনিসপত্র ভঙ্গুর করে দিতে পারে, ঐতিহাসিক সৌধ, প্রাসাদ এসবের ক্ষতি করতে পারে।

সাধারণ ধোঁয়াশার উৎপত্তি সম্পর্কে আবহাওয়াবিদ্‌গণের যা অভিমত সরলীকৃতভাবে তা হল এইরকম :

স্বাভাবিক অবস্থায় ভূপৃষ্ঠ সংলগ্ন বায়ুস্তরের তাপমাত্রা উচ্চতা বৃদ্ধির সঙ্গে হ্রাস পায়। সেজন্য নীচের তপ্ততর বায়ুস্তর উপরে উঠে যায় এবং উপরের সতেজ শুদ্ধ শীতল বাতাস নীচে নেমে আসে, ফলে ভূপৃষ্ঠের ঠিক উপরের বাতাস সতেজ ও শুদ্ধ থাকতে পারে। কিন্তু আবহাওয়ার বিশেষ অবস্থায় এই তাপমাত্রার ব্যাপারটা উল্টো হয়ে গেলেই বিপদ ঘনিয়ে আসতে পারে। শীতকালে অত্যধিক ঠাণ্ডায় কোনও স্থানে ভূপৃষ্ঠের ঠিক উপরের বাতাস যদি অত্যধিক ঠাণ্ডা হয়ে জমাট বেঁধে নীচেই আবদ্ধ হয়ে থাকে এবং সেই বাতাসে যদি শিল্প, মোটরযান ইত্যাদি থেকে জাত বিষাক্ত গ্যাস বা কণাজাতীয় দূষক মিশে থাকে তবে ধোঁয়াশার বিপর্যয় ঘনিয়ে আসতে পারে। উপরের বাতাসের তাপমাত্রা এক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত বেশী হওয়াতে উপরের সতেজ শুদ্ধ বাতাস নীচে নেমে আসতে পারে না। কাজেই, ধোঁয়াশা সৃষ্টির জন্য প্রথমতঃ দায়ী হল বায়ুস্তরের তাপমাত্রা উল্টে যাওয়ার (inversion of temperature) এই ব্যাপারটা। দ্বিতীয় কারণ হল শিল্প, মোটরযান ইত্যাদি থেকে নির্গত বিষাক্ত ধোঁয়ার বাতাসে মিশে থাকা। এই ধোঁয়া এবং কুয়াশা মিলিত হয়ে ধোঁয়াশার সৃষ্টি করে।

ধোঁয়াশার মারাত্মক এবং মূল ক্ষতিকারক উপাদানরূপে সালফারডাইঅক্সাইড গ্যাসকেই চিহ্নিত করা হচ্ছে। 1952 সালের লণ্ডন ধোঁয়াশা বিপর্যয়ের সময়ে সেখানের বাতাসে সালফারডাইঅক্সাইডের গাঢ়ত্ব অন্য সময়ের স্বাভাবিক গাঢ়ত্বের (concentration) তুলনায় 6 গুণ বৃদ্ধি পেয়েছিল। লণ্ডন নগরী বরাবরই কুয়াশার জন্য খ্যাত। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকেই এখানে ধোঁয়াশার সমস্যা মাঝে মাঝেই প্রকট হয়ে ওঠে (1952 সালের পর 1956, 1957 এবং 1962 সালগুলিতেও লণ্ডনের আকাশ পুরু ধোঁয়াশার আবরণে ঢাকা পড়েছিল)।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লস্‌ এঞ্জেলেস শহরে বছরে গড়ে প্রায় 270 বার ধোঁয়াশার সৃষ্টি হয়। এখানে ধোঁয়াশার ধোঁয়ায় মূলতঃ নাইট্রোজেনের বিভিন্ন অক্সাইড ও ওজোন থাকে, এছাড়াও মোটরগাড়ি নিঃসৃত হাইড্রোকার্বনসমূহের সঙ্গে প্রথমোক্ত দুটির আলোকরাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে উৎপাদিত অন্যতর বহু যৌগও থাকে। এই ধোঁয়াশাকে তাই **আলোক-রাসায়নিক ধোঁয়াশা** বলা হয়। এই ধোঁয়াশায় মানবদেহের চোখ, নাক এবং শ্বাসনালী আক্রান্ত হয়। উদ্ভিদেরও বহুতর ক্ষতি সাধন এই ধোঁয়াশা দ্বারা হতে পারে (পূর্বের আলোচনা দ্রষ্টব্য)। লস এঞ্জেলেস শহরে পৃথিবীর সর্বাধিক সংখ্যক মোটরগাড়ি যাতায়াত করে, সুবিপুলসংখ্যক মোটরযানের ধোঁয়া কুয়াশার সঙ্গে মিলে ধোঁয়াশার সৃষ্টি করবে এটি অস্বাভাবিক নয়।

প্রকৃতপক্ষে বিশ্বের বিভিন্ন শহরেই ও শিল্পাঞ্চলে ধোঁয়াশার সমস্যা আজ প্রকট। অনেক বিশেষজ্ঞই এ বিষয়ে সতর্কবাণী শোনাচ্ছেন। কালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের আবহাওয়াবিদ মোরিস নিউয়ারবার্জারের (Morris Newerberger) মতে সারা পৃথিবীই একদিন কালো ধোঁয়াশায় ঢেকে যাবে এবং সভ্যতার ধ্বংসে ঘনিয়ে আসবে। এই ধরনের সতর্কবাণীতে এখনই আতঙ্কিত হবার প্রয়োজন না থাকলেও এ সমস্যার প্রতিকারে সুপরিকল্পনা গ্রহণ যে জরুরী সে সম্পর্কে দ্বিমতের অবকাশ নেই।

7.1.5.2. অ্যাসিডবৃষ্টি (Acid rain)

সহজভাবে বলতে গেলে বৃষ্টির সঙ্গে অ্যাসিড মিশে থাকলে তাকেই অ্যাসিডবৃষ্টি বলা যায়। বাতাসে মিশে থাকা কয়েকটি আম্লিক গ্যাস, যেমন সালফার ডাইঅক্সাইড, নাইট্রোজেনের কয়েকটি অক্সাইড ইত্যাদি বাতাসের অক্সিজেন ও জলীয়

বাষ্পের সঙ্গে দীর্ঘকালীন বিক্রিয়ার মাধ্যমে বিভিন্ন অ্যাসিড উৎপন্ন করে। বৃষ্টি হলে বৃষ্টির জলের সঙ্গে এই সব অ্যাসিড দ্রবীভূত হয়ে (এবং বাতাসে ভাসমান কণাধর্মী অনেক দূষক পদার্থও) নীচে নেমে এসে ভূ-পৃষ্ঠের মৃত্তিকা বা বিভিন্ন জলাশয়ের জলকে আম্লিক করে দিতে পারে এবং তার ফলে বিভিন্ন ধরনের বিপত্তি দেখা দিতে পারে। অ্যাসিডবৃষ্টি তাই বায়ুদূষণেরই অনুষঙ্গ।

অ্যাসিডবৃষ্টির ফলে প্রাণীজগৎ ও উদ্ভিদজগতের মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে, আবার বিভিন্ন ইমারৎ, স্থাপত্যকীর্তির নিদর্শন এসবেরও ক্ষতি হতে পারে। অ্যাসিডবৃষ্টির ফলে মাটির অম্লতা বেড়ে যাবার ফলে অনেক ফসলের ক্ষতি হতে পারে, মাটি অনুর্বর বা পুরোপুরি বন্ধ্যা হয়ে যেতে পারে। গাছপালা, বনভূমিও অ্যাসিডবৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। পশ্চিম জার্মানীতে অ্যাসিডবৃষ্টির ফলে বনভূমির একটা বিরাট অংশ ধ্বংসপ্রাপ্ত বা মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। উত্তর আমেরিকা, কানাডা এবং ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশে যেমন জাপানেও এভাবে অ্যাসিডবৃষ্টিতে বনসম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। মটর, সিম, আলু, মুলো এসব সব্জির উৎপাদন অ্যাসিডবৃষ্টিতে মারাত্মকভাবে হ্রাস পেতে পারে। পাইন, দেবদারু এসবের বৃদ্ধি অ্যাসিডবৃষ্টিতে ব্যাহত হয়।

বিভিন্ন প্রাণীর উপরও অ্যাসিডবৃষ্টির ক্ষতিকারক প্রভাব পড়তে পারে। বৈজ্ঞানিক সমীক্ষায় দেখা গেছে যে অ্যাসিডবৃষ্টির প্রভাবে মথ জাতীয় প্রাণীর বংশবৃদ্ধি ব্যাহত হয়। অ্যাসিডবৃষ্টির দরুণ পৃথিবীর বহু জায়গায় বিভিন্ন শ্রেণীর পাখীর সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে, যেমন নরওয়েতে। আমাদের দেশেও ভরতপুর পক্ষীনিবাসের হ্রদের জল বাতাসের সালফার ডাইঅক্সাইড দ্বারা আম্লিক হয়ে যাচ্ছে, ফলে এখানে আগেকার তুলনায় যাযাবর পাখীর আগমন কমে আসছে। প্রয়াত পক্ষীবিশারদ সেলিম আলি এই অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন। অ্যাসিডবৃষ্টি নদী, পুকুর, হ্রদ এসবের জলকে যথেষ্ট আম্লিক করে দিলে ঐ জলে মাছেদের পাড়া ডিম নষ্ট হয়ে যেতে পারে, মাছের শারীরিক প্রক্রিয়াসমূহ ব্যাহত হতে পারে, পরিণামে নির্দিষ্ট জলাশয় মাছশূন্য হয়ে যাওয়া বিচিত্র নয়। জলাশয়ের নীচের এবং চারিদিকের মাটি যদি ক্ষারকীয় ধর্মী হয়, তবে ঐ জলাশয়ে অ্যাসিডবৃষ্টির ফলাফল জলজপ্রাণীদের উপর ততখানি মারাত্মক নাও হতে পারে, কিন্তু ঐ মাটিতে যদি অ্যাসিডে দ্রবণীয় মাছেদের পক্ষে তীব্রক্ষতিকারক কিছু ধাতু বর্তমান থাকে তবে ফলাফল ভয়াবহ হতে পারে। যেমন, ম্যাঙ্গানিজ এবং অ্যালুমিনিয়াম ধাতু অ্যাসিডবৃষ্টির ফলে মাটি থেকে দ্রবীভূত হয়ে জলে মিশে মাছেদের সর্বনাশের কারণ হয়ে উঠতে পারে, পারদযৌগও অ্যাসিডের উপস্থিতিতে মাছেদের পক্ষে মারাত্মক বিপদের কারণ হয়ে উঠতে পারে। প্রকৃতপক্ষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সুইডেন প্রভৃতি দেশে অজস্র হ্রদ অ্যাসিডবৃষ্টির দরুণ মাছশূন্য হয়ে পড়েছে।

প্রাণীদেহে এবং জনস্বাস্থ্যের উপর অ্যাসিডবৃষ্টির প্রভাব মারাত্মক হতে পারে। অ্যাসিডবৃষ্টির মধ্যে মূলতঃ সালফিউরিক অ্যাসিড এবং নাইট্রিক অ্যাসিড থাকে, এই দুটি অ্যাসিডই ফুসফুস এবং শ্বাসক্রিয়ার পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকারক এবং ফুসফুসের ক্যান্সার সৃষ্টির কারণ হয়ে উঠতে পারে। তাছাড়া আমাদের পরিপাকতন্ত্র এবং স্নায়ুতন্ত্রের ক্ষতি সাধন করতে পারে, আমরা স্নায়ুরোগের শিকার হয়ে পড়তে পারি। অ্যাসিডবৃষ্টির মধ্যে অ্যাসিড ছাড়াও মারাত্মক বায়ুদূষক বিভিন্ন পদার্থ মিশে থাকতে পারে যেগুলিও বিভিন্ন রকম ক্ষতি করতে পারে।

এসব ক্ষতিছাড়াও অ্যাসিডবৃষ্টিতে পৃথিবীর বিভিন্নস্থানে কিছু ঐতিহাসিক স্থাপত্যকীর্তি স্মৃতিস্তম্ভ এসবও বিপদের সম্মুখীন, কারণ মার্বেলপাথর, চুনাপাথর ইত্যাদি দ্বারা নির্মিত স্থাপত্যসমূহ অ্যাসিড দ্বারা আক্রান্ত হয় এবং ধীরে ধীরে ক্ষয়প্রাপ্ত হতে পারে। যেমন, সালফার ডাইঅক্সাইড ঘটিত অ্যাসিডবৃষ্টিতে ওয়াশিংটনের লিংকন স্মৃতিসৌধ ও ক্লীওপেট্রার নীড্‌ল, গ্রীসের এক্রোপলিস, ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ভবন এবং আরও অনেক পৃথিবীবিখ্যাত শিল্পকীর্তি ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন। আমাদের এখানেও এই ধরনের বিপদের আশঙ্কা রয়েছে। কয়েক বছর আগে আগ্রার তাজমহলের দেওয়ালের গায়ে যে ক্ষয় দেখা গিয়েছিল তাজমহল সংলগ্ন বাতাসে সালফার ডাইঅক্সাইডের গাঢ়ত্ব উচ্চ হওয়াতেই এবং সেই বাতাসের সংস্পর্শে তাজমহলের

দেওয়ালের দীর্ঘদিন ব্যাপী বিক্রিয়ার ফলেই এটি ঘটেছিল বলে বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছিলেন। সালফার ডাইঅক্সাইডের সঙ্গে বাতাসের ও জলীয় বাষ্পের দীর্ঘকালীন বিক্রিয়ায় সৃষ্ট অ্যাসিড (মূলতঃ সালফিউরিক অ্যাসিড) এবং তাজমহলের মার্বেল পাথরের বিক্রিয়ায় তাজমহলের দেওয়ালে ক্ষয় দেখা দেয়। যমুনা নদীর অপর তীরে অবস্থিত মথুরা পেট্রোলিয়াম শোধনাগার থেকে নির্গত সালফার ডাইঅক্সাইড মূলতঃ তাজমহল সংলগ্ন আগ্রার বাতাসে সালফার ডাইঅক্সাইডের ঘনত্ব বাড়িয়ে তুলেছিল। কিছু নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা নেওয়ায় তাজমহলের এই 'স্টোন ক্যান্সার' আপাততঃ বন্ধ করা গেছে। দিল্লীর বাতাসে সালফার ডাইঅক্সাইডের ঘনত্ব বাড়ছে, কাজেই এখানেও লালকেল্লা সহ পাথরে নির্মিত অন্যান্য স্থাপত্য কীর্তির বিপদের সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কলকাতাতেও ভবিষ্যতে ভিক্টোরিয়া স্মৃতিসৌধ এই ধরনের বিপদের সম্মুখীন হতে পারে।

সাধারণতঃ বৃষ্টির জল সামান্য আম্লিক হয়েই থাকে, বাতাসের কার্বন ডাইঅক্সাইড এই জলে কিছুটা দ্রবীভূত হয়ে কার্বনিক অ্যাসিড গঠন করায়। ঐ সামান্য অম্লতা তেমন ক্ষতিকারক নয়, তাছাড়া বাতাসে ভাসমান ক্ষারকীয় ধূলিকণা দ্বারা এই অম্লত্ব অনেকটা প্রশমিত হয়ে যায়। কিন্তু বাতাসে যদি যথেষ্ট পরিমাণে সালফার ডাইঅক্সাইড, নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড ইত্যাদি আম্লিক অক্সাইড থাকে তবে বৃষ্টির জলের অম্লত্ব নগণ্য নাও হতে পারে এবং অ্যাসিডবৃষ্টি তখনই যথেষ্ট ক্ষতিকারক হয়। সারা পৃথিবীতে অ্যাসিডবৃষ্টি নিয়ন্ত্রণের সম্ভাব্য উপায়ের কথা ভাবা হচ্ছে।

7.2. গ্রীনহাউস এফেক্ট বা সবুজঘর প্রভাব

অনেক নাতিশীতোষ্ণ দেশে অর্থনৈতিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ এমন কিছু উদ্ভিদ যেগুলি শীতকালে অতিনিম্ন তাপমাত্রায় মুক্তস্থানে জন্মাতে পারে না সেগুলির চারা সূর্যালোকে উদ্ভাসিত এমনস্থানে কাচের দেওয়াল ঘেরা এবং কাচের ছাদ ঢাকা ঘরে (গ্লাস হাউসে) জন্মানো হয়। শীতকালে অনেক ক্রান্তীয় (subtropic) অঞ্চলেও বিশেষতঃ অত্যধিক ঠাণ্ডা অতি উচ্চতার স্থানগুলিতে মূল্যবান সব্জি এবং ফুলচাষের জন্যও কাচ ঘর ব্যবহৃত হয়ে থাকে, গবেষণার জন্য বিশেষতঃ নতুনজাতের ফসল উৎপাদনে এবং ফসলের উপর বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার কাজেও কাচঘর ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কাচের ঘরের মধ্যের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়, এর কারণ হল সূর্যের আলো ঘরের মধ্যে প্রবেশকালে কাচের দেওয়াল বা ছাদ বাধার সৃষ্টি করে না, কিন্তু মেঝে থেকে দীর্ঘতর তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের অবলোহিত রশ্মি সমৃদ্ধ প্রতিফলিত আলো ও তাপের ঘরের বাইরে নির্গমনে বাধার সৃষ্টি ক'রে ঘরের মধ্যে তাপ বৃদ্ধিতে ভূমিকা নেয়। এই ধরনের কাচের ঘরকে সবুজ-ঘর বা গ্রীনহাউস বলা হয়, কারণ সবুজ উদ্ভিদ জন্মাতে এই ধরনের ঘরে উৎপন্ন আলো ও তাপ খুবই উপযোগী ভূমিকা নেয়, যদিও ঘরের বাইরেটা থাকে খুবই ঠাণ্ডা এবং অনেকক্ষেত্রে বরফ-আবৃত এবং বন্ধ্যা।

বায়ুমণ্ডলের কার্বন ডাইঅক্সাইড এবং অন্যান্য কয়েকটি গ্যাসের কাচঘরের অনুরূপ তাপ আটকে দেবার ধর্ম বিদ্যমান। কাচঘরের কাচ যেমন ঘরের অভ্যন্তরের তাপকে বিকিরিত হয়ে বাইরে নির্গত হতে বাধা দেয়, বায়ুমণ্ডলীয় এই সব গ্যাসগুলি যাদের গ্রীনহাউস গ্যাস বলা হয় সেগুলিও পৃথিবী থেকে বিকিরিত তাপ আটকে দেয় অবলোহিত রশ্মি শোষণের মাধ্যমে। এই তাপ আংশিকভাবে আবার ভূপৃষ্ঠে প্রতিফলিত হয়। এই ঘটনাটিকে তাই গ্রীনহাউস এফেক্ট বা সবুজঘর প্রভাব বলা হয়, বায়ুমণ্ডলীয় কয়েকটি গ্যাস যেক্ষেত্রে কাচ ঘরের কাচের আবরণীর ন্যায় ভূমিকা নেয় (এবং পৃথিবীই এক্ষেত্রে কাচঘরের ভূমিকা পালন করে)।

এ বিষয়টি পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে যে, বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাইঅক্সাইড এবং অন্যান্য গ্রীনহাউস গ্যাসগুলির পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে ভূ-পৃষ্ঠের এবং ভূ-পৃষ্ঠ সংলগ্ন বায়ুস্তরের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাবে, অপরদিকে বায়ুমণ্ডলে গ্রীনহাউস গ্যাসগুলির পরিমাণ হ্রাস পেলে ভূ-তাপমাত্রাও হ্রাস পাবে। প্রকৃতপক্ষে বায়ুমণ্ডলে প্রায় সবকটি গ্রীনহাউস গ্যাসের পরিমাণই ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে, এর ফলে ভূ-তাপমাত্রা বৃদ্ধি এবং আবহাওয়ামণ্ডলের পরিবর্তন হবে বলে বিশেষজ্ঞরা আশংকা প্রকাশ করছেন এবং এসবের ফলে পৃথিবীর বাস্তুতন্ত্রে মারাত্মক বিপর্যয় দেখা দিতে পারে বলে তাঁদের আশংকা। সুতরাং বায়ুমণ্ডলে গ্রীনহাউস গ্যাসগুলির পরিমাণের হ্রাস বৃদ্ধি সম্পর্কে আমাদের সম্যক অবহিত থাকা জরুরী।

7.2.1. সম্ভাব্য কিছু ফলাফল

যে প্রশ্নটি আমাদের মনে উঁকি দেয় সেটি হল বায়ুমণ্ডলে ঐসব গ্রীনহাউস গ্যাসগুলির ক্রমবর্ধমান বৃদ্ধির সম্ভাব্য ফলাফল পরিবেশে কী হতে পারে? বিজ্ঞানীরা যেসব ভবিষ্যৎবাণী করছেন তার ভিত্তিতে এ প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় সম্ভাব্য ফলাফল কিছু হবে প্রত্যক্ষ কিছু পরোক্ষ।

বায়ুমণ্ডলে গ্রীনহাউসগ্যাসগুলির পরিমাণ বৃদ্ধি পেতে থাকলে সম্ভাব্য প্রত্যক্ষ ফল হবে ভূপৃষ্ঠ এবং এর সংলগ্ন বায়ুস্তরের গড় তাপমাত্রার বৃদ্ধি-এ বিষয়টি আগেই উল্লেখিত হয়েছে। তবে এই তাপমাত্রা বৃদ্ধি কী পরিমাণে ঘটবে এবং কত দ্রুততার সাথে ঘটবে সে বিষয়ে বিজ্ঞানীদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। আসলে বিজ্ঞানীরা যে কাল্পনিক মডেলের ভিত্তিতে ভবিষ্যৎবাণী করতে চেষ্টা করেছেন সেই মডেল একটিমাত্র নয়, একাধিক, কাজেই উপরের প্রশ্নটির উত্তরে কিছুটা ভিন্নমত লক্ষিত হয়, তাছাড়া বায়ুমণ্ডলে গ্রীনহাউস এফেক্টের বিপরীতমুখী একটি প্রতিক্রিয়ার সম্ভাবনাও ঐ প্রশ্নের সঠিক উত্তর প্রদানে বিজ্ঞানীদের কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত করেছে—এই সম্ভাবনা হল বায়ুমণ্ডলে গ্রীনহাউস গ্যাসগুলির পরিমাণ যেমন বৃদ্ধি পাচ্ছে তেমনই ভাসমান বা প্রলম্বিত কঠিন কণার পরিমাণও তো বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং এর ফলে এইসব কণাগুলি সূর্যরশ্মির পৃথিবীতে আপতনের পথে কিছুটা পর্দা প্রতিম প্রভাব ফেলবার সম্ভাবনা সৃষ্টি করছে, সূর্যরশ্মিকে কিছুটা প্রতিফলিত এবং অংশতঃ অবশোষণের মাধ্যমে, এর ফলে পৃথিবী-পৃষ্ঠে লভ্য সৌরতাপের পরিমাণ কিছুটা হ্রাস পেতে পারে, পরিণতিতে ভূ-তাপমাত্রা হ্রাস পেয়ে ভূ-পৃষ্ঠ শীতলতর হয়ে উঠবার সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে। তবে গ্রীনহাউস এফেক্টের বিপরীতমুখী এই প্রভাবটির সম্ভাবনা উড়িয়ে না দিলেও ভূ-তাপমাত্রা যে কমবেশী হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও বাড়তে থাকবে এ বিষয়ে বিজ্ঞানীদের মধ্যে কোনও দ্বিমত নেই, প্রশ্ন থেকে গিয়েছে কত দ্রুততার সঙ্গে এই তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাবে সেই প্রসঙ্গটিতেই।

বর্তমানে গড় ভূ-তাপমাত্রা মোটামুটিভাবে 15° সেলসিয়াস। এই তাপমাত্রার অতীতেও হ্রাসবৃদ্ধি ঘটেছে। আজ থেকে প্রায় 18000 বছর আগে শেষ হিম যুগে বাতাসে কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ বর্তমান পরিমাণের তুলনায় যখন অনেক কম ছিল, তখন গড় ভূ-তাপমাত্রা আজকের তুলনায় প্রায় 5° সেলসিয়াস কম ছিল। প্রায় এক কোটি বছর আগে (ডাইনোসর যুগে) ভূ-তাপমাত্রা আজকের তুলনায় প্রায় 4—5° সেলসিয়াস বেশী ছিল। প্রাকশিল্প বিপ্লবের সময় থেকে (1860 সাল থেকে) আজ পর্যন্ত সময়কালে ভূ-তাপমাত্রা প্রায় 0.5° থেকে 1.5° সেলসিয়াস মত বেড়ে গেছে। অধিকাংশ বিজ্ঞানীর ভবিষ্যৎবাণী হল যে বায়ুমণ্ডলের গ্রীনহাউস গ্যাসগুলির সমতুল্য পরিমাণ (তাপ আটকে দেবার ক্ষমতার নিরিখে) কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ দ্বিগুণিত হলে আগামী শতাব্দীর মাঝামাঝি নাগাদ গড় ভূ-তাপমাত্রা আনুমানিক 1.5° থেকে 4.5° সেলসিয়াসের মতো বৃদ্ধি পাবে।

ভূ-তাপমাত্রা বৃদ্ধি সম্পর্কে যে ভবিষ্যৎবাণী করা হচ্ছে আপাতদৃষ্টিতে সেটি খুব বেশী বলে মনে না হতে পারে, কিন্তু প্রকৃতই যদি ভূ-তাপমাত্রা এভাবে বেড়ে যায় তার ফলাফল মারাত্মক হতে পারে। বলা হয়েছে যে গড় ভূ-তাপমাত্রা যদি বর্তমানের তুলনায় মাত্র 3° সেলসিয়াস বেড়ে যায় তাহলে এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি হবে যাতে পৃথিবীর জীবকুলকে গত 1,00,000 (একলক্ষ) বছরের মধ্যে পড়তে হয়নি।

ভূ-তাপমাত্রা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সম্ভাব্য অন্যান্য আনুষঙ্গিক ফলাফল সম্পর্কে বেশ কিছু ভবিষ্যৎবাণী করা হয়েছে। এমনতর সম্ভাব্য কিছু ফলাফল সম্পর্কে এখানে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল :

সমুদ্রজলতল স্ফীততর হবার সম্ভাবনা : ভূ-তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে পৃথিবীর মেরু অঞ্চলের (গ্রীনল্যাণ্ড, আন্টার্কটিকার) সঞ্চিত বরফস্তূপ হিমবাহগুলি আংশিকভাবে গলে যেতে পারে, সমুদ্রজলের ভাসমান বরফও আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে গলে যেতে পারে, আর তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে সমুদ্রজলের আয়তনও প্রসারিত হতে পারে এবং এসবের ফলে সমুদ্রজলতল স্ফীততর

হতে পারে। প্রকৃতপক্ষে এই শতাব্দীতেই সমুদ্রজলতল প্রায় 0.15 মিটার স্ফীত হয়েছে। কতিপয় বিজ্ঞানীর মতে ভূ-পৃষ্ঠ গড়ে যদি 3° থেকে 5° সেলসিয়াস অধিকতর উত্তপ্ত হয় তবে সমুদ্রজলতল প্রায় 3 মিটার পর্যন্ত বেড়ে যেতে পারে। এর ফলে পৃথিবীর অনেক জনবহুল নিম্ন এলাকা (বিশেষতঃ সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চল সমূহ) প্লাবিত হতে পারে। এভাবে জনবহুল এলাকা প্লাবিত হলে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের পুনর্বাসনের সমস্যা বহু দেশেই প্রকট হয়ে দেখা দিতে পারে। তাছাড়া সমুদ্রের লবণাক্ত জল প্লাবিত অঞ্চলের উর্বরা কৃষিজমি লবণাক্ত হয়ে চাষের অনুপযুক্ত হয়ে যেতে পারে, পরিণতিতে ফসল উৎপাদন ব্যাপকভাবে ব্যাহত হতে পারে। একথা বুঝতে অসুবিধা হয় না যে এমনতর সমস্যার সৃষ্টি হলে সবচাইতে অসুবিধায় পড়তে হবে তৃতীয় বিশ্বের গরীব দেশগুলিকে। সমুদ্রজলতল স্ফীত হলে ব-দ্বীপ অঞ্চলের নিম্নভূমিগুলি প্লাবিত হবার সম্ভাবনা সর্বাধিক—মিশর, বাংলাদেশ, আমাদের পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবন অঞ্চলসহ ভারতের সমুদ্র উপকূলবর্তী বহু এলাকা সমুদ্রজলে প্লাবিত বা নিমজ্জিত হতে পারে। বাংলাদেশের প্রায় অর্দ্ধেক ভূমিখণ্ডের উচ্চতা সমুদ্রজলতল থেকে 5 মিটারেরও কম, আশংকা করা হয়েছে সমুদ্রজলতলের উচ্চতা যদি সত্যিই ভবিষ্যৎবাণী অনুযায়ী বৃদ্ধি পায় তবে আগামী শতকের মাঝামাঝি সময় নাগাদই বাংলাদেশের ভূমিখণ্ডের প্রায় 18 শতাংশ জলের নীচে চলে যাবে আর তার ফলে ঐ দেশের প্রায় 15 শতাংশ মানুষকে বাস্তুহারা হতে হবে। আর ঐ শতকের শেষে এজন্য ঐ দেশের প্রায় 35 শতাংশ মানুষকে পারিবেশিক বাস্তুহারা হতে হবে। মালদ্বীপ পুরোপুরি জলমগ্ন হয়ে যেতে পারে আগামী 300 বছরের মধ্যে। তবে সামান্য ভরসার কথা এই যে কতিপয় বিজ্ঞানী বলেছেন যে বাস্তব ক্ষেত্রে সমুদ্রজলতলের উচ্চতা 13 থেকে 78 সেন্টিমিটারের বেশী বাড়বে না। কারণ কিছু বিপরীতমুখী প্রতিক্রিয়ার ফলে সমুদ্রজলের আয়তন যতটা আশংকা করা হচ্ছে ততটা বৃদ্ধি পাবে না। সেক্ষেত্রেও প্লাবিত অঞ্চলসমূহের আয়তন কিছুটা কমতে পারে। কিন্তু কিছু নীচু অঞ্চল প্লাবিত হবেই।

7.2.1.1. আবহাওয়ামণ্ডলের উপর সম্ভাব্য প্রভাব

ক্রমবর্ধমান হারে গ্রীনহাউস গ্যাসগুলির বায়ুমণ্ডলের নির্গমন আবহাওয়ামণ্ডলকে দারুণভাবে প্রভাবিত করতে পারে।

গড় ভূ-তাপমাত্রা বৃদ্ধির দরুন পৃথিবীর বিভিন্ন উৎসের জল (ভূতলস্থিত) অধিকতর দ্রুততার সঙ্গে এবং বেশী পরিমাণে বাষ্পায়িত হতে পারে এবং তার ফলে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ সামগ্রিকভাবে বৃদ্ধি পেতে পারে, কিন্তু পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলেই সুষমভাবে বিষয়টি ঘটবে না, কোথাও অতিবৃষ্টি আবার কোথাও বা খরা দেখা দিতে পারে। বহু অঞ্চলে (বিশেষতঃ গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলে) গ্রীষ্মকাল দীর্ঘায়িত হতে পারে, আবার উত্তর মেরু অঞ্চলে শীতকালে ভূ-পৃষ্ঠ এবং এর সংলগ্ন বায়ুস্তরের তাপমাত্রা বর্তমানের তুলনায় অনেক উচ্চতর হবে।

7.2.1.2. বনাঞ্চল ও কৃষিউৎপাদনের ক্ষেত্রে প্রভাব

ফসলের উৎপাদনের ক্ষেত্রে গ্রীনহাউস এফেক্ট এবং ভূ-তাপমাত্রা বৃদ্ধির প্রভাব কেমনভাবে পড়বে সে সম্পর্কে সঠিক ভবিষ্যৎবাণী করা সম্ভব হয়নি কারণ পরস্পর বিরোধী কিছু প্রভাব এক্ষেত্রে ক্রিয়াশীল হতে পারে। ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে না হ্রাস পাবে সেটি নির্ভর করবে অনেকগুলি বিষয়ের উপর, যেমন নির্দিষ্ট অঞ্চলের ভৌগোলিক অবস্থান ও সেখানে আবহাওয়ার পরিবর্তন কীভাবে ঘটে, বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাইঅক্সাইডের বৃদ্ধির পরিমাণ কতটা, মৃত্তিকার আর্দ্রতা বা শুষ্কতা কীরূপ, ফসলের ধরন এ-সবকিছুর উপর। যেমন, উত্তর গোলার্ধের মধ্য অক্ষাংশের দেশগুলিতে গ্রীনহাউস এফেক্টের ফলে গ্রীষ্মকালে ঘন ঘন খরা দেখা দিতে পারে বলে আশংকা প্রকাশ করা হয়েছে, সেক্ষেত্রে উত্তর আমেরিকা এবং প্রাক্তন সোভিয়েত রাশিয়ার উৎপাদনশীল অঞ্চলগুলিতে ফসলের উৎপাদন হ্রাস পেতে পারে। আবার, বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ দ্বিগুণ হয়ে গেলে এবং ভূ-তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে প্রাক্তন সোভিয়েত রাশিয়ার কেন্দ্রীয় ইয়োরোপীয় অঞ্চলে গমের উৎপাদন প্রায় 33 শতাংশ বেড়ে যেতে পারে ; পক্ষান্তরে বার্লির উৎপাদন বেশ কিছুটা কমে যেতে পারে। কারণ বার্লি উৎপাদনের জন্য অধিকতর তাপমাত্রা প্রতিকূল অবস্থার সৃষ্টিকারক। বাতাসে কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ বৃদ্ধি উদ্ভিদের

সালোকসংশ্লেষের হার বৃদ্ধির সহায়ক। কাজেই এই বৃদ্ধি কিছু কিছু ক্ষেত্রে ফসলের ফলন যেমন বাড়িয়ে দিতে পারে, তেমনি রুক্ষ অনার্দ্র মাটি এবং মাটির উচ্চতর উষ্ণতা ফসলের ফলন কমিয়েও দিতে পারে, গ্রীষ্মকালে সেচের জলের অভাব কোথাও কোথাও প্রকট হয়ে উঠতে পারে। আবার কোথাও অতিবর্ষণজনিত কারণে ভূমিক্ষয় দ্রুততর হবার ফলে, বাতাসে কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ বৃদ্ধিতে ফসলের ফলন বৃদ্ধির যতটা সম্ভাবনা লভ্য কৃষিজমির আয়তন সঙ্কুচিত হবার ফলে সেই সম্ভাবনা বাস্তবক্ষেত্রে অনেক কমে যেতে পারে। মধ্য ও উচ্চ অক্ষাংশে অবস্থিত অঞ্চলগুলিতে, যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমতল অঞ্চল, পশ্চিম ইয়োরোপ, উত্তর কানাডা, সাইবেরিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে গ্রীষ্মে মৃত্তিকা অনেক শুষ্কতর হয়ে উঠবে, ফলে এমনতর মৃত্তিকার উৎপাদিকাশক্তি হ্রাস পাবে। কৃষিতে ভবিষ্যৎবাণী করা হয়েছে যে 2050 সাল নাগাদ ভারত ও পাকিস্তানে ফসলের ফলন অন্তত 30 শতাংশে কমে যাবে।

7.2.2. গ্রীনহাউস এফেক্ট নিয়ন্ত্রণে গ্রহণীয় সম্ভাব্য ব্যবস্থাদি

গ্রীনহাউস গ্যাসগুলির ক্রমবর্ধমান হারে বায়ুতে নির্গত হওয়া এবং তার ফলে যে মারাত্মক অবস্থা আগামী দিনে সৃষ্টি হতে চলেছে তার প্রতিকারার্থে ত্রিবিধ ব্যবস্থা অবলম্বনের কথা ভাবা যেতে পারে : (ক) গ্রীনহাউস গ্যাসগুলির বাতাসে নির্গমন নিয়ন্ত্রণ, (খ) ভবিষ্যতে পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে চলবার জন্য আগুপ্রস্তুতি গ্রহণ (গ) ব্যাপক ও নিরবচ্ছিন্ন গবেষণা।

7.2.2.1. গ্রীনহাউস গ্যাসসমূহের নির্গমন হ্রাস করা

গ্রীনহাউস গ্যাসগুলির মধ্যে প্রধান হল কার্বন ডাইঅক্সাইড। বাতাসে এর পরিমাণ বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে মূলতঃ দুই ধরনের পন্থা নির্দেশিত হয়েছে। যথা, জীবাশ্মজ্বালানীসমূহের ব্যাপক ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ এবং বনভূমি সংরক্ষণ ও নয়া বনভূমি সৃজন যথাসম্ভব ব্যাপকভাবে সম্পাদন।

জীবাশ্মজ্বালানীর ব্যাপক দহন যেহেতু বাতাসে কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ বৃদ্ধির প্রধান কারণ, সুতরাং এই ধরনের জ্বালানীর ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত না হলে কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ সম্ভব নয়। এমনিতেও অবশ্য পৃথিবীর তরল ও গ্যাসীয় জীবাশ্মজ্বালানী ভাণ্ডার দ্রুত নিঃশেষের পথে। সেদিক থেকেও এই জ্বালানীর ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত হওয়া প্রয়োজন। সেক্ষেত্রে বিকল্পজ্বালানীর ব্যবস্থা করা জরুরী। সৌরশক্তি, হাইড্রোজেন বা পারমাণবিক শক্তি অথবা জলবিদ্যুৎ পরিবর্ত জ্বালানী হিসেবে বেশী করে ব্যবহার করতে পারলে বাতাসে কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ বৃদ্ধি অনেকাংশে কমিয়ে আনা সম্ভব হতে পারে।

বাতাসে কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণবৃদ্ধি রোধ করতে বনসম্পদের নির্বিচারে ধ্বংসসাধন রোধ যেমন জরুরী, সাথে সাথে দিকে দিকে নতুন বনাঞ্চল যতখানি সম্ভব গড়ে তুলতে সচেষ্ট হতে হবে। অবশ্য হিসেব করা হয়েছে যে প্রতিবছর বাতাসে যে পরিমাণ কার্বন (মূলতঃ কার্বন ডাইঅক্সাইড হিসেবেই) বাতাসে জমা হয় তা কেবল বনসম্পদ গড়ে তুলে শোষণ করাতে হলে প্রায় 46 কোটি 50 লক্ষ হেক্টর নতুন বনাঞ্চল গড়ে তোলা প্রয়োজন।

এখানে উল্লেখ্য যে 1988-এর জুন মাসে কানাডার টরেন্টোয় অনুষ্ঠিত একটি বিশ্বসম্মেলন থেকে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে মূলতঃ শিল্পোন্নত দেশগুলিকে 2005 সাল নাগাদ বাতাসে কার্বন ডাইঅক্সাইড নির্গমনের হার অন্তত শতকরা 20 ভাগ কমিয়ে আনতে হবে।

কৃষিজমিতে নাইট্রোজেন ঘটিত সারের ব্যাপক ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করে, কাঠ ও জীবাশ্মজ্বালানী সমূহের ব্যাপক দহন নিয়ন্ত্রণ করে বাতাসে নাইট্রাসঅক্সাইডের নির্গমন কিছুটা নিয়ন্ত্রিত হতে পারে।

মোটরগাড়ির ইঞ্জিনে এবং বিভিন্ন শিল্পে জীবাশ্মজ্বালানীর দহনকালে উৎপন্ন নাইট্রোজেনের বিভিন্ন অক্সাইডের সঙ্গে বাতাসের অক্সিজেনের দীর্ঘকালীন বিক্রিয়ায় ওজোন উৎপন্ন হয়। কাজেই ঘনমণ্ডলীয় বাতাসে ওজোন নির্গমন নিয়ন্ত্রণেও জীবাশ্মজ্বালানীসমূহের ব্যাপক ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ জরুরী এবং বিকল্পজ্বালানীর সংস্থান প্রয়োজন।

ক্লোরোফ্লুওরো কার্বন যৌগশ্রেণী এবং হ্যালন যৌগশ্রেণীর উৎপাদন যাতে যথাসম্ভব নিয়ন্ত্রিত রাখা যায় সে উদ্দেশ্যে 1987 সালের সেপ্টেম্বরে কানাডার মন্ট্রিলে একটি আন্তর্জাতিক চুক্তি (যেটি মন্ট্রিল প্রোটোকল রূপে খ্যাত) স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী দেশগুলি (49টি) সিদ্ধান্ত নেয় যে 1998 সালের মধ্যে CFC যৌগসমূহের উৎপাদন 1986 সালের উৎপাদনের 50 শতাংশ হ্রাস করতে হবে। পরবর্তীকালে এটি অনুভূত হয় যে মাত্র 50 শতাংশ উৎপাদন হ্রাসই যথেষ্ট নয়, এই যৌগশ্রেণীর উৎপাদন সম্পূর্ণভাবেই বন্ধ হওয়া প্রয়োজন। 1990 সালে অনুষ্ঠিত লণ্ডন সম্মেলন থেকে তাই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে শিল্পোন্নত দেশগুলি 2000 সালের মধ্যে এবং উন্নয়নশীল দেশগুলি 2010 সালের মধ্যে CFC যৌগশ্রেণীর উৎপাদন সম্পূর্ণভাবেই নিষিদ্ধ করবে। 1992-এর আগস্ট মাস থকে এই চুক্তি কার্যকরী হয়েছে। আশা করা যায় এর ফলে CFC জনিত গ্রীনহাউস এফেক্ট হ্রাস পাবে।

কর্দমাক্ত জলাভূমি বা ধানক্ষেত থেকে উৎপন্ন মিথেন গ্যাসের বেশী পরিমাণে বাতাসে মেশা নিয়ন্ত্রণের জন্য সারা বিশ্বে বিশেষ করে ধান উৎপাদনকারী দেশগুলিতে জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন। ভারতেও জনসংখ্যা 100 কোটি ছাড়িয়ে গেছে। বর্ধিত জনসংখ্যার খাদ্য চাহিদা মেটাতে ধানের উৎপাদন কমানো সম্ভব নয়, বরং এই উৎপাদন বাড়াতে হবে। জমি ঠিকভাবে গড়ে তুলে (পুকুর খননজাত মাটি দিয়ে নীচু জমিকে উন্নীত করে) অন্য ধরনের ফসল চাষের দিকে সচেষ্ট হবার প্রস্তাবটি বিশাল এলাকা জুড়ে করা বাস্তবসম্মত নয়। মাত্র কয়েকটি ক্ষেত্রে জলব্যবস্থাপনা এবং উন্নত কিছু পদ্ধতি গ্রহণ করা যেতে পারে, কিন্তু এর ফলে সার্বিকভাবে অবস্থার দারুণ পরিবর্তন করা সম্ভব হবে না। ঘটনাক্রমে জনসংখ্যার বিপুল চাপের ফলে কর্দমাক্ত জলাভূমির (marshy land) আয়তন ক্রমশ সংকুচিত হয়ে আসছে। এখন এ বিষয়টি যথেষ্ট স্পষ্ট যে গ্রীনহাউস গ্যাসগুলির বায়ুমণ্ডলে বর্ধিত মাত্রায় নির্গমনে মিথেনের ভূমিকা এবং সেক্ষেত্রে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির এবিষয়ে ভূমিকা উন্নত দেশগুলি অনেকখানি বাড়িয়ে দেখিয়েছে। প্রকৃতপক্ষে কার্বন ডাইঅক্সাইড, নাইট্রাস অক্সাইড, ক্লোরোফ্লুওরো কার্বন যৌগসমূহ, এইসব গ্রীনহাউস গ্যাসগুলির বিপুল পরিমাণে উৎপাদন ও বায়ুমণ্ডলে নির্গমনের জন্য উন্নত দেশগুলি অনেক বেশী দায়ী। যেমন, বিশ্বের মাত্র 5 শতাংশ জনসংখ্যার দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বের বায়ুমণ্ডলে পরিত্যক্ত মোট কার্বন ডাইঅক্সাইডের প্রায় 23 শতাংশ নির্গমনের জন্য দায়ী (যেখানে বিশ্বজনসংখ্যার 16 শতাংশ জনসংখ্যা বিশিষ্ট ভারত থেকে পরিত্যক্ত কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে ত্যক্ত কার্বন ডাইঅক্সাইডের 3 শতাংশ মাত্র)। প্রকৃতপক্ষে সারা বিশ্বে জ্বালানী খরচের 80 শতাংশের জন্যই দায়ী হল শিল্পোন্নত ধনী দেশগুলি।

কাজেই গ্রীনহাউস গ্যাসগুলির বায়ুমণ্ডলে নির্গমন নিয়ন্ত্রণে সারা বিশ্বে যেসব কর্মসূচী রূপায়ণ করতে হবে তার আর্থিক দায়দায়িত্ব এইসব ধনী দেশগুলোরই বহন করা উচিত, বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে বনসম্পদ সংরক্ষণ ও নয়া বনভূমি গড়ে তুলতে এই দেশগুলিকে অকৃপণভাবে আর্থিক সহায়তার হাত প্রসারিত করতে হবে। উত্তরের দেশগুলি এবং দক্ষিণের দেশগুলির সমবেত প্রয়াসেই কেবল গ্রীনহাউস গ্যাসসমূহের নির্গমন নিয়ন্ত্রণ এবং ভূ-তাপমাত্রাবৃদ্ধির প্রবণতা রোধের কর্মসূচী রূপায়ণ সম্ভব।

7.2.2.2. পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে চলার চেষ্টা করা

ক্রমবর্ধমান গ্রীনহাউস এফেক্ট এবং তার ফলে ভূ-তাপমাত্রা বৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী এটি ধরে নিয়ে তার পরিণতিতে যেসব পরিবর্তনের আশংকা করা হচ্ছে সেই পরিবর্তনগুলি যদি রোধ করা সম্ভব না হয় তবে ঐ পরিবর্তনগুলির সঙ্গে কীভাবে মানিয়ে চলা যায় তার জন্যে এখন থেকেই ভাবনাচিন্তা করতে হবে এবং এইরূপ চিন্তাভাবনা শুরু হয়ে গেছে। যেমন,

সমুদ্রজলতলের উচ্চতা বেড়ে যাবার সম্ভাবনা থাকলে সমুদ্রতীরবর্তীস্থানসমূহের অধিবাসীবৃন্দকে আগে থেকেই অন্যত্র পুনর্বাসনের ব্যবস্থা রাখা যেতে পারে। সমুদ্রে বাঁধ দিয়ে বা সমুদ্রসংলগ্ন ভূমিখণ্ড উন্নীত করে সমুদ্রজলপ্লাবন আটকাতে সচেষ্ট হওয়া যেতে পারে। সমুদ্রউপকূলবর্তী কৃষিজমিসমূহে লবণাক্ততা নিয়ন্ত্রণে বা লবণাক্ত জমিতেই যাতে ফসল ফলানো যায় তার জন্য নিরন্তর গবেষণার মাধ্যম উন্নত প্রযুক্তি উদ্ভাবন করতে হবে। বর্তমানেই পৃথিবীর কিছু কিছু স্থানে সমুদ্র থেকেই কৃষিজমি বা আবাসনের উপযোগী জমি উদ্ধার করে ব্যবহার করা হচ্ছে (যেমন, নেদারল্যাণ্ডসে)। এসব স্থানে অধীত প্রযুক্তি ভবিষ্যতে সমুদ্রজলে প্লাবিত হবার আশংকা আছে এমন সব দেশের ক্ষেত্রেই লভ্য হওয়া প্রয়োজন। গ্রীনহাউস এফেক্টের দরুন আবহাওয়ামণ্ডলের যে ধরনের সম্ভাব্য পরিবর্তনের কথা বলা হচ্ছে, সেই ধরনের পরিবর্তনের কিছু সুবিধার দিক পরিকল্পিত ভাবে কাজে লাগাতে সচেষ্ট হতে হবে। যেমন, বিজ্ঞানীরা বলেছেন যে জাপানের কেন্দ্রীয় অঞ্চলে বর্তমানে যে ধানের উৎপাদন হয় ভবিষ্যতে বাতাসে কার্বনডাইঅক্সাইডের পরিমাণ দ্বিগুণিত হলে সেই ধানচাষের ব্যবস্থা জাপানের উত্তরাংশে করতে পারলে উৎপাদন 25 শতাংশের বেশী বৃদ্ধি পাবার সম্ভাবনা। পৃথিবীর শীতপ্রধান অঞ্চলগুলির ফসল ফলানোর সময়কাল দীর্ঘায়িত হলে এবং কৃষিক্ষেত্রের মৃত্তিকার তাপমাত্রা উচ্চতর হলে, ঐ অঞ্চলগুলিতে নিম্নতর তাপমাত্রায় যে ফসলের উৎপাদন হয়, তার পরিবর্তে উষ্ণতর তাপমাত্রায় ফসল ভাল হয় এমন ফসলের চাষ করলে অধিকতর লাভবান হবার সম্ভাবনা প্রবল। পরিবর্তিত আবহাওয়ায় নির্দিষ্ট ফসল উৎপাদনের কাল কিছুটা পরিবর্তিত করে নিলেও হয়তো সুফল মিলতে পারে এবং এসবক্ষেত্রে অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষাগ্রহণ করতে হবে। যেমন, 1988 সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্য পশ্চিমভাগে গ্রীষ্মকালে প্রচণ্ড খরায় ফসলের উৎপাদন মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়েছিল এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে সর্বপ্রথম চাহিদার তুলনায় ফসল-উৎপাদন অনেক কম হয়েছিল, এই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে কৃষকেরা পরের বছর ঐসব ফসলের বীজবপন করেছিলেন নির্দিষ্ট সময়ের বেশ কিছুটা আগে যাতে খরায় ফসল নষ্ট না হয়ে যেতে পারে এবং এর সুফলও মিলেছিল। এভাবে পরিবর্তিত আবহাওয়ার সঙ্গে খাপ খাইয়ে ফসলের চাষের ব্যবস্থা বর্তমান সময় থেকে অন্যতর সময়ে করে, মৃত্তিকার তাপমাত্রা এবং চাষের জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য অবস্থার পরিবর্তন অনুযায়ী ফসলের উৎপাদন স্থানের হেরফের ঘটিয়ে, জলসেচ ব্যবস্থা, জমিতে সার, কীটনাশক এসব প্রয়োগ ব্যবস্থা পরিবর্তিত পরিস্থিতি অনুযায়ী করতে পারলে কৃষি উৎপাদন হ্রাস প্রতিহত করা হয়তো সম্ভব হতে পারে।

এসব কিছুর জনাই আন্তর্জাতিক জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে সর্বস্তরেই ব্যাপক এবং উন্নত গবেষণার প্রয়োজন। যেমন গ্রীনহাউস গ্যাসগুলির নির্গমন হ্রাসে বিকল্প জ্বালানী উদ্ভাবনে, ভূ-তাপমাত্রা বৃদ্ধির পরিমাণ ভবিষ্যতে ঠিক কতখানি বাড়বে সে সম্পর্কে আভাষ দেবার জন্য এবং পরিবর্তন ঘটলে তার সঙ্গে মানিয়ে চলতে গেলে কী কী করা প্রয়োজন, অত্যধিক তপ্ত আবহাওয়ায় কী ব্যবস্থা নিলে জনস্বাস্থ্যের বা অন্যান্য জীবকুলের পক্ষে ক্ষতি ন্যূনতম পর্যায়ে রাখা সম্ভব সেসব সম্পর্কে পূর্বাভাষ ও প্রয়োজনীয় সুপারিশ করবার জন্যও ব্যাপক গবেষণার প্রয়োজন।

7.3. গ্রীনহাউস গ্যাসসমূহ, ভূ-তাপমাত্রাবৃদ্ধি এবং ওজোনগহ্বর

কার্বন ডাইঅক্সাইড-চক্র সম্পর্কিত আলোচনাকালে একথা বলা হয়েছে যে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় বায়ুতে ত্যক্ত বা নির্গত কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ এবং বিভিন্ন উৎসে শোষিত কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণের মধ্যে মোটামুটি একটা সমতা থাকলে বায়ুমণ্ডলীয় কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ মোটামুটি স্থির থাকে। কিন্তু বিভিন্ন কারণে এই সমতা দারুণভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে। বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। বনভূমির ব্যাপক ধ্বংসসাধন, বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় কাঠ ও জীবাশ্মজ্বালানীসমূহের (কয়লা, খনিজ তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস ইত্যাদির) ব্যাপক দহন, দাবাগ্নির ফলে বনভূমি দগ্ধ হওয়া, বনভূমি পুড়িয়ে দিয়ে কৃষিজমি হিসাবে ব্যবহার (ঝুমচাষ)—এসবের জন্যই বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ বেড়ে চলেছে। শিল্প বিপ্লবের ঠিক আগের মুহূর্তের (মোটামুটিভাবে 1860 সালের) তুলনায় কয়লা, তেল এবং গ্যাস বিভিন্ন শিল্পে

জ্বালানী হিসাবে ব্যবহারের ফলে বর্তমানে বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাইঅক্সাইডের আনুপাতিক পরিমাণ প্রায় 25-26 শতাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বর্তমানে প্রতি বছর গড়ে প্রায় 0.4 শতাংশ হারে এই গ্যাসটির পরিমাণ বায়ুমণ্ডলে বৃদ্ধি পাচ্ছে বলে প্রকাশ (অপরদিকে বাতাসে অক্সিজেনের পরিমাণ প্রতি বছর কমে যাচ্ছে)। বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ এভাবে ক্রমশ বেড়ে যেতে থাকলে পরিবেশে তার পরিণাম মারাত্মক হয়ে উঠতে পারে।

বায়ুমণ্ডলীয় কার্বন ডাইঅক্সাইডের একটি বিশেষ ধর্ম হল এই গ্যাসটি সূর্যরশ্মির পৃথিবীতে আপতনের পথে বাধাস্বরূপ নয়, কিন্তু গ্যাসটি ভূ-তাপকে মহাশূন্যে বিকিরিত হতে বাধা দেয়, কারণ সূর্যরশ্মিতে ভূ-পৃষ্ঠ তপ্ত হবার পর তা থেকে যে তাপ বিকিরিত হয় সেটিতে মূলতঃ বর্তমান অবলোহিত রশ্মি বাতাসের কার্বন ডাইঅক্সাইড (এবং অন্যান্য কয়েকটি গ্যাস) দ্বারা অবশোষিত হয় এবং এর কিছুটা আবার ভূ-পৃষ্ঠে পুনরায় প্রতিফলিত হয়। বাতাসের কার্বন ডাইঅক্সাইড তাই ভূ-তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে। বাতাসের কার্বন ডাইঅক্সাইডের ভূ-পৃষ্ঠের এবং ঠিক তার উপরের বায়ুস্তর থেকে বিকিরিত তাপ আটকে দেবার বিষয়টিকে বলা হয় গ্রীনহাউস এফেক্ট এবং কার্বন ডাইঅক্সাইডসহ অন্যান্য কয়েকটি গ্যাস যেগুলি বায়ুতে বর্তমান বা এতে মিশে যাচ্ছে, যেগুলির এইভাবে ভূ-তাপ বিকিরণ আটকে দেবার ক্ষমতা আছে সেগুলিকে গ্রীনহাউস গ্যাস বলা হয়। কার্বন ডাইঅক্সাইড ব্যতীত অন্যান্য প্রধান গ্রীনহাউস গ্যাসগুলি হল জলীয় বাষ্প, মিথেন, নাইট্রাস অক্সাইড, ঘনমণ্ডলীয় ওজোন, ক্লোরোফ্লুওরো কার্বনযৌগসমূহ এবং হ্যালন যৌগসমূহ।

7.3.1. কার্বন ডাইঅক্সাইড

বায়ুমণ্ডলে মুখ্য কার্যকরী গ্রীনহাউস গ্যাস হল কার্বন ডাইঅক্সাইড। বায়ুর উপাদনগুলির মধ্যে কার্বন ডাইঅক্সাইড সবচাইতে ভারী হওয়ায় ভূপৃষ্ঠ সংলগ্ন ঘনমণ্ডলীয় (tropospheric) বাতাসে কার্বন ডাইঅক্সাইডের ঘনত্ব খুব বেশী এবং জলীয় বাষ্প ছাড়া অন্যান্য গ্রীনহাউস গ্যাসগুলির তুলনায় এর পরিমাণ অনেক বেশী হওয়ায় বিকিরিত ভূ-তাপ আটকে দেবার ব্যাপারে বাতাসের কার্বন ডাইঅক্সাইডের ভূমিকা সর্বপ্রধান। প্রকৃতপক্ষে মনুষ্যসৃষ্ট উৎসজনিত গ্রীনহাউস এফেক্টের প্রায় 60 শতাংশ পরিমাণের জন্য কার্বন ডাইঅক্সাইড দায়ী। বাতাসে কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ দ্রুতহারে বেড়ে চলেছে মূলতঃ দুটি কারণে : (ক) কাঠ ও জীবাশ্মজ্বালানী সমূহের (fossil fuels), যথা কয়লা, খনিজতেল ও প্রাকৃতিক গ্যাসের ব্যাপক দহনের ফলে, এবং (খ) বনভূমিতে দাবাগ্নির জন্য বা কৃষিজমি ও বাসভূমির জন্য বনভূমি পুড়িয়ে ফেলা।
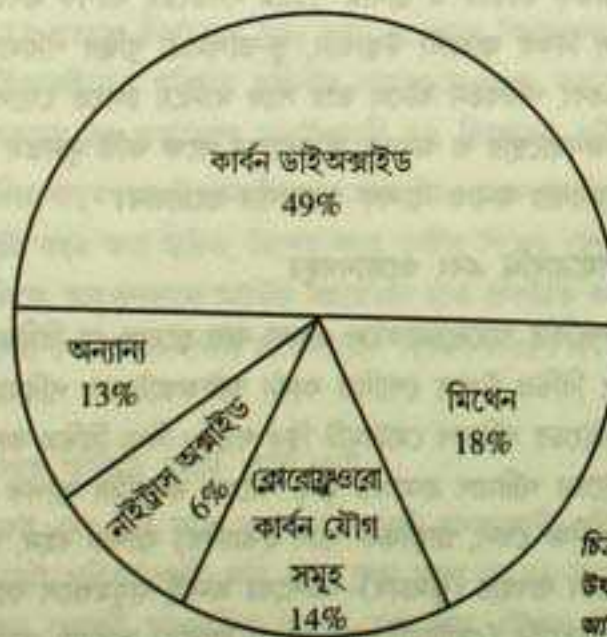
চিত্র 7.1. গ্রীনহাউস-এফেক্ট জনিত পৃথিবীর উষ্ণতামাত্রা বৃদ্ধিতে বিভিন্ন গ্রীনহাউস গ্যাসের আপেক্ষিক ভূমিকা।

এভাবে মূলতঃ মানুষেরই বিভিন্ন কার্যকলাপে প্রতিবছর বায়ুমণ্ডলে গড়ে প্রায় 2200 কোটি টন (22 billion) কার্বন ডাইঅক্সাইড (বা প্রায় 600 কোটি বা 6 billion টন কার্বন) পরিত্যক্ত হচ্ছে, এর মাত্র 50 শতাংশ উদ্ভিদজগৎ এবং সমুদ্র দ্বারা শোষিত হচ্ছে, বাকি পঞ্চাশ শতাংশ বায়ুমণ্ডলে জমা হতে থাকছে। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে এর ফলে বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ বছরে গড়ে প্রায় 0.4 শতাংশ হারে (কার্বন ডাইঅক্সাইডের বর্তমান পরিমাণ 100 ধরে গণনা করলে) বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং এই হারে বৃদ্ধি পেতে থাকলে আগামী শতাব্দীর মধ্য ভাগেই বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ প্রায় দ্বিগুণ (0.07%) হয়ে যেতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করা হচ্ছে। প্রাক-শিল্পবিপ্লবের সময় থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত সময়কালে বাতাসে কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ প্রায় 25-26 শতাংশ ইতিমধ্যেই বৃদ্ধি পেয়েছে বলে হিসেব করা হয়েছে।

7.3.2. মিথেন

মিথেন মূলতঃ উৎপন্ন হয় ধানক্ষেতে বা অন্যান্য কর্দমাক্ত জলাভূমিতে (marshy lands) ব্যাকটিরিয়ার প্রভাবে বায়ুর প্রায় অবর্তমানে (anaerobic condition) উদ্ভিদের পচনের ফলে, গবাদিপশুর মলমূত্রের পচনের ফলে, বায়ুর অবর্তমানে কিছু প্রাণীদেহের পচনের ফলেও। অর্থাৎ, বায়ুমণ্ডলীয় মিথেন মূলতঃ বিভিন্ন জৈব উৎস থেকেই আসে। বর্তমানে প্রতি 10 লক্ষ ভাগ বাতাসে প্রায় 1.7 ভাগ মিথেন (1.7 parts per million বা 1.7 ppm) উপস্থিত এবং প্রতিবছর গড়ে প্রায় 1.1 শতাংশ হারে বাতাসে এর পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে। প্রতি অণু মিথেনের তাপ আটকে দেবার ক্ষমতা প্রতি অণু কার্বন ডাইঅক্সাইডের এই ক্ষমতার তুলনায় প্রায় 25 গুণ বেশী, তবে বাতাসে এর পরিমাণ কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণের তুলনায় অনেক কম হওয়াতে গ্রীনহাউস এফেক্টে এর অবদান 15-20 শতাংশের মত। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে বাতাসে মিথেনের পরিমাণ প্রায় সমান্তরাল গতিতে বেড়ে চলেছে বলে প্রকাশ। ভারতের মত উন্নয়নশীল দেশে যেখানে কৃষি ও পশুপালনের উপর দেশ অনেকাংশে নির্ভরশীল সেখানে গ্রীনহাউস এফেক্টে কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরই মিথেনের অবদান সবচেয়ে বেশী। সারা পৃথিবীতে বায়ুমণ্ডলে ত্যক্ত মিথেনের পরিমাণের প্রায় 14 শতাংশ ভারতের অবদান।

7.3.3. নাইট্রাস অক্সাইড (N_2O)

বিভিন্ন প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যেমন মৃত্তিকার সঙ্গে বিশেষ জীবাণুর বিক্রিয়ার ফলে, দাবাগ্নির ফলে নাইট্রাস অক্সাইড উৎপন্ন হয়। ফসলের অবশেষের মৃদু ও স্বতঃ দহনের ফলে, কৃষিজমিতে নাইট্রোজেনঘটিত কৃত্রিম সার প্রয়োগের ফলেও নাইট্রাস অক্সাইড উৎপাদিত হয় বা এটির উৎপাদন ত্বরান্বিত হয়। জীবাশ্মজ্বালানীসমূহের ব্যাপক দহনের ফলে, বিশেষতঃ বিপুল সংখ্যক মোটর গাড়ির জ্বালানী রূপে ব্যবহৃত খনিজ তেলের ব্যাপক দহনেও এটি উৎপন্ন হয়। বায়ুমণ্ডলে প্রতি বছর গড়ে প্রায় 0.3 শতাংশ হারে এই গ্যাসের পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই হারে বৃদ্ধি পেতে থাকলে বিজ্ঞানীদের আশংকা প্রাক-শিল্পবিপ্লব মুহূর্তের তুলনায় বায়ুমণ্ডলে এই গ্যাসটির পরিমাণ প্রায় 34-35 শতাংশ বৃদ্ধি পাবে। এই সময়কালে গ্রীনহাউস এফেক্টে এই গ্যাসটির অনুমিত অবদান প্রায় 4 থেকে 5 শতাংশ। তাপ আটকে দেবার ক্ষমতার দিক থেকে একটি নাইট্রাস অক্সাইড অণু একটি কার্বন ডাইঅক্সাইড অণুর তুলনায় 250 গুণ বেশী কার্যকরী।

7.3.4. ক্লোরোফ্লুওরোকার্বন যৌগসমূহ (CFCs)

এই যৌগগুলি কৃত্রিমউপায়ে প্রস্তুত যৌগশ্রেণী—বিভিন্ন ধরনের হিমায়ণে (মোটরগাড়িতে, রেফ্রিজারেটারে, হিমঘর ইত্যাদিতে) হিমায়ক দ্রব্যরূপে, তরল প্রসাধন দ্রব্যের স্প্রেসহায়করূপে, অন্তরকদ্রব্যরূপে, সোফার কুশনে ইত্যাদিতে, আরও বহুকাজেই শিল্পদ্রব্য হিসেবে এই যৌগশ্রেণী বহুল ব্যবহৃত হয়। শান্তমণ্ডলীয় বায়ুস্তরের ওজোন ধ্বংসে এই শ্রেণীর যৌগগুলির প্রধান ভূমিকা বর্তমান আর ঘনমণ্ডলের বাতাসে এগুলি গ্রীনহাউস গ্যাসরূপে ক্রিয়াশীল। এই যৌগশ্রেণীর যে দুটির ব্যবহার

সর্বাধিক সে দুটিকে CFC–12 এবং CFC–11 হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। প্রথমটির প্রতি অণুর তাপ আটকে দেবার ক্ষমতা কার্বন ডাইঅক্সাইডের প্রতি অণুর এই ক্ষমতার তুলনায় 20,000 গুণ বেশী আর দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে এই ক্ষমতা 17,500 গুণ বেশী। এই যৌগগুলির আয়ুষ্কাল অতিদীর্ঘ (100 বছর বা তার বেশী)। বায়ুমণ্ডলে এই যৌগগুলির পরিমাণ প্রায় 5 শতাংশ হারে প্রতি বছরে বেড়ে চলেছে। গ্রীনহাউস এফেক্টে এই যৌগশ্রেণীর অবদান প্রায় 10 থেকে 12 শতাংশ।

7.3.5. ঘনমণ্ডলীয় ওজোন (Tropospheric ozone)

শান্তমণ্ডলীয় ওজোনের স্তর সূর্যরশ্মির ভূপৃষ্ঠে আপতনকালে সূর্যরশ্মিমধ্যস্থ অতিবেগুনী রশ্মি অবশোষণের মাধ্যমে পৃথিবীর তাবৎ জীবকুলের রক্ষাকারীর ভূমিকা নিলেও ঘনমণ্ডলীয় ওজোন কিন্তু গ্রীনহাউস গ্যাসরূপে অত্যন্ত কার্যকরী এবং বায়ুদূষকও বটে। মোটর গাড়ির ইঞ্জিনে এবং বহু শিল্পে জীবাশ্মজ্বালানীসমূহের দহনের ফলে উৎপন্ন নাইট্রোজেন অক্সাইড সমূহ এবং হাইড্রোকার্বন যৌগসমূহের পারস্পরিক বিক্রিয়ায় এই গ্যাসের সৃষ্টি হয়। এই গ্যাসের পরিমাণও বায়ুমণ্ডলে অনেকস্থানেই বেড়ে চলেছে গড়ে বৎসরে প্রায় 0.5%–2% হারে।

7.4. বায়ুমণ্ডলের ওজোন গহ্বর : শান্তমণ্ডলীয় ওজোন স্তর (Stratospheric ozone layer)

ভূ-পৃষ্ঠের উপরে 10 থেকে 35 কিলোমিটার অঞ্চল পর্যন্ত বায়ুমণ্ডলের ওজোন স্তর (ozone layer) বিস্তৃত। বায়ুমণ্ডলের অক্সিজেন (O_2) সূর্যের অতিবেগুনী রশ্মির প্রভাবে (ultraviolet rays) অক্সিজেন পরমাণুতে (O) ভেঙ্গে যায় এবং অক্সিজেন পরমাণুর সঙ্গে অক্সিজেন অণুর (O_2) রাসায়নিক সংযোগে ওজোন উৎপন্ন হয়।

(i) একটি অক্সিজেন অণু (O_2) $\xrightarrow{\text{অতিবেগুনী রশ্মি}}$ দুইটি অক্সিজেন পরমাণু (O + O)

(ii) একটি অক্সিজেন অণু (O_2) + একটি অক্সিজেন পরমাণু (O) $\longrightarrow$ একটি ওজোন অণু (O_3)
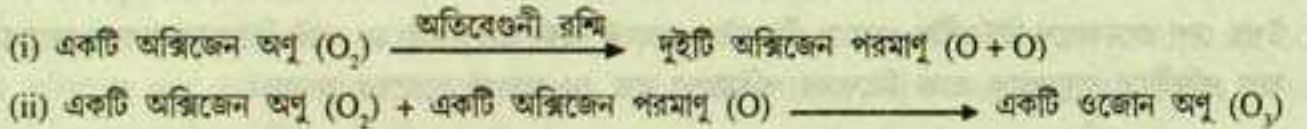
7.4.1. ওজোন স্তরের ভূমিকা

ভূপৃষ্ঠ সংলগ্ন বাতাসে ওজোনের উপস্থিতি জনস্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক হলেও পৃথিবীর জীবকুলের মঙ্গলার্থে বায়ুমণ্ডলের (শান্তমণ্ডলের) ওজোন স্তরের একটি বিশেষ ভূমিকা বর্তমান। কারণ সূর্যরশ্মির ভূপৃষ্ঠে আপতন কালে জীবকুলের পক্ষে ক্ষতিকারক অতিবেগুনী রশ্মির শতকরা প্রায় 99 ভাগই এই ওজোন স্তর দ্বারা অবশোষিত হয়। ঊর্ধ্ব বায়ুমণ্ডলের এই ওজোন স্তর তাই ছাতার মত আবরণ সৃষ্টি করে সূর্যের অতিবেগুনী রশ্মি থেকে পৃথিবীর তাবৎ জীবকুলকে রক্ষা করছে।

ওজোন স্তরে গহ্বর : কিন্তু সাম্প্রতিক কালে এই ওজোন স্তর পৃথিবীর কোনও কোনও অঞ্চলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়ছে বলে প্রকাশ। ঐসব অঞ্চলে ওজোন স্তর পাতলা হয়ে আসতে থাকায় সূর্যের অতিবেগুনী রশ্মির বেশী পরিমাণে ভূ-পৃষ্ঠে পৌছবার আশঙ্কা দেখা দিচ্ছে। 1985 সালে আন্টার্কটিকাতে (Antarctica) পর্যবেক্ষণরত একদল ব্রিটিশ বিজ্ঞানী সর্বপ্রথম সমস্যাটির প্রতি সারা বিশ্বের বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তাঁরা বলেন যে 1979 সাল থেকে প্রতি বসন্তে আন্টার্কটিকার বায়ুমণ্ডলের ওজোন স্তরে একটা বড় আকারের ফাটল বা গহ্বর দৃশ্যমান হচ্ছে। এই সংবাদে বিশ্বের বিজ্ঞানীমহল হতচকিত হয়ে যান এবং এই সময় থেকেই এ বিষয়ে বিস্তৃত পর্যবেক্ষণ শুরু হয়ে যায়। 1984 সালে (বসন্তকালে) আন্টার্কটিকার উপর বায়ুমণ্ডলের ওজোন স্তরে যে গহ্বরের সৃষ্টি হয়েছিল তার বিস্তৃতি ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আয়তন থেকেও বেশী এবং উচ্চতায় সেটি ছিল এভারেস্ট পর্বতশৃঙ্গ থেকেও বেশী।

ব্যাপক গবেষণায় ক্রমশ প্রকাশ পেতে থাকল যে কেবল আন্টার্কটিকাতেই নয় ওজোন স্তর কমবেশী ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে প্রায় সারা পৃথিবীতেই। আন্টার্কটিকার বিশেষ আবহাওয়া পরিস্থিতির দরুন সেখানের ওজোন স্তর যেহেতু সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত, পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলির ওজোন স্তরেও এই বিপদ দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে পারে বলে বিজ্ঞানীদের আশঙ্কা। এই অঞ্চলগুলির মধ্যে রয়েছে অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, আর্জেন্টিনা, চিলি, ব্রাজিল, উরুগুয়ে প্রভৃতি দেশের কম-বেশী অংশবিশেষ। দক্ষিণ মেরু অঞ্চলে এই বিপদ বেশী ঘনীভূত হলেও উত্তর মেরু অঞ্চলও এ বিপদ থেকে মুক্ত নয়। 1988 সালে গ্রীনল্যান্ডে পরিচালিত শীতকালীন একটি সমীক্ষায় বিষয়টি প্রতীয়মান হয়। 1992 এর সেপ্টেম্বরে NASA (The National Aeronatics and Space Administration)-এর NIMBUS-7 উপগ্রহ থেকে একটি চমকপ্রদ তথ্য উদ্‌ঘাটিত হয়। আন্টার্কটিকার উপর আকাশে ওজোন গহ্বরের আকার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আয়তনের তিনগুণ হয়ে প্রায় 23 মিলিয়ন (2 কোটি 30 লক্ষ) বর্গ কিলোমিটার হয়ে যায় এবং ওজোন স্তর স্বাভাবিক অবস্থার তুলনায় প্রায় 80 শতাংশে পাতলা হয়ে যায়। এইরূপ পরিস্থিতিতে মারাত্মক অতিবেগুনী-B (UV-B) রশ্মি অনেক বেশী পরিমাণে ওজোন স্তর ভেদ করে ভূ-পৃষ্ঠে আপতিত হবে। এই অতিবেগুনী-B রশ্মি প্রায় সব ধরনের জীবের উপরেই মারাত্মক ক্ষতিকারক প্রভাব ফেলে। সমুদ্রজলে এই UV-B রশ্মি জলস্তরের প্রায় 25 মিটার গভীরতা পর্যন্ত প্রবিষ্ট হতে পারে এবং ফাইটোপ্লাঙ্কটন এবং জু-প্লাঙ্কটনের বৃদ্ধি মারাত্মকভাবে ব্যাহত করে অন্যান্য জলজজীবেরও ক্ষতিসাধন করতে পারে।

অতি সম্প্রতি 2000 খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর 9—10 তারিখে ওজোন গহ্বরের বিস্তৃতির পরিমাণ ছিল 29.5 মিলিয়ন (2.95 কোটি) বর্গ কিলোমিটার। ঐ দুটি দিন এই গহ্বর দক্ষিণ চিলির পুন্টা এরেনাস (Punta Arenas) শহরের উপর বিদ্যমান ছিল এবং শহরের অধিবাসীদের উপর সূর্যের ক্ষতিকর অতিবেগুনী রশ্মি বর্ষিত হয়েছিল। বৈজ্ঞানিকেরা আশঙ্কা করছেন ভবিষ্যতে আর্জেন্টিনা, দক্ষিণ আফ্রিকার দক্ষিণ অংশ, অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যান্ডও ওজোন গহ্বরের আওতায় এসে যাবে।

7.4.2. ওজোনগহ্বরের সম্ভাব্য কিছু ফলাফল

ঊর্ধ্ব বায়ুমণ্ডলে ওজোন স্তর এভাবে পাতলা হতে থাকলে সূর্যের অতিবেগুনী রশ্মি অধিকতর মাত্রায় পৃথিবীপৃষ্ঠে পৌঁছালে তার ফলাফল জনস্বাস্থ্যের উপর, উদ্ভিদ ও প্রাণীদের উপর মারাত্মক হতে পারে। অতিবেগুনী রশ্মির সংস্পর্শে আমাদের চোখে ছানি পড়তে পারে, আমরা বিভিন্ন চর্মরোগ, অ্যালার্জি এমনকি চামড়ার ক্যান্সারেও আক্রান্ত হতে পারি। অনেক ফসলের ক্ষতি হতে পরে, ফলন কমে যেতে পারে, ফসলের গুণগত মানের অবনতি হতে পারে, কীটপতঙ্গ রোগ-ব্যাধি প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে আসতে পারে। অতিবেগুনী রশ্মি সামুদ্রিক বাস্তুতন্ত্রের ক্ষতি করতে পারে। মাছেদের সংখ্যা কমে যেতে পারে, সামুদ্রিক উদ্ভিদসমূহের (যেমন, ফাইটোপ্লাঙ্কটনের) সালোকসংশ্লেষ ক্ষমতা হ্রাসপ্রাপ্ত হতে পারে, যার পরিণামে সমগ্র সামুদ্রিক খাদ্যশৃঙ্খল বিপন্ন হতে পারে। সব চাইতে মারাত্মক বিপদ নেমে আসতে পারে আন্টার্কটিকার উদ্ভিদ ও প্রানিজগতের উপর, এখানকার ক্রিল, সিল, তিমি ও অন্যান্য স্তন্যপায়ী জীবদের মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে।

সমগ্র পৃথিবীতেই চামড়ার ক্যান্সারে আক্রান্ত ব্যক্তিদের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে, বিশেষ করে আন্টার্কটিকা সংলগ্ন দেশগুলিতে এবং যাদের মুক্ত আকাশের নীচে রোদের মধ্যে দিনের বেশীরভাগ সময় কাটাতে হয় সেইসব ব্যক্তিদের ক্ষেত্রেই এই ধরনের চামড়ার ক্যান্সার অধিকতর লক্ষিত হচ্ছে। ওজোন স্তরের ওজোনের পরিমাণ মাত্র এক শতাংশে হ্রাস পেলেই এই চামড়ার ক্যান্সারে আক্রান্ত ব্যক্তিদের সংখ্যা অন্তত 4 থেকে 5 শতাংশে বৃদ্ধি পেতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে। বিষুবরেখার কাছাকাছি অঞ্চলে বাস করেন এবং গায়ের রং হাল্‌কা (শ্বেতবর্ণ) এমন মানুষদেরই এভাবে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা বেশী। অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, আর্জেন্টিনা, চিলি এসব দেশের মানুষদের সর্বাধিক ক্ষতি হবার সম্ভাবনা, কারণ এই দেশগুলি আন্টার্কটিকার বসন্তকালে এর ওজোন ছিদ্রের আওতার মধ্যেই পড়বে। মেলানোমা (melanoma) নামক মারাত্মক ধরনের চামড়ার ক্যান্সারে অস্ট্রেলিয়া এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ক্রমশ অধিকতর সংখ্যায় মানুষ আক্রান্ত হচ্ছেন। পৃথিবীর অন্যান্য স্থানেও বছরে গড়ে 3 থেকে 7 শতাংশে হারে মেলানোমায় আক্রান্ত ব্যক্তিদের সংখ্যা বেড়ে চলেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের

পরিবেশ সংরক্ষণ বিষয়ক সংস্থার (EPA) মতে ওজোন স্তর পাতলা হয়ে আসা এবং সূর্যের অতিবেগুনী রশ্মির ভূপৃষ্ঠে বেশী করে আপতিত হবার পরিণতিতেই এমন হচ্ছে। অতিবেগুনী রশ্মির সংস্পর্শে মানব শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে আসতে পারে, ফলে বিশেষ করে সংক্রামক ব্যাধিতে আমরা সহজেই আক্রান্ত হতে পারি। ডিপথিরিয়া, টি.বি. এসব রোগ হলে ওষুধে কাজ হবে না। AIDS-এ আক্রান্ত ব্যক্তিদের অতিবেগুনী রশ্মির প্রভাবে মৃত্যু ত্বরান্বিত হতে পারে। অন্যতর ক্ষতিরও সম্ভাবনা আছে। অতিবেগুনী রশ্মির আঘাতে প্লাস্টিকের জিনিসপত্র, P.V.C. পাইপলাইন এসব ভঙ্গুর হয়ে পড়তে পারে। ভূপৃষ্ঠ সংলগ্ন বায়ুস্তরের অক্সিজেন অতিবেগুনী রশ্মির আঘাতে অংশতঃ ওজোনে পরিণত হতে পারে এবং মজার ব্যাপার হল ভূপৃষ্ঠ সংলগ্ন অঞ্চলে ওজোন কিন্তু তীব্র বায়ুদূষক এবং জনস্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক, ধোঁয়াশা সৃষ্টির মাধ্যমে ফসল ও গাছপালারও ক্ষতিসাধন করে।

7.4.3. ওজোন স্তর পাতলা হয়ে আসার কারণ

প্রথমদিকে মনে করা হয়েছিল যে ঊর্ধ্বাকাশে শব্দের চেয়ে দ্রুতগামী বিমানের (যেমন কনকর্ড) যাতায়াতই ওজোন স্তরের ওজোন ভেঙ্গে দেবার জন্য দায়ী, কিন্তু এখন বিজ্ঞানীরা এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ যে ওজোন স্তরের ওজোন ভেঙ্গে দেবার জন্য মূলত দায়ী হল ক্লোরোফ্লুওরোকার্বন নামক যৌগশ্রেণী (যেগুলিকে সংক্ষেপে CFC বলা হয়ে থাকে)। ওজোন স্তরে ছিদ্রের সূত্রপাত বিশেষ করে আন্টার্কটিকার আকাশে হওয়ার প্রেক্ষিতে বিজ্ঞানীরা এই ছিদ্র সৃষ্টির পেছনে একাধিক কারণের সমন্বয় দায়ী বলে মনে করছেন। এই কারণগুলি হল: আন্টার্কটিকার বিশেষ আবহাওয়া পরিস্থিতি, মেরুদেশীয় শান্তমণ্ডলীয় মেঘের (Polar stratospheric cloud) সঞ্চার, শান্তমণ্ডলীয় বায়ুতে নাইট্রোজেন অক্সাইড সমূহের স্বল্প গাঢ়ত্ব এবং ক্লোরোফ্লুওরোকার্বন যৌগসমূহ থেকে সঞ্জাত সক্রিয় ক্লোরিনের উচ্চ গাঢ়ত্ব।

আন্টার্কটিকাতে বসন্তের (সেপ্টেম্বর-অক্টোবর) আগমনের ঠিক আগের মাসগুলোতে (মার্চ থেকে আগষ্ট) বিশেষ আবহমণ্ডলীয় অবস্থায় বাতাসের তাপমাত্রা –90° সেলসিয়াসেরও নীচে চলে যায়, তার ফলে বাতাসের জলীয় বাষ্প ঘনীভূত হয়ে মেরুদেশীয় শান্তমণ্ডলীয় মেঘের সৃষ্টি করে। এই মেঘের মধ্যেকার বরফ কেলাসগুলির সংস্পর্শে বাতাসে ভাসমান বিভিন্ন রাসায়নিকের মধ্যে বিভিন্ন বিক্রিয়া ঘটবার সুযোগ তৈরি হয়। নাইট্রোজেনের অক্সাইডগুলি ঘনীভূত হয়ে নাইট্রিক অ্যাসিডে পরিণত হয়ে যায়, ফলে CFC যৌগসমূহ থেকে সঞ্জাত ক্লোরিনের সঙ্গে ঐ অক্সাইডগুলির বিক্রিয়ার সুযোগ না থাকাতে এই ক্লোরিনের নিষ্ক্রিয় হয়ে যাবার সুযোগ থাকে না (নাইট্রিক অ্যাসিডের সঙ্গে ক্লোরিনের বিক্রিয়া হয় না)। এই সময়কালটিতে অবশ্য আন্টার্কটিকার আকাশ থাকে সূর্যহারা, ঘন অন্ধকারে আবৃত। কিন্তু বসন্তের আগমনের সাথে সাথে আকাশে সূর্য উদ্ভাসিত হলে ঐ ক্লোরিন অত্যন্ত সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং ওজোন স্তরের ওজোন ভাঙ্গার প্রক্রিয়া শুরু করে দেয়, যে প্রক্রিয়া শৃঙ্খল বিক্রিয়া হিসেবে প্রায় 5-6 সপ্তাহ ধরে চলতে থাকে। বিক্রিয়ায় ওজোন ভেঙ্গে গিয়ে অক্সিজেনে পরিবর্তিত হয়, ক্লোরিন অনুঘটকরূপে ক্রিয়া করে প্রায় অপরিবর্তিতই থেকে যায়। হিসাবে করা হয়েছে, এভাবে একটা মাত্র ক্লোরিন পরমাণু প্রায় 100000 (এক লক্ষ) ওজোন অণুকে ভেঙ্গে দিতে পারে। ক্লোরোফ্লুওরোকার্বন যৌগশ্রেণী নিম্ন বায়ুমণ্ডলে (ঘনমণ্ডলে) অত্যন্ত সুস্থিত এবং নিতান্তই নির্বিষ রাসায়নিক; এগুলি দাহ্যও নয়। সর্বপ্রথম এই শ্রেণীর যে যৌগটির শিল্পোৎপাদন হয় সেটির বাণিজ্যিক নাম হল ফ্রেয়ন (Freon) এবং এটি CFC-12 হিসাবে পরিচিত। (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিখ্যাত ডু পঁ কোম্পানি এটি 1931 সালে প্রথম উৎপাদন করে)। বর্তমানে এটি হিমায়ক দ্রব্যরূপে হিমঘরে, রেফ্রিজারেটরে, মোটর গাড়ির হিমায়নে বহুল ব্যবহৃত হয়, অন্তরক (insulator) হিসাবে এটি টেলিফোন, প্লাস্টিকের জিনিসপত্রে ব্যবহৃত হয়। CFC-12 ছাড়াও বহুতর CFC যৌগ পরবর্তীকালে উৎপাদিত হয়েছে, যেমন CFC-11, CFC-113 ইত্যাদি। CFC-11 এবং CFC-12 স্প্রে-সহায়ক (propellant) দ্রব্য হিসাবে হেয়ার স্প্রে, বিভিন্ন প্রসাধন দ্রব্য, কীটনাশক, সুগন্ধ দ্রব্য স্প্রে করতে বহুল ব্যবহৃত হয়। CFC-113 ধূলা, ময়লা এসব ইলেকট্রনীয় সরঞ্জাম থেকে দূর করতে দ্রাবক হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

সারা পৃথিবীতে ব্যবহৃত CFC যোগগুলির প্রায় 29% মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ব্যবহৃত হয়, এর পরই ইউরোপের শিল্পোন্নত দেশগুলি, কানাডা, জাপান, অস্ট্রেলিয়া এই যৌগশ্রেণীর বহুল ব্যবহারকারী। চিন ও ভারত মিলিতভাবে সারা পৃথিবীতে ব্যবহৃত এই যৌগশ্রেণীর 2 শতাংশ ব্যবহার করে। আর তৃতীয় বিশ্বের অন্যান্য দেশগুলি মিলিতভাবে প্রায় 14 শতাংশ এই রাসায়নিকগুলি ব্যবহার করে। অর্থাৎ, CFC যৌগশ্রেণী শিল্পোন্নত দেশগুলিতে মূলতঃ উৎপাদিত এবং বহুল ব্যবহৃত হলেও তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিও এই যৌগগুলি ব্যবহারের দিক থেকে খুব একটা পিছিয়ে নেই।

CFC যৌগগুলি ভূ-পৃষ্ঠ সংলগ্ন বায়ুমণ্ডল থেকে ধীরে ধীরে উর্দ্ধে উঠতে থাকে এবং 6 থেকে 8 বছরে শান্তমণ্ডলে গিয়ে উপস্থিত হতে পারে। এখানে 100 বছরেরও বেশী সময় ধরে এই যৌগগুলি টিকে থাকতে পারে। সূর্যের অতিবেগুনী রশ্মির আঘাতে এই যৌগগুলি ধীরে ধীরে ভেঙ্গে গিয়ে ক্লোরিন পরমাণু নির্গত করে যা ওজোন ভেঙ্গে দিতে শুরু করে।

CFC-11 এবং CFC-12 যৌগ দুটির বায়ুমণ্ডলে নির্গমন বছরে গড়ে 5 শতাংশ হারে বেড়ে চলেছে।

CFC যৌগশ্রেণী প্রকৃতপক্ষে হ্যালন (halon) নামক সাধারণ যৌগশ্রেণীর অন্তর্গত। ব্রোমিন সমন্বিত এই শ্রেণীর যৌগশ্রেণী যেমন, হ্যালন-1211 এবং হ্যালন-1301 অগ্নিনির্বাপক হিসাবে বহুল ব্যবহৃত হয়, বিশেষতঃ কম্পিউটার ঘর, টেলিফোন এক্সচেঞ্জ, ব্যাঙ্কের ভল্ট এসব স্থানে। এই যৌগগুলি শান্তমণ্ডলে গিয়ে ব্রোমিন নির্গত করে, যেটির ওজোন ধ্বংসকারী ক্ষমতা ক্লোরিন থেকেও বেশী।

ক্লোরোফ্লুওরোকার্বন এবং ব্রোমোফ্লুওরোকার্বন যৌগশ্রেণী ছাড়াও জৈবদ্রাবক হিসাবে বহুল ব্যবহৃত মিথাইল ক্লোরোফর্ম এবং কার্বনটেট্রাক্লোরাইড যৌগদুটিও ওজোন স্তরের ওজোন ভাঙ্গতে সক্রিয় ভূমিকা নেয়।

7.4.4. সম্ভাব্য সমাধান পন্থা

সারা পৃথিবী জুড়েই ওজোন হ্রাসকারী বস্তু সমূহের (ozone depleting substances—ODS) ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে বা বন্ধে চিন্তাভাবনা এবং গবেষণা শুরু হয়ে গেছে। যে ধরনের প্রচেষ্টা এ বিষয়ে চলেছে সেগুলিকে প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে ভাগ করা চলে :

(ক) ঐ ধরনের বস্তুসমূহের বাতাসে নির্গমন রোধে বা নিয়ন্ত্রণে ব্যবস্থাদি গ্রহণ, ব্যবহৃত বস্তুসমূহের যথাসম্ভব পুনরুদ্ধার করে বারে বারে ব্যবহার (recycle) করা।

(খ) ক্ষতিকারক বস্তুসমূহের উপযুক্ত বিকল্প উদ্ভাবন যেগুলি বাতাসে নির্গত হলেও ওজোন স্তরে পৌঁছোবার আগেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে অথবা পৌঁছোলেও ওজোনের সঙ্গে বিক্রিয়া করবে না।

(গ) ওজোনহ্রাসকারী বস্তুসমূহের উৎপাদন ও ব্যবহার ক্রমশ কমিয়ে এনে পরে সম্পূর্ণরূপেই বন্ধ করে দেওয়া।

যেসব CFC যৌগ দ্রাবক হিসেবে ব্যবহৃত হয় সেগুলির পুনরুদ্ধার খুব কষ্টসাধ্য নয়। জার্মানী (পশ্চিম), মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং জাপানে কয়েকটি কোম্পানী ব্যবহৃত CFC যৌগের প্রায় 70 থেকে 95 শতাংশ পুনরুদ্ধারে সক্ষম হয়েছে। নমনীয় ফোম উৎপাদনে যেসব CFC যৌগ ব্যবহৃত হয় যুক্তরাজ্যে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে সেগুলির 80—90 শতাংশ পর্যন্ত পুনরুদ্ধার সম্ভব হয়েছে। রেফ্রিজারেটর, হিমঘর বা মোটরগাড়িতে হিমায়নে ব্যবহৃত CFC যৌগসমূহের বায়ুতে নির্গমন অনেকাংশে নিয়ন্ত্রণ সম্ভব ঐসবের উন্নত পরিকল্পনা, সঠিক রক্ষণাবেক্ষণ, লিকেজ বন্ধের উন্নত ব্যবস্থা অবলম্বনের মাধ্যমে। পশ্চিম জার্মানীর কয়েকটি শহরে বাড়ি বাড়ি গিয়ে অব্যবহার্য বা অকেজো রেফ্রিজারেটর সংগ্রহ করে সেগুলি থেকে CFC যৌগ পুনরুদ্ধারের ব্যবস্থা করা হয়।

তবে, পুনরুদ্ধার প্রচেষ্টা স্বল্পমেয়াদী ব্যবস্থা হিসাবেই চলতে পারে। তাছাড়া 100 শতাংশ পুনরুদ্ধার কোনও মতেই সম্ভব নয়। সামান্য পরিমাণ CFC যৌগও ওজোন স্তরের বিপুল ক্ষতিসাধনে সক্ষম। কাজেই দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা হিসাবে ওজোন ধ্বংসকারী বস্তুসমূহের বিকল্প বস্তু উদ্ভাবন ও ব্যবহারের কথা ভাবা দরকার।

বিশ্ববিখ্যাত ডু পঁ (Du Pont) কোম্পানী এবং I.C.I., CFC-12 এর বিকল্প হিসাবে ক্লোরিনমুক্ত হাইড্রোফ্লুওরো কার্বন যৌগ (HFC) উৎপাদন ও ব্যবহারের প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। অন্য কয়েকটি কোম্পানীও এই ধরনের কয়েকটি যৌগ উৎপাদন করেছে। এইসব যৌগের ওজোন ধ্বংসকারী ক্ষমতা ক্লোরোফ্লুওরোকার্বন যৌগসমূহের এই ক্ষমতার 5 শতাংশে মাত্র, তবে এগুলির উৎপাদনব্যয় CFC যৌগগুলির উৎপাদন ব্যয়ের 3—5 গুণ।

রেফ্রিজারেটরে এবং মোটরগাড়িতেও হিমায়নের কাজে CFC-এর পরিবর্তে অনেক দেশে হিলিয়াম বা অ্যামোনিয়া ব্যবহৃত হচ্ছে (যেমন, সাংহাইতে হিলিয়াম এবং জাপানে অ্যামোনিয়া)। আগুন নেভাবার কাজে ব্যবহার্য হ্যালন যৌগসমূহের বাতাসে নির্গমন কমিয়ে আনা খুব একটা কষ্টসাধ্য নয়। কারণ এই যৌগগুলি কোথাও আগুন লাগলেই কেবল ব্যবহৃত হয়। 1987 সালের 16 সেপ্টেম্বর কানাডার মন্ট্রিলে ওজোন হ্রাসকারী বস্তুসমূহের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত একটি আন্তর্জাতিক চুক্তি (যেটি মন্ট্রিল প্রোটোকল রূপে খ্যাত) স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তিতে 24টি দেশ স্বাক্ষর করে, পরবর্তীকালে আরও 25টি দেশ এই চুক্তিতে সামিল হয়। চুক্তিটিতে স্থির হয় যে 1998 সালের মধ্যে CFC উৎপাদন 1986 সালের উৎপাদনের 50 শতাংশে নামিয়ে আনতে হবে।

মন্ট্রিল প্রোটোকল রাষ্ট্রসঙ্ঘের পরিবেশ কর্মসূচীর (UNEP) ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য সাফল্য। কিন্তু বিশেষজ্ঞরা আশঙ্কা করছেন যে এই চুক্তি সম্পূর্ণরূপে রূপায়িত হলেও ওজোন স্তরের ধ্বংস ঠেকানো যাবে না, কারণ ইতিমধ্যেই যে পরিমাণ ওজোন ধ্বংসকারী বস্তুসমূহ বাতাসে পরিত্যক্ত হয়েছে সেগুলির আয়ুষ্কাল সুদীর্ঘ হওয়াতে দীর্ঘকালব্যাপী এগুলি ওজোন স্তরে ধ্বংসলীলা চালাতেই থাকবে। CFC যৌগগুলির গড় আয়ুষ্কাল মোটামুটিভাবে গড়ে 100 বছর ধরে গণনা করে একজন বিজ্ঞানী দেখিয়েছেন, মন্ট্রিলচুক্তি পুরোপুরি রূপায়িত হবার 100 বছর পরেও CFC যৌগশ্রেণীর প্রায় 37 শতাংশ ওজোন স্তরে থেকে যাবে, 200 বছর পরেও থাকবে প্রায় 13 শতাংশ এবং 300 বছর পরে প্রায় 4 শতাংশে। তাছাড়া সারা পৃথিবীতে CFC যৌগের যে মজুতভাণ্ডার ইতিমধ্যেই গড়ে উঠেছে সেগুলির বাতাসে নির্গমনের ফলেও ওজোন স্তরের ওজোন হ্রাস পেতেই থাকবে। কাজেই পরিবেশবিদেরা মন্ট্রিল প্রোটোকলের দৃষ্টিভঙ্গীর প্রশংসা করলেও গৃহীত সিদ্ধান্ত যথেষ্ট নয় বলে মন্তব্য করেছেন। 1989 সালের 2রা মে হেলসিঙ্কিতে ওজোন স্তর সংরক্ষণের ঘোষণাপত্রে 2000 সালের মধ্যে CFC যৌগসমূহের উৎপাদন ও ব্যবহার সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দেবার নীতি ঘোষিত হয়।

ওজোন স্তর সুরক্ষায় ভারতেও জাতীয় স্তরে কিছু কর্মসূচী গৃহীত হয়েছে। সাম্প্রতিক কালে অবশ্য লক্ষ্য করা যাচ্ছে অগ্নিনির্বাপক হিসাবে হ্যালন যৌগের প্রচার ও বিক্রয় এখানে ক্রমবর্ধমান, এটি শুভলক্ষণ নয়। বিশেষতঃ আমরা প্রায়ই লক্ষ্য করে থাকি যে যেসব রাসায়নিক উন্নত দেশগুলিতে নিষিদ্ধ হচ্ছে সেইসব রাসায়নিকের উৎপাদন আমাদের মত তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে অবাধে চলেছে। এজন্য যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া জরুরী।

7.5. শব্দদূষণ (Noise pollution)

শব্দ আমাদের ভাব বিনিময়ের মাধ্যম, শব্দ ছাড়া আমরা কথা বলতে পারি না। পরস্পর যোগাযোগের ভাষা যুগিয়েছে শব্দই। পাখির কলকাকলি, সেতারের সুরেলা ধ্বনি, সুন্দর সঙ্গীত, সুরেলা কণ্ঠের আবৃত্তি এসব আমাদের শ্রবণ-মনকে তৃপ্তি দেয়। একটা নিঃশব্দ ঘরে দিনের পর দিন যদি কোনও মানুষকে বন্দী করে রাখা যায় তবে সে মানুষটি তো পাগল হয়ে যেতে পারে। কাজেই শব্দ এক অমূল্য সম্পদ। কিন্তু এই শব্দ যদি বেসুরো হয় বা উচ্চ গ্রামের হয়ে বাড়াবাড়ি পর্যায়ে

চলে যায় এবং বিশেষতঃ এমনতর শব্দ যদি একটানা হতে থাকে তবে সেই শব্দ আমাদের বিরক্তি উৎপাদন করে, অস্থির করে দেয়, সেই শব্দ হয়ে ওঠে শব্দযন্ত্রনা বা কোলাহল (noise)।

কোলাহল বা noise এর বহুতর সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। শ্রোতার কাছে অনভিপ্রেত, অস্বস্তিকর, বেসুরো, বিরক্তি উৎপাদক এমনতর শব্দকে (sound) কোলাহল বা শ্রুতিকটু কলরব (noise) বলা যায়। বিশেষ কোনও শব্দ একজন শ্রোতার কাছে সুরেলা কিন্তু অপরজনের কাছে কোলাহল মনে হতে পারে, আবার একই শব্দ আস্তে হলে সুরেলা মনে হতে পারে, সেই শব্দই খুব জোরে হলে কোলাহল হয়ে যেতে পারে, বিরক্তির কারণ হতে পারে। শব্দদূষণ বা কোলাহলদূষণের (noise pollution) একাধিক সংজ্ঞা প্রদত্ত হয়েছে। একটি সংজ্ঞা এইভাবে দেওয়া যায় : কোনও অনাকাঙ্খিত শব্দ যদি আমাদের অস্বস্তিকারক হয়, বিরক্তি সৃষ্টি করে, আমাদের পারস্পরিক যোগাযোগে বিঘ্ন ঘটায়, শারীরিক বা মানসিকভাবে স্বাস্থ্যহানিকর হয় তবে শব্দদূষণ বা কোলাহল দূষণ হয়েছে বলা যায়। কোলাহলদূষণ শব্দশক্তির অপচয় হিসেবে গণ্য হতে পারে। সাধারণতঃ শব্দের প্রাবল্যমাত্রা এবং স্থিতিকাল বা পুনঃপুনঃ সংঘটনের উপর শব্দদূষণের মাত্রা নির্ভর করে। একটানা হাতুড়ি মারার শব্দ, মোটর গাড়ির এয়ার হর্ণ একটানা জোরে বাজানোর আওয়াজ, জলের পাম্প একটানা চলার শব্দ বা জেনারেটর চালানোর একটানা শব্দ এসব কিছুই শব্দদূষণের ও যন্ত্রনাসৃষ্টির উদাহরণ।

7.5.1. শব্দদূষণের বিভিন্ন উৎস

মানুষের বিভিন্ন কার্যকলাপের ফলে সৃষ্ট যে শব্দ বা কোলাহলদূষণ তার বিভিন্ন উৎসসমূহকে প্রধানতঃ তিনটি শ্রেণীতে বিন্যস্ত করা যায়, যথা : (1) যানবাহন ও পরিবহন (2) বিভিন্ন শিল্প এবং (3) গৃহাভ্যন্তরে ও পারিপার্শ্বিকে ব্যবহৃত বিভিন্ন যন্ত্র ও সরঞ্জাম এবং সংঘটিত কিছু কার্যাবলী।

7.5.1.1. পরিবহন জনিত শব্দদূষণ

পরিবহন আবার মূলতঃ তিন ধরনের হতে পারে : (ক) ভূতল পরিবহন (খ) বিমান পরিবহন এবং (গ) রেল পরিবহন।

(i) ভূতল পরিবহন : ভূতল পরিবহনজাত শব্দদূষণের সমস্যাই বর্তমান সভ্যতায় কলরব দূষণের সবচাইতে বড় সমস্যা এবং এই সমস্যা বিশেষ করে শহরাঞ্চলে প্রকট থেকে প্রকটতর হয়ে উঠছে যানবাহনের সংখ্যা নিরন্তর বৃদ্ধি পাবার প্রেক্ষিতে। কলরবের মাত্রা এবং প্রাবল্য, মোটরযানের গতিবেগ, ওজন এসবের উপর যেমন নির্ভর করে, তেমনি রাস্তার অবস্থা, যান চলাচলের ঘনত্ব (অর্থাৎ নির্দিষ্ট স্থান দিয়ে প্রতি ঘণ্টায় চলাচলকারী যানের সংখ্যা), ইঞ্জিনের রক্ষণাবেক্ষণ অবস্থা, ব্যবহৃত জ্বালানির প্রকৃতি এসব অনেক কিছুর উপরই নির্ভর করে। সাধারণতঃ ভারী এবং ডিজেলচালিত মোটরযানগুলি সবচাইতে প্রবলমাত্রার কলরব সৃষ্টিকারক। শহরাঞ্চলে সাধারণতঃ দিনের বিশেষ কিছু সময়ে যানচলাচলের চাপ সর্বোচ্চমাত্রায় থাকার ফলে ঐ সময়গুলিতে কোলাহলের প্রাবল্যও সর্বোচ্চ পর্যায়ে থাকে। আমাদের কলকাতা মহানগরীতে অফিস যাওয়া আসার সময়কালে অফিস এলাকার রাস্তাগুলিতে এবং অফিস যাতায়াতের প্রধান রাস্তাগুলিতে কোলাহলের প্রাবল্যমাত্রা সর্বোচ্চ পর্যায়ে থাকে। মহানগরীতে বর্তমানে নথিভুক্ত মোটরযানের সংখ্যা প্রায় 9 লক্ষ, আর যেহেতু এখানে রাস্তা-এলাকা মোট এলাকার মাত্র 6 শতাংশের মত, তাই এই স্বল্পায়তন রাস্তায় বিপুল সংখ্যক মোটর যানের চলাচল উচ্চমাত্রায় কোলাহল এবং শব্দদূষণ সৃষ্টি করে। ভূতল পরিবহনজাত কলরব বড় বড় শহরগুলিতে প্রায় সারাদিনব্যাপী নিরবচ্ছিন্নভাবে সংঘটিত হয়ে থাকে, কখনও কম কখনও বেশী প্রাবল্যমাত্রায়।

(ii) বিমান পরিবহন : বিমান পরিবহনজাত শব্দের ভূতল পরিবহনজাত শব্দ মত সারাদিনব্যাপী নিরবচ্ছিন্নভাবে সংঘটিত না হলেও প্রাবল্যমাত্রার দিক থেকে এই ধরনের শব্দ উচ্চতর গ্রামের। এই ধরনের শব্দের প্রাবল্য সর্বোচ্চ হয়

বিমান বন্দরের রানওয়ে থেকে বিমানের উড়বার সময়ে এবং বন্দরে অবতরণের মুহূর্তে। জেট বিমানের ক্ষেত্রে শব্দ প্রাবল্য অন্যতর বিমান থেকে বেশী হয়। আর শব্দাপেক্ষা দ্রুতগামী বিমান, যেমন কনকর্ডের ক্ষেত্রে শব্দ প্রাবল্য এত মারাত্মক উচ্চতায় যেতে পারে যার ফলে বিমানবন্দরের ধারে কাছ বাড়ি-ঘরেরও ক্ষতিসাধন হতে পারে। বিমান পরিবহনজাত শব্দদূষণের শিকার হতে হয় সাধারণতঃ বিমানবন্দর সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দাদের।

(iii) রেল পরিবহন ঃ রেল পরিবহন ব্যবস্থা যেহেতু সাধারণতঃ লোকালয়ের থেকে কিছুটা দূরত্ব বজায় রেখে নেওয়া হয় তাই রেল পরিবহন থেকে সৃষ্ট শব্দদূষণ তেমন মারাত্মক নয়, তবে জনসংখ্যার বিপুল চাপের ফলে রেললাইন এবং রেল স্টেশনের কাছেই এখন জনবসতি গড়ে উঠেছে ও উঠছে এবং এসবস্থানে জনঘনত্বও নগণ্য নয়, সুতরাং রেল পরিবহনজাত কলরবদূষণ থেকে এই ধরনের জনবসতির মানুষেরা পুরোপুরি রেহাই পান না, রেললাইনের ধারে অবস্থিত বাড়িঘরেরও কিছুটা ক্ষতি এই ধরনের কোলাহল দূষণ থেকে হতে পারে।

7.5.1.2. শিল্পজাত শব্দদূষণ

বিভিন্ন শিল্পে ব্যবহৃত মেশিন চলবার শব্দ এবং এসব শিল্পে সংঘটিত নানাবিধ প্রক্রিয়া দূষণের সমস্যা সৃষ্টি করে। এই ধরনের দূষণের শিকার কর্মরত শ্রমিকেরা এবং শিল্পসংলগ্ন এলাকার মানুষেরা। যান্ত্রিক করাত চালাবার শব্দ, ড্রিলিং মেশিন একটানা চলবার শব্দ, লোকালয়ের মধ্যে চালকল গমকল এসবের একটানা আওয়াজ আমাদের অস্থির করে দেয়, কানকে যেন বধির করে দিতে চায়।

7.5.1.3. গৃহাভ্যন্তরীণ ও পারিপার্শ্বিক শব্দদূষণ

বাড়ি ঘরে ব্যবহৃত বিভিন্ন মেশিন ও বিবিধ সরঞ্জাম থেকে উদ্ভূত অনেক ধরনের আওয়াজ কলরব ও কলরবদূষণের সৃষ্টি করতে পারে। জেনারেটর, জলের পাম্প, ওয়াশিং মেশিন এসবের একটানা আওয়াজ, টি. ভি., রেডিও, টেপ রেকর্ডার, ভি. সি. আর. এসব জোরে চালাবার শব্দ, ভ্যাকুয়াম ক্লিনার, ত্রুটিপূর্ণ বৈদ্যুতিক পাখা, এসব চলবার শব্দ শব্দদূষণ সৃষ্টি-কারক। পারিপার্শ্বিকে অবস্থিত মন্দির, মসজিদ, জনজমায়েত বা অনুষ্ঠান স্থলে ব্যবহৃত মাইকের উঁচু আওয়াজ, পরিপার্শ্বে অবস্থিত বাজারের বিচিত্র বাজারী আওয়াজ, মারদাঙ্গা গোলমালের শব্দ এসবও কলরবদূষণ সৃষ্টিকারক।

7.5.2. শব্দের প্রাবল্যমাত্রা

শব্দের প্রাবল্যমাত্রা প্রকাশ করা হয় **বেল বা ডেসিবেল** এককে (1 বেল = 10 ডেসিবেল)। দূরভাষের আবিষ্কর্তা আলেকজান্ডার গ্রাহাম বেলের নামানুসারে এই এককের নামকরণ। ডেসিবেলের সংজ্ঞা গাণিতিকভাবে প্রকাশ করা যায় নীচের সমীকরণটির মাধ্যমে—

$$\text{ডেসিবেল (dB)} = 10 \log_{10} \frac{\text{নির্ণীত শব্দপ্রাবল্য (I)}}{\text{প্রামাণ্যের শব্দপ্রাবল্য } (I_0)}$$

কোনও বিশেষ শব্দের প্রাবল্য যদি প্রামাণ্য শব্দের প্রাবল্যের 10 গুণ হয় (অর্থাৎ, $\frac{I}{I_0} = 10$) তবে ঐ বিশেষ শব্দের প্রাবল্যমাত্রা 10 ডেসিবেল হবে (কারণ, $\log_{10}10 = 1$ সুতরাং $10 \times \log_{10} 10 = 10 \times 1 = 10$)। আবার বিশেষ কোনও শব্দের প্রাবল্য প্রামাণ্য শব্দ প্রাবল্যের 100 গুণ হলে ঐ বিশেষ শব্দের শব্দপ্রাবল্যমাত্রা হবে 20 ডেসিবেল (কারণ $\log_{10} 100 = 2$ সুতরাং $10 \times \log_{10} 100 = 10 \times 2 = 20$)। অর্থাৎ 20 ডেসিবেল শব্দের প্রাবল্যমাত্রা 10 ডেসিবেল শব্দের প্রাবল্যমাত্রার দ্বিগুণ নয়, 10 গুণ। একইভাবে 30 ডেসিবেলের শব্দ প্রাবল্যমাত্রা 20 ডেসিবেলের 10 গুণ, 40 ডেসিবেলের প্রাবল্যমাত্রা 30 ডেসিবেলের 10 গুণ—এভাবে পর্যায়ক্রমে বাড়বে।

এখানে একটি সারণী প্রকাশ করা হল। যেখানে বিভিন্ন শব্দের তীব্রতা ডেসিবেল এককে প্রকাশ করা হয়েছে এবং ঐ তীব্রতা মানুষের শ্রুতিগোচর শব্দের নিম্নতম মাত্রা শূন্য ডেসিবেল থেকে কত বেশী তীব্র তাও দেখানো হয়েছে। ভ্যাকুয়াম ক্লিনারের শব্দের তীব্রতা 70 ডেসিবেল। বাস্তবে এটি এক কোটিগুণ বেশী তীব্র মানুষের শ্রুতিগোচর শব্দের নিম্নতম মাত্রা থেকে। মানুষের শ্রবণযন্ত্রের শব্দের তীব্রতা গ্রহণ করবার সীমা যদিও খুবই বিস্তৃত (সারণী 7.2 দ্রষ্টব্য) তবু 70 ডেসিবেল থেকে বেশী তীব্র শব্দ মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর নানারকম শারীরিক ও মানসিক ক্ষতির কারণ হয়,—বিশেষ করে অনির্দিষ্টকাল ধরে যদি তা চলতে থাকে।

সারণী 7.2. শব্দ তীব্রতা, শব্দের উৎস এবং উচ্চমাত্রার শব্দের ক্ষতিকর প্রভাব

শব্দের তীব্রতার মাত্রা 10-এর ঘাত হিসাবে	সাধারণ	ডেসিবেল মাত্রা	শব্দের উৎস ও তার ক্ষতিকর প্রভাব
10^0	1	0*	মানুষের শ্রুতিগোচর শব্দের নিম্নতম মাত্রা।
10^1	10	10	গাছের পাতা নড়ার শব্দ।
10^2	100	20	বেতার স্টুডিওর অভ্যন্তরের শব্দ।
10^3	1,000	30	পাঠাগারের অভ্যন্তরের শব্দ।
10^4	10,000	40	গৃহের অভ্যন্তরের শব্দ।
10^5	100,000	50	30 মিটার দূর থেকে শ্রুত অতি হালকা যানবাহনের শব্দ।
10^6	1000,000	60	সাধারণ কথাবার্তার শব্দ।
10^7	10,000,000	70	ভ্যাকুয়াম ক্লিনারের শব্দ, শব্দের এই মাত্রাটি ক্ষতিকর।
10^8	100,000,000	80	মোটর হর্ণ, লাউড স্পিকার, এই মাত্রা খুবই ক্ষতিকর।
10^9	1000,000,000	90	জেনারেটার, মোটর সাইকেল, রক মিউজিক, এই মাত্রা স্থায়ী ক্ষতিকর।
10^{10}	10,000,000,000	100	300 মিটার দূর থেকে জেট প্লেনের শব্দ, সিমেন্ট ভাঙা ড্রিলের শব্দ, এই মাত্রা স্থায়ী ক্ষতিকর।
10^{11}	একের পর 11টি শূন্য	110	বজ্রের শব্দ, ভারী কংক্রিট ভাঙা যন্ত্রের শব্দ, অতি বিপদজনক মাত্রা এবং স্থায়ী ক্ষতি ঘটায়।
10^{12}	একের পর 12টি শূন্য	120	খুব শক্তিশালী বাজির শব্দ, অত্যন্ত ক্ষতিকারক।
10^{15}	একের পর 15টি শূন্য	150	জেট প্লেনের মাটি থেকে উঠবার সময় শব্দমাত্রা। বিমানবন্দর লোকালয় থেকে বহুদূরে হওয়া বাঞ্ছনীয়।
10^{17}	একের পর 17টি শূন্য	170	মহাশূন্যে উত্তরণের সময় মহাকাশ যানের রকেট উৎক্ষেপণের শব্দমাত্রা। লোকালয় থেকে বহুদূরে উপযুক্ত সতর্কতা অবলম্বন করেই উৎক্ষেপণ করা হয়।

পাদটীকা

* গাণিতিক হিসাবে শূন্য, কারণ ডেসিবেল এর মানের সূত্র, $n = 10 \log \frac{I}{I_0}$, এক্ষেত্রে I এবং I_o উভয়েই 1। সুতরাং $\frac{I}{I_0} = 1$, $10 \log 1 = 10 \times 0 = 0$, সাধারণ শব্দ তীব্রতা যদি 2 হয় তাহলে ডেসিবেলের পরিমাণ হবে $10 \log 2/1 = 10 \log 2 = 10 \times 0.301 = 3.01$, একই ভাবে সাধারণ শব্দ তীব্রতা 3,4,5,6,7,8,9 এবং 10 হলে ডেসিবেলের মাপে যথাক্রমে 4.77, 6.02, 6.989, 7.781, 8.541, 9.542 এবং 10 হবে।

আমাদের কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ-নির্ধারিত নিরাপদ শব্দমাত্রা শহরাঞ্চলে চার ধরনের এলাকা সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে কলকাতা মহানগরীর বাস্তব অবস্থা নীচের সারণী থেকে স্পষ্ট হতে পারে।

সারণী 7.3. কোনও নগরীতে নির্ধারিত নিরাপদ শব্দ প্রাবল্যমাত্রা এবং কলকাতায় প্রকৃত শব্দ প্রাবল্যমাত্রা

বিশেষ এলাকা	নির্ধারিত নিরাপদ শব্দ প্রাবল্যমাত্রা (ডেসিবেল)		কলকাতায় প্রকৃত শব্দ প্রাবল্যমাত্রা (ডেসিবেল)	
	দিনে	রাত্রে	দিনে	রাত্রে
বসবাস-এলাকা	55	45	79	65
নিঃশব্দ অঞ্চল (হাসপাতাল, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এসবের 100 মিটার দূরত্ব পর্যন্ত)	50	40	79	65
বাণিজ্য এলাকা	65	55	82	75
শিল্পাঞ্চল	75	65	78	67

এই সারণী থেকে দেখা যাচ্ছে যে একমাত্র শিল্প এলাকা ছাড়া অন্য সব ধরনের এলাকাতেই শব্দ প্রাবল্যমাত্রা নির্ধারিত নিরাপদ মাত্রা অপেক্ষা অনেক বেশী। বসবাসের এলাকায় এবং শান্ত অঞ্চলে শব্দ প্রাবল্যমাত্রা একই রকম আর ব্যবসা বাণিজ্যের এলাকায় শব্দের প্রাবল্যমাত্রা শিল্পাঞ্চলের তুলনায় বেশী। শান্ত এলাকায় মোটরগাড়ির হর্ণ বাজানো আইনত নিষিদ্ধ হলেও এই আইনের পরোয়া করা হয় না, কাজেই শান্ত অঞ্চল আর বসবাস অঞ্চলে শব্দমাত্রার ফারাক নেই।

সারণী 7.4. কলকাতার কয়েকটি স্থানে পারিপার্শ্বিক উৎসসম্ভূত শব্দপ্রাবল্যমাত্রা (ডেসিবেলে)

ক্রমিক সংখ্যা	স্থান	এলাকার প্রকৃতি	সকালে	অপরাহ্নে	রাতে
1.	নিউ আলিপুর (P-ব্লক)	বসবাস এলাকা	70.5	64.0	63.8
2.	যাদবপুর স্টেশন রোড (8B বাস স্ট্যান্ডের কাছে)	বাণিজ্যিক	78.6	78.9	69.8

ক্রমিক সংখ্যা	স্থান	এলাকার প্রকৃতি	সকালে	অপরাহ্নে	রাতে
3.	যোধপুর পার্ক	বসবাস	69.1	63.6	66.4
4.	বালিগঞ্জ (একডালিয়া পার্ক)	বসবাস	71.6	67.4	66.7
5.	গড়িয়াহাট মার্কেট	বাণিজ্যিক	77.9	81.6	75.6
6.	রাসবিহারী মোড় (লেক মার্কেটের কাছে)	বাণিজ্যিক	76.1	78.7	81.5
7.	ভবানীপুর (পোস্ট অফিসের কাছে)	বসবাস	70.3	67.6	69.2
8.	ভিক্টোরিয়া স্মৃতিসৌধ	বিনোদন	68.1	66.5	69.7
9.	পার্কস্ট্রীট (কেনাকাটার এলাকা)	বাণিজ্যিক	79.2	81.1	77.8
10.	পার্ক সার্কাস ময়দান	বাণিজ্যিক	81.0	77.0	76.9
11.	নীলরতন সরকার হাসপাতাল (জরুরী বিভাগের ব্লক)	নিঃশব্দ এলাকা	64.8	68.3	66.3
12.	শিয়ালদহ স্টেশন	বাণিজ্যিক	69.7	76.5	71.0
13.	এস. এন. ব্যানার্জি রোড (তালতলা এলাকা)	বাণিজ্যিক	77.3	77.6	71.6
14.	এসপ্ল্যানেড (বাস্ টার্মিনাস)	বাণিজ্যিক	78.4	77.3	74.2
15.	কলকাতা হাইকোর্ট (মূল গেটের কাছে)	নিঃশব্দ এলাকা	67.0	70.3	64.6
16.	বি. বা. দী. বাগ (কেনাকাটার এলাকা)	বাণিজ্যিক	85.6	73.3	74.5
17.	বড়বাজার (কেনাকাটার এলাকা)	বাণিজ্যিক	75.4	76.8	76.5
18.	কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (কলেজ স্ট্রীট ক্যাম্পাস)	নিঃশব্দ	64.9	65.2	52.2
19.	গিরিশ পার্ক (কেনাকাটার এলাকা)	বাণিজ্যিক	78.7	76.9	78.4
20.	শ্যামবাজার	বাণিজ্যিক	80.3	78.1	76.5
21.	ডানলপ ব্রিজ	শিল্প-এলাকা	82.8	81.1	73.3
22.	উল্টোডাঙ্গা মুরারী পুকুর	শিল্প-এলাকা	84.6	72.8	77.0
23.	সল্ট লেক (AC ব্লক)	বসবাস	72.2	70.6	60.1
24.	রাজাবাজার (বস্তির মধ্যে)	বসবাস	71.2	77.9	63.0

30 মিনিটব্যাপী নিরবচ্ছিন্ন শব্দ প্রাবল্যমাত্রার গড় মান (Equivalent continuous noise level for 30 minutes in A weighting)

সকালে = 8টা থেকে 11টা

অপরাহ্নে = 2টা থেকে 3টা

রাতে = 9টা থেকে 12টা

(উৎস : পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ—শব্দ প্রাবল্যের পরিমাপ 1995 সালে কৃত)

7.5.3. জনস্বাস্থ্যের উপর শব্দদূষণের ক্ষতিকর ফলাফল

শব্দদূষণ আমাদের শারীরিক এবং মানসিক উভয় প্রকার ক্ষতিই করতে পারে। সাধারণতঃ শব্দপ্রাবল্যমাত্রা এবং শব্দের স্থিতিকালের উপর ক্ষতির মাত্রা নির্ভর করে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) নির্দেশিত শব্দের নিরাপদ প্রাবল্যমাত্রা হল 45 ডেসিবেল। এমনকি এই 45 ডেসিবেল আওয়াজের শব্দও যদি একটানা আমাদের কানের কাছে হয়ে যেতে থাকে তা হলেও আমাদের নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটে, বিরক্তি উৎপাদন করতে পারে। 80 ডেসিবেল আওয়াজের শব্দ আমাদের ক্রুদ্ধ করে তুলতে পারে, 85 ডেসিবেল আওয়াজের শব্দ আমাদের কানের ক্ষতি করতে শুরু করে, 88 ডেসিবেলের শব্দ একটানা হতে থাকলে আমাদের শ্রবণক্ষমতা কমে আসতে থাকে, 110 ডেসিবেল শব্দের আওয়াজ আমাদের পক্ষে অস্বস্তিকারক, 135 ডেসিবেলের আওয়াজ যন্ত্রণাদায়ক আর 150-160 ডেসিবেল আওয়াজের কোলাহল আমাদের শ্রবণমুহূর্তেই চিরতরে বধির করে দিতে পারে। বিভিন্ন প্রাবল্যমাত্রার শব্দ এবং স্থায়ী স্বাস্থ্যহানি এড়াতে সেই সব শব্দের মধ্যে থাকবার অনুমোদনযোগ্য সর্বোচ্চ সময়কাল (প্রতিদিন) নীচের সারণীতে প্রদত্ত হল :

সারণী 7.5 উচ্চ প্রাবল্যমাত্রার শব্দের অনুমোদনযোগ্য সর্বোচ্চ সময়কাল

শব্দের প্রাবল্যমাত্রা (ডেসিবেল এককে)	অনুমোদনযোগ্য সর্বোচ্চ সময়কাল (দৈনিক)
90	8 ঘণ্টা
95	4 ঘণ্টা
100	2 ঘণ্টা
105	1 ঘণ্টা
110	1/2 ঘণ্টা (30 মিনিট)
115	1/4 ঘণ্টা (15 মিনিট)

শব্দ যেহেতু আমরা কান দিয়ে শুনি তাই প্রবল শব্দ বা কোলাহল প্রত্যক্ষভাবেই কানের এবং শ্রবণক্ষমতার ক্ষতি করে। অতি উচ্চ আওয়াজের শব্দের (130 dB বা তার থেকে উচ্চতর মাত্রার) মধ্যে দীর্ঘক্ষণ থাকলে অনেকেই কানে ঝাঁ ঝাঁ শব্দের গুনগুনানি অনুভব করতে পারেন, এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে এই গুনগুনানি স্থায়ী রূপে পরিণত হতে পারে (এই রোগকে বলে tinnitis)। এই রোগের কোনও চিকিৎসা নেই, অনেকক্ষেত্রে এই যন্ত্রণা অসহ্য হতে পারে। কোলাহল দূষণ সম্পর্কিত বহুতর গবেষণার কয়েকটি পর্যবেক্ষণ উল্লেখ্য, যেমন, গ্রামের নিরালা পরিবেশে জীবনযাত্রা নির্বাহ করেন এমন মানুষদের কোলাহলমুখর নগরীর মানুষদের তুলনায় শ্রবণক্ষমতা সাধারণভাবে অনেক বেশী। কোলাহল মুখরিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং তুলনামূলকভাবে অনেক নিরালা পরিবেশের সুদানের অধিবাসীদের মধ্যে একটি তুলনামূলক সমীক্ষা চালিয়ে দেখা গেছে যে যেক্ষেত্রে একজন মার্কিন নাগরিক 65 বছরে প্রায় 40 শতাংশ শ্রবণ ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেন একজন সুদানীর

সেখানে 70 বছর বয়সেও শ্রবণক্ষমতা প্রায় অটুটই থাকে। আমাদের এখানে দমদম বিমানবন্দর সংলগ্ন অঞ্চলে সমীক্ষা চালিয়ে দেখা গেছে যে, বিমান বন্দরের ধারেকাছে বসবাসকারী মানুষজনদের শ্রবণক্ষমতা অপেক্ষাকৃত কম। এদের শতকরা প্রায় 16 জন কানে কম শোনেন। পাশ্চাত্যে শ্রুতিবিজ্ঞানীদের একটি পরীক্ষায় দেখা গেছে যে একটানা 88 ঘণ্টা রেকর্ড করা রক-মিউজিক শোনাবার ফলে গিনিপিগের সমস্ত কর্ণকোষগুলি ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। একটি কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদের উপর সমীক্ষা চালিয়ে দেখা গেছে যে তুলনামূলকভাবে উচ্চতর আওয়াজের মধ্যে কর্মরত শ্রমিকদের অপেক্ষাকৃত কম আওয়াজের স্থানে কর্মরত শ্রমিকদের তুলনায় শ্রবণক্ষমতা সাধারণত কম।

শব্দদূষণের ফলে শ্রবণক্ষমতা হ্রাস বা লুপ্ত হওয়া ছাড়াও বহুতর শারীরিক ও মানসিক ক্ষতি হতে পারে।

শব্দদূষণ আমাদের বিরক্তি বা ক্রোধের উদ্রেক করতে পারে, আমরা বিষণ্ণ বোধ করতে পারি, আমাদের মনের একাগ্রতা বিনষ্ট হতে পারে, বিশেষ করে স্কুলের ছেলেমেয়েরা পড়াশুনায় অন্যমনস্ক হয়ে যেতে পারে। উচ্চগ্রামের শব্দের মধ্যে কাজ করতে হয় এমন ব্যক্তিরা (যেমন লরির ড্রাইভার, শিল্পশ্রমিক প্রভৃতি) সাধারণত একটু উগ্রস্বভাবের হয়ে থাকেন। শব্দদূষণের শিকার হবার ফলেই সম্ভবত এরা এমন উগ্রমেজাজী হয়ে থাকেন।

শব্দদূষণের ফলে মানুষের মানসিক চাপ বাড়তে পারে, তাঁরা স্নায়বিকরোগে, মাইগ্রেণ বা আধকপালীতে, মাথাধরায় আক্রান্ত হতে পারেন। তাদের কর্মদক্ষতা হ্রাস পেতে পারে, রক্তচাপ, রক্তে চিনির মাত্রা এসব বৃদ্ধি পেতে পারে। উচ্চ গ্রামের একটানা শব্দ হৃদরোগীদের পক্ষে মারাত্মক হতে পারে। শব্দদূষণের ফলে মানসিক উদ্বেগ, পেপটিক আলসার, শ্বাসকষ্ট এসবও হতে পারে। প্রসূতি নারী দীর্ঘকালব্যাপী শব্দযন্ত্রণার মধ্যে থাকলে বিকলাঙ্গ বা কম ওজনের সন্তান প্রসব করতে পারেন। এ ধরনের শিশু জড়বুদ্ধিসম্পন্ন হবারও সম্ভাবনা থাকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গবেষণার ফলে জানা গেছে যে সেখানে সামগ্রিকভাবে মোট জনসংখ্যার প্রায় 2 শতাংশ মানসিক রোগে আক্রান্ত, কিন্তু জনবসতির ঘনত্ব উচ্চ এবং কোলাহলমুখর এমন অঞ্চলে বসবাসকারী জনসংখ্যার প্রায় 10 শতাংশ মানসিক ব্যাধির শিকার।

7.5.4. শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে করণীয়

প্রথমেই উল্লেখ করা দরকার যে শব্দদূষণ আধুনিক সভ্যতার অনুষঙ্গ, এই দূষণ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করা সম্ভব নয়, তবে উপযুক্ত কিছু বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থাদি গ্রহণের মাধ্যমে কোলাহলের প্রাবল্যমাত্রা এবং দূষণমাত্রা কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব।

কোলাহলদূষণ নিয়ন্ত্রণে প্রধানত তিন ধরনের পদ্ধতি অনুসরণ করা যেতে পারে :

(i) শব্দ-উৎসেই কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ যার ফলে শব্দের প্রাবল্যমাত্রা কমিয়ে আনা যায়।

(ii) শব্দ-উৎস থেকে শ্রোতার কাছে পৌঁছাবার মাঝপথেই শব্দ-শোষক কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ এবং

(iii) শ্রোতার জন্যে কিছু সুরক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ যার ফলে শব্দ-প্রাবল্য হ্রাস পেয়েই কেবল শ্রোতার কানের অভ্যন্তরভাগে প্রবিষ্ট হতে পারে।

এসব ব্যবস্থা ছাড়াও সামগ্রিকভাবে বিশেষ নগরপরিকল্পনার মাধ্যমে, উপযুক্ত আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগের মাধ্যমে, প্রশাসনিক কিছু ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে দূষণ সম্পর্কে ব্যাপক সচেতনতা গড়ে তুলবার মাধ্যমেও শব্দদূষণমাত্রা কিছুটা নিয়ন্ত্রিত হতে পারে।

(i) জেনারেটর জলের পাম্প এসবকে সুনির্বাচিত স্থানে শব্দ-শোষক পদার্থ নির্মিত ভারী প্যাডের উপর স্থাপন করে, যথাযথ আবেষ্টনী তৈরী করে শব্দের প্রাবল্যমাত্রা বেশ কিছুটা কমিয়ে আনা যায়। এসবের যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমেও আওয়াজ কিছুটা কমানো যায়। মোটরযানে কম্পন হ্রাসকারী ব্যবস্থা বা ইঞ্জিনে ধাক্কা নিবারণী (anti knocking) যথাযথ

ব্যবস্থা নিয়েও শব্দ-প্রাবল্যমাত্রা কিছুটা কমানো সম্ভব। মাইক্রোফোন উচ্চগ্রামে না বাজানো, ক্যাসেটের দোকানে জোর আওয়াজে ক্যাসেট রেকর্ডার চালানো বন্ধ করা, মোটরযানে কর্কশ আওয়াজের এয়ার হর্ণ ব্যবহার পুরোপুরি বন্ধ করা, কলে কারখানায় যন্ত্রপাতির সঠিক রক্ষণাবেক্ষণ এবং উপযুক্ত প্রযুক্তির সাহায্যে শব্দ-প্রাবল্য কমিয়ে আনবার ব্যবস্থা করা ইত্যাদি ব্যবস্থার মাধ্যমেও শব্দদূষণ কিছুটা নিয়ন্ত্রিত হতে পারে। যানবাহনের বা শিল্পের বিভিন্ন যন্ত্র থেকে শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে উপযুক্ত প্রযুক্তি উদ্ভাবন করতে হবে, প্রয়োজনে বিদেশে লভ্য প্রযুক্তি আমদানি করতে হবে। যেমন, মোটরযানে শব্দহ্রাসের জন্য যুক্তরাজ্যে আচ্ছাদিত এয়ার কমপ্রেসার (বায়ুসংনমক) গাড়ির ইঞ্জিনে ব্যবহার করা হয় (এর ফলে দেখা গেছে যে 86 ডেসিবেলের শব্দকে প্রায় 69 ডেসিবেল প্রাবল্যমাত্রায় নামিয়ে আনা সম্ভব হয়)। আমাদের দেশেও মোটরগাড়িতে এই ধরনের এয়ার কমপ্রেসার ব্যবহার করে মোটরযানজনিত কোলাহল দূষণমাত্রা অনেকখানি কমানো যেতে পারে। পাতালরেলে, চক্ররেলে বা ট্রামেও উপযুক্ত প্রযুক্তির প্রয়োগে শব্দদূষণমাত্রা নিয়ন্ত্রণে সচেষ্ট হতে হবে। একটানা নিরবচ্ছিন্ন প্রবল শব্দই সাধারণতঃ শব্দদূষণ ঘটায়, তাই অনেকক্ষেত্রে একটানা শব্দকে ভেঙ্গে দিতে পারলেও শব্দদূষণমাত্রা কিছুটা কমানো যায়। যেমন, স্কুল-কলেজে আগে যেমন ঘন্টা বাজানো হত একটানা শব্দের আওয়াজের বদলে তেমনটা আবার চালু করা যেতে পারে। লোকালয়ের মধ্য দিয়ে যাতায়াতকারী ট্রেনেও একটানা শব্দের বাঁশি বাজাবার বদলে ঘণ্টাধ্বনির ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

(ii) শব্দ-উৎস থেকে উৎসারিত প্রবল আওয়াজের শব্দ শ্রোতার কানে পৌঁছাবার আগেই মাঝপথে সেই শব্দের প্রাবল্যমাত্রা বিভিন্ন পন্থায় কিছুটা কমানো যায়। যেমন শব্দ কোনও শিল্প-উদ্ভূত হলে ঐ শিল্পের চারিদিকে ঘনসংবদ্ধ নির্বাচিত গাছপালা লতা এসব লাগিয়ে শব্দ-প্রাবল্য কমানো যেতে পারে। শব্দের গতিপথে পরিকল্পনামাফিক শব্দশোষক পদার্থ নির্মিত বোর্ড, প্রাচীর এসব স্থাপন করেও শব্দ প্রাবল্য কিছুটা কমানো সম্ভব। শহরে বিজ্ঞাপনের জন্য যে হোর্ডিং ব্যবহৃত হয় সেগুলি শব্দ-শোষক পদার্থ নির্মিত হলে রাস্তায় চলাচলরত যানবাহনজাত শব্দের প্রাবল্য কিছুটা কমতে পারে। প্রেক্ষাগৃহের দেওয়ালে বিশেষ ধরনের সিমেন্ট (sorel cement) ব্যবহার করে শব্দের প্রতিফলন হ্রাসের মাধ্যমে শব্দ প্রাবল্য কমানো হয়। হাসপাতাল, ছোটদের স্কুল এসবকে ঘিরেও গাছপালার ঘন আবেষ্টনী তৈরী করা প্রয়োজন। করিডরে ধাতুনির্মিত আসবাবপত্র অপেক্ষা কাঠের তৈরী আসবাবপত্র ব্যবহার করাই শ্রেয়, কারণ কাঠের তৈরী আসবাব কিছুটা শব্দ শোষণে সমর্থ। ভারী ট্রাক, যানবাহন যাতায়াতকারী বড় রাস্তার একেবারে ধারে বাড়ি করা বা ফ্ল্যাট কেনা এসব এড়াতে পারলেই ভাল। বাড়ির জানালা শব্দপ্রবণ রাস্তার দিকে থাকলে জানালায় ভারী পর্দা লাগাবার ব্যবস্থা করতে পারলে ভাল হয়। বাড়িতে জেনারেটার, জলের পাম্প এসব প্রবল আওয়াজ সৃষ্টিকারী যন্ত্রাদি থাকলে সেগুলি শয়নকক্ষ বা ছোটদের পঠন-পাঠন কক্ষ থেকে যাতে যথাসম্ভব দূরে থাকে সে ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। রেডিও, টি. ভি., টেপরেকর্ডার এসব কম আওয়াজে চালাতে হবে।

(iii) আর এক ধরনের ব্যবস্থা হল শ্রোতার জন্য ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক কিছু ব্যবস্থা অবলম্বন। শ্রোতার কানে প্রবেশরত শব্দের প্রাবল্য কমিয়ে আনতে কানে ব্যবহার করবার উপযোগী বেশ কিছু জিনিস এখন উদ্ভাবিত হয়েছে, যেমন ইয়ার প্লাগ, ইয়ার মাফ, নয়েজ হেলমেট ইত্যাদি। ঐসব যন্ত্র কানে পরে নিলে শব্দপ্রবণ পরিবেশে কর্মরত ব্যক্তিদের কাজ করতে সুবিধা হয়, কারণ কানে প্রবেশরত শব্দের প্রাবল্য এর ফলে অনেকটা কমে যায়। প্রবল শব্দের মধ্যে ইয়ার প্লাগ এবং ইয়ার মাফ দুটিই একসঙ্গে ব্যবহার করা যায়। এই ধরনের যন্ত্রের অভাবে স্বাস্থ্যহানিকর নয় এমন তেলে ভেজানো বা মোম মাখানো তুলো কানে দিয়ে শব্দপ্রবণ এলাকায় কাজ করবার পরামর্শ দেওয়া যেতে পারে।

উপযুক্ত নগর পরিকল্পনার মাধ্যমে কিছু উচ্চ শব্দ উৎসকে জনবসতি থেকে দূরে স্থাপন করে (যদি সম্ভব হয় তবে বায়ুর সচরাচর গতির দিকে লক্ষ্য রেখে), বসতি এলাকা, নিঃশব্দ এলাকা প্রভৃতি কোলাহলপূর্ণ ব্যবসাবাণিজ্যের এলাকা বা শিল্প এলাকা থেকে দূরে স্থাপন করে, রাস্তা এলাকার সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ করে শব্দদূষণমাত্রা অনেকাংশে নিয়ন্ত্রণ সম্ভব। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় বিমানবন্দর জনবসতি থেকে নিরাপদ দূরত্বে রাখা দরকার। রেলওয়ে স্টেশন বা রেল পরিবহন ব্যবস্থা জনবসতি এলাকার কিছুটা বাইরে দিয়ে হওয়া বাঞ্ছনীয়।

তেমনিই উপযুক্ত আইন প্রণয়ন করে এবং সেই আইনের কঠোর প্রয়োগের মাধ্যমেও যে কোলাহলদূষণমাত্রা কিছুটা কমানো সম্ভব সেটি আমাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ। জোর আওয়াজের বাজি পটকা ফাটানো নিষিদ্ধ করে এবং উৎসব প্যাণ্ডেলে দিনের বিশেষ সময়ে মাইক বাজানো সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করে এবং অন্য সময়ে শব্দ প্রাবল্যমাত্রা 65 ডেসিবেলের মধ্যে বেঁধে দিয়ে সাম্প্রতিককালে দুর্গাপূজা, কালীপূজা বা অন্যান্য অনুষ্ঠানকালে শব্দযন্ত্রণা থেকে নাগরিকেরা বেশ কিছুটা রেহাই পেয়েছেন। কিন্তু অনুষ্ঠানের সময় ব্যতীত অন্যান্য সময়ে তেমন সুফল মিলছে না, এ জন্যে প্রশাসনিক ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপক জনসচেতনতা গড়ে তোলা জরুরী, এ ব্যাপারে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিরও একটি ভূমিকা পালন করবার আছে।

রেডিও, টি.ভি., টেপরেকর্ডার যাতে খুব জোরে বাজানো না হয়, একটা নির্দিষ্ট শব্দ-প্রাবল্যমাত্রা বজায় রেখে বাজানো হয়, প্রতিবেশীর শব্দযন্ত্রণা না ঘটে সেদিকে লক্ষ্য রেখে অনেক উন্নত দেশের নগরীতে (যেমন, কানাডাতে) নির্দিষ্ট পৌর আইন আছে। আমাদের এখানেও এই ধরনের আইন প্রণীত এবং রূপায়িত হওয়া প্রয়োজন।

একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন। জনসংখ্যার বিপুল চাপে আমাদের অনেক গ্রামই এখন আধাশহরে রূপান্তরিত। আধুনিক নগরসভ্যতার ভালমন্দ সব অনুষঙ্গই এখন গ্রামগুলিতেও বর্তমান। শব্দদূষণ সমস্যা থেকে অনেক গ্রামাঞ্চলও তাই এখন মুক্ত নয়। শহরাঞ্চলের পুরসভা ও নাগরিকদের যেমন এ সমস্যার প্রতিবিধানে ভাবতে হবে, গ্রামাঞ্চলেও পঞ্চায়েত ও গ্রামবাসীদের এ সমস্যা সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকলে চলবে না।

সার্বিক সুষ্ঠু পরিকল্পনামাফিক প্রশাসনিক ব্যবস্থাদি গ্রহণ, যথাযথ আইন প্রণয়ন এবং সেগুলির কঠোর প্রয়োগ, ব্যাপক জনসচেতনতা গড়ে তোলা এবং নিরবচ্ছিন্ন গঠনমূলক গণআন্দোলন এগুলির সমন্বয়ের মাধ্যমেই কেবল শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণ সম্ভব।

7.6. গন্ধদূষণ

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে বহুতর গন্ধদ্রব্যের সংস্পর্শে আমাদের আসতে হয়। এইসব দ্রব্যের কোনও কোনওটির সুগন্ধ আমাদের আমোদিত করে, শরীর ও মনকে যেন জুড়িয়ে দেয়, আবার কোনও কোনওটির দুর্গন্ধে টেঁকা দায় হয়ে দাঁড়ায়। তবে সুগন্ধী দুর্গন্ধী নির্বিশেষে অনেক বস্তুই বা ঐসব বস্তু থেকে নির্গত বস্তুকণা বা গ্যাসীয় পদার্থ বাতাস দূষিত করতে পারে এবং সেই বাতাসে শ্বাসগ্রহণে আমাদের শরীর ও মনের উপর কুপ্রভাব পড়তে পারে। গন্ধদ্রব্যজনিত কারণে যে বায়ুদূষণ তাকে **গন্ধদূষণ** বলা যায়।

গন্ধের অনুভূতি অবশ্য অনেকটা ব্যক্তিভিত্তিক। একজন ব্যক্তির কাছে যেটি অত্যন্ত খারাপগন্ধ অপর কোনও ব্যক্তির কাছে সেই গন্ধই তত খারাপ বলে মনে নাও হতে পারে। কোনও গন্ধের প্রাবল্য ব্যক্তিবিশেষের বয়সের উপর, সেই ব্যক্তি নারী অথবা পুরুষ এসবের উপরও নির্ভর করে। এমনকি একজনের কাছে যেটি বাজে গন্ধ অন্য একজনের কাছে সেটিই সুন্দর গন্ধ মনে হতে পারে।

7.6.1. দুর্গন্ধের উৎসসমূহ

প্রথমে আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের অভিজ্ঞতায় অনুভূত দুর্গন্ধের কয়েকটি উৎসের কথা স্মরণ করা যেতে পারে। এমনতর কয়েকটি উৎস হল ঃ

(i) জমা আবর্জনা ঃ রাস্তায় বা অন্যত্র যেখানে সেখানে জমা জঞ্জালের পচনে দুর্গন্ধের সৃষ্টি হয়। এই জঞ্জালের মধ্যে হরেক রকম পদার্থ থাকে। ধাতব পদার্থ, আনাজপাতি, শাক সব্জি, ব্যবহৃত কাগজ, কাচের টুকরো, শিশি, বোতল,

ডাবের খোলা, বাজারের হরেক পরিত্যক্ত পদার্থ কতকিছুইনা থাকে। জমানো জঞ্জালের একটা অংশ প্রায় সবসময়েই থেকে যায় মূলতঃ দুটি কারণে—পুরোপুরি অপসারিত না হওয়ায় এবং অপসারণের সময়ের ঠিক পরেই নতুন আবর্জনা ঐস্থানে ফেলবার ফলে। জমা জঞ্জালের মধ্যেকার জৈব পদার্থের পচনের ফলে ক্ষতিকারক জৈব বা অজৈব রাসায়নিক উৎপন্ন হয়ে বাতাসে মিশে স্থানীয় বাতাসকে দুর্গন্ধময় করে তোলে। ঐ বাতাসে শ্বাসগ্রহণে আমাদের যে কেবল বিরক্তি বোধ হয় বা বমিভাব হয় তাই নয়, অনেকক্ষেত্রে আমাদের মারাত্মক শারীরিক ক্ষতি হতে পারে। কলকাতা মহানগরীতে প্রতিদিন গড়ে প্রায় 3100 টন জঞ্জাল জমে, এর অন্তত 10 শতাংশ দিনের যে কোনও সময়েই থেকে যায়, সুতরাং ডাস্টবীন, ভ্যাট বা অন্যত্রও এই জঞ্জালের পচনে সংলগ্ন এলাকায় অসহনীয় অবস্থার সৃষ্টি হয়।

(ii) **জনসাধারণের ব্যবহার্য প্রস্রাবাগার, শৌচাগার :** শহরে জনসাধারণের জন্য ব্যবহার্য শৌচাগার থেকে বা হাসপাতাল, বড় বড় অফিস, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এসবের শৌচাগার থেকেও অ্যামোনিয়া এবং অন্যান্য গ্যাস এলাকার বাতাসকে কিছুটা দূষিত করতে পারে, অ্যামোনিয়ার ঝাঁঝালো গন্ধ আমাদের বিরক্তি উৎপাদন করতে পারে।

(iii) **গবাদিপশুর খাটাল (Cattle shed), মুরগী-খামার (Poultry), শূকর-খামার (Piggery) :** এসব স্থান থেকেও দুর্গন্ধ নির্গত হয়। খাটাল থেকে গরু মোষের মলমূত্র পচনজাত মিথেন, অ্যামোনিয়া গ্যাস বায়ুদূষণ করে, পোল্ট্রি থেকে ডিমের পচনজাত হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাস দুর্গন্ধ সৃষ্টিকারী এবং বিষাক্ত গ্যাস। শূকর-খামার থেকেও মিথেন, অ্যামেনিয়া এসব নির্গত হতে পারে।

(iv) **শব-ব্যবচ্ছেদ ঘর বা মর্গ :** হাসপাতালগুলি এবং শব-ব্যবচ্ছেদ কেন্দ্রগুলি যেহেতু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জনবহুল এলাকায় অবস্থিত, ঐসব স্থানে রক্ষিত শবদেহ এবং শবদেহ-ব্যবচ্ছেদজনিত দুর্গন্ধ সংলগ্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে—শরীর ও মনের উপর এই দুর্গন্ধ অবর্ণনীয় কুপ্রভাব ফেলে। শ্মশান সংলগ্ন এলাকাতেও কিছুটা এই ধরনের দুর্গন্ধ অনুভূত হতে পারে। এছাড়াও প্রাকৃতিক দুর্যোগে বা দুর্ঘটনায় মৃত মানুষ বা গবাদিপশুর মৃতদেহ পচনের ফলেও দুর্গন্ধে বাতাস দূষিত হয় এবং জনস্বাস্থ্যের উপর ক্ষতিকারক প্রভাব ফেলে (যেমনটি সম্প্রতি ওড়িশায় প্রবল ঘূর্ণি ঝড়ে ঘটেছে)।

(v) **ম্যানহোল, অব্যবহৃত ইঁদারা, কূপ ও নর্দমা :** ম্যানহোলের ঢাকনা খোলা থাকলে তা থেকে বা বহু দিনের পুরানো ইঁদারা, কুয়ো এসব থেকেও দুর্গন্ধ নির্গত হয় এবং এইসব উৎস থেকে নির্গত পচা ডিমের গন্ধযুক্ত বিষাক্ত হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাস অনেকক্ষেত্রে এগুলির মধ্যে নেমে এগুলি পরিষ্কার করতে যাওয়া অনেকের মৃত্যু পর্যন্ত ঘটায়। খোলা নালা নর্দমার পাঁক ও নানাবিধ বর্জ্যপদার্থের পচন-জনিত দুর্গন্ধের অভিজ্ঞতা আমাদের অজানা নয়। এটিও জনস্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল নয়। (পচনজাত পদার্থে মিশে থাকা মিথেন গ্যাস বায়ুদূষক)। আমাদের কলকাতা মহানগরীর খালগুলি (বেলেঘাটা, কেষ্টপুর, বাগজোলা, টালিনালা ইত্যাদি) যথাযথ সংস্কারের অভাবে শোচনীয় অবস্থায় বর্তমান এবং অন্যতর অজস্র পরিবেশ সমস্যার সৃষ্টি করা ছাড়াও দুর্গন্ধ সৃষ্টির প্রায় স্থায়ী উৎস হিসেবে এগুলি গণ্য হবার যোগ্য।

(vi) **চামড়া প্রক্রিয়াকরণ কারখানা (Tanneries) :** মৃত পশুর চামড়া প্রক্রিয়াকরণ কারখানা জনবসতির কাছে থাকলে তা থেকে নির্গত দুর্গন্ধ যেমন আমাদের কাছে অসহনীয় মনে হয় তেমনিই চামড়া প্রক্রিয়াকরণে ব্যবহৃত কিছু রাসায়নিক জনস্বাস্থ্যের পক্ষে মারাত্মক ক্ষতিকারক হতে পারে। এইসব রাসায়নিক মূলতঃ জলদূষণের সমস্যাসৃষ্টিকারক হলেও বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে বায়ুদূষক হিসেবেও ক্রিয়াশীল হতে পারে। এইসব দূষকের মধ্যে কিছু ভারী ধাতুকণা (যেমন, লেড বা সীসা, ক্রোমিয়াম ইত্যাদি), চামড়ার গুঁড়ো, কিছু জৈব রাসায়নিক (যেমন ট্যানিক অ্যাসিড) থাকতে পারে। আমাদের মহানগরীতে তিলজলা এলাকায় ট্যানারী থেকে নির্গত দুর্গন্ধ এবং দূষক পদার্থসমূহের সম্পর্কে তিক্ত অভিজ্ঞতা আমাদের আছে (আদালতের নির্দেশে এগুলিকে এখন সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে)।

7.6.2. শিল্প কলকারাখনা থেকে নির্গত গন্ধের প্রকৃতি

বিভিন্ন শিল্প, কারখানা থেকেও বহুতর গন্ধদূষক পদার্থ বাতাসে মিশে গন্ধদূষণ ঘটাতে পারে। যেসব গন্ধদূষক বাতাসে গন্ধ ছড়ায় সেগুলির মধ্যে মূলতঃ উদ্বায়ী এবং অসম্পৃক্ত জৈব যৌগ থাকলেও অনেকক্ষেত্রে কয়েকটি অজৈব পদার্থও থাকতে পারে। নীচে কয়েকটি শিল্প এবং সেগুলি থেকে নির্গত গন্ধদূষক পদার্থের উল্লেখ করা হল :

শিল্প	গন্ধদূষক
(i) সার উৎপাদন শিল্প	অ্যামোনিয়া, জৈবনাইট্রেট যৌগ, হাড়ের গুঁড়ো ইত্যাদি
(ii) পেট্রোলিয়াম শিল্প	সালফার ডাইঅক্সাইড ও সালফিউরাস যৌগসমূহ, ক্রেসল যৌগ
(iii) কাগজ শিল্প	সালফিউরাস যৌগসমূহ
(iv) কোক চুল্লী	অ্যামোনিয়া ঘটিত, সালফার ঘটিত যৌগসমূহ, ফেনল জাতীয় যৌগ
(v) সাবান শিল্প	প্রাণিজ চর্বি, বিভিন্ন পারফিউম
(vi) খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প	ডেয়ারীর বর্জ্য, মাংসে প্রক্রিয়াকরণজাত পদার্থসমূহ, মাছের গন্ধ ইত্যাদি।

খাদ্যদ্রব্য অধিকতর সুগন্ধী এবং আকর্ষণীয় করে তুলবার জন্য অনেক সময় কিছু রাসায়নিক ঐসব খাদ্যদ্রব্যে মিশিয়ে দেওয়া হয়। কোনও কোনও ক্ষেত্রে ঐসব রাসায়নিক জনস্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক হতে পারে। এই ধরনের একটি রাসায়নিক মনোসোডিয়াম গ্লুটামেট (MSG) বিশেষ কিছু রেস্তোরাঁয় প্রক্রিয়াকরণজাত খাদ্যদ্রব্যে প্রায়শঃ মিশিয়ে ব্যবহার করা হয়। এটির গন্ধ অনেকটা টোম্যাটোর ন্যায়। এই ধরনের রেস্তোরাঁয় এই রাসায়নিক মিশ্রিত খাবার খেয়ে অনেকে অসুস্থ হয়ে পড়েন বলে শোনা যায়, অনেকের ঠোঁট ফুলে ওঠে, চোখ জ্বালা করে, বমির উদ্রেক করে বলে অভিযোগ। তবে এই ধরনের অভিযোগ কতটা সত্যি সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যায়নি। অনেকের মতে মনোসোডিয়াম গ্লুটামেট নয়, রেস্তোরাঁয় খাবারের সঙ্গে ব্যবহৃত বিশেষ ধরনের সস্‌ই (শামুকের খোলাজাত) আসলে এজন্য দায়ী। খাবারে ব্যবহৃত এমনতর আরও একটি এই ধরনের রাসায়নিক হল মনোপটাসিয়াম গ্লুটামেট। প্রক্রিয়াকরণজাত মাংসে এবং টিনে ভর্তি করা খাবার-দাবারেও এই যৌগগুলি অনেক ক্ষেত্রে সুগন্ধী হিসেবে ব্যবহৃত হয়—এগুলি স্বাস্থ্যের পক্ষে নিরাপদ নাও হতে পারে।

আমাদের এখানে অনেক মিষ্টির দোকানে খাবার আকর্ষণীয় করবার জন্য একদিকে যেমন খাবারের সঙ্গে কৃত্রিম রঙ মেশানো হয়, তেমনি অনেকক্ষেত্রে কৃত্রিম সুগন্ধীও মেশানো হয়। এই সুগন্ধীগুলি অনেকের ক্ষেত্রে বমি বমি ভাবের সৃষ্টিকারক, অ্যালার্জিকারক, পেটে ব্যথার কারক হতে পারে।

জ্যাম, জেলী, আচারে অনেক সময় কৃত্রিম গন্ধ সৃষ্টির জন্য বিশেষ বিশেষ রাসায়নিক পদার্থ যুক্ত করা হয়, এগুলিও সব ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যের পক্ষে শুভ নাও হতে পারে। অনেক সময় অনেক পানীয়তেও গন্ধদ্রব্য যোগ করা হয়। অতিরিক্ত মশলাযুক্ত এবং গন্ধযুক্ত খাদ্যদ্রব্য ব্যবহারের প্রবণতা যেখানে বেশী সেখানে সেইসব খাবার খেয়ে পেটে যন্ত্রণা, বমি বমি ভাবের উদ্রেক এসবের অভিযোগ প্রায়শঃ পাওয়া যায়, কৃত্রিম গন্ধদ্রব্য এসবের জন্য দায়ী হতে পারে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে কয়েকটি ক্ষতিকর রাসায়নিক যেমন, মেটানিল ইয়ালো (metanil yellow), অরামিন (auramine), সানসেট ইয়ালো (sunset yellow), কঙ্গোরেড (congo red), ম্যালাচাইট গ্রীন (malachite green), টার্টাজাইন (tartazine) খাদ্যদ্রব্য রঙ্গীন করতে এবং এগুলির কয়েকটি সুগন্ধীকরণেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এগুলির ব্যবহার অবিলম্বে বন্ধ হওয়া উচিত।

কয়েকটি সুগন্ধী জৈব পদার্থ যেগুলি দ্রাবক হিসাবে নেলপালিশ, লিপস্টিক বা অন্যতর প্রসাধনী দ্রব্যে ব্যবহৃত হয়ে থাকে, কম্পিউটার, সেমিকণ্ডাকটার শিল্পে ব্যবহৃত হয়, সেগুলির জনস্বাস্থ্যের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলবার সম্ভাবনা বর্তমান। এমনতর কয়েকটি পদার্থ এবং সেগুলির সম্ভাব্য ক্ষতিকারক কয়েকটি ফলাফল নীচে প্রদত্ত হল।

অ্যাসিটোন (মিষ্টি গন্ধ) : মাঝারি বা উচ্চমাত্রায় এর বাষ্পের সংস্পর্শে চোখ, নাক, গলা জ্বালা করতে পারে, বিভ্রান্তি, স্মৃতিবিভ্রম ঘটাতে পারে। খুব বেশী মাত্রায় এটির সংস্পর্শে মুখগহ্বরের চামড়ার ক্ষতি হয়, অজ্ঞান হয়ে যাবার সম্ভাবনা। দীর্ঘদিন ধরে অ্যাসিটোন বাষ্পের সংস্পর্শে কিড্‌নি, লিভার, স্নায়ুর স্থায়ী ক্ষতি হতে পারে। গর্ভবতী মহিলারা অসুস্থ সন্তান প্রসব করতে পারেন, পুরুষেরা জনন ক্ষমতা হারাতে পারেন।

বেঞ্জিন : অস্থিমজ্জার ক্ষতি হতে পারে, ফলে রক্তের লোহিত কণিকা উৎপাদন হ্রাস পেতে পারে, যার পরিণতিতে অ্যানিমিয়া, লিউকোমিয়া এসব হবার সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে, প্রজনন ক্ষমতা হ্রাস পেতে পারে, শরীরে মেদ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যেতে পারে। বেঞ্জিন শরীরে ক্যান্সার কোষ সৃষ্টিকারী।

মিথাইল ক্লোরোফর্ম : মাথা ধরা, চোখ নাক গলায় প্রদাহ সৃষ্টিকারক, হৃদরোগের সম্ভাবনা সৃষ্টি করে।

টলুইন : স্বল্প বা মাঝারি মাত্রায় দীর্ঘসময়ব্যাপী এর বাষ্পের সংস্পর্শে থাকলে শ্রান্তি আসে। শরীর দুর্বল লাগে, স্মৃতিশক্তি লোপ পায়, শ্রবণ ক্ষমতা লুপ্ত হয়, বমি বমি ভাব হয়। উচ্চমাত্রায় স্বল্পকালীন সংস্পর্শেও মস্তিষ্কের স্থায়ী ক্ষতি হতে পারে, শ্রবণ ও দর্শনের ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দিতে পারে, দেহের ভারসাম্যের অভাব বোধ হতে পারে। স্নায়ুরোগ সৃষ্টিকারক, শিশুদের বৃদ্ধি ব্যাহত করে, ক্যান্সার কোষ সৃষ্টি করে। (এই সব রাসায়নিকের প্রতিটিরই একটি মিষ্টি গন্ধ আছে।)

7.6.3. প্রতিকার—কী করণীয়

গন্ধ-দূষণ বিশেষতঃ দুর্গন্ধদূষণ থেকে অন্তত কিছুটা রেহাই পাওয়া যেতে পারে কীভাবে সে বিষয়টি ভাবা দরকার। সুপরিকল্পিত পরিবেশ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কিছুটা নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থা গ্রহণ অবশ্যই সম্ভব।

জমা আবর্জনাঘটিত যে গন্ধদূষণ (বা অন্যতর দূষণ) তা থেকে মুক্তি পেতে জঞ্জাল অপসারণের সুষ্ঠু ব্যবস্থা গ্রহণ জরুরী। আমাদের শহরগুলিতে ভ্যাটে বা অন্যত্র জমা জঞ্জালের একটা অংশ দিনের প্রায় সব সময়েই থেকে যায়। যদি দৈনিক একবারের পরিবর্তে অন্ততঃ দুবার জঞ্জাল অপসারণের ব্যবস্থা করতে পারা যায় তবে জমা জঞ্জালজাত গন্ধদূষণ থেকে নাগরিকদের অনেকটা সুরাহা হবে। ভ্যাটগুলির অবস্থান জনাকীর্ণ এলাকায় না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। গ্রামাঞ্চলেও জমা আবর্জনা লোকালয়ের বাইরে বিশেষ স্থানে নীচেটা এবং চারিদিক বাঁধানো গর্তে ফেলে কম্পোস্ট সার তৈরীর ব্যবস্থা করা যেতে পারে—গ্রাম পঞ্চায়েত এ বিষয়ে বিজ্ঞানসম্মত পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারেন। জমাজঞ্জাল থেকে সার, বায়োগ্যাস, বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকল্পনা সঠিকভাবে রূপায়ণ করতে পারলে জমা জঞ্জাল আপদ না হয়ে সম্পদ হয়ে উঠতে পারে।

খাটাল, পোল্ট্রি এসব লোকালয় থেকে দূরে থাকা বাঞ্ছনীয় এবং এসব থেকে বর্জ্যপদার্থের অপসারণের সুষ্ঠু এবং বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থা থাকা জরুরী। জনসাধারণের ব্যবহার্য প্রস্রাবাগার, শৌচাগার এসব থেকে ত্যক্ত গ্যাস (অ্যামোনিয়া ইত্যাদি) অন্যভাবে ব্যবহার করা যায় কিনা ভাবা দরকার এবং তেমনভাবে পরিকল্পনা গ্রহণ করা দরকার। শব-ব্যবচ্ছেদ ঘর বা মর্গ কখনও জনবহুল এলাকায় থাকা কাম্য নয়, আর জনাকীর্ণ এলাকায় এসব রাখতে বাধ্য হলে এগুলি থেকে দুর্গন্ধ যাতে বাইরে না ছড়ায় সেদিকে লক্ষ্য রাখতেই হবে। সুগন্ধী ফুলগাছ ইত্যাদির আবেষ্টনী গড়ে তুলে এই দুর্গন্ধ ছড়ানো সম্ভবতঃ কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে।

শহরের রাস্তায় ম্যানহোলগুলির ঢাকনা যাতে বন্ধ থাকে, খোলা না থাকে সেদিকে নিরন্তর দৃষ্টি রাখতে হবে। পুরানো ইঁদারা কূপ এসবের মাঝে মাঝেই সংস্কার সাধন জরুরী, সেক্ষেত্রে ঐসব থেকে বিষাক্ত গ্যাস নির্গত হবার সম্ভাবনা অনেকটাই কমে যাবে, এসবের জলও এই সংস্কারের ফলে ব্যবহার্য হতে পারে।

দুর্গন্ধ সৃষ্টিকারী চামড়ার প্রক্রিয়াকরণ কারখানা (বা অন্যান্য কারখানাও) জনবসতি এলাকা থেকে দূরে স্থানান্তরিত করা প্রয়োজন এবং এসব কারখানায় দূষণ নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থাদি নেওয়া প্রয়োজন। নির্গত বর্জ্যপদার্থ অন্যভাবে কাজে লাগাবার প্রযুক্তি উদ্ভাবন করতে হবে, সরকারের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দফতরকে এজন্য গবেষণার মাধ্যমে উপযুক্ত প্রযুক্তি উদ্ভাবনে সচেষ্ট হতে হবে।

সস্তার প্রসাধন দ্রব্য—পারফিউম, নেলপালিশ এসবের ব্যবহার পরিহার করে চলা বাঞ্ছনীয়। খাদ্যদ্রব্য, পানীয় এসবে গন্ধদ্রব্য যোগ করলে সেগুলি স্বাস্থ্যহানিকর কিনা সে বিষয়ে খতিয়ে দেখতে সরকার বা পুরসভার স্বাস্থ্য দফতরের সতর্ক ভূমিকা থাকা প্রয়োজন। কৃত্রিম গন্ধযুক্ত খাবার বা পানীয় গ্রহণ থেকে বিরত থাকাই কাম্য। জনসাধারণের মধ্যে এসব বিষয়ে একটা ব্যাপক সচেতনতা গড়ে তোলা জরুরী।

দুর্গন্ধ নিয়ন্ত্রণের একটি পদ্ধতি হল গন্ধ-দূরীকারক পদার্থ ব্যবহার করা। এই ধরনের গন্ধ-দূরীকারক পদার্থসমূহ তাদের নিজেদের সুগন্ধ দ্বারা দুর্গন্ধ চাপা দেয়। কয়েকটি গন্ধ-দূরীকারক পদার্থ দুর্গন্ধী পদার্থকে বিনষ্ট করে দেয়। স্নানাগার বা টয়লেটে এই ধরনের একটি গন্ধদূরীকারক পদার্থ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেসব জীবাণু, ছত্রাক এসব গন্ধদূষণ ঘটায় সেগুলি কিছু জীবাণুনাশক যেমন ফরমালডিহাইডের সাহায্যে ধ্বংস করা যায়। অনেক কারখানায় বিশেষ দুর্গন্ধ দূর করতে অপর এমন একটি গন্ধদ্রব্য যোগ করা হয় যাতে দুটি গন্ধ মিলে একটি সুগন্ধের সৃষ্টি হয়। এই পদ্ধতিটিকে পুনঃগন্ধায়ন বলা যায়।

অষ্টম অধ্যায়

দূষণ এবং বর্জ্য পদার্থ ব্যবস্থাপন

অধ্যায় সূচী

পরিবেশ দূষণের বেশ কিছু দিক ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে। বর্তমান অধ্যায়ে জল ও বায়ু দূষণ, বিশেষভাবে দূষণ নিয়ন্ত্রণ, দীর্ঘস্থায়ী জৈবদূষকের জৈব সঞ্চয় ও বিবর্ধন এবং পরিবেশে এদের প্রভাব, এবং বিভিন্ন বর্জ্য পদার্থের ব্যবস্থাপন-এর সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হ'ল।

8.1. জলদূষণ

দুটি হাইড্রোজেন পরমাণু ও একটি অক্সিজেন পরমাণুর সমন্বয়ে একটি জলের অণু গঠিত হয়। কিন্তু প্রকৃতিতে "বিশুদ্ধ" জল পাওয়া যায় না বললেই চলে। ভৌত কারণে এবং বিভিন্ন রাসায়নিক, জৈব পদার্থ ও জীবাণুর সংযোগে জল দূষিত

হ'তে পারে। বস্তুতপক্ষে জলের গুণমানের পরিমাপযোগ্য এমন কোন পরিবর্তন যা এক বা একাধিক ক্ষেত্রে জলকে ব্যবহারের অনুপযুক্ত করে তোলে তাকেই জলদূষণ বলা যেতে পারে।

সারণী 8.1. জলদূষণের উৎস ও প্রভাব

দূষক পদার্থের প্রকার ও শ্রেণী		উৎস	প্রভাব
(ক) সূক্ষ্মকণা	১. ভাসমান ও জল বাহিত মৃত্তিকা, কর্দম, বালুকণা, নুড়িপাথর ইত্যাদি	ভূমিক্ষয়—যা বন্যা, অরণ্যধ্বংস, পলি উত্তোলন (dredging), নির্মাণকার্য ইত্যাদি থেকে হতে পারে	জলের ঘোলাটে ভাব ও অস্বচ্ছতা
	২. পচনশীল জৈব সূক্ষ্মকণা, জলজ কীট	জৈব আবর্জনা (যেমন ক্ষুদ্র জলজ উদ্ভিদ, গাছের পাতা ও পরিত্যক্ত অংশ, কাগজ ইত্যাদি), কীটপতঙ্গ বা জীবের দেহাবশেষ	দুর্গন্ধ সৃষ্টি, জলপ্রবাহে বাধা সৃষ্টি
	৩. প্লাস্টিক বা অনুরূপ পদার্থ যা পচনশীল নয়	গৃহস্থালীতে ব্যবহৃত কৃত্রিম বা সংশ্লেষিত (synthetic) পদার্থ ও কিছু শিল্পবর্জ্য	বিভিন্ন প্রাণীর ও অরণ্য জীবনের ক্ষতি সাধন
(খ) দ্রবীভূত ও ভাসমান রাসায়নিক পদার্থ	১. ভূমিতে প্রযুক্ত কৃত্রিম সার ও অন্যান্য রাসায়নিক অবশেষ, দ্রবীভূত সাবান জাতীয় পদার্থ, কারখানা থেকে বর্জিত রাসায়নিক	কৃষিক্ষেত্র থেকে নির্গত জল, কারখানার বর্জ্য জল, পৌর বর্জ্য জল	জলজ প্রাণীর ক্ষতিসাধন, কিছু জলজ উদ্ভিদের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি
	২. ক্লোরিনঘটিত জৈব যৌগ	কৃষিক্ষেত্রে ব্যবহৃত কিছু কীটনাশক, কীটনাশক প্রস্তুতের কারখানার বর্জ্য জল	জলজ প্রাণীর ক্ষতিসাধন, জৈব বিবর্ধন
	৩. খনিজতৈল ঘটিত পদার্থ	দুর্ঘটনাজনিত বা অসাবধানতাবশতঃ তৈল ক্ষেপ (oil spills), খনিজ তৈল শোধনাগারের বর্জ্য জল	নদনদীর ও সামুদ্রিক জীবজগতের ক্ষতিসাধন ও ধ্বংস
	৪. ভারী ধাতু-যৌগ ও ধাতু-আধান (পারদ, সীসা, ক্যাডমিয়াম, তামা, আর্সেনিক ইত্যাদি)	কিছু কিছু শিল্পের বর্জ্য পদার্থ, কীটনাশক প্রযুক্ত কৃষিক্ষেত্র থেকে নির্গত জল	জলজ প্রাণীর ক্ষতিসাধন এবং পরিণতিতে মানুষের ও অন্যান্য জীবের ক্ষতিসাধন
(গ) রোগজীবাণু	কীটাণু, ভাইরাস, ছত্রাক, জীবাণু (বিশেষতঃ কোলিফর্ম জীবাণু)	মলমূত্র, হাসপাতালের বর্জ্য পদার্থ	বিভিন্ন ধরনের জলবাহিত রোগ (নবম অধ্যায়ে বিস্তারিত বলা হয়েছে)

কি কাজে জল ব্যবহৃত হচ্ছে তার উপর নির্ভর করে জলের প্রয়োজনীয় গুণমান নির্ধারিত হয়। শিল্পকার্যে ব্যবহৃত জল, কৃষিকার্যে ব্যবহৃত জল এবং গৃহস্থালীতে পানীয় হিসেবে ব্যবহৃত জলের গুণমান অনুরূপ নাও হতে পারে। যেমন পানীয় জলের গুণমান নিরূপণে তার উপযুক্ত রাসায়নিক বিশুদ্ধতা, ভৌতগুণ ও জীবাণুর অনুপস্থিতি বিশেষভাবে বিচার্য।

পৃথিবীর বহু স্থানেই উপযুক্ত গুণমানের জল সহজলভ্য নয়। এই কারণে জলের অপরিমিত ব্যবহার সম্পর্কে সচেতনতার যেমন প্রয়োজন রয়েছে তেমনই প্রয়োজন রয়েছে দূষিত ও বর্জ্য জলের শুদ্ধিকরণের।

8.1.1. জলের গুণাবলীর সূচক

জল জীবনের একটি সবিশেষ প্রয়োজনীয় বস্তু—তাই কথায় বলে 'জলই জীবন'। কিন্তু দূষিত জল মানব জীবন ও জীব জগতের নানাবিধ ক্ষতিসাধন করে। দেড়শো বছর আগে জলের মাধ্যমে নানাধরনের রোগ ছড়ানোর ব্যাপারটা আবিষ্কৃত হয়। সাধারণ ব্যাধির প্রায় ৪0 শতাংশই জলবাহিত। মানুষের বর্জ্য পদার্থের দ্বারা জল দূষণ অথবা শিল্প কারখানা থেকে নির্গত রাসায়নিক পদার্থ দ্বারা জল দূষণের সাথে এখন কৃষিকার্যে ব্যবহৃত নানা রকম ছত্রাক, কীট অথবা আগাছানাশক রাসায়নিক পদার্থ, অজৈব ও জৈব সার দ্বারা পুকুর, খাল, বিল, নদীনালার জলদূষণ একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা।

জলের গুণাবলী কেমন তা নির্ভর করে ভৌত, রাসায়নিক পদার্থ অথবা জীব বা জীবাণুর উপস্থিতির উপর। আর এই সমস্ত গুণাবলীর উপর নির্ভর করে জলের শোধন প্রক্রিয়া ও পরবর্তী পর্যায়ে জলের ব্যবহার।

8.1.1.1. ভাসমান কণা

জলদূষক পদার্থ জলে দ্রবীভূত অথবা ভাসমান অবস্থায় থাকতে পারে। ভাসমান বা বাহিত বস্তুকণা আবার অজৈব (যেমন মাটি, পাথর বা ইঁটের কুচি প্রভৃতি) কিংবা জৈব (তন্তু, শৈবাল, জীবাণু ইত্যাদি) হতে পারে। এইসব বস্তুর অনেক গুলিই প্রত্যক্ষভাবে বিপজ্জনক, তাই সেই সব বস্তুর উপস্থিতিতে জল অব্যবহার্য হয়ে ওঠে। দ্রবীভূত অথবা ভাসমান জৈব পদার্থগুলি আবার জৈব প্রক্রিয়ায় ধ্বংস হয় এবং কিছু ক্ষতিকর পদার্থের সৃষ্টি করে। জলে জীবাণুর উপস্থিতি রোগের সৃষ্টি করে। ভাসমান কণার পরিমাণ মাপার জন্য নমুনা জলকে ফিলটার করে কঠিন অবশেষটিকে নির্দ্দিষ্ট তাপমাত্রায় নির্দ্দিষ্ট পদ্ধতিতে শুষ্ক করে ওজন করা হয়। ভাসমান বস্তুর পরিমাণ প্রকাশ করা হয় "মিলিগ্রাম প্রতি লিটার জলে" এই হিসাবে।

8.1.1.2. বর্ণ ও গন্ধ

দ্রবীভূত ও ভাসমান পদার্থের উপস্থিতির ফলে জলে বর্ণ বা রং দেখা দিতে পারে। বেশ কিছু শিল্পের (যেমন বস্ত্র রঞ্জন, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, কাগজ তৈরি, ধৌতকাজ ইত্যাদি) বর্জ্য জলে নানা ধরণের বর্ণ বা রং দেখা যায়। রঙিন জল দৃষ্টিশোভন নয় ; রঞ্জক পদার্থগুলি দূষক ও শরীরের পক্ষে ক্ষতিকারক। জৈব পদার্থগুলি অনেক সময় জলে আপত্তিকর গন্ধেরও সৃষ্টি করে।

8.1.1.3. তাপমাত্রা

তাপমাত্রা প্রাকৃতিক ভূতলস্থিত জল ও শিল্পের বর্জ্য জলের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। জলে জৈব পদার্থের উপস্থিতি ও তার কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে তাপমাত্রা। তাপমাত্রা জলচর প্রাণীর নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের জন্য প্রয়োজনীয় অক্সিজেনের দ্রাব্যতাকে প্রভাবিত করে।

8.1.1.4. অম্লতা বা ক্ষারত্ব (pH)

এটি (pH) এমন একটি গুণ যা অম্লতা বা ক্ষারত্বের পরিমাণ নির্দেশ করে। পরিশুদ্ধ জলের pH হয় মোটামুটিভাবে সাত। pH সাতের কম হলে জলকে আম্লিক (অ্যাসিডিক) এবং সাতের বেশী হলে জলকে ক্ষারীয় (অ্যালকালাইন) বলা হয়। সাতের বেশী বা কম pH এর জল শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর।

8.1.1.5. ধাতু আধান (Metal ions)

উৎস অনুসারে বর্জ্য জলে নানা রকম ধাতু আধান উপস্থিত থকে। খুব বেশী পরিমাণে না থাকলে সোডিয়াম, আয়রন, ম্যাঙ্গানিজ, অ্যালুমিনিয়াম এবং জিঙ্ক বিষাক্ত নয়। ক্রোমিয়াম, ক্যাডমিয়াম, লেড বা সীসা, মার্কারী বা পারদ, আর্সেনিক, অ্যান্টিমনি, বেরিয়াম, কোবাল্ট প্রভৃতি ধাতু বিভিন্ন মাত্রায় বিষাক্ত। রাসায়নিক শিল্প, ধাতুর তড়িৎ প্রলেপন এবং ধাতু সমাপ্তিকরণ (metal finishing) শিল্পের এবং কস্টিক-ক্লোরিন শিল্পের বর্জ্য জলে উপরোক্ত ধাতুগুলির মধ্যে এক বা একাধিক বর্তমান থাকে। ধাতু আধান দূরীকরণের সবচেয়ে কার্যকরী পদ্ধতি হল উপযুক্ত রাসায়নিক পদার্থের সাহায্যে অত্যন্ত অদ্রবণীয় অবস্থায় ধাতুর অধঃক্ষেপণ।

8.1.1.6. দ্রবীভূত অক্সিজেন (Dissolved Oxygen, DO)

দ্রবীভূত অক্সিজেন জলের প্রাণীদের প্রশ্বাসের কাজে লাগে। বায়ুমণ্ডলের অক্সিজেনই জলে দ্রবীভূত অক্সিজেনের উৎস। জলজ উদ্ভিদ ও শৈবালের সালোকসংশ্লেষ থেকেও জলে অক্সিজেন পাওয়া যায়। দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ মাপা হয় DO মিটারের সাহায্যে অথবা রাসায়নিক পদ্ধতিতে (Winkler's method)।

8.1.1.7. জৈবনিক অক্সিজেন চাহিদা (Biological Oxygen Demand, BOD)

শিল্পের বর্জ্য জল এবং পৌর ব্যবহৃত জলে উপস্থিত জৈব পদার্থগুলি জলচর অতি ক্ষুদ্র প্রাণীদের খাদ্য হিসাবে কাজে লাগে। এই ধরনের জৈব বস্তুগুলিকে জৈব ক্ষয়িষ্ণু বা biodegradable বলে। এরকম কিছু পদার্থ হল শর্করা, চর্বি বা স্নেহ, আমিষ বা প্রোটিন, অ্যালকোহল, অ্যালডিহাইড, এস্টার প্রভৃতি। এছাড়া গাছপালা ও প্রাণীদের দেহাবশেষ থেকেও biodegradable পদার্থ উৎপন্ন হয়। জীবাণুঘটিত এই ক্ষয় সবাত (aerobic) বা অবাত (anaerobic) হতে পারে। সবাত প্রক্রিয়াটি জারণ দ্বারা এবং অবাত প্রক্রিয়াটি বিজারণ দ্বারা নিষ্পন্ন হয়। সবাত প্রক্রিয়ায় কার্বন ডাইঅক্সাইড ও জল এবং অবাত প্রক্রিয়ায় হাইড্রোকার্বন, কার্বন ডাইঅক্সাইড, অ্যামোনিয়া, হাইড্রোজেন সালফাইড প্রভৃতি উৎপন্ন হয়।

সবাত জৈব ক্ষয় অর্থাৎ aerobic biodegradation-এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ফল হল জলে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ হ্রাস। জীবাণুদের শারীরবৃত্তীয় ক্রিয়ার জন্য প্রয়োজনীয় অক্সিজেন সোজাসুজি জল থেকে পাওয়া যায়। ফলে জলে দ্রবীভূত অক্সিজেন-এর মাত্রা ক্রমশঃ কমে যেতে থাকে। অর্থাৎ জলে উপস্থিত জৈবক্ষয়িষ্ণু জৈবিক পদার্থ যত বেশী হয়, জলে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ তত কম হয়। কোনো জলে biodegradable বা জৈবক্ষয়িষ্ণু জৈবিক পদার্থের পরিমাণ প্রত্যক্ষভাবে মাপা হয় না ; সেই জলে উপস্থিত আণুবীক্ষণিক প্রাণীদের অক্সিজেনের চাহিদাই তার জৈবক্ষয়িষ্ণু পদার্থের উপস্থিতির পরিমাণ নির্দেশ করে। এই চাহিদাকে জৈব রাসায়নিক অক্সিজেন চাহিদা বা Biochemical Oxygen Demand, সংক্ষেপে BOD বলে। BOD প্রকাশের একক হল প্রতি লিটার জলে জৈবিক ক্ষয়ের জন্য প্রয়োজনীয় মিলিগ্রাম অক্সিজেন।

একটি জলের নমুনা নিয়ে সেটিকে পাঁচদিন ধরে 20°C তাপমাত্রায় রাখলে তার মধ্যে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ যতটা কমবে, তা দিয়ে তার BOD পরিমাপ করা হয়। নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে এই মান নির্ণয় ও হিসাব করা হয়। একে সংক্ষেপে BOD_5 বলে।

8.1.1.8. রাসায়নিক অক্সিজেন চাহিদা (Chemical Oxygen Demand, COD)

কৃষিক্ষেত্রে ব্যবহৃত কীটনাশকযুক্ত বর্জ্য জল এবং শিল্প থেকে বর্জিত জল কিন্তু দ্রুত জৈবক্ষয় প্রাপ্ত হয় না। এগুলি ধীরে ধীরে অথবা বিশেষ ধরনের জীবাণু দ্বারা বিশ্লিষ্ট হয়। বহু জৈব যৌগ বহু বছর ধরে জলে অবিকৃত অবস্থায় থেকে যায়। এগুলি স্থায়ী জৈব যৌগ এবং জীবের পক্ষে ক্ষতিকর। অ্যারোমাটিক, ক্লোরিনযুক্ত যৌগ, ফিনল এবং তার থেকে জাত যৌগ, কিছু সাবানজাতীয় পদার্থ, কীটনাশক ইত্যাদি এর উদাহরণ। সহজে জৈব ক্ষয়িষ্ণু নয় এরকম পদার্থের সার্বিক পরিমাপকে Chemical Oxygen Demand, সংক্ষেপে COD বলা হয়।

জৈব ক্ষয় হয় না এরকম রাসায়নিক পদার্থকে জারিত করতে যতটা অক্সিজেন লাগবে, প্রতি লিটার জলে তত মিলিগ্রাম অক্সিজেনকে ঐ জলের রাসায়নিক অক্সিজেন চাহিদা বা COD বলা হয়।

8.2. বর্জ্য জলের শোধন

পরিবেশ আইনে গ্রহণযোগ্য মানে পৌঁছবার জন্যে শিল্প ও পৌর ব্যবহৃত বর্জ্য জলের শোধন প্রয়োজন। এই শোধন পদ্ধতির বিভিন্ন প্রক্রিয়া হল ঃ

(ক) ভাসমান কঠিন পদার্থ দূরীকরণ (জৈব ও অজৈব)

(খ) জৈব ক্ষয়িষ্ণু পদার্থ দূরীকরণ

(গ) জৈব অথবা অজৈব পদার্থ যা সহজে জৈব প্রক্রিয়ায় ক্ষয় পায় না তা দূরীকরণ।

প্রথাগত শোধন পদ্ধতিতে তিনটি প্রধান ধাপ আছে। যথা : **প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও চূড়ান্ত শোধন।**

প্রাথমিক শোধন পদ্ধতিতে পরিস্রবণ, অধঃক্ষেপণ, ভাসন পদ্ধতিতে ভাসমান কণা দূর করা হয়।

জৈব ক্ষয়িষ্ণু পদার্থের দূরীকরণ মাধ্যমিক শোধন পদ্ধতির অন্তর্গত। এই ধাপে BOD হ্রাস পায়। চূড়ান্ত শোধন পদ্ধতিতে ভৌত, জৈব ও রাসায়নিক পদ্ধতিতে বর্ণ ও গন্ধ মোচন সহ জৈব ও অজৈব যৌগ দূর করা হয়। নাইট্রোজেন ও ফসফরাস ঘটিত এবং অন্যান্য অজৈব দূষক তথা অবশিষ্ট জৈব দূষক এই স্তরে দূর করা হয়। বর্জ্য জল শোধন ব্যবস্থা চিত্র ৪.1-এ দেখান হল।

৪.2.1. প্রাথমিক শোধন

ভাসমান কঠিন পদার্থ দূর করা হয় প্রধানতঃ ছাঁকনির সাহায্যে ছেঁকে এবং অধঃক্ষেপণের মাধ্যমে। তারজালি, সছিদ্র ধাতব পাত অথবা সমান্তরাল ধাতব দণ্ড অশোধিত বর্জ্য জলের প্রবাহ পথে রাখা হয় যাতে ভাসমান বস্তুখণ্ড তাতে আলাদা হয়ে যায়। এরপর সেই বর্জ্য জল অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত এক কক্ষে প্রবেশ করে এবং তার গতিবেগ কমে যায়। ফলে ছোট পাথরের বা ইঁটের কুচি, বালি প্রভৃতি এখানে অধঃক্ষিপ্ত হয়। এবার ভাসমান কণিকামুক্ত বর্জ্য জল প্রাথমিক অধঃক্ষেপণ আধার (primary clarifier)-এ প্রবেশ করে।

এটি একটি জলাধার যার মধ্য দিয়ে জল খুব ধীরে ধীরে প্রবাহিত হয় এবং অবশিষ্ট সূক্ষ্ম ভাসমান কণার 50-70 শতাংশ, যার মধ্যে প্রধানতঃ জৈব ক্ষয়িষ্ণু পদার্থ আছে, তা অধঃক্ষিপ্ত হয়। এই জলাধার চৌকো অথবা গোলাকৃতি হতে পারে। যান্ত্রিকভাবে অধঃক্ষেপ পরিষ্কার করার ব্যবস্থা থাকে।
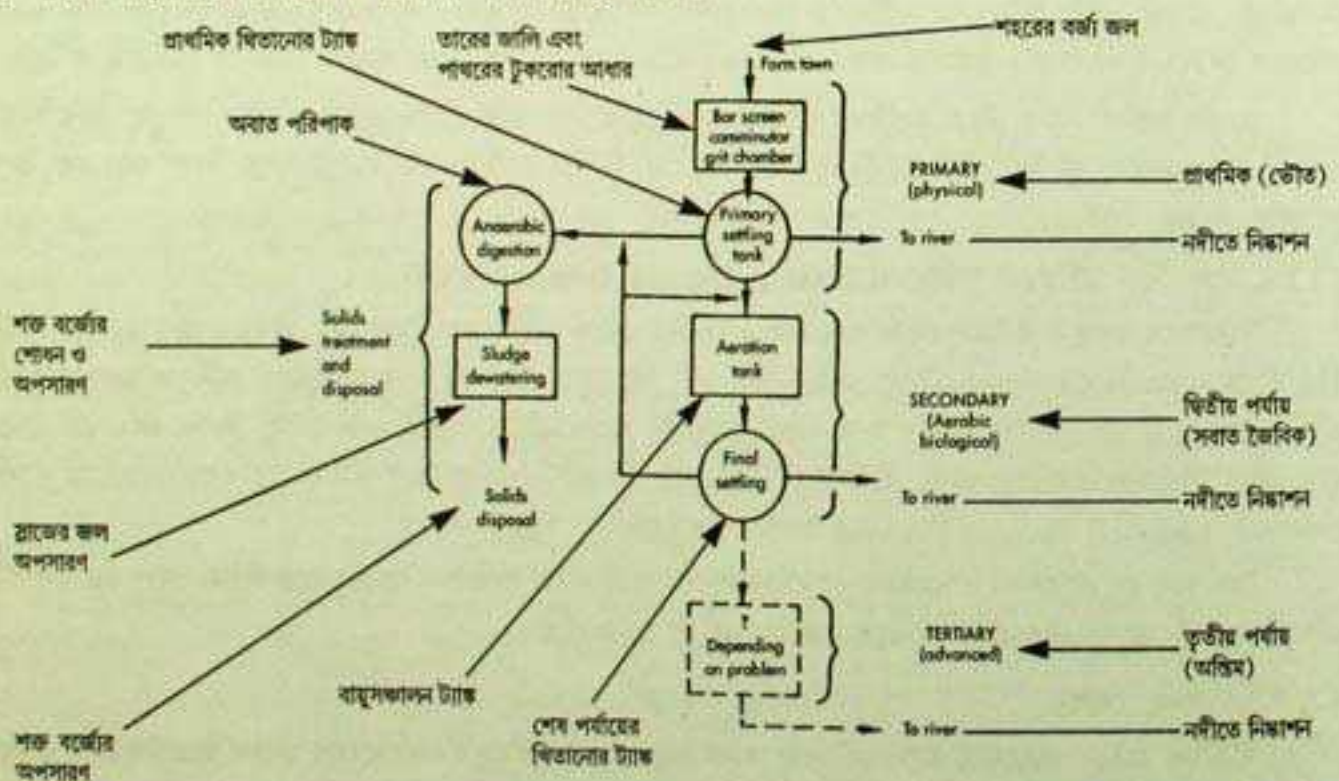
চিত্র ৪.1. বর্জ্য জল শোধনের বিভিন্ন পর্যায় : প্রাথমিক ভৌতিক শোধন পর্যায় (primary physical treatment steps), মাধ্যমিক বায়বীয় জৈবিক শোধন পর্যায় (secondary aerobic biological steps) এবং শেষ উন্নতমানের তৃতীয় পর্যায় (tertiary advanced steps)। অবায়বীয় জৈবিক (anaerobic biological) প্রক্রিয়ায় শক্ত বা আধাশক্ত স্লাজ (sludge) সাধারণতঃ জমিতে এবং শোধিত তরল জল নদীতে নিষ্কাশন করা হয়।

8.2.2. মাধ্যমিক শোধন

প্রাথমিক শোধনের পর অবিশিষ্ট ভাসমান বা দ্রবীভূত জৈব পদার্থ দূরীভূত করার জন্য জল মাধ্যমিক শোধন কক্ষে প্রবাহিত হয়। জলের BOD কমানোই এই শোধনস্তরের উদ্দেশ্য। জৈব পদ্ধতিতে BOD-কে গ্রহণযোগ্য মাত্রায় নিয়ে যাওয়া হয়। জলের জৈব ক্ষয়িষ্ণু যৌগগুলি জলে উপস্থিত জীবাণু দ্বারাই বিশ্লিষ্ট ও মুক্ত হয়। মাধ্যমিক শোধন পদ্ধতির গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগুলির দুটি হল চোঁয়ানো বা trickling filter এবং সক্রিয় গাদ পদ্ধতি বা activated sludge process।
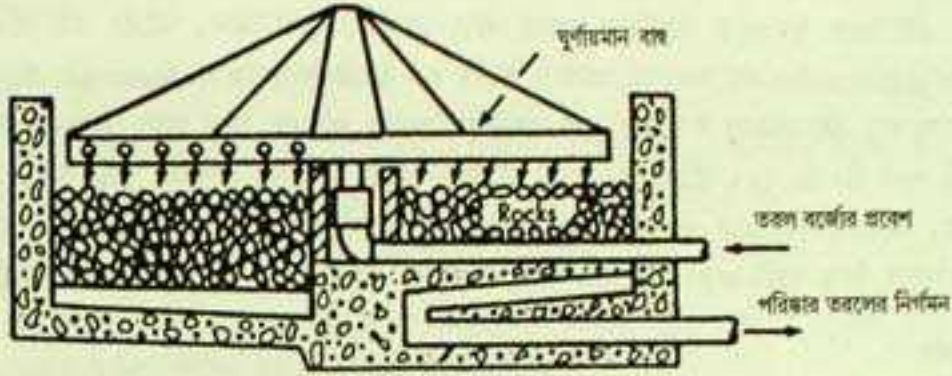
চিত্র 8.2. ট্রিকলিং ফিলটার (Trickling filter) : পাথরের নুড়ির স্তরের মধ্য দিয়ে ফিলটার প্রক্রিয়ায় বর্জ্য জল শোধন।

Trickling filter বা চোঁয়ানো পরিস্রাবণ পদ্ধতিটি প্রায় একশ' বছরেরও বেশী পুরোনো। এটি মূলতঃ বিশাল চোঙাকৃতি পাত্রে রাখা নুড়ি পাথরের স্তরবিন্যাস (চিত্র 8.2)। বর্জ্য জল সবচেয়ে উপরের স্তরে পড়ে এবং চুঁইয়ে চুঁইয়ে নুড়ি পাথরের বা অন্যান্য দানাকৃতি বস্তুর স্তরের মধ্য দিয়ে নীচে আসে। এই স্তরগুলির মধ্যে দিয়ে পর্যাপ্ত পরিমাণ বাতাস চলাচল করতে পারে। স্তর গুলির উপর ও নীচের ভাগের মধ্যে তাপমাত্রার তারতম্যই এই বায়ুপ্রবাহের কারণ। ভাসমান ও দ্রবীভূত জৈব পদার্থের উপস্থিতিতে নুড়িগুলির উপর একটি জৈব স্তর বা biomass-এর স্তর পড়ে। এই জৈবস্তর অথবা গাদ স্তরের মধ্যে থাকে জীবাণু, ছত্রাক, শৈবাল, এককোষী প্রাণী, কৃমি প্রভৃতি যারা জৈববস্তু খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে এবং BOD-র ওপর জীবন ধারণ করে। গাদ ক্রমশঃ ঘন হতে থাকে। খুব ঘন হয়ে গেলে এই জৈবস্তর প্রবহমান জলের সাথে নীচে নেমে আসে। শোধনের পর পরিশুদ্ধ জল স্তম্ভের নীচে অবস্থিত একটি আধারে সঞ্চিত হয় এবং তারপরে একটি জলগ্রাহকে প্রবাহিত হয়। এখানে উল্লেখ্য এই যে এই পদ্ধতিতে কোনো রকম তথাকথিত filtration বা 'পরিস্রাবণ' হয় না—এটি জলের অধঃপ্রবাহ এবং বায়ুর উর্ধ্বপ্রবাহ দ্বারা জীবাণুকে পোষণ করে এবং তার সাহায্যে বর্জ্য জলের শোধন করে।

সক্রিয় গাদ পদ্ধতি বা activated sludge process চোঁয়ানো ফিল্টারের চেয়ে বেশী প্রচলিত। এই পদ্ধতিতে প্রাথমিক শোধন আধার থেকে আসা বর্জ্য জলের মধ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণ আণুবীক্ষণিক জীবাণুকণাকে ভাসমান অবস্থায় রাখা হয়। Aeration tank বা বায়ু সঞ্চালন আধারে উপযুক্ত ব্যবস্থার সাহায্যে বর্জ্য জলের মধ্যে দিয়ে বায়ু বুদ্‌বুদাকারে চালনা করা হয়। জলে উপস্থিত জৈবিক পদার্থ ও চালিত বায়ুর অক্সিজেন জৈবকণিকার পক্ষে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে ; ফলে নতুন biomass সৃষ্টি হয়। ভুক্ত BOD-র একটা অংশ এই জৈবকণিকার বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি সরবরাহ করে ও অন্য অংশে নতুন কোষ তৈরীতে সহায়তা করে। জৈবক্ষয়ের ফলে কার্বন ডাইঅক্সাইড ও জল উৎপন্ন হয়। জৈবকণিকাগুলি বেশ কিছু সময় নিয়ে উপস্থিত জৈব পদার্থগুলিকে ধ্বংস করে ও BOD-কে গ্রহণযোগ্য মাত্রায় নামিয়ে আনে। এরপর বর্জ্য জল

ভাসমান জৈব কণিকা সহ অন্য একটি আধারে পাঠানো হয় যেখানে জৈবকণিকাগুলি গাদ হিসাবে অধঃক্ষিপ্ত হয় এবং পরিষ্কার জল বেরিয়ে যায়। এই জৈবকণিকাগুলি আরও খাদ্যের জন্য সক্রিয় থাকে বলে এদের সক্রিয় খাদ বা activated sludge বলে। এই গাদ পর্যায়ক্রমে আংশিকভাবে সরিয়ে গাদ প্রক্রিয়াকরণ করা হয়। বাকী গাদ সক্রিয় অবস্থায় আবার বায়ু সঞ্চালন আধারে পাম্পের সাহায্যে পাঠানো হয়। এই প্রক্রিয়া অনবরত চলতে থাকে।

একটি বর্জ্য জলের শোধনাগারে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শোধন প্রক্রিয়ায় প্রচুর গাদ উৎপন্ন হয়। এই গাদে প্রচুর জল (শতকরা ৯৫ শতাংশের মত) এবং প্রধানতঃ জৈব পদার্থ থাকে। বর্জনের আগে এই গাদকে সঠিক ভাবে প্রক্রিয়াকরণ করা হয়। কেননা এই গাদে দুর্গন্ধযুক্ত অবাঞ্ছিত পদার্থ এবং রোগজীবাণু বর্তমান। গাদের এই প্রক্রিয়াকরণকে বলে stabilization। গাদ stabilization-এর সবচেয়ে প্রচলিত পদ্ধতি হল অবাত পরিপাক বা anaerobic digestion। ঘনীভবন আধারে জল মোচনের পর এই প্রক্রিয়া করা হয়। এই পদ্ধতিতে পর্যাপ্ত পরিমাণ জৈব গ্যাস (মিথেন, কার্বনডাই অক্সাইড, নাইট্রোজেন ইত্যাদি সহ) উৎপন্ন হয়। প্রক্রিয়াকৃত গাদে উপস্থিত কঠিন পদার্থের পরিমাণ বৃদ্ধি করার জন্য ঘনীভবন ও জলমোচন করা হয়। ফলে উৎপন্ন আর্দ্র ও কঠিন বস্তু জমি ভরাট করার জন্য ব্যবহার করা হয়। এটিকে সার হিসাবেও ব্যবহার করা যেতে পারে, কিন্তু ভারী ধাতুর উপস্থিতি রোধ না করতে পারলে সার হিসাবে এই গাদ ব্যবহার করা অনুচিত।

8.2.3. চূড়ান্ত শোধন

মাধ্যমিক অর্থাৎ জৈব শোধনের আধার থেকে বহির্গত বর্জ্য জলে তখনও কিছু নাইট্রোজেন ও ফসফরাস ঘটিত যৌগ এবং কিছু বিষাক্ত পদার্থ থাকে। এইগুলি দূর করার জন্য চূড়ান্ত বা অগ্রসর শোধন ব্যবস্থার সাহায্য নেওয়া হয়। একটি প্রচলিত উপায় হল একটি জারণ জলাধার বা পরিমার্জন জলাধার (oxidation pond/polishing pond) ব্যবহার করা। এটি চূড়ান্ত শোধনের জন্য আগত জলের একটি বিরাটাকার উন্মুক্ত আধার। এই আধারে জলের ধারণ সময় বেশ দীর্ঘ, এমনকি কয়েক সপ্তাহও হতে পারে। উপস্থিত দূষকের পরিমাণ অনুসারে এই আধারে বায়ুসঞ্চালনের ব্যবস্থা রাখা হয়। এই জলাধারগুলিকে aerated lagoon বা বায়ুসঞ্চালিত হ্রদ বলা হয়।

8.2.4. শিল্পক্ষেত্রের বর্জ্য জল শোধন

পৌর ব্যবহৃত জলে প্রধান দূষক হল ভাসমান কণা, জৈব ক্ষয়িষ্ণু ও অজৈব ক্ষয়িষ্ণু বস্তু এবং রোগজীবাণু। শিল্প ক্ষেত্রের বর্জ্য জলে দূষক হিসাবে থাকতে পারে অ্যাসিড বা অম্ল, ক্ষারক বা alkali, ভারী ধাতু এবং জৈব অবিশ্লেষ্য ক্ষতিকারক ও বিষাক্ত পদার্থ। লৌহ-ইস্পাত শিল্প, কয়লা অঙ্গারীকরণ, পেট্রোরসায়ন শিল্প, কস্টিক-ক্লোরিন কারখানা, কাগজ শিল্প, ওষুধ শিল্প, প্লাস্টিক, রাবার ও রেজিন শিল্প, ধাতু শিল্প, রঞ্জক ও বস্ত্র শিল্প এবং রাসায়নিক শিল্প প্রধান জলদূষক।

অম্ল বা acid এবং ক্ষারক বা alkali বিভিন্ন ধরণের শিল্পের বর্জ্য জলে থাকতে পারে। এই বর্জ্য জল পরিবেশে নির্গমনের আগে neutralization বা প্রশমন করা হয়, কেননা অম্ল বা ক্ষার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে হানিকর। ইস্পাত কারখানা, ধাতু সমাপ্তিকরণ কারখানা এবং রঙ কারখানা থেকে ভারী ধাতু নির্গত হয় যা অধঃক্ষিপ্ত করা প্রয়োজন। পেট্রোরসায়ন ও জৈব রসায়নিক শিল্প থেকে বিষাক্ত জৈব পদার্থ, cyanide এবং রঞ্জক পদার্থ নির্গত হয় যা প্রায়শঃই জৈব অবিশ্লেষ্য। বিশেষ রাসায়নিক পদ্ধতিতে তাই শিল্পের বর্জ্য জল শোধন করা হয়। শিল্পাঞ্চলগুলিতে যৌথ জলশোধন ব্যবস্থা ব্যবহার করা আর্থিকভাবে লাভজনক ; দেশের দু' একটি শিল্পাঞ্চলে এরকম ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে।

অংশতঃ শোধিত অথবা পুরোপুরি অশোধিত শিল্প বর্জ্য জল ও পৌর ব্যবহারের বর্জ্য জলের ক্ষতিসাধনের উদাহরণ হল গঙ্গা বা হুগলী নদীর বর্তমান অবস্থা। এই ধমনীস্বরূপা নদী, যার অর্থনৈতিক ও সামাজিক গুরুত্ব অপরিসীম, তা আজ সম্পূর্ণ দূষিত। কলকাতা ও হাওড়া শহরের পৌর ব্যবহৃত এবং শিল্প বর্জ্য জল থেকে হুগলী নদীতে নির্গত BOD-র পরিমান

যথাক্রমে প্রতিদিনে প্রায় 120 টন (পৌর ব্যবহৃত জল) এবং 270 টন (শিল্প বর্জ্য জল)। কৃষি বর্জ্য জলের দূষণ হয় মূলতঃ কীটনাশক ও সার থেকে। এই দূষণও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। গঙ্গা অ্যাকশন প্ল্যান-এ অনেকগুলি বর্জ্য জলের শোধনাগার তৈরী হয়েছে, যার সবকটি এখনও চালু হয়নি। ফলে জলের মান এখনও গ্রহণযোগ্যতার অনেক নীচে। কলকাতা শহরের জন্যে কোনো পুরোদস্তুর পৌর বর্জ্য বস্তু শোধনাগার নেই। আংশিক সময়ের জন্যে চালু একটি শোধনকেন্দ্র রয়েছে বাগতলায় যা নাকি কলকাতার প্রতিদিনের বর্জ্য জল আংশিক ভাবে শোধন করতে পারে।

বর্জ্য জল ও বর্জ্য বস্তুর শোধনের জন্যে অনতিবিলম্বেই ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন।

8.3. বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ

8.3.1. নাইট্রোজেন অক্সাইডগুলি (NO_x) দূরীকরণ

চুল্লী, ইঞ্জিন প্রভৃতিতে জ্বালানী দহনের ফলে তিনটি প্রক্রিয়ায় নাইট্রোজেনের অক্সাইড তৈরী হয় (সাধারণতঃ নাইট্রিক অক্সাইড এবং নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড, একসঙ্গে NO_x বলা হয়)। এগুলি হল—

(i) উচ্চ তাপমাত্রায় নাইট্রোজেন ও অক্সিজেনের বিক্রিয়া। একে 'তাপঘটিত NO_x' (thermal NO_x) বলে।

(ii) কয়লা বা খনিজ তেলের মধ্যকার নাইট্রোজেন ঘটিত যৌগের একাংশ জারিত হয়ে NO_x তৈরী করে। একে 'জ্বালানীঘটিত NO_x' (fuel NO_x) বলে।

(iii) তৃতীয় প্রক্রিয়াটি হল বাতাসের নাইট্রোজেন ও দহনজাত পদার্থের বিক্রিয়া এবং জারণ দ্বারা উৎপন্ন NO_x—এটি শিখার ঠিক মূলে ঘটে। এভাবে জাত নাইট্রোজেন অক্সাইডগুলিকে 'তাৎক্ষণিক বা prompt NO_x' বলে।

প্রথম দুটি প্রক্রিয়াই প্রধানতঃ দহনের সময়ে NO_x উৎপন্ন করে। আরও কিছু পদ্ধতিতে শিল্পে NO_x তৈরী হয়—তার মধ্যে প্রধান একটি হল নাইট্রিক অ্যাসিড প্রস্তুতি।

দহনের সময় NO_x উৎপাদনের মাত্রা কমানোর বেশ কয়েকটি পদ্ধতি প্রচলিত আছে। একটি জ্বালানীর জন্যে সবচেয়ে ফলপ্রদ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি নির্ভর করে NO_x সৃষ্টির প্রধান উপায়ের উপর। প্রাকৃতিক গ্যাস বস্তুতঃ নাইট্রোজেন যৌগ মুক্ত। তাই প্রাকৃতিক গ্যাস দহনের ফলে কেবলমাত্র 'তাপঘটিত NO_x' উৎপন্ন হয়। কিন্তু খনিজ তেলের দহনে 'জ্বালানী ঘটিত NO_x' নাইট্রোজেন অক্সাইডের প্রায় 80 শতাংশ অধিকার করে। কয়লা দহনে জ্বালানী ঘটিত NO_x-এর পরিমাণ 50-60 শতাংশ ; অবশিষ্টাংশ তাপঘটিত NO_x।

যেহেতু নাইট্রোজেন ও অক্সিজেনের রাসায়নিক বিক্রিয়া খুবই উচ্চ তাপমাত্রায় ঘটে (এই কারণেই বজ্রবিদ্যুৎ দ্বারা আবহমণ্ডলে NO_x উৎপন্ন হয়), NO_x নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি নিম্নলিখিত ভিত্তির উপরে করা হয় :

(i) দহন তাপমাত্রার নিয়ন্ত্রণ এবং

(ii) ফ্লু গ্যাসের NO_x উপযুক্ত রাসায়নিক দ্বারা দূরীকরণ।

প্রথম পদ্ধতি তথা দহন নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি প্রয়োগগত দিক থেকে সহজতম। এটি শিখার উচ্চতম তাপমাত্রা কমিয়ে আনে এবং 'তাপঘটিত NO_x'-এর পরিমাণ কমায়। দহন প্রক্রিয়া কয়েকটি ধাপে হয়। প্রথম ধাপে জ্বালানী নাইট্রোজেন অক্সিজেনবিরল অঞ্চলে মুক্ত হয়। দ্বিতীয় ধাপে অতিরিক্ত বায়ু সরবরাহ করে দহন সম্পূর্ণ করা হয় যখন দেখা যায় জ্বালানী নাইট্রোজেন আণবিক নাইট্রোজেনে পরিণত হয়েছে। এই উপায়ে NO_x সৃষ্টি কমিয়ে 50 শতাংশে নামিয়ে আনা যায়। চুল্লীর

দহনাঞ্চলে অ্যামোনিয়া বা ইউরিয়ার মত বিজারক পদার্থ প্রবেশ করিয়ে এই NO_x উৎপাদনের মাত্রা আরও কমিয়ে আনা যায়। এই রাসায়নিক পদার্থগুলি NO_x-এর সঙ্গে বিক্রিয়া করে নাইট্রোজেন তৈরী করে। এই পদ্ধতিকে বিশেষ অনুঘটকবিহীন বিজারণ (selective non-catalytic reduction, SNCR) বলে। এই পদ্ধতির কার্যকারিতা নির্ভর করে রাসায়নিক পদার্থটি উপযুক্ত তাপমাত্রায় প্রবেশ করানো এবং গ্যাস ও রাসায়নিকের সুষম মিশ্রণের ওপর।

দহনোত্তর নিয়ন্ত্রণের ওপর নির্ভর করে একই রাসায়নিকের সাহায্যে অনুঘটকের দ্বারা NO_x কমানোর একটি বিকল্প পদ্ধতি আছে। ভ্যানাডিয়াম পেন্টক্সাইড (V_2O_5) এই বিক্রিয়ার একটি কার্যকরী অনুঘটক। এটি 370°C—400°C তাপমাত্রায় সবচেয়ে কার্যকরী হয়।

$$6NO + 4\ NH_3 \rightarrow 5N_2 + 6H_2O$$
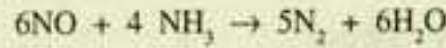
উপরোক্ত পদ্ধতিগুলির সমন্বয়ের দ্বারা NO_x সৃষ্টির স্বাভাবিক পরিমাণের 20 শতাংশে নামিয়ে আনা সম্ভব। বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন কেন্দ্র সহ বিভিন্ন চুল্লীতে NO_x নিয়ন্ত্রণে উপরোক্ত পদ্ধতিগুলি খুবই কার্যকরী।

8.3.2. সালফার অক্সাইডগুলির (SO_x) দূরীকরণ

অ্যাসিড বৃষ্টির জন্য মূলতঃ দায়ী সালফারের অক্সাইডগুলি। শক্তি উৎপাদন কেন্দ্র, দস্তা ও তামার নিষ্কাশন কেন্দ্র [*], সালফিউরিক অ্যাসিড সহ রসায়ন শিল্পগুলি থেকে এই সালফারের অক্সাইড নির্গত হয়। কয়লার মধ্যে সালফার থাকে অজৈব সালফার (প্রধানতঃ পাইরাইটস) এবং জৈব সালফার (কয়লার বিধৃত অবস্থায়) হিসাবে। দহন কালে কয়লার সালফার জারিত হয়ে অক্সাইডে পরিণত হয়। বেশ কিছু পরিমাণ অজৈব সালফার কয়লা পরিষ্কার ও ধৌতির সময় নিষ্ক্রান্ত হয়। এর ফলে কয়লা আপেক্ষিকভাবে অশুদ্ধিমুক্ত হয়। অবশ্য এর দ্বারা সমস্যা সম্পূর্ণ দূর হয় না। বর্তমানে ফ্লু গ্যাস থেকে দহনকালেই SO_x দূরীকরণের প্রযুক্তি সুলভ হয়েছে। চুনাপাথরের গুঁড়ো ও জলের তরল মিশ্রণের সাহায্যে গ্যাস পরিস্রুত করা (wet scrubbing) এর মধ্যে সর্বাধিক প্রচলিত। সালফারের অক্সাইড, প্রধানতঃ সালফার ডাইঅক্সাইড (SO_2), চুনাপাথরের সঙ্গে নিম্নরূপ বিক্রিয়া করে এবং ক্যালসিয়াম সালফেট (জিপসাম) উৎপন্ন হয়। এটি একটি সফল প্রযুক্তি এবং পৃথিবীতে বহু শক্তি উৎপাদন কেন্দ্রে এই পদ্ধতি গৃহীত হয়েছে। এই পদ্ধতির একটি প্রধান অসুবিধা হল বিপুল পরিমাণ ক্যালসিয়াম সালফেট গাদের উৎপাদন। একটি বিকল্প কার্যকরী পদ্ধতি হল শুষ্ক পরিষ্করণ বা dry scrubbing। চুন ও চুনাপাথর সোজা চুল্লীর মধ্যে প্রবেশ করানো হলে সালফারের অক্সাইডগুলি উৎপাদনস্থলেই ক্যালসিয়াম সালফেটে পরিণত হয় ও চুল্লীর ছাই-এর সঙ্গে বর্জিত হয়।

$$CaCO_3 + SO_2 + H_2O_2 \rightarrow CaSO_4 + CO_2$$
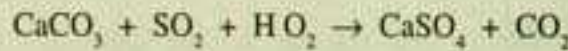
8.3.3. মোটরগাড়ী থেকে উৎসারণ রোধ

বায়ুদূষণে যানবাহন থেকে উৎসারিত কার্বন মনোক্সাইড (CO), অদগ্ধ হাইড্রোকার্বন, NO_x এবং কিছু পরিমাণ SO_x এর প্রভাব উল্লেখযোগ্য। যানবাহন থেকে নির্গত বায়ুদূষণের সমস্যা শহরাঞ্চলে খুবই বেশী। আধুনিক ইঞ্জিনের সাহায্যে নির্গত গ্যাসে উপস্থিত দূষকের মাত্রা কমানোর ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

---

[*] কানাডার সাডবেরিতে অবস্থিত একটি বিশাল তামা নিষ্কাশনের কারখানা থেকে সর্বাধিক সালফার ডাইঅক্সাইড নির্গত হয়। ষাটের দশকে এই কারখানা থেকে প্রতি বছর পঁচিশ লক্ষ টন গ্যাস ছাড়া হত। এর ফলে ঐ এলাকার বনাঞ্চল প্রভূতভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বর্তমানে এই কারখানা থেকে প্রায় 3,65,000 টন সালফার ডাইঅক্সাইড নির্গত হয়।

নাইট্রোজেন অক্সাইডের মাত্রা নিয়ন্ত্রণের জন্যে দহনাঞ্চলের তাপমাত্রা কমানো হয়। এই বিষয়ে চুল্লীতে ব্যবহৃত মূলনীতিই এখানে অনুসরণ করা হয়। নির্গত গ্যাসের একটি অংশকে টাটকা বাতাস ও জ্বালানীর সঙ্গে মিশিয়ে পুনরাবর্তিত করা হয়। অক্সিজেনের মাত্রার তুলনায় জ্বালানী ও বায়ুর অনুপাত লঘু হয়। উচ্চতম দহন তাপমাত্রা এবং NO_x উৎপাদন তার ফলে কমে যায় কিন্তু অসুবিধা হল এই পদ্ধতিতে অক্সিজেনের পরিমাণ কম থাকায় নির্গত গ্যাসে অদগ্ধ হাইড্রোকার্বনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।

কার্বন মনোক্সাইড ও হাইড্রোকার্বন কমানোর সবচেয়ে প্রচলিত যন্ত্র হল অনুঘটকীয় পরিবর্তক। ইঞ্জিন থেকে নির্গত গ্যাস একটি ছোট অনুঘটকপূর্ণ প্রকোষ্ঠের মধ্যে দিয়ে যায়। অনুঘটকটি হল অ্যালুমিনার উপর সূক্ষ্মভাবে বিভক্ত বরধাতু (noble metal, প্লাটিনাম বা প্যালাডিয়াম)। একটি সাধারণ অনুঘটকীয় পরিবর্তক বা catalytic converter-এ দেড় গ্রাম বরধাতু লাগে। নির্গত গ্যাসের কার্বন মনোক্সাইড ও হাইড্রোকার্বন এই পরিবর্তকের মধ্যে জারিত হয়ে কার্বন ডাইঅক্সাইড ও জলে পরিণত হয় এবং অপেক্ষাকৃতভাবে দূষণমুক্ত গ্যাস যানবাহনের নির্গমন নল দিয়ে নির্গত হয়। ইঞ্জিনের কর্মক্ষমতা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কমতে থাকে—অনুঘটকীয় পরিবর্তকের কার্যকারিতাও তার সঙ্গে কমে যায় ; ফলে পুরোনো যানবাহন নতুনের তুলনায় বেশী দূষক বাতাসে ছাড়ে। উৎসারণের নির্দিষ্ট মাত্রার মধ্যে রাখার জন্যে তাই মাঝে মাঝে নির্গত গ্যাস পরীক্ষা করাতে হয়, পুরানো যানবাহনে অনুঘটকীয় পরিবর্তক লাগানোর ফলে নির্গত গ্যাসের মান উন্নত হয়। সীসাযুক্ত জ্বালানীতে এই অনুঘটকীয় পরিবর্তক কাজ করে না কেননা অনুঘটকের উপর সীসার ক্ষতিকর প্রভাবে অনুঘটক নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে।

8.3.4. পারদের উৎসারণ

মার্কারী বা পারদ কয়লার মধ্যে খুবই সামান্য পরিমাণে (দশলক্ষ ভাগে এক ভাগ) বর্তমান। দহনকালে মৌল হিসাবে এবং অক্সাইড, ক্লোরাইড ও সালফেট যৌগ হিসাবে পারদ ফ্লু গ্যাসের সঙ্গে নির্গত হয়। ফ্লু গ্যাসে পারদের পরিমাণ খুবই কম হলেও সারা বছরের হিসাবে পারদের উৎসারণের পরিমাণ কিন্তু উল্লেখযোগ্য। আমেরিকার একটি সাম্প্রতিক সমীক্ষায় প্রকাশ যে শক্তি উৎপাদন কেন্দ্রগুলি থেকে উৎসারিত পারদের পরিমাণ শিল্প বা অন্যান্য উৎস থেকে পারদ উৎসারণের প্রায় পঞ্চাশ শতাংশ। একটি 500 মেগাওয়াট পরিমাণ শক্তি উৎপাদন কেন্দ্র থেকে বছরে 60 থেকে 120 কিগ্রা—পারদ উৎসারিত হয়। এটি একটি বিপদজনক পরিমাণ। ফ্লু গ্যাস থেকে মার্কারী বা পারদ দূর করার কোনো সফল প্রযুক্তি নেই। ফ্লু গ্যাসের আর্দ্র পরিষ্করণ (wet scrubbing) প্রক্রিয়ায় লবণ হিসাবে উপস্থিত পারদের 50 শতাংশ দূর হয়ে যায় বলে জানা গেছে।

8.3.5. সূক্ষ্মকণা দূরীকরণ

সূক্ষ্ম কঠিন বস্তুকণা আবহমণ্ডলে অপরিহার্যভাবে বর্তমান। বেশী মাত্রায় কিংবা নির্দিষ্ট কিছু সূক্ষ্ম কণার উপস্থিতি মানব দেহের পক্ষে ক্ষতিকর। প্রায় সব শিল্প ও কৃষিকর্মই সূক্ষ্ম বস্তুকণা আবহমণ্ডলে বর্জন করে। সূক্ষ্ম বস্তুকণাগুলিকে নিম্নোক্ত ভাগে ভাগ করা যায়।

ধুলো (dust) : বস্তুর প্রক্রিয়াকরণ এবং যে কোনো যান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপকালে নির্গত বাতাসে ভাসমান কঠিন বস্তুকণাগুলি এর অন্তর্গত। কয়লার গুঁড়ো, চুল্লীর ছাই, সিমেন্ট, কাঠের গুঁড়ো, বালি ইত্যাদি উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে। এই ধরনের বস্তুকণার মাপ সাধারণতঃ 0.1 থেকে 75 মাইক্রন পর্যন্ত হয় (এক মাইক্রন = এক মিলিমিটারের এক হাজার ভাগের এক ভাগ)।

বাষ্প (vapour/fume) : রাসায়নিক, খনিজ ও অন্যান্য শিল্পের থেকে জাত বাষ্পের ঘনীভবনের ফলে উৎপন্ন খুবই সূক্ষ্ম বস্তুকণা বাষ্প বা fume আকারে নির্গত হয়। কণার মাপ হয় 0.03 থেকে 0.3 মাইক্রন।

শীকর (mist) : রাসায়নিক ও শিল্পের বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় জাত বাষ্পের ঘনীভবনের ফলে যে সূক্ষ্ম তরলকণা পাওয়া যাতে তাকে mist বা শীকর বলে। কণার মাপ 0.5 থেকে 3 মাইক্রন পর্যন্ত হতে পারে।

ধোঁয়া (smoke) : কার্বনজাত বস্তুর অসম্পূর্ণ দহনের ফলে উৎপন্ন ধোঁয়াতে 0.05 থেকে 1 মাইক্রন পর্যন্ত মাপের কঠিন বস্তুকণা বর্তমান থাকে।

শিল্পের বিভিন্ন প্রক্রিয়া সব রকম বস্তুকণার উৎস। উদাহরণস্বরূপ শক্তি উৎপাদন কেন্দ্র, সহায়ক বয়লার, চুল্লী, ধাতু নিষ্কাশক প্রভৃতি। কৃষিকর্ম ও যানবাহনও দূষক হিসাবে বস্তুকণা নির্গত করে। দাবানল, শুকনো পাতা পোড়ানো, কাঠের চুল্লী প্রভৃতি থেকেও বাতাসে বস্তুকণা ছড়িয়ে পড়ে। গ্রামাঞ্চলে বায়ুদূষণের এগুলি প্রধান কারণ। সীসা নিষ্কাশক থেকে লেড অক্সাইড নিঃসৃত হয় ; তামা নিষ্কাশক ও কাঁচ গলানোর চুল্লী থেকে অন্য দূষক ছাড়াও আর্সেনিয়াস অক্সাইড উৎসৃত হয়। বাতাসে সীসা ছড়ানোর জন্য যানবাহনের ধোঁয়া বহুলাংশে দায়ী। ধাতু প্রক্রিয়াকরণ, কয়লা পরিবহন, পাথর কাটাই প্রভৃতি বেশ কিছু শিল্পে প্রচুর বস্তুকণা নির্গত হওয়া সত্ত্বেও উপযুক্ত ধুলো নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা নেই। উদাহরণস্বরূপ পাথর কাটাই শিল্পে দু' কিলোমিটার দূরবর্তী অঞ্চলের বাতাসেও পাথরের গুঁড়ো পাওয়া যায়। দিল্লী শহরে নিকটবর্তী পাথর কাটাই শিল্পাঞ্চলে বায়ুদূষণ কয়েক বছর আগে প্রচুর কর্মীর ওপর বিপজ্জনক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে এবং পরিণামে পাথার-কাটাই কারখানাগুলি বন্ধ করে দেওয়া হয়। মেদিনীপুরের ঝাড়গ্রামের কাছে একটি পাথর কাটাই শিল্পের বেশ কিছু শ্রমিক বেশী মাত্রায় বায়ু দূষণের শিকার হয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন ও এই ঘটনা খবরের কাগজের শিরোনাম হয়। সিলিকোসিসে আক্রান্ত হয়ে অনেকের মৃত্যু ঘটে। সুপ্রিম কোর্টে মৃত ও অসুস্থ শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ দানের আদেশ দেওয়া হয়।

আর একটি ক্ষতিকারক বস্তু হল অ্যাসবেসটস যা মূলতঃ ছাউনি, পার্টিশন ও অপরিবাহী পদার্থ হিসাবে কাজে লাগে। অ্যাসবেসটস প্রক্রিয়াকরণ কারখানার নিকটবর্তী অঞ্চলের বাতাসে সূক্ষ্ম অ্যাসবেসটস তন্তু পাওয়া যায়। এর ফলে অ্যাসবেসটোসিস (asbestosis) এবং ফুসফুসের ক্যানসার হতে পারে। অনেক উন্নত দেশে অ্যাসবেসটসের ব্যবহার বর্তমানে নিষিদ্ধ।

যে সব শক্তি উৎপাদন কেন্দ্র গুঁড়ো কয়লা জ্বালানী হিসাবে ব্যবহার করে তা থেকে উড়ন্ত ছাই বা fly ash বেরোয়। এটি একটি পরিবেশ দূষণের সমস্যা। ভারতে প্রতিদিন 100,000 টন উড়ো ছাই উৎসৃত হয়।

অন্য বায়ুদূষকের মত বস্তুকণাগুলিকেও উৎসেই নিয়ন্ত্রণ করা উচিত কেননা একবার এই দূষক নির্গত হয়ে পরিবেশে ছড়িয়ে পড়লে তাকে দূর করার কোনো উপায় থাকে না যতক্ষণ না সেগুলি নিজে থেকে থিতিয়ে পড়ে অথবা বৃষ্টিতে অধঃক্ষিপ্ত হয় অথবা আবহমণ্ডলের নিজস্ব রাসায়নিক পদ্ধতিতে তার রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে। উৎসে এই বস্তুকণা নিয়ন্ত্রণের জন্য কতগুলি যন্ত্র আছে। তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণগুলি নীচে বলা হল :

8.3.5.1. বাধক অভিকর্ষজ অধঃক্ষেপক (Baffled gravity settler)

অভিকর্ষজ অধঃক্ষেপক একটি দীর্ঘ প্রকোষ্ঠ যার মধ্যে দিয়ে বস্তুকণা যুক্ত গ্যাস খুব কম গতিবেগে প্রবাহিত হয়। অনেকগুলি অনুভূমিক বাধক পাত (baffles) এই প্রকোষ্ঠে লাগানো থাকে যাতে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে ধুলোকণা এই প্রকোষ্ঠেই অধোক্ষিপ্ত হয় এবং পরিষ্কৃত গ্যাস বেরিয়ে যায়। এটি 100 মাইক্রন বা তার চেয়ে বড় মাপের বস্তুকণা দূর করার জন্য একটি সহজ ও সরল ব্যবস্থা।

8.3.5.2. ঘূর্ণি পৃথকীকারক (Cyclone separator)

এই যন্ত্রটির (চিত্র 8.3) ঊর্ধ্বভাগ চোঙাকৃতি ও নিম্নভাগ শঙ্কু আকৃতির হয়। ধূলিকণাসম্বলিত গ্যাস একটি স্পর্শক-রেখা ধরে যন্ত্রের উপর অংশে প্রবেশ করে। ঘূর্ণিবেগে এই গ্যাস তলার শঙ্কু আকৃতি অংশে ঢোকে এবং আবার উপর অংশ দিয়েই বেরিয়ে যায়। স্পর্শক গতিবেগের ফলে ধূলিকণা তলার অংশে সঞ্চিত হয় ও তলা দিয়েই বর্জিত হয়।
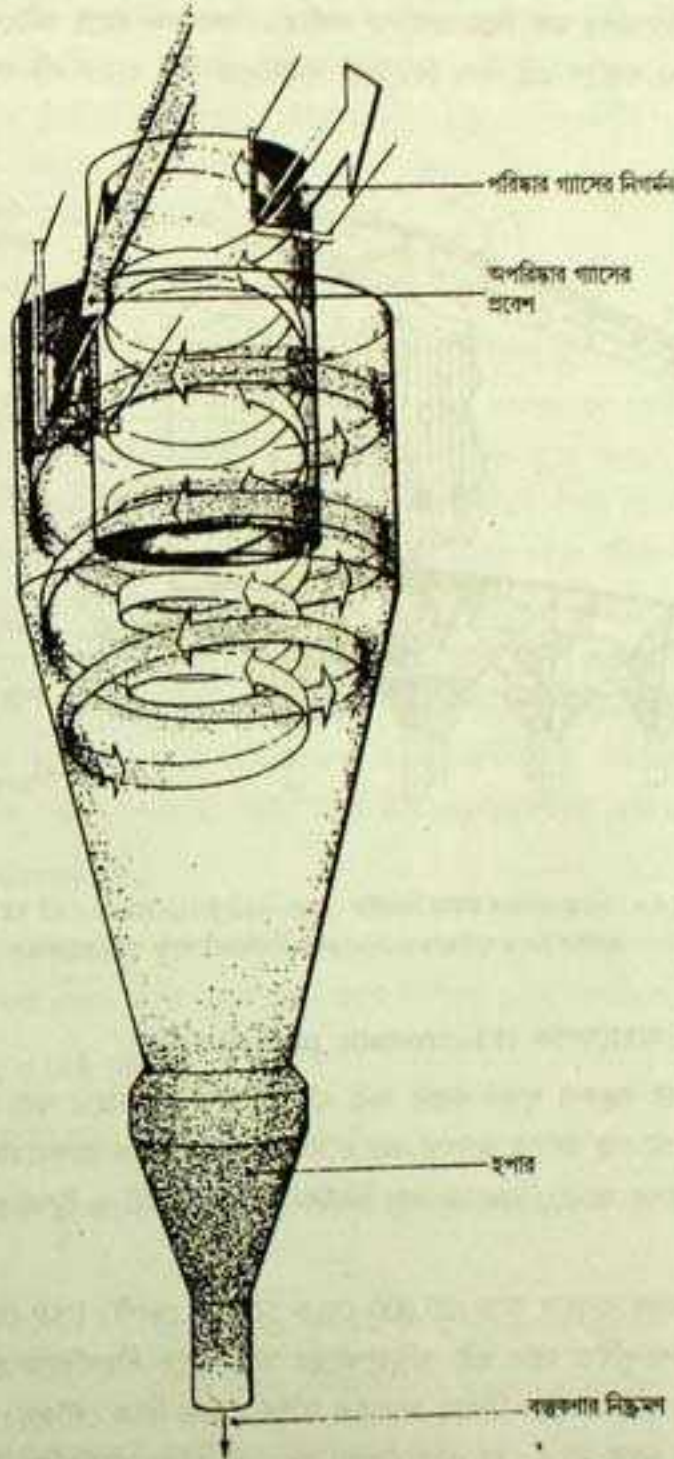
চিত্র 8.3. ঘূর্ণি পৃথকীকারক (Cyclone separator) ঃ এই অধঃক্ষেপক যন্ত্র ধুলোময়লা অপসারণের জন্য খুবই উপযুক্ত।

8.3.5.3. কাপড়ের বা ব্যাগের ফিল্টার (Fabric or bag filter)

ঘর্ষক কণা (abrasive particles), রাসায়নিক চূর্ণ, চুল্লীর নির্গত গ্যাস, সিমেন্ট প্রভৃতির কণাকে ফিল্টার করার জন্যে এই ফিল্টার (চিত্র 8.4) ব্যবহৃত হয়। এর কার্যনীতি ভ্যাকুয়াম ক্লিনারের মত। প্রধান পৃথকীকরণ বা filter-এর মাধ্যমটি হল একটি কাপড়, পলিয়েস্টার বা কাচতন্তুর তৈরী ব্যাগ। কারখানার 'ব্যাগ কক্ষ'-তে এই ব্যাগগুলি ঝোলানো অবস্থায় থাকে। কঠিন কণাযুক্ত গ্যাস এই ব্যাগগুলির মধ্য দিয়ে প্রবাহিত করা হয়। কণাগুলি ব্যাগে আটকে থাকে। 0.5 থেকে 5 মাইক্রন মাপের বস্তুকণার শতকরা 99 শতাংশ এই ব্যাগ ফিল্টারে পৃথকীকৃত করা যায়। এটি বহুল ব্যবহৃত হয় সিমেন্ট শিল্পে।
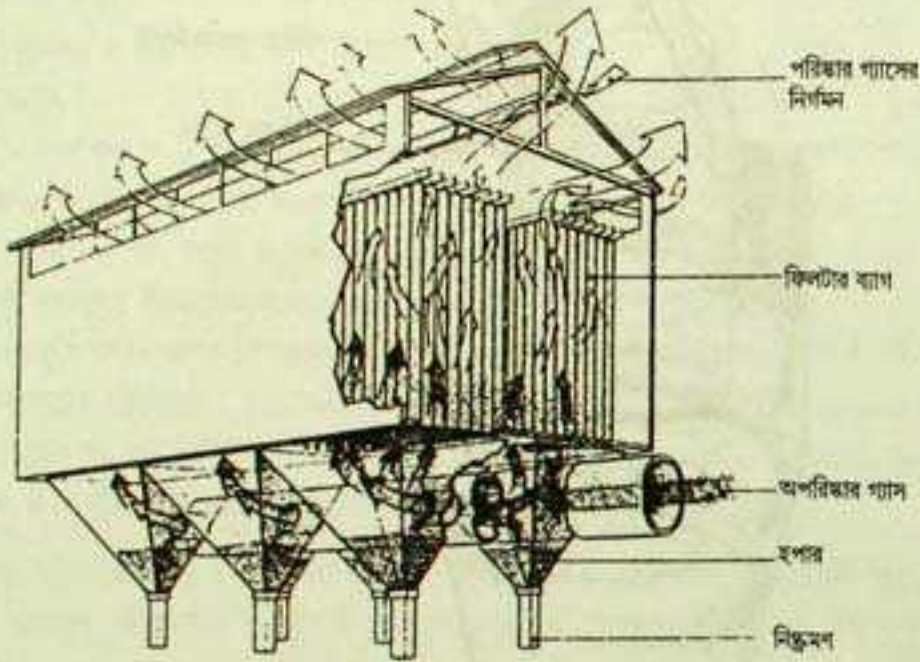
চিত্র 8.4. শিল্পে ব্যবহৃত তন্তুজ ফিল্টার (Industrial fabric filter) : এই যন্ত্র ধুলোময়লা আটকে রেখে পরিষ্কার গ্যাস বাতাসে নির্গমনের পক্ষে খুবই সহায়ক।

8.3.5.4. স্থির তড়িৎ চালিত অধঃক্ষেপক (Electrostatic precipitator)

বাষ্পসহ বিভিন্ন মাপের বস্তুকণা পৃথক করার জন্য এই যন্ত্র (ESP) ব্যবহার করা হয়। অত্যন্ত কার্যকারিতার সঙ্গে এটি 1 মাইক্রনের চেয়েও ছোটো বস্তু কণাকে আলাদা করতে সক্ষম। এই যন্ত্র উচ্চ তাপমাত্রাতেও কাজ করে। শক্তি উৎপাদন কেন্দ্রে (উড়ন্ত ছাই পৃথকীকরণের জন্যে), তামা ও দস্তা নিষ্কাশন শিল্পে, সিমেন্ট ও ইস্পাত উৎপাদন কেন্দ্রে ESP ব্যবহার হয়।

বিশাল DC বিভব প্রভেদ ব্যবহার করে (20,000 থেকে 50,000 ভোল্ট) ESP-তে একটি শক্তিশালী স্থির তড়িৎ-ক্ষেত্র তৈরী করা হয়। বস্তুকণা-দূষিত গ্যাস এই তড়িৎক্ষেত্রের মধ্যে দিয়ে ধীরগতিতে প্রবাহিত হয়। সূক্ষ্ম বস্তুকণাগুলি তড়িতাধানে পরিণত হয় এবং তড়িৎক্ষেত্রের ক্রিয়ায় সংগ্রাহক তড়িৎ মেরুর দিকে পৌঁছায়। সঞ্চিত ধূলিস্তর সংগ্রাহক তড়িৎ মেরুতে জমা হতে থাকে, যা মাঝে মাঝে বের করে নেওয়া হয়। এই যন্ত্রের কার্যকারিতা খুব বেশী কিন্তু এটি বেশ দামী যন্ত্র।

8.4. দীর্ঘস্থায়ী জৈব দূষক (Persistent organic pollutant)

দীর্ঘস্থায়ী জৈব দূষক বা POP হল এমন জৈব যৌগ যারা খুবই ধীরে জৈব বিশ্লেষিত হয় অথবা প্রায় অবিশ্লেষ্য। বিভিন্ন শিল্প ও কৃষিকর্মের মাধ্যমে এই ধরনের বস্তু পরিবেশে বর্জিত হয়। বর্তমানে এটা স্বীকৃত সত্য যে প্রাণীর প্রজনন, বৃদ্ধি ও প্রতিরোধ ক্ষমতার উপর এসব বস্তুর প্রবল বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়। এই বস্তুগুলি সাধারণতঃ ক্যানসার সৃষ্টিকারী। দীর্ঘস্থায়ী জৈব বস্তুর মধ্যে বারোটি রাসায়নিক শ্রেণী রয়েছে যার মধ্যে রয়েছে পলিক্লোরিনেটেড বাইফিনাইল (PCB), পলিক্লোরিনেটেড ডাইবেনজো-ডাইঅক্সিন (PCDD), পলিক্লোরিনেটেড ডাইবেনজোফিউরান এবং ডিডিটি, ক্লোরানডেন, হেপ্টাক্লোর, হেক্সাক্লোরো বেনজিন (HCB), হেক্সাক্লোরো সাইক্লোহেক্সেন (HCH), অ্যালড্রিন, ডাইঅ্যালড্রিন প্রভৃতি কীটনাশক এবং ন্যাপথালিন, অ্যানথ্রাসিন, পাইরিন, বেনজোপাইরিন প্রভৃতি পলিনিউক্লিয়ার অ্যারোম্যাটিক হাইড্রোকার্বন। এই সব কীটনাশকের অনেকগুলিই উন্নত দেশে স্বল্প ব্যবহৃত বা নিষিদ্ধ।

8.4.1. জৈববিবর্ধন (Biomagnification)

উল্লিখিত যৌগগুলি জলে অদ্রবণীয়, এবং এদের বেশীর ভাগেরই বাষ্প চাপ অত্যন্ত কম। কিন্তু এগুলি স্নেহাসক্ত (fat loving or lipophilic) অর্থাৎ স্নেহ বা তেল জাতীয় দ্রাবকে এদের দ্রাব্যতা খুব বেশী। এই বস্তুগুলি যদি জীবদেহে প্রবেশ করে, তাহলে দেহের চর্বিতে এগুলি আবদ্ধ হয় এবং ক্রমশঃ সঞ্চিত হতে থাকে। এইবার এই সব জীব যাদের দেহে দূষক বর্তমান, তাদের যদি অন্য পশু খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে তবে সেই খাদক পশুর দেহেও POP সঞ্চারিত হয়। POP—দূষিত খাদ্য বারবার খাওয়ার ফলে খাদকের দেহে বিপজ্জনক মাত্রায় POP সঞ্চিত হয়। এইভাবে জীবিত দেহের কলায় (tissue) খাদ্যশৃঙ্খলের মাধ্যমে বিষাক্ত পদার্থের ক্রমবর্ধমান সঞ্চয় হওয়াকে bioaccumulation বা biomagnification অর্থাৎ জৈবসঞ্চয় অথবা জৈববিবর্ধন বলে। এটি স্নেহাসক্ত পদার্থের বৈশিষ্ট্য। পক্ষান্তরে স্নেহভীত (lipophobic) দূষক (ফসফরাসঘটিত জৈব কীটনাশক যেমন প্যারাথিয়ন, ম্যালাথিয়ন প্রভৃতি) জলে দ্রবণীয় এবং চর্বিতে অদ্রবণীয়। ফলে স্বেদ এবং রেচনের সঙ্গে সহজেই এই দূষক দেহ থেকে বেরিয়ে যায়। একই বিষক্রিয়াযুক্ত স্নেহভীত পদার্থ ও স্নেহাসক্ত পদার্থের মধ্যে স্নেহভীত পদার্থ কম ক্ষতি করে কেননা তা দেহের মধ্যে দীর্ঘ সময় থাকে না এবং দেহের মধ্যে সঞ্চিতও হয় না।

8.4.2. পরিবেশে দীর্ঘস্থায়ী জৈবদূষক

দীর্ঘস্থায়ী জৈবদূষক (POP) ঘটিত প্রচুর ঘটনার বিবরণ পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ আমেরিকার মিশিগান হ্রদের DDT-র জৈববিবর্ধনের উল্লেখ করা যেতে পারে। কয়েকবছর আগে মিশিগান হ্রদের আবহমণ্ডলে DDT-র মাত্রা ছিল এরকম :

হ্রদতলের অধঃক্ষেপ : 0.014 ppm

মাছ : 3—6 ppm, মৎস্য-ভূক পাখি : 2400 ppm

মাছের দেহের মধ্যেকার POP-এর জৈববিবর্ধনের পরিমাণ বোঝাবার জন্যে জৈবমাত্রা গুণিতক বা bioconcentration factor ব্যবহার করা হয়।

$$\text{জৈব মাত্রা গুণিতক (BCF)} = \frac{\text{মাছের দেহে দূষকের মাত্রা (concentration)}}{\text{জলের মধ্যে দূষকের মাত্রা (concentration)}}$$

রাসায়নিক পরীক্ষায় মাপা কয়েকটি POP-এর BCF হল :

DDT = 54000, ডাইঅক্সিন = 5000, PCB = 100,000, হেপ্টাক্লোর = 15,700 ppm

হেক্সাক্লোরোবেঞ্জিন এবং PCB-কে 'ডাইঅক্সিনসদৃশ' যৌগ বলা হয় কারণ এদের শারীরবৃত্তীয় প্রতিক্রিয়া একই রকম। দুধসহ অনেক খাদ্যবস্তুতেও এই যৌগ পাওয়া গেছে। এমনকি মায়ের দুধেও এই দূষক পাওয়া গেছে। আমাদের দেশে কীটনাশক ঘটিত দূষণ, জৈব বিবর্ধন ও তার ফলে মানুষ ও পশুর জীবন ও স্বাস্থ্যের ক্ষতিগ্রস্ত হবার প্রচুর ঘটনা জানা গেছে, কীটনাশক ঘটিত দূষণে মাছের গুরুতর রোগ ধরা পড়েছে কেরালার কুট্টানাড জেলায়। উড়িষ্যার চিল্কা ও অন্ধ্রপ্রদেশের কোল্লেরু হ্রদে কীটনাশক-অবশেষ মাছ ও পাখিদের নিদারুণ ক্ষতি করেছে। বেশ কয়েক বছর আগে কর্ণাটকের চিকমাগালুরে কীটনাশক দূষিত কাঁকড়া খেয়ে অনেক লোক মারা গিয়েছিল।

কীটনাশক ছাড়া দীর্ঘমেয়াদী জৈব দূষক সোজাসুজি তৈরী করা হয় না—বহু শিল্প ও রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় এই দূষক স্বভাবতঃ খুবই সামান্য মাত্রায় হলেও তৈরী হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, ডাইঅক্সিন নামে একটি বিষাক্ত ও ক্যান্সার সৃষ্টিকারী যৌগ তৈরী হয় ক্লোরিনযুক্ত (যথা পলিভিনাইল ক্লোরাইড বা PVC) পৌরবর্জ্য বস্তু ভস্মীকরণের (incineration) সময়। পেন্টাক্লোরোফেনল (PCP) নামে একটি কীটনাশক তৈরীর সময় এবং কাঠের মণ্ড ক্লোরিন দিয়ে বিরঞ্জনের (bleaching) সময়ও এই যৌগ তৈরী হয়ে থাকে। সমস্ত পৃথিবীতে ক্লোরিনযুক্ত ডাইঅক্সিন ও ডাইবেঞ্জোফিউরানের উৎসারণের পরিমাণ 3000 কিগ্রা প্রতি বছরে। বায়ু এবং জলবাহিত হয়ে এসব পদার্থ উৎসের বহুদূরে ছড়িয়ে পড়ে। ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময় ডাইঅক্সিন নির্গমনের কুখ্যাত ঘটনা ঘটে। আমেরিকার সেনাবাহিনী 'এজেন্ট অরেঞ্জ' নামে ডাইঅক্সিন এবং 2,4,5-ট্রাইক্লোরোফেনক্সিঅ্যাসেটিক অ্যাসিড নামে একটি কীটনাশকের মিশ্রণ ছড়িয়ে দিয়েছিল যাতে ভিয়েতনামের বৃহৎ বনভূমি ও গাছপালা নষ্ট হয়ে যায় এবং মানুষ ও পশুর ওপর বিপজ্জনক প্রভাব পড়ে।

দীর্ঘ মেয়াদী জৈব দূষক নদী ও হ্রদের তলার পলি, মাটি, বাতাস ও জলে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে দেখা গেছে। একটি যৌগ জলে যদি দ্রবণীয় হয় তবে গাছের শিকড় দিয়ে বিশোষিত হয়। মেদকণার (lipid) মাত্রা এবং পাতার ক্ষেত্রফলের উপর এই ঊর্দ্ধ সংবহনের হার নির্ভর করে। গাছে POP-এর জৈববিবর্ধনের প্রচুর প্রমাণ পাওয়া গেছে। গাছের পাতার, বিশেষতঃ পাইন শলাকার উদ্ভিজ্জ বিশ্লেষণ (vegetation analysis) ক'রে ইউরোপের কয়েকটি স্থানে জল বাতাস ও মাটির মধ্যে কিছু জৈব ক্লোরো-যৌগের (যেমন DDT, PCB, PCP, HCH) উপস্থিতি নির্ধারণ করা গেছে। এই পদ্ধতিকে জৈব ক্লোরের আঙুলের ছাপ বা organochlor fingerprint বলে। বাস্তবিক কিছু গাছপালা এতটা POP বিশোষণ করে যে তাদের জৈবদূষকের ধারক হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। এই ঘটনাকে ভিত্তি করে ব্যবহৃত কৌশলকে phytoremediation বলে। কিছু নির্বাচিত জৈবদূষক ও ভারী ধাতুর তড়িতাধান থেকে বায়ু জল ও মাটিকে মুক্ত করার ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি ব্যবহার করা যেতে পারে।

জৈববিবর্ধনের ঘটনা জৈব পদার্থেই সীমাবদ্ধ থাকে না। ভারী ধাতু খাদ্য শৃঙ্খলের মাধ্যমে জৈববিবর্ধিত হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে শক্তি উৎপাদন কেন্দ্রে কয়লা পোড়ানো ছাই হল ক্যাডমিয়ামের মত একটি বিষাক্ত ধাতুর উৎস। ক্যাডমিয়াম হৃদরোগ ত্বরান্বিত করে। কয়লাতে ক্যাডমিয়াম থাকে খুব কম মাত্রায় (দশ লক্ষ ভাগে 0.05 ভাগেরও কম), কিন্তু ছাইতে ক্যাডমিয়ামের মাত্রা থাকে তুলনায় অনেক বেশী। এই ছাই যখন জমি ভরাট করতে ব্যবহার করা হয় তখন ভারী ধাতুগুলি বিভিন্ন পরিমাণে ধুয়ে বেরিয়ে এসে মাটিতে মিশে যায়। ঐ মাটিতে যে গাছপালা জন্মায় তাতে ক্যাডমিয়ামের মাত্রা ধাতু ছাই-এ উপস্থিত মাত্রার তুলনায় 3 থেকে 5 গুণ ঘনীভূত হয়। গাছপালা থেকে এই দূষক তৃণভোজী প্রাণীদের মধ্যে সঞ্চারিত হয় এবং তারপর স্বভাবতঃই মানুষসহ সমস্ত মাংসাশী প্রাণীদের দেহে খাদ্য শৃঙ্খলের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। বিষাক্ত ধাতুর মাত্রা এইভাবে 50—60 গুণ বৃদ্ধি পায় যা স্বাস্থ্য ও জীবনের পক্ষে মারাত্মকভাবে ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়ায়। ক্যাডমিয়াম ছাড়াও পারদ, সীসা, সেলেনিয়াম প্রভৃতির জৈববিবর্ধন লক্ষ্য করা গেছে।

পঞ্চাশের দশকে জাপানের উপকূল শহর মিনামাতাতে পারদের জৈববিবর্ধনের ভয়াবহ ঘটনা প্রত্যক্ষ করা গেছে। প্রথমে দেখা গেল এলাকার পাখিরা এলোমেলো ভাবে উড়ছে ; বেড়ালদের মুখে ফেনা এবং মস্তিষ্ক বিকৃতিও দেখা গেল। এর বছর দুই পরে অঞ্চলের বেশীর ভাগ মৎসজীবীর হাত-পা ও চোয়াল অসাড় হতে দেখা গেল, সঙ্গে পেশীর সংকোচনহীনতা ও মস্তিষ্কের অস্বাভাবিকতা। বিশাল সংখ্যক মানুষের মৃত্যু হল এবং আরও অনেকে পরবর্তী কয়েক বছরে বিকলাঙ্গ হয়ে পড়ল। মাতৃগর্ভস্থ ভ্রূণেরও ক্ষতি হতে দেখা গেল। এই দুর্ঘটনার কারণ অনুসন্ধান করে দেখা গেল যে সমস্তটাই ঘটেছে পারদের বিষক্রিয়া থেকে। কাছের একটি রাসায়নিক কারখানায় পারদের একটি লবণ অনুঘটক হিসাবে ব্যবহার করা হত এবং মিনামাতা উপসাগরে পারদ-দূষিত বর্জ্য বস্তু ফেলা হত। জীবাণুঘটিত ক্রিয়ায় এই পারদ তীব্র বিষাক্ত মিথাইল মার্কারীতে পরিণত হয়েছিল এবং মাছের দেহে জৈববিবর্ধিত হয়েছিল। যেসব মানুষ এবং পাখি উপসাগরের মাছ খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করেছে সবাই পারদ বিষক্রিয়ার শিকার হয়েছে।

8.5. কঠিন বর্জ্য পদার্থের ব্যবস্থাপন

সভ্যতার অগ্রগতির সাথে সাথে মানুষ কঠিন বর্জ্য পদার্থকে নানাভাবে অপসারণের পন্থা উদ্ভাবন করেছে। গ্রামাঞ্চলে গৃহস্থালীর বর্জ্য পদার্থ মাটিতে ফেলে রাখা হয় পচনের জন্য বা গোবর ইত্যাদির সাথে মিলিয়ে মাটির উর্বরতা বৃদ্ধিতে কাজে লাগানো হয়।

শহরাঞ্চলে গৃহস্থালীর বর্জ্য পদার্থের মধ্যে পচনশীল জৈব আবর্জনা ছাড়াও নানারকম রাসায়নিক যৌগ, যেমন প্লাস্টিক, টিন, কাগজ, ব্যাটারী, কাপড় বা ন্যাকড়া ও অন্যান্য কঠিন পদার্থ থাকে। সারণী 8.2-তে কলকাতা শহরে দৈনিক যে আবর্জনা জমে তার একটি নমুনা তুলে ধরা হ'ল। তবে প্লাস্টিক জাতীয় বর্জ্যের পরিমাণ উত্তরোত্তর বাড়ছে। সাধারণভাবে পুরসভাগুলি এই বর্জ্য পদার্থগুলি বাড়ী থেকে বা বাড়ীর সামনে থেকে সংগ্রহ করে নিয়ে যায়। কাগজকুড়ানীরা পচনশীল জৈব পদার্থ থেকে কঠিন অপচনশীল রাসায়নিক যৌগ পদার্থগুলিকে সরিয়ে ফেলে তা পুনর্ব্যবহারের যোগ্য করে তোলার জন্য বিভিন্ন শিল্পে যোগান দেয়।

খুব বড় শহরগুলির (যেমন কোলকাতা, দিল্লী, মুম্বাই) আবর্জনা প্রতিদিন 3000 থেকে 5000 মেট্রিক টন অবধি হয়। এত বিশাল আবর্জনার ব্যবস্থাপন এক বিরাট সমস্যা। এত আবর্জনা ফেলার মত স্থানও দিনে দিনে হ্রাস পাচ্ছে। আবর্জনাকে কাজে লাগানোর বিভিন্ন উপায় উদ্ভাবিত হয়েছে এবং তার অপসারণের নানা দিক ভাবা হয়েছে ও কাজে লাগানো হয়েছে।

সারণী 8.2 কলকাতার পৌর আবর্জনার দৈনিক উপাদানভিত্তিক পরিমাণ ও প্রকৃতি (মেট্রিক টন)

(ন্যূনতম পরিমাণ আনুমানিক 3000 টন প্রতিদিন)

বর্জ্য পদার্থ	বর্জ্যের পরিমাণ	শতাংশ	বর্জ্যের প্রকৃতি
গাছের পাতা/খড়	582	19.4	জ্বলনক্ষম
শাকসবজির অবশিষ্টাংশ	480	16.0	জ্বলনক্ষম
আধপোড়া কয়লা	243	8.1	জ্বলনক্ষম
ভাঙ্গা মাটির ও কাচের পাত্র	207	6.9	জ্বলনক্ষম নয়
কাগজ ও কাপড়	204	6.8	জ্বলনক্ষম

বর্জ্য পদার্থ	বর্জ্যের পরিমাণ	শতাংশে	বর্জ্যের প্রকৃতি
ডাবের খোলা	147	4.9	জ্বলনক্ষম
পাথর	54	1.8	জ্বলনক্ষম নয়
চামড়া	25.8	0.86	জ্বলনক্ষম
ধাতু	19.8	0.66	জ্বলনক্ষম নয়
প্লাস্টিক	19.5	0.65	জ্বলনক্ষম
হাড়জাতীয় পদার্থ	12.6	0.42	জ্বলনক্ষম
মাটি/ছাই	1002	33.4	জ্বলনক্ষম নয়
বিবিধ	3.3	0.11	
	মোটামুটি 3000	100	

8.5.1. আবর্জনা অপসারণ ও কাজে লাগানোর পদ্ধতি সমূহ

(ক) আবর্জনা সৃষ্টি হ্রাস

(খ) পুনর্ব্যবহার

(গ) পুনঃ আবর্তনশীল করে ব্যবহারযোগ্য করা

(ঘ) জৈব সার উৎপাদন

(ঙ) ভস্মীভূত করা

(চ) মাটিতে পুঁতে ফেলা বা জমি ভরাট

(ক) আবর্জনা সৃষ্টি হ্রাস

গৃহস্থালীতে যাতে বেশী আবর্জনা তৈরী না হয়, জিনিষ অপচয় না ক'রে জীবন যাত্রার মান পাল্টে ও ব্যবহার করা জিনিষ রাস্তায় সরাসরি না ফেলে দিয়ে, আবর্জনা সৃষ্টি হ্রাস করা যেতে পারে সকলের প্রচেষ্টাতে।

(খ) পুনর্ব্যবহার

নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবন করে আবর্জনা বা ফেলে দেওয়ার জিনিষপত্র থেকে অন্যান্য দ্রব্য খেলনা, ঘর সাজানোর জিনিষ, লেখার সামগ্রী ইত্যাদি তৈরী করা।

(গ) পুনঃ আবর্তনশীল করে ব্যবহারযোগ্য করা

কাগজ, কাচ, ধাতু, প্লাস্টিক, মোটর গাড়ীর ব্যবহৃত তেল, ব্যাটারী, টায়ার, ছেঁড়া কাপড় ইত্যাদি পুনঃ আবর্তনশীল প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পুনরায় ব্যবহারযোগ্য করে তোলা যায়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সেই সব সামগ্রীর ওপর "রিসাইকেল্ড পদার্থ

থেকে সৃষ্ট" ছাপ মারা থাকে। পুনশ্চক্রায়নের ফলে প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষিত হয়। শক্তির ব্যবহারও সাধারণতঃ কম হয়। আমাদের দেশে বর্জ্য প্লাস্টিকের প্রায় 40 শতাংশে পুনঃ আবর্তিত হয়। তবে কয়েকবার আবর্তনের পর তার গুণাবলী হ্রাস পায়। জৈবভঙ্গুর (বায়োডিগ্রেডেবল) না হওয়ার জন্য বর্জ্য হিসাবে প্লাস্টিক নিয়ে পরিবেশে নানা সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। বিজ্ঞানীরা এই সমস্যা এড়ানোর জন্য জৈবভঙ্গুর প্লাস্টিক তৈরীর চেষ্টা করছেন।

(ঘ) জৈব সার উৎপাদন

এই পদ্ধতিতে জৈব বর্জ্য পদার্থে ব্যাকটিরিয়া বা জীবাণুর সাহায্যে পচন সৃষ্টি করা হয়। জৈবপদার্থ থেকে হিউমাস জাতীয় এক নতুন পদার্থ সৃষ্টি হয়। প্রক্রিয়া চলাকালীন যে তাপ উৎপন্ন হয় (60° সেলসিয়াস অবধি উঠতে পারে) তা বর্জ্য পদার্থের ক্ষতিকারক বস্তু বিশেষভাবে ক্ষতিকর জীবাণুগুলিকে ধ্বংস করে। উত্তপ্ত প্রক্রিয়া বা ব্যাকটিরিয়া প্রয়োগ করে বর্জ্য পদার্থ থেকে যে সার উৎপাদন করা হয়ে থাকে তার মধ্যে উদ্ভিদের বৃদ্ধির জন্য বেশ কিছু পরিমাণ নাইট্রোজেন ও ফসফেট এবং অনুখাদ্য (মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট-ও থাকে। সাধারণতঃ দেড় থেকে দুই মাসের মধ্যে পৌর আবর্জনা থেকে জৈব সার তৈরী হয়ে যায়।

(ঙ) ভস্মীভূত করা

কঠিন বর্জ্য পদার্থকে উচ্চ তাপে পুড়িয়ে ফেলা হয়। কোন কোন সময়ে বর্জ্য পদার্থগুলিকে কেটে কেটে ছোট করে তারপর পোড়ানো হয়। তবে এই পদ্ধতিতে বায়ু দূষণ ঘটে থাকে। যেমন প্লাস্টিক পোড়ালে ক্ষতিকর গ্যাস, যাদের মধ্যে অত্যন্ত বিষাক্ত ডাইঅক্সিনও থাকে (যদিও অল্পপরিমাণে), পরিবেশ দূষিত করতে পারে।

(চ) মাটিতে পুঁতে ফেলা বা জমি ভরাট

এই পুঁতে ফেলা বা জমি ভরাট কাজটিকে স্বাস্থ্যসম্মত জমি ভরাট (স্যানিটারী ল্যান্ডফিল) বলা হয়ে থাকে। এই পদ্ধতিতে একটি নির্দিষ্ট স্থানে আবর্জনার জৈব অংশ আলাদা করে একটি প্রায় 2 মিটার উঁচু স্তর বিছিয়ে দেওয়া হয়। তার ওপরে 20—25 সেন্টিমিটার মাটির স্তর ছড়িয়ে দেওয়া হয়। মাটির মধ্যকার জীবাণু আবর্জনার ভৌত ও রাসায়নিক পদার্থের পরিবর্তন ঘটায়। এর ফলে নানা ধরনের গ্যাস (মিথেন, কার্বন ডাইঅক্সাইড, হাইড্রোজেন সালফাইড ইত্যাদি) সৃষ্টি হয় যা বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে। তবে তা থেকে বায়ু দূষণ খুব বেশি একটা হয় না।

বৃষ্টির জল দ্বারা বর্জ্য পদার্থ নোংরা জল বাহিত হয়ে বা চুঁইয়ে মাটির ওপরের জল বা ভূগর্ভস্থ জলস্তরকে দূষিত করতে পারে। বর্তমানে তাই মাটিতে পোঁতার এই পদ্ধতিতে যে গর্ত করা হয় তা সুরক্ষিত রাখার উপায় উদ্ভাবন হয়েছে। স্বাস্থ্যসম্মত জমিভরাট তিন রকমের হতে পারে, টাইপ তিন (type III), টাইপ দুই (type II), টাইপ এক (type I)। প্রথমটি (টাইপ তিন) সবচেয়ে সহজ, খরচও খুব কম। এতে খড়কুটো রাবিশ বা যেসব বর্জ্য থেকে ক্ষতিকারক রাসায়নিক বের হয় না সেই সব বর্জ্য ব্যবহার করা হয়। টাইপ দুই বেশি খরচ সাপেক্ষ। এ থেকে দূষিত পদার্থ বেরিয়ে দূষণ করতে না পারার ব্যবস্থা, জমা গ্যাসের নিষ্কাশন ব্যবস্থা ইত্যাদি থাকে। সবচেয়ে বেশি সুরক্ষিত হ'ল টাইপ এক জমি ভরাট ব্যবস্থা—যেটি ব্যবহৃত হয় বেশি বিপজ্জনক রাসায়নিক বা অন্যান্য ক্ষতিকারক পদার্থের জন্য (hazardous materials)। যেহেতু এতে অনেক বেশি সাবধানতা অবলম্বন করতে হয় সেজন্য খরচও খুব বেশি পড়ে।

নবম অধ্যায়

পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্য

অধ্যায় সূচী

9.1. জনস্বাস্থ্যের সঙ্গে পরিবেশ দূষণের সম্পর্ক

জনস্বাস্থ্যের সঙ্গে পরিবেশ দূষণের অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক আছে। পরিবেশ যতই দূষিত হবে, জনস্বাস্থ্য ততই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

জনস্বাস্থ্যের কয়েকটি স্তম্ভ : (১) নিরাপদ জল, (২) দূষণহীন মাটি, (৩) শুদ্ধ বাতাস, (৪) অবাধ বায়ু চলাচল, (৫) পর্যাপ্ত আলো, (৬) শব্দের সীমিত মাত্রা, (৭) ন্যূনতম আণবিক বিকিরণ, (৮) সুষ্ঠু মলমূত্র অপসারণ ও নালানর্দমার নিকাশী ব্যবস্থা, (৯) যথাযথ আবর্জনা অপসারণ, (১০) সংক্রামক ও অন্যান্য রোগ দূরীকরণ, (১১) আবহাওয়ার সঙ্গে সামঞ্জস্য স্থাপন ও (১২) বিভিন্ন বৃত্তিতে নিয়োজিত ব্যক্তির স্বাস্থ্য সংরক্ষণ।

এইসব ক্ষেত্রে পরিবেশ দূষণ জনস্বাস্থ্য সমস্যা ডেকে আনে, জনস্বাস্থ্যকে আঘাত হানে, অনেক সময় পঙ্গু করে তোলে। পরিবেশের এই দূষণের জন্য মানুষই অবশ্য মূলতঃ দায়ী এবং এই দূষণ দূর করতে পারে সচেতন মানুষের সঙ্ঘবদ্ধ প্রচেষ্টা।

9.1.1. জলদূষণ

জলের উৎস : (১) বৃষ্টি, (২) মাটির উপর জমা জল যেমন নদনদী, পুকুর, ডোবা, জলাভূমি, মানুষের তৈরী সরোবর ও হ্রদ (৩) মাটির নিচের জল যেমন অগভীর কূপ, গভীর কূপ, ঝর্ণা ইত্যাদি। খাওয়া, হাত পা ধোয়া, স্নান করা, রান্না করা প্রভৃতিতে মাথা পিছু 100—150 লিটার জল দরকার। আমাদের দেশে সবাই সবসময়ে এতটা জল পায় না।

জল দূষণের উৎস : (১) নর্দমার মলমূত্র ও আবর্জনা মেশা নোংরা জল, (২) কলকারখানার বর্জ্য পদার্থ, (৩) কৃষিভূমির সার ও কীটনাশক ধোওয়া জল নদীনালা, হ্রদ, জলাশয়, পুকুর, কূপ প্রভৃতিকে দূষিত করে, (৪) ভৌত দূষণ যেমন তাপ ও আণবিক বিকিরণের ফলেও জল দূষিত হয়, (৫) মাটির একটি নির্দ্দিষ্ট স্তরের ধাতব পদার্থ জলে মিশে যায় যেমন আর্সেনিক।

9.1.2. মাটিদূষণ

(১) মাঠে, জঙ্গলে, ময়দানে যেখানে সেখানে মানুষ ও গবাদি পশুর মলমূত্র ত্যাগ, (২) মাটিতে মিশে যাওয়া ক্ষতিকারক রাসায়নিক সার ও কীটনাশক, (৩) প্লাস্টিক ও ফোমের তৈরী চায়ের কাপ, গ্লাস, খাবারের প্লেট প্রভৃতি মাটিতে মিশলে অবিকৃত থেকে যায়।

9.1.3. বায়ুদূষণ

বায়ুদূষণের উৎস : (১) দেশে শিল্প উন্নয়নে অনেক ধরনের কলকারখানা গড়ে উঠেছে যেমন ধাতু ও তৈল শোধনাগার, রাসায়নিক ও সার কারখানা, বিদ্যুৎ উৎপাদন কারখানা প্রভৃতি। বাতাসদূষণে এদের সবার ভূমিকা আছে। (২) কলকারাখানায় ও বাড়ীতে কয়লা, তেল ও অন্যান্য জ্বালানী থেকে ধোঁয়া, ধুলো ও অন্যান্য রাসায়নিক দ্রব্য বাতাসে মিশে যায়। (৩) মোটর গাড়ীর ধোঁয়া থেকে সীসা সহ বহু ক্ষতিকারক রাসায়নিক বাতাসে মেশে। শহরের বায়ুদূষণের মূল উৎস (৪) বিবিধ যেমন— আবর্জনা পোড়ানো, কীটপতঙ্গ দমনের জন্য রাসায়নিক কীটনাশক ছড়ানো প্রভৃতি।

9.1.3.1. বায়ুচলাচল

বাতাস চলাচলে বাধা সৃষ্টি করে ঘিঞ্জি ছোট ঘর, ঘন জনবসতি, সামনাসামনি (ক্রজুক্রজু) দরজা জানালা না থাকা বা পর্যাপ্ত জানালা দরজার অনুপস্থিতি। জনপ্রতি দরকার 25-50 বর্গমিটার (250-500 বর্গফুট) জায়গা এবং প্রতি জনে প্রতি ঘণ্টায় 8.5-85 কিউবিক মিটার (300-3000 কিউবিক ফুট) বাতাস। সে বাতাস বন্ধ হলে চলবে না।

9.1.4. আলো

পর্যাপ্ত ও ভালো আলো না থাকলে চোখের উপরে চাপ পড়ে ও দৃষ্টিশক্তি কমে। ঘরে ও কাজের জায়গায় দিনের বেলায় স্বাভাবিক আলো আসাও দরকার। ঘিঞ্জি অন্ধকার ঘরে শিশুরা থাকলে, সূর্যের আলো না এলে রিকেট্‌স-এ ভুগতে পারে।

9.1.5. মলমূত্র অপসারণ নালানর্দমার নিকাশী ব্যবস্থা এবং আবর্জনা অপসারণ ও নিষ্কাশন

মাঠে ঘাটে মলমূত্র ত্যাগের ফলে পরিবেশ দূষিত হয়, অনেক অসুখ ছড়ায়। খাটা পায়খানাও পরিবেশ দূষিত করে। মলমূত্র যথাযথ অপসারণ না করলে ও নালানর্দমার নিকাশী ব্যবস্থা চালু না রাখলে মাটি, জল ও বাতাস দূষিত হবে। খাবার-দাবার ও পানীয় জলে মলমূত্রের সংস্পর্শ সংক্রমণ ছড়াবে ; মাছি, আরশোলা, ইঁদুর প্রভৃতির উপদ্রব বাড়বে।

আবর্জনা নিষ্কাশন : আবর্জনা হতে পারে রাস্তার বাজারের, গোয়াল বা আস্তাবলের, কলকারখানার ও গৃহস্থালীর। আবর্জনা প্রথমে নির্দিষ্ট জায়গায় নির্দিষ্ট সময়ে জমা করতে হবে। আবর্জনা নিষ্কাশনের বিভিন্ন পদ্ধতি—নিচু জমি ভরাট করা, পোড়ানো বা বৈদ্যুতিক চুল্লিতে ভস্মীভূত করা, পুঁতে ফেলা ও সার তৈরী করা।

9.1.6. শব্দদূষণ

অবাঞ্ছিত বিকট শব্দ শরীরে নানা অসুবিধা ও রোগ সৃষ্টি করতে পারে। শব্দের সহ্যসীমার উচ্চতম মাত্রা ঠিক করে দেওয়া হয়েছে 60 ডেসিবেল। বসবাসের এলাকাতে সাধারণতঃ দিনের বেলা 55 ডেসিবেল ও রাতের বেলা 40 ডেসিবেল আওয়াজ হয়। কানে কানে কথা বলায় 20 ডেসিবেল।

আওয়াজ শ্রবণযন্ত্রকে শ্রান্তক্লান্ত করে দেয়। প্রথম প্রথম কানে আসে শিষ দেওয়ার মত শব্দ, কান ভোঁ ভোঁ করে, হতে পারে সাময়িক বা স্থায়ী বধিরতা, কথা শোনা, বলা বা বোঝানোর অসুবিধা, বিরক্তি, মানসিক ধৈর্যচ্যুতি, মনঃসংযোগের অভাব, ফলে দক্ষতা কমে, বমি, রক্তচাপ বৃদ্ধি, মাথাধরা, মাথাঘোরা, মাথা ঝিমঝিম, অনিদ্রা, বমিভাব, স্নায়ুর চাপ ও নাড়ীর স্পন্দন দ্রুত, বেশি ঘাম, পেপটিক আলসার প্রভৃতি।

9.1.7. সংক্রামক এবং অন্যান্য রোগ

এদের কিছু হয় জল, বায়ু বা মাটি দূষণের জন্য, কিছু পোকামাকড় বাহিত। আবার মানুষের জীবনযাত্রা প্রণালীও রোগ ব্যাধি ডেকে আনে। যেমন **(ক)** খাবার দাবার—তেল, ঘি, চর্বিযুক্ত মাংস প্রভৃতি অতিরিক্ত খেলে হার্টের অসুখ ও ডায়াবেটিসের ঝুঁকি বাড়ে। খাবারে ভিটামিন 'এ'র অভাব থাকলে (শাকসব্জী নিয়মিত খেলে এ অভাব দূর হয়) কোন কোন ধরনের টিউমার হয়। বেশি শর্করা ও বেশী তেল জাতীয় খাবার খেলে শরীরে মেদ জমবে, দাঁতের অসুখ হবে। **(খ)** ধূমপান ও ধোঁয়ায় থাকে ক্যান্সার সৃষ্টিকারী রাসায়নিক (পলিসাইক্লিক অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন ও নাইট্রোস্যামাইন (polycyclic aromatic hydrocarbons and nitrosamines)।

9.1.8. ধূমপান

ধূমপানের ঝুঁকি : খুকখুকে কাশি, তাড়াতাড়ি হাঁপ ধরে যাওয়া, দীর্ঘস্থায়ী ব্রঙ্কাইটিস বা ফুসফুসের প্রদাহ, ফুসফুসের সংকোচন ও প্রসারণশীলতা কমে যাওয়া, খুঁতওয়ালা শুক্রাণুর সংখ্যা বৃদ্ধি প্রাপ্তি, স্মরণ রাখার ক্ষমতা হ্রাস, হার্টের অসুখে হঠাৎ মৃত্যু, রক্তচাপ বৃদ্ধি, ফুসফুস, অন্ননালী ও মূত্রথলির ক্যান্সার। যিনি মা হতে চলেছেন তিনি ধূমপান করলে নবজাতকের ওজন হ্রাস, ভ্রূণ অবস্থায় বা জন্মের পরেই শিশুর মৃত্যুর হার বৃদ্ধি। পরোক্ষ ধূমপানের প্রভাবে মা, বাবা ধূমপায়ী হলে

শিশুর নিউমোনিয়া, ব্রঙ্কাইটিস, হাঁপানী হতে পারে, অন্যদেরও ক্যান্সারের ঝুঁকি বাড়ে। বিড়ি, তামাক, জর্দা, খৈনি, নস্যি প্রভৃতি একই ধরনের ক্ষতিকারক নেশা।

9.1.9. আণবিক বিকিরণ

উৎস : (1) **প্রাকৃতিক** – (ক) বর্হিজগৎ থেকে আবহাওয়ামণ্ডলে ঢুকছে, (খ) পরিবেশেই অল্পস্বল্প আণবিক বিকিরণ করতে পারে এমন সব ধাতু ও গ্যাস রয়েছে, (গ) মানুষের শরীরের কোষকলা থেকেও অল্পস্বল্প আণবিক বিকিরণ হয় তবে মাত্রা খুবই কম, (2) **মানুষের সৃষ্টি** – (ক) এক্স-রে, পারমাণবিক বিস্ফোরণ বা আণবিক চুল্লীর দুর্ঘটনা, (খ) বিবিধ টিভি, তেজস্ক্রিয় ঘড়ি প্রভৃতি থেকে বিকিরণ।

আণবিক বিকিরণ দু'ধরনের (১) শরীর ভেদ করতে পারে যেমন এক্স-রে, গামা রশ্মি, নিউট্রন, (২) শরীর ভেদ করতে পারে না যেমন আলফা ও বিটা রশ্মিসমূহ।

অসুস্থতার লক্ষণ আণবিক বিকিরণের পরিমাণের উপর নির্ভর করে। আণবিক বিস্ফোরণ, আণবিক চুল্লী, আণবিক শক্তি ব্যবহৃত হয় এমন কলকারখানা বা হাসপাতালে দুর্ঘটনা ঘটলে আণবিক বিকিরণের মাত্রা বিপদ সীমার বহু উপরে উঠে যায়—100 র‍্যাড (1 Gy = 1 grey) পেরিয়ে যায়।

মাত্রা যখন 75-125 র‍্যাড, তখন তাৎক্ষণিক অসুস্থতার লক্ষণ বমিভাব, বমি, শারীরিক দুর্বলতা। কয়েকদিনের ভিতর রক্তের সাদাকণা ও অনুচক্রিকা কমে যায়, শরীরের প্রতিরোধ শক্তি দুর্বল হয়ে যায়। ঝুঁকি থাকে লিউকিমিয়া বা অন্য ধরনের টিউমার হবার।

বিকিরণের মাত্রা আরও বেশী হলে (200-1000 র‍্যাড) প্রথম দিকে বমি তারপর তুলনামূলকভাবে সুস্থ মনে হবে তারপর 2-3 সপ্তাহের মধ্যে শরীরে সাদা রক্তকণা ও অনুচক্রিকা কমবে, অস্থিমজ্জার অবদমনও হবে, কোন নতুন রক্তকণা গঠিত হতে পারবে না, শরীরের বিভিন্ন জায়গা দিয়ে রক্তপাত হবে, অনেকে সংক্রামক নানা অসুখে ভুগতে শুরু করবে, মৃত্যুর হার অনেক সময়ে বেড়ে যাবে। পেটের রোগের লক্ষণও দেখা দেবে। যেমন কয়েক ঘণ্টা ধরে বারবার বমি, সাময়িকভাবে থেমে যাওয়ার তিন চারদিন পর আবার বমি শুরু হবে, এর সঙ্গে সাংঘাতিক পাতলা রক্ত মেশা পায়খানা, যা চিকিৎসায় সারানো যায় না। শরীরে জলস্বল্পতা, নানা ধরনের সংক্রমণ এবং মৃত্যুর সম্ভাবনা। বিকিরণের মাত্রা আরও বেশী (3000 র‍্যাডের বেশী) হলে স্নায়ুতন্ত্রের নিম্নোক্ত লক্ষণগুলি দেখা দেবে—বমিভাব, বমি, বিভ্রান্তি, আচ্ছন্নভাব, মস্তিষ্কের সাংঘাতিক শোথ। 36 ঘণ্টার মধ্যে মৃত্যু হতে পারে।

আণবিক বিকিরণের ফলে চামড়ার উপর যে সব উপসর্গ দেখা দেয় সেগুলি হ'ল চামড়া রক্তাভ, চামড়ার নীচে রক্তপাত, চামড়ায় ফোস্কা পড়বে, নানা রকম গৌণ সংক্রমণ ছড়ায়। চুল উঠে যাবে। সমস্ত শরীর থেকে চুল যদি উঠে যায় সেটা খুব খারাপ লক্ষণ, সাধারণতঃ 500 র‍্যাড বিকিরণের ফলে হয়।

তাৎক্ষণিক লক্ষণগুলি ছাড়াও আণবিক বিকিরণ শরীরে দীর্ঘস্থায়ী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। বহুদিন পরেও তাদের হতে পারে লিউকিমিয়া বা ক্যান্সার, বিশেষ করে চামড়া, থাইরয়েড গ্লান্ড ও লালাগ্রন্থির। এছাড়া পুরুষত্বহীনতা, বন্ধ্যাত্ব, ছানি এবং মাতৃগর্ভে ভ্রূণের নানারকম ত্রুটিও দেখা যায়। জিনঘটিত পরিবর্তন পরবর্তী প্রজন্মেও প্রকাশ পেতে পারে।

9.1.10. আবহাওয়ার সঙ্গে সামঞ্জস্য

পরিবেশে আবহাওয়ার সঙ্গে সামঞ্জস্যের অভাবে মানুষ ভুগতে পারে। যেমন (১) **অত্যধিক তাপ** – (ক) কাহিল হয়ে পড়া—খুব গরম আবহাওয়ায় আগে থেকে সহনশীল না থাকলে হতে পারে—রক্তচাপ কম, ভুল বকা, হঠাৎ মূর্চ্ছা,

বমি বন্ধ হয় না। শরীরের তাপ 38°-40°C, জল স্বল্পতা দেখা দেয়, শরীর থেকে একদিনে 5-6 লিটার জল ও 20-25 গ্রাম লবণ বেরিয়ে যেতে পারে। (খ) তাপে মাংসপেশীর খিঁচুনি (সাধারণতঃ পায়ে) খুব বেদনাদায়ক গরমে তাপে খুব বেশী দৈহিক পরিশ্রম করলে হয়। জল ও লবণ খেলে কমে যায়। খাবারে বাড়তি লবণ যোগ করলে খিঁচুনির সম্ভাবনা কমে। (গ) সর্দি-গর্মি (হীট স্ট্রোক)—মাথা ব্যথা, বমিভাব, বমি, দুর্বলতা, চামড়া গরম (তাপ 40°C-র উপরে), ঘাম বন্ধ হয়ে যেতেও পারে, নাও পারে, বিভ্রান্তি, ভুল বকা, আচ্ছন্নতা। আবহাওয়া খুব গরম ও ভ্যাপসা, যেখানে বাতাস একদম নেই, সেখানে হতে পারে। এই জায়গা থেকে ঠাণ্ডা জায়গায় নিয়ে যেতে হবে ; ঠাণ্ডা জলে শরীর ধোওয়াতে হবে, বরফ পাওয়া গেলে বরফ দিয়ে শরীর ঠাণ্ডা করতে হবে, তাড়াতাড়ি চিকিৎসা করলে দ্রুত সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ হবে কিন্তু দেরী হলে মৃত্যুর সম্ভাবনা থাকে। হীট স্ট্রোক থেকে জটিলতা শক, কিডনীর ক্রিয়াশক্তি লোপ পেতে পারে। **(২) অত্যধিক ঠাণ্ডা** – খুব ঠাণ্ডায় দীর্ঘক্ষণ যথাযথ শরীরের পোষাক না পরে থাকলে শরীর অসাড় হয়ে যায়। স্পর্শের অনুভূতি লোপ পায়, মাংসপেশীর দুর্বলতা, ঘুমের ইচ্ছা, আচ্ছন্নতা ও মৃত্যু। আবার বরফের দেশে হতে পারে তুষারপাত, কোষকণা জমে যায়। অঙ্গ কেটে বাদ দিতে হতে পারে। **(৩) আর্দ্রতা**—আবহাওয়া যদি অত্যন্ত শুষ্ক হয়, আর্দ্রতার ভাব কম থাকে, তাহলে নাকের ভিতরটা শুকিয়ে যায় এবং নাসিকা পথে বিভিন্ন রোগ সংক্রমণের সম্ভাবনা বাড়ে। **(৪) বৃষ্টি**—বৃষ্টিতে ভিজলে ঠাণ্ডা লাগার ভয়—ইনফ্লুয়েঞ্জা, নিউমোনিয়া, টিবি প্রভৃতি সংক্রমণের ঝুঁকি বাড়ে। **(৫) ইলেকট্রিক শক**—মৃদু ও সাধারণ ইলেকট্রিক শকে একটা বেদনাদায়ক অনুভূতি, ভীতিপ্রদ—বিশেষ ক্ষতিকারক নয় ; তবে সুখকরও নয়। শরীরের কোথাও, চামড়ায় বা স্নায়ুতন্ত্রে কোন চিহ্ন থাকে না। ইলেকট্রিক শকের মাত্রা বেশী হলে যেমন কাছে বাজ পড়লে যে ইলেকট্রিক শক লাগে তার ফলে নাড়ীর গতি অত্যন্ত দ্রুত হয়, মাংসপেশী সঙ্কুচিত হয় এবং স্নায়ুরজ্জু ক্ষতিগ্রস্ত হয়। চামড়া উপর উপর পুড়ে যেতে পারে বা চামড়ার নীচের কোষকলা পুড়ে ও পচে যেতে পারে।

ধোঁয়া : ধোঁয়াতে থাকে গরম বাতাস ও গ্যাসের মধ্যে কার্বন কণা। কণাগুলোর উপর লেগে থাকে জৈব অম্ল ও অ্যালডিহাইড। প্লাস্টিকের প্যাকেট (তৈরী হয় পলিভিনাইল ক্লোরাইড নামে রাসায়নিক দিয়ে) পোড়ালে ধোঁয়াতে মেশে কার্বন মনোক্সাইড ও হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড। ধোঁয়ায় বেশীক্ষণ থাকলে শ্বাস নিতে কষ্ট হয়, অক্সিজেনের ভাগ কমে যায়, শ্বাসরোধ হতে পারে, ফুসফুসের শোথ হতে পারে। এগুলো খারাপ লক্ষণ—মৃত্যুর সম্ভাবনা থাকে।

কার্বন মনোক্সাইড : থাকে রান্নার গ্যাসে, মোটর গাড়ীর ধোঁয়ায়। অক্সিজেন না থাকলে যে কোন ধরনের জ্বালানী যখন জ্বলে, তখন কার্বন মনোক্সাইড নির্গত হয়। হেমোগ্লোবিনের সঙ্গে মিশে এটি অন্য একটি যৌগ তৈরী করে। হেমোগ্লোবিনের সঙ্গে অক্সিজেন যুক্ত হতে পারে না। **বিষক্রিয়ার** – মাথাধরা, বমিভাব, বমি, চামড়ায় বৈশিষ্ট্যমূলক গোলাপী রঙ, হার্টের স্ফীতি, মানসিক দুর্বলতা ও বিভ্রান্তি, অজ্ঞান হয়ে মৃত্যুর সম্ভাবনা।

9.1.11. বিভিন্ন বৃত্তিতে নিয়োজিত লোকজনের স্বাস্থ্য সংরক্ষণ

নানা শিল্প সংস্থায় যাঁরা কাজ করেন তাঁদের পরিবেশ দিনদিন জটিল হয়ে উঠছে। কর্মস্থলের পরিবেশ কর্মীর স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব ফেলতে পারে এবং তার কর্মদক্ষতা কমিয়ে দিতে বা নষ্ট করতে পারে।

9.1.11.1. শিল্পশ্রমিকদের স্বাস্থ্যসমস্যা

(ক) পারিপার্শ্বিক বাহ্যিক উপাদান : খুব গরম বা খুব ঠাণ্ডা, স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়া, কম বায়ুচলাচল, কম আলো বা বেশী উজ্জ্বল আলো, তাপ বিকিরণ, পারমাণবিক বিকিরণ, কোলাহল, অত্যধিক কম্পন প্রভৃতি। এছাড়া টয়লেট, হাত পা ধোওয়া—চান করা প্রভৃতির সুবন্দোবস্ত না থাকলেও শরীর খারাপ হবার সম্ভাবনা থাকে। **(খ) রাসায়নিক উপাদান** : সুরক্ষার ব্যবস্থা না থাকলে নানারকমের রাসায়নিক বিষাক্ত পদার্থ ধোঁয়া ও গ্যাস কর্মীদের ফুসফুস, চামড়া, রক্ত ও শরীরের

অন্যান্য যন্ত্রের ক্ষতি করতে পারে। **(গ) জৈব উপাদান :** অনেক ধরনের ভাইরাস, জীবাণু ও পরজীবী কর্মীদের শরীর খারাপের জন্য দায়ী হতে পারে। যেখানে কাজ করে, দূষণের সম্ভাবনা থাকে সেখানে, এসব রোগ জীবাণু তাদের শরীরে ঢুকতে পারে, দূষিত জল, মাটি বাতাস ও খাবারের মাধ্যমে বা জীবজন্তু বা তাদের শরীর নিঃসৃত পদার্থের সংস্পর্শে থাকলে। **(ঘ) মেশিন :** যদি অরক্ষিত থাকে, ঠিকভাবে বসানো না হয়, নিরাপত্তা বজায় রাখার ব্যবস্থা না থাকে পুরানো ঝরঝরে হয়ে যায়, তাহলে দুর্ঘটনার সম্ভাবনা থাকে। **(ঙ) পারস্পরিক সম্পর্ক :** কর্মীদের নিজেদের মধ্যে অথবা কর্মী ও কর্তৃপক্ষের মধ্যে যদি সম্পর্ক ভাল না থাকে, কাজের বিধিব্যবস্থা, অবস্থা, উন্নতি, নিরাপত্তা যদি ব্যাহত হয়, মানসিক এবং সার্বিকভাবে স্বাস্থ্যের উপর তার প্রভাব পড়ে।

9.1.11.2. কৃষিকর্মীদের স্বাস্থ্যসমস্যা

(১) দুর্ঘটনা—প্রথমতঃ যেসব যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয় তার থেকে দ্বিতীয়তঃ—বিষাক্ত সাপের কামড়ে, মৌমাছি বা বোলতা বা ভীমরুলের বা কাঁকড়াবিছার হুল ফোটানো প্রভৃতি। **(২) সংক্রামক রোগ** যেমন জাপানীজ এনকেফালাইটিস, টাইফাস, কাইসানুর ফরেস্ট ডিজিজ, অ্যানথ্রাক্স, ওয়েলস ডিজিজ, টিটেনাস, টিবি, হুকওয়ার্ম, সিসটোসোমিয়াসিস (আমাদের দেশে নেই) প্রভৃতি। **(৩) আবহাওয়ার সঙ্গে সামঞ্জস্য**—নানা প্রতিকূল অবস্থায় তাঁদের কাজ করতে হয়, স্বাস্থ্যের উপর চাপ বাড়ে যেমন ঝড়বৃষ্টি, সাইক্লোন, খরা, বন্যা ইত্যাদি। তাঁকে হয়ত বেশী শব্দ ও কম্পন দীর্ঘক্ষণ সহ্য করতে হয়। **(৪) বিষাক্ত সার ও কীটনাশক** এর ব্যবহার কৃষিতে দিনদিন বাড়ছে, এসব ব্যবহার করতে গিয়ে কৃষিকর্মীর স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয়। কোন কোন রাসায়নিক থেকে তীব্র বিষক্রিয়ার সৃষ্টি হয় এবং কর্মী মারাও যেতে পারে। কোন কোন রাসায়নিক চামড়ার অসুখ সৃষ্টি করে।

9.2. প্রধান প্রধান জলবাহিত রোগসমূহ

9.2.1. ভাইরাস, বীজাণু বা ব্যাকটিরিয়া ইত্যাদি থেকে রোগ

কারণ	অসুখের নাম
(ক) ভাইরাস	(i) হেপাটাইটিস এ (Hepatitis A) (ii) হেপাটাইটিস ই (Hepatitis E) (iii) পোলিওমায়েলাইটিস (Poliomyelitis) (iv) রোটা ভাইরাস থেকে পেটখারাপ (Rota virus) (v) নরওয়াক ভাইরাস থেকে পেট খারাপ প্রভৃতি (Norwalk virus disease)
(খ) বীজাণু	(i) কলেরা (ii) ব্যাসিলারি ডিসেনটেরি বা রক্তামাশয় (iii) টাইফয়েড (iv) প্যারটাইফয়েড (v) অন্যান্য কয়েকধরনের বীজাণু থেকে আন্ত্রিক (vi) ওয়েল্‌স ডিজিজ
(গ) এক কোষী পরজীবী বা প্রোটোজোয়া	(i) আমাশয় (ii) জিয়ারডিয়াসিস (iii) ক্রিপটোস্পোরিডিওসিস
(ঘ) কৃমি	(i) গিনিওয়ার্ম (ভারত থেকে সম্প্রতি দূর করা গেছে) (ii) সিসটোসোমিয়াসিস (ভারতে নেই)

9.2.2. জলে দ্রবীভূত বিষাক্ত ধাতু ইত্যাদি

কোন বিষাক্ত ধাতু যেমন সীসা, আর্সেনিক, সেলেনিয়াম, পারদ, ক্যাডমিয়াম প্রভৃতি অথবা সায়ানাইড জলে নির্দিষ্ট মাত্রার বেশী থাকলে শরীরের পক্ষে বিপদের কারণ হয়। আবার জলে ফ্লুওরাইড কম থাকলে দাঁত ক্ষয়ে গর্ত হয়ে যায়। বেশী থাকলে হাড়ের অস্বাভাবিক যন্ত্রণাদায়ক বৃদ্ধি হয়।

9.2.3. জলদূষণ রোধে করণীয় ব্যবস্থা

(১) নিরাপদ জল খেতে হবে। পুরসভার কলের জল, গভীর নলকূপের জল সাধারণত নিরাপদ। (২) হোটেল ও ভোজসভার জল খেলে দূষণের ঝুঁকি থাকতে পারে। (৩) মলত্যাগ করার পর সাবান দিয়ে হাত ধুতে হবে। (৪) বাজারের কাটা ফলমূল, সরবৎ, বরফ প্রভৃতি খেলে দূষণের ঝুঁকি থাকে। (৫) খাবার আগে সাবান দিয়ে হাত ধুতে হবে। (৬) সাধারণ ফিল্টার জল দূষণ রোধে খুব একটা কার্যকর নয়। অতিবেগুনী আলো দিয়ে জল শোধন তার চাইতে নিরাপদ বলা হয়। (৭) ফোটানো জল সব থেকে নিরাপদ। (৮) জল নিরাপদ মনে না হলে ব্লিচিং পাউডার মেশানো যেতে পারে, 1000 লিটার জলে 2.0 গ্রাম। (৯) সিন্নি, পাদোদক, প্রসাদ প্রভৃতি থেকে দূষণের আশঙ্কা বেশী।

9.2.4. মাটি থেকে প্রধান যে সব রোগ ছড়ায়

বীজাণু : ক্ষতস্থানে ধুলামাটি লাগালে টিটেনাস (ধনুষ্টঙ্কার) ও ঘা হতে পারে।

কৃমি : গ্রামাঞ্চলে অনেক সময় মানুষ মাঠে মলত্যাগ করে। এর ফলে মাটিতে কৃমির ডিম মিশে থাকে। গোল বড় কৃমি, চাবুক কৃমি প্রভৃতি মাটিতে থাকে এবং এসব মাটিতে শিশুরা খেললে তাদের আঙুলের নখে লেগে কৃমির ডিম পেটে যায় ও সংক্রমণ হয়। খালি পায়ে মাঠে ময়দানে মাটিতে হাঁটলে হুকওয়ার্মের লার্ভা চামড়া ফুটো করে শরীরের ভিতরে ঢোকে ও শেষ পর্যন্ত অন্ত্রে এসে বাসা বাঁধে। মাটিতে মেশা কীটনাশক ফল, ফসল ও সব্জীর ভিতর দিয়ে মানুষের শরীরে ঢুকে পড়ে এবং স্বাস্থ্য খারাপ করতে পারে। নানা রাসায়নিক সারও এইভাবে দূষিত ফলের সঙ্গে মিশে শরীরে ঢোকে।

ছত্রাক : মাটি থেকে ছত্রাক সংক্রমণও হতে পারে।

9.2.4.1. মাটি থেকে ছড়ানো অসুখের প্রতিরোধ

(১) রাসায়নিক সারের বদলে জৈব সার ব্যবহারের উপর জোর দিতে হবে। (২) মাঠে ময়দানে খালি পায়ে হাঁটলে হুক ওয়ার্ম সংক্রমণের ঝুঁকি থাকে, জুতো বা চটি পরতে হবে। (৩) টিটেনাসের টীকা নিয়ে রাখতে হবে এবং ক্ষতস্থানে মাটি প্রভৃতি লাগলে ভাল করে ধুয়ে বীজাণুনাশক ওষুধ লাগাতে হবে। (৪) যে সব মাটিতে কৃমির ডিম বা লার্ভা থাকার সম্ভাবনা, সে সব জায়গায় খেলা করতে দিলে কৃমি সংক্রমণের ঝুঁকি থাকে।

9.2.5. বাতাস থেকে ছড়ানো প্রধান প্রধান অসুখ

ইনফ্লুয়েঞ্জা—ভাইরাস এবং বীজাণু থেকে হতে পারে।

নিউমোনিয়া—ভাইরাস, বীজাণু ও ছত্রাক থেকে হতে পারে।

হাম ও জলবসন্ত—ভাইরাস থেকে।

যক্ষা, কুষ্ঠ, হুপিং কাশি, ডিপথেরিয়া ও অ্যানথ্রাকস—বীজাণু থেকে।

কয়লাখনি থেকে কয়লার ধুলো, সোনা, রূপা, অভ্র (মাইকা), সীসা প্রভৃতির খনি বা বালি নিয়ে যেখানে কাজ হয়, সেখানকার বালি বা সিলিকার কণা, অ্যাসবেসটসের গুঁড়ো, কাপড়কলের তুলার সূক্ষ্ম আঁশ, চিনির কারখানায় আখের সূক্ষ্ম অংশ, খামারের শস্যকণার ধুলো ও ছত্রাক ফুসফুসে চলে যেতে পারে এবং ফুসফুসের রোগ ও ক্ষতিসাধন করতে পারে।

রঙঝালাই, বার্ণিশের কাজ, ইলেকট্রনিক কারখানার রাসায়নিক গ্যাস, নানারকমের ধাতু পরিশোধনের সময়ে উৎপন্ন গ্যাস, ব্যাটারী কারখানার গ্যাস প্রভৃতি থেকে অ্যালার্জী, ব্রঙ্কাইটিস (ফুসফুসের প্রদাহ) প্রভৃতির সম্ভাবনা আছে।

প্রতিরোধ : (১) যেখানে সেখানে কফ্, নাকের সর্দি, থুথু, পানের পিক ফেলা বন্ধ করতে হবে। (২) হাম, যক্ষা, হুপিংকাশি, ডিপথেরিয়ার টিকা আছে। জল বসন্তের টিকা বের হয়েছে। (৩) একপাত্রে আহার করা, এঁটো খাওয়া উচিত নয়। (৪) শিশুদের একজনের মুখে দেওয়া খেলনা অন্য জন নিয়ে যেন না খেলে বা মুখে দেয় এটা দেখতে হবে। (৫) কলকারখানার চিমনি থেকে ধোঁয়া কমানো বা বন্ধ করা গেলে দূষণ কমানো যায়।

9.2.6. খাবার থেকে ছড়ানো প্রধান প্রধান অসুখ

(১) নানাধরনের ভাইরাস, বীজানু বা এককোষী পরজীবী (প্রোটোজোয়া) দিয়ে খাবার দূষিত ও সংক্রামিত হতে পারে বা বীজাণুর শরীর নিঃসৃত বিষ মিশতে পারে খাবারে। তখন সেই খাবার খেলে বিষক্রিয়া দেখা দেয়। যেমন বেশী সময় রাখা পান্তাভাত, সিন্নি, চরণামৃত, প্রসাদ, কাটাফল, বহুক্ষণ তৈরী করে রাখা স্যালাড, দূষিত জলে তৈরী বরফ বা আইসক্রিম, ভালো করে না ধোয়া পাত্রে রাখা বা আঢাকা খাবার, আরশোলা, মাছি, পিঁপড়ে বসা খাবার, ইঁদুর বেড়ালের মুখ দেওয়া বা মলমূত্র মেশা খাবার, বাসী পচনশীল খাবার, অনেকদিনের জমে থাকা পুরোনো খাবার প্রভৃতি।

(২) চিংড়ি কাঁকড়া, স্ট্রবেরী ফল প্রভৃতি খেলে কোন কোন লোকের অ্যালার্জি ও বিষক্রিয়া হয়।

(৩) কোন কোন মাছ বা ছত্রাক খেলে বিষক্রিয়া হয়। এমনকি মাছ পচে গেলে বীজাণু সংক্রমণ হলে তার থেকে সাংঘাতিক বিষক্রিয়া হতে পারে।

(৪) কাঁচা বা আধসেদ্ধ শূকর বা গরুর মাংস খেলে ফিতে কৃমি হতে পারে। এইভাবে অ্যানথ্রাক্স বীজাণু সংক্রামিত মাংস খেলে অ্যানথ্রাক্স হতে পারে।

(৫) সংক্রামিত ছোট কাঁকড়া ও চিংড়ি খেলে, শামুক, জলজ মাছ প্রভৃতি ভালভাবে সুসিদ্ধ করে না খেলে, ফুসফুসের, লিভার ও অন্ত্রের নানা ধরনের চ্যাপ্টা কৃমি মানুষের শরীরে বাসা বাঁধতে পারে।

(৬) কাঁকড়া, শামুক প্রভৃতি থেকে কলেরার বীজাণুও সংক্রামিত হতে পারে, যদি ভালভাবে সেদ্ধ করে না খাওয়া যায়।

9.2.7. পোকামাকড়, পোষা প্রাণী ইত্যাদি থেকে অসুখ

মশা	অ্যানোফেলিস	ম্যালেরিয়া	পরজীবী বা প্রোটোজোয়া
	কিউলেক্স, ম্যানসনিয়া	ফাইলেরিয়া	কৃমি
	কিউলেক্স	জাপানীজ এনকেফালাইটিস	ভাইরাস
	ঈডিশ	ডেঙ্গু	ভাইরাস
		ডেঙ্গু হেমোরেজিক ফিভার	ভাইরাস
		চিকুনগুনিয়া	ভাইরাস
		পীতজ্বর (ভারতে নেই)	ভাইরাস

স্যান্ডফ্লাই	কালাজ্বর	এককোষী পরজীবী
	চামড়ার ক্ষত (পরজীবী সংক্রামণজনিত)	এককোষী পরজীবী
	স্যাণ্ডফ্লাই ফিভার	ভাইরাস
ইঁদুর-পোকা (র‍্যাট-ফ্লি)	প্লেগ	বীজাণু
	মিউরিন টাইফাস	বীজাণু
গায়ের উকুন	এপিডেমিক টাইফাস রিলাপ্সিং ফিভার, ট্রেঞ্চ ফিভার	
মাছি, আরশোলা, পিঁপড়ে	আমাশয়, জিয়ারডিয়া প্রভৃতি	পরজীবী
	পোলিওমায়েলাইটিস, হেপাটাইটিস এ, ই, প্রভৃতি	ভাইরাস
	কলেরা, টাইফয়েড, প্যারাটাইফয়েড়	
	অ্যানথ্রাক্স, ডিসেন্ট্রি, আন্ত্রিক, কুষ্ঠ, যক্ষা প্রভৃতি	বীজাণু
	গোলকৃমি, চাবুক কৃমি, হুকওয়ার্ম প্রভৃতি	কৃমি
এঁটুলি	টাইফাস, কাইসানুর ফরেস্ট ডিজিজ, রিল্যাপ্সিং ফিভার	বীজাণু
মাকড়	চুলকণা, স্ক্রাব টাইফাস	
সাইক্লপস	গিনিওয়ার্ম	কৃমি
পোষাপ্রাণী কুকুর	জলাতঙ্ক (ভাইরাস)	কৃমি (হাইডাটিড ডিজিজ)
বিড়াল	টকসোপ্লাসমা (প্রোটোজোয়া)	কৃমি (ট্রিচিনেলোসিস)
ইঁদুর	প্লেগ (বীজাণু)	ওয়েলস্ ডিজিজ (বীজাণু)

9.2.8. পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের সঙ্গে ক্যান্সারের যোগসূত্র

উপাদান	উদাহরণ		ক্যান্সার
ভৌত	অতি-বেগুনি রশ্মি	কৃষক, নাবিক, আনবিক চুল্লীর কর্মী	চামড়ার, ফুসফুসের, স্তনের,
	আণবিক বিকিরণ	দুর্ঘটনা, আণবিক বোমা বিস্ফোরণ	থাইরয়েডের ক্যান্সার, রক্তে লিউকিমিয়া, চামড়ায় মেলানোমা প্রভৃতি
রাসায়নিক	আলকাতরা, তেল	চিমনী পরিষ্কার করে যারা	চামড়ার ক্যান্সার
	বিটা ন্যাপথল অ্যামাইন	এই রাসায়নিক নিয়ে যারা কাজ করে	মূত্রথলির ক্যান্সার
	অ্যাসবেসটস	অ্যাসবেসটস কারখানা বা ইনসুলেশান কর্মী	ফুসফুসের ক্যান্সার
	বেনজিন	বার্ণিশ ও পালিশ নিয়ে যারা কাজ করে	লিউকিমিয়া
	ভিনাইল ক্লোরাইড	প্লাস্টিক প্রস্তুত কারকরা	লিভারের ক্যান্সার
	অ্যাফলাটক্সিন	ছত্রাক থেকে এই বিষাক্ত রাসায়নিক পাওয়া যায়। এই ছত্রাকের সংক্রমণ হয় বাদাম, ভুট্টা, মিলেটস, মটরশুটি, সরগম প্রভৃতিতে	লিভারের ক্যান্সার
ভাইরাস	হেপাটাইটিস বি ভাইরাস	যারা সংক্রমিত হয় তাদের 10% এর ঝুঁকি থাকে	লিভারের ক্যান্সার
	মানুষের প্যাপিলোমা ভাইরাস		জরায়ুর ক্যান্সার
	এপস্টাইন-বার (Epstein-Barr) ভাইরাস		নাক ও গলার ক্যান্সার ব্রঙ্কাইটিস লিমফোমা
	হিউমান ইমিউনো-ডেফিসিয়েন্সি ভাইরাস		সম্পর্ক রয়েছে ক্যাপসিস সারকোমা, ননহজকিন্স লিমফোমা, স্নায়ুতন্ত্রের লিমফোমা ও হজকিনস্ অসুখের
কৃমি	সিসটোসোমা হেমাটোবিয়াম (সিসটোসোমিয়াসিস)		মূত্রথলির ক্যান্সার
	ক্লোনরকিস সাইনেনসিস্ (লিভারের কৃমি)		লিভারের ক্যান্সার

জীবনযাত্রা প্রণালী	ধূমপান	ফুসফুস, মুখ, গলনালী, অন্ননালী ও মূত্রথলির ক্যান্সার
	খাদ্যদ্রব্য (বেশি চর্বিযুক্ত ইত্যাদি)	অন্ত্রের ক্যান্সার, স্তনের ক্যান্সার
	মদ	লিভার ও অন্ননালীর ক্যান্সার

9.3. ম্যালেরিয়া পরজীবীর জীবনবৃত্ত

মানুষের ম্যালেরিয়া পরজীবীর জীবনবৃত্ত (Life cycle of malaria parasites of man)

ম্যালেরিয়া পরজীবী এককোষী জীব। মানুষের ম্যালেরিয়া পরজীবী চার ধরনের :

(১) *প্লাসমোডিয়াম ভাইভ্যাকস (Plasmodium vivax)*

(২) *প্লাসমোডিয়াম ফ্যালসিপেরাম (Plasmodium falciparum)*

(৩) *প্লাসমোডিয়াম ম্যালেরিয়ি (Plasmodium malariae)*

(৪) *প্লাসমোডিয়াম ওভেল (Plasmodium ovale)*

ভারতে যত ম্যালেরিয়া হয় তার ভিতর **প্লাসমোডিয়াম ভাইভ্যাকস** কম বেশী 60 শতাংশ ও **প্লাসমোডিয়াম ফ্যালসিপেরাম** কম বেশী 40 শতাংশ। অতীতের তুলনায় এখন **ফ্যালসিপেরাম** ম্যালেরিয়া বাড়ছে। **প্লাসমোডিয়াম ম্যালেরিয়ির** সংখ্যা খুবই কম, দেখতে পাওয়া যায় সাধারণতঃ কিছু কিছু আদিবাসীর ভিতর। **প্লাসমোডিয়াম ওভেল** ভারতে বিরল।

প্লাসমোডিয়াম ভাইভ্যাকস, প্লাসমোডিয়াম ম্যালেরিয়ি ও **প্লালসমোডিয়াম ওভেল** ম্যালেরিয়ায় ভুগে মানুষের মারা যাবার সম্ভবানা নেই বললেই চলে। শুধু ফ্যালসিপেরাম ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়ে দীর্ঘদিন ধরা না পড়লে, রোগ কঠিন ও জটিল হয়ে পড়লে এবং সময়ে সঠিক চিকিৎসা না করলে কোন কোন রোগীর মারা যাবার সম্ভাবনা থাকে।

মনুষের ম্যালেরিয়া অন্য কোন জীবজন্তু থেকে আসে না। মানুষ থেকে মানুষে ম্যালেরিয়া ছড়ায় সংক্রমিত স্ত্রী অ্যানোফেলিস মশার মাধ্যমে।

9.3.1. ম্যালেরিয়া পরজীবীর জীবনবৃত্তের অযৌন ও যৌন পর্ব

ম্যালেরিয়া পরজীবীর জীবনের দুটি পর্ব—**অযৌন পর্ব** ও **যৌন পর্ব**।

অযৌন পর্ব অতিবাহিত হয় মানুষের শরীরের ভিতর। এই পর্বে অযৌন উপায়ে (অর্থাৎ একটি কোষ ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে বহুগুণিত হয়ে) ম্যালেরিয়া পরজীবীর সংখ্যা বৃদ্ধি হয়। প্রথমে যকৃৎ বা লিভারের কোষের ভিতর, পরে লাল রক্তকণার ভিতর আশ্রয় নিয়ে।

ধরা যাক একটি সংক্রমিত মশা তার লালাগ্রন্থিতে ম্যালেরিয়ার জীবাণু (স্পোরোজয়েট) বহন করছে। সে একজন সুস্থ মানুষকে কামড়ালো। তার লালারসের সঙ্গে কয়েকটি জীবাণু মানুষটির রক্তের মধ্যে ঢেলে দিল। আধঘণ্টা থেকে 45 মিনিট বাদে আর তাদের রক্তে দেখা যাবে না। কিছু নষ্ট হয়, যে কটা বাঁচে রক্তের সঙ্গে গিয়ে ঢুকে পড়ে যকৃতের কোষে। যকৃতের এক একটি কোষে এক একটি জীবাণু ঢোকে। সেই কোষের ভিতর একটা থেকে ভাঙতে ভাঙতে সংখ্যায় কয়েক হাজার হয়। যকৃৎকোষ আর জায়গা দিতে পারে না। আক্রান্ত কোষগুলো ফেটে যায়। হাজার হাজার পরজীবী রক্তে মেশে।

ম্যালেরিয়া পরজীবীর মূল বাসস্থান লাল রক্তকণার ভিতর। এক একটি পরজীবী এক একটি লাল রক্তকণার ভিতর ঢুকে পড়ে।

লাল রক্তকণার ভিতর এরপর পরজীবীর বংশবৃদ্ধি শুরু হয়। এক একটি সংক্রমিত লাল রক্তকণার ভিতর এক একটি পরজীবী ভেঙে অনেক (6–36টি) হতে পারে। লালরক্ত কণা ফেটে যায়। বেরিয়ে আসা পরজীবীগুলো অন্য সুস্থ লাল রক্তকণার ভিতর ঢোকে। এইভাবে 48 ঘন্টা (বা ম্যালেরিয়ি ম্যালেরিয়ার ক্ষেত্র 72 ঘন্টা) বার বার সংক্রমিত লাল রক্তকণাগুলো ফেটে যেতে থাকে (যার জন্য জ্বর হয়) এবং পরজীবী ক্রমশঃ সংখ্যাবৃদ্ধি করে চলে।

উড়ন্ত অবস্থায় স্ত্রী ও পুরুষ অ্যানোফেলিস মশার যৌনমিলন এবং জলে স্ত্রী মশার ডিম প্রসব ও ডিম থেকে লার্ভা, তার থেকে পিউপা এবং শেষে পূর্ণাঙ্গ মশার আবির্ভাব।

↓

পূর্ণাঙ্গ স্ত্রী মশার ম্যালেরিয়া রোগাক্রান্ত মানুষের রক্তপান ও রক্তপানের সময় এককোষী পরজীবি প্লাজমোডিয়াম গ্যামেটোসাইটদের *(মানবশরীরে কিছু প্লাজমোডিয়ামের রক্তের লোহিতকণিকা আক্রমনে বিরত থেকে স্ত্রী ও পুরুষ গ্যামেটোসাইটে রূপান্তর – এরাই মশার দেহে প্লাজমোডিয়াম পরজীবির সূচনা করে)* মশার পাকস্থলীতে প্রবেশ।

↓

স্ত্রী মশার শরীরে স্ত্রী ও পুরুষ প্লাজমোডিয়াম গ্যামেটোসাইটদের যৌনমিলন ও প্রথমে "উসিষ্ট" এবং পরে "স্পোরোজয়েট" সৃষ্টি (যৌনপর্ব) এবং স্পোরোজয়েটদের প্রচুর সংখ্যায় মশার লালাগ্রন্থিতে প্রবেশ এবং বসবাস।

↓

প্লাজমোডিয়াম স্পোরোজয়েট বহনকারী মশার সুস্থব্যক্তিকে দংশন এবং সুস্থ মানুষের শরীরে মশার লালা থেকে প্লাজমোডিয়াম স্পোরোজয়েটদের অনুপ্রবেশ।

↓

প্লাজমোডিয়াম পরজীবির স্পোরোজয়েটদের প্রথমে মানুষের যকৃতে ও পরে রক্তের লোহিত কণিকায় বিবর্ধন (অযৌন পর্ব) এবং ম্যালেরিয়া রোগের লক্ষনের বহির্প্রকাশ – এইভাবে প্লাজমোডিয়াম বহনকারী মশার আক্রমনে ম্যালেরিয়া রোগীর সংখ্যাবৃদ্ধি।

↓ (back to the second box)

চিত্র 9.1. ম্যালেরিয়া পরজীবির জীবনচক্র (Life cycle of the malarial parasite)।

[ভাইভ্যাকস ও ওভেল ম্যালেরিয়ায় ওষুধ খেয়ে রোগ পুরো সেরে যায়। তারপরও কোন কোন সময় পুনরাক্রমণ বা রিল্যাপ্স হয়। কিন্তু তা কিভাবে? ভাইভ্যাকস ও ওভেল ম্যালেরিয়ার বেলা কয়েকটি জীবাণু (স্পোরোজয়েট) লিভারের কোষের ভিতর চুপচাপ থেকে যায়। যেন ঘুমোয় (তাই এদের বলে হিপনোজয়েট)। সময় সুযোগ বুঝে কয়েক সপ্তাহ বা কয়েক মাস পরে এরা জেগে উঠে জীবনবৃত্ত শুরু করতে পারে, সংখ্যায় বেড়ে লিভারের কোষ ফেটে বেরিয়ে এসে আবার লাল রক্তকণা আক্রমণ করে। তখন পুনরাক্রমণ বা রিল্যাপ্স হয়। ফ্যালসিপেরাম ও ম্যালরিয়ি ম্যালেরিয়ার বেলায় এই হিপনোজয়েট অবস্থাটা থাকে না তাই ফ্যালসিপেরাম ও ম্যালেরিয়ি ম্যালেরিয়ায় পুনরাক্রমণ বা রিল্যাপ্স হয় না।]

কোন কোন ম্যালেরিয়া পরজীবী লাল রক্তকণার ভিতর ঢুকে বংশবৃদ্ধির দিকে যায় না। হয় স্ত্রী বা পুরুষ পরজীবীতে রূপান্তরিত হয়। ম্যালেরিয়া ছড়াবার ব্যাপারে মূলতঃ এরাই দায়ী। স্ত্রী **অ্যানোফেলিস** মশার শরীরে গিয়ে এদের **যৌন পর্ব** অতিবাহিত হবে।

যৌনপর্ব (স্ত্রী অ্যানোফেলিস মশার শরীরের ভিতর)

ধরা যাক ম্যালেরিয়ায় ভুগছে এমন লোকের রক্তে স্ত্রী ও পুরুষ ম্যালেরিয়া পরজীবী আছে। স্ত্রী অ্যানোফেলিস মশা তার রক্ত খেল। মশার পেটের ভিতর এল স্ত্রী ও পুরুষ ম্যালেরিয়া পরজীবী। সেখানে স্ত্রী ও পুরুষ পরজীবীর মিলন হল। তারপর ভাগ হতে হতে জীবাণু সংখ্যায় বহুগুণ বাড়ল। ছড়িয়ে পড়ল মশার শরীরে এবং শেষে জীবাণুগুলো ঢুকে পড়ল মশার লালাগ্রন্থিতে। একটি সংক্রমিত মশার লালাগ্রন্থিতে এরকম তিন লক্ষ জীবাণু (স্পোরোজয়েট) থাকতে পারে।

স্ত্রী মশা ম্যালেরিয়া ছড়ায় কিন্তু পুরুষ মশা তা পারে না। কারণ পুরুষ মশার চোষণাঙ্গ সরু ও ভোঁতা। তাই দিয়ে সে চামড়া ফুটো করতে ও রক্ত খেতে পারে না। তাই তার পেটে পরজীবী ঢুকতে পারে না স্ত্রী মশার চোষণাঙ্গ চামড়া ভেদ ও রক্ত শোষণ করতে পারে। স্ত্রী মশা রক্ত খায় এটা তার জৈবিক প্রয়োজন, রক্ত না খেলে জীবন্ত ডিম পাড়তে পারে না। স্ত্রী মশা রক্ত খায় বলেই তার শরীরের ভিতর ম্যালেরিয়া পরজীবী মিলিত হতে এবং বংশবৃদ্ধি করতে পারে এবং একজন মানুষ থেকে আর একজন মানুষের শরীরে ম্যালেরিয়া পরজীবী ঢুকিয়েও দিতে পারে।

অ্যানোফেলিস ছাড়া অন্য কোন ধরনের মশা (যেমন কিউলেক্স বা ঈডিশ)-এর শরীরের ভিতর মানুষের ম্যালেরিয়া পরজীবী বাঁচেও না, বৃদ্ধিও পায় না। তাই শুধু স্ত্রী অ্যানোফেলিস মশাই মানুষের ম্যালেরিয়া বাহিকা।

মশার শরীরে পরজীবীর যৌনপর্ব সম্পূর্ণ হতে লাগে ৮—১৬ দিন। অর্থাৎ মশা কোন ম্যালেরিয়া রোগীর রক্ত খাবার ৮—১৬ দিন পর রোগ ছড়াতে পারে। তার আগে কামড়ালে রোগ ছড়াতে পারে না। একবার সংক্রামিত হলে মশা সারা জীবন ঐ জীবাণু বহন করে চলে।

এইভাবে অংশত মানুষের মধ্যে ও অংশত মশার শরীরে ম্যালেরিয়া পরজীবীর জীবনবৃত্ত পূর্ণ হয়। ম্যালেরিয়া দমন বা উচ্ছেদ করতে গেলে কোন না কোন জায়গায় বৃত্তটিকে ভাঙতে হবে। কীভাবে সম্ভব তা নীচে দেওয়া হয়েছে।

মানুষের শরীরে যদি পরজীবী থাকে, তাহলে ওষুধ দিয়ে চিকিৎসা করে তাকে ধ্বংস করা যেতে পারে। তখন পরজীবী সংখ্যায় বৃদ্ধি পেতে পারে না।

মানুষের রক্তে থাকা স্ত্রী ও পুরুষ ম্যালেরিয়া পরজীবীগুলোকে ওষুধ দিয়ে যদি ধ্বংস করা যায়, তাহলে তখন মশা ম্যালেরিয়া রোগীর রক্ত খেলেও ম্যালেরিয়া ছড়াতে পারবে না।

মশা যদি মানুষকে কামড়াতে না পারে তাহলে সে ম্যালেরিয়া পরজীবী সংগ্রহ ও বহন করতে এবং ছড়াতে পারবে না।

মশার ঘনত্ব একটি নির্দিষ্ট মাত্রার নীচে কমিয়ে আনলে ম্যালেরিয়া ছড়ানো সম্ভব হয় না। কাজেই মশা দমন ম্যালেরিয়া দমনে সাহায্য করে।

9.3.2. রোগ বহনকারী পোকামাকড় দমন

রোগ বহনকারী পোকামাকড় দমন করতে অনেক রকম পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়। যেমন—পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখা, ব্যক্তিগত সুরক্ষা, বিভিন্ন উপায়ে পোকামাকড় নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি।

9.3.2.1. পরিবেশের স্বাস্থ্যসম্মত রদবদল

(১) পরিবেশ পরিষ্কার রাখতে হলে বাড়ীতে একটি পাত্রে আবর্জনা ঢেকে রাখতে ও যথাসময়ে অপসারণের ব্যবস্থা করলে, মানুষের মল অপসারণের জন্য স্যানিটারী পায়খানার ব্যবহার করলে, খাবার দাবার ঢেকে রাখলে, মাছি, আরশোলা প্রভৃতি উৎপাত করতে পারে না। (২) বাড়ীর চারদিকের নীচু জমি, খানাখন্দ ভরাট করলে সে সব জায়গায় জল জমে মশা জন্মাতে পারে না। (৩) নালানর্দমা বরাবর প্রবহমান থাকলে মশার লার্ভা বাড়তে পারে না ভেসে চলে যায়। (৪) বাড়ীর চারপাশের ঝোপজঙ্গল পরিষ্কার করলে মশা লুকিয়ে থাকতে পারে না। (৫) স্যানিটারী পায়খানার নল থেকে জল বেরিয়ে কোথাও জমে থাকলে, সরিয়ে ফেলার ব্যবস্থা না করলে মশা জন্মাবে। (৬) মাটির নীচে আধুনিক উন্নত নিকাশী ব্যবস্থা থাকলে যেখানে সেখানে জল জমে মশা জন্মাতে পারে না। (৭) ঘরবাড়ী, রাস্তা, রেল, বাঁধ প্রভৃতি তৈরী হবার সময় কর্তৃপক্ষ আগে থেকে যথোচিত ব্যবস্থা না নিলে মশার বংশবৃদ্ধি হবে। (৮) মাটির ঘুপচি ঘর, খড়ের চালা মশা, মাছি, আরশোলা প্রভৃতি লুকোবার আদর্শ জায়গা। বড় ঘর, বড় জানালা, টিনের বা অ্যাসবেস্টসের চাল হলে সে সম্ভাবনা কম। (৯) স্যানিটারী পায়খানার ভিতর এক ধরনের মশা (আর্মিজারিস মশা যা রোগ বহন করে না তবে সকালে বিকালে কামড়ায়) জন্মায়। ভেন্টপাইপ জাল দিয়ে ঢেকে রাখলে ঐ মশা ঢুকতে বেরুতে পারে না। (১০) পুকুরে টোপাপানা থাকলে এক ধরনের মশার (ম্যানসনিয়া) লার্ভা তার শিকড়ে লেগে থাকে এবং জীবনবৃত্ত পূর্ণ করে। টোপাপানা তুলে ফেলে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। (১১) মাঠে জল নিয়ন্ত্রণ করা গেলে হঠাৎ জলস্তর কমিয়ে মশার লার্ভা মারা সম্ভব।

9.3.2.2. ব্যক্তিগত সুরক্ষা

(ক) মশারি – মশারি টাঙিয়ে শুলে মশার কামড়ের ঝুঁকি কম থাকে। রোগ বহনকারী বেশীর ভাগ মশা (ঈডিশ ছাড়া) কামড়ায় রাতের বেলা। শিশুদের তো রাত্রে রাখতেই হবে মশারির ভিতর। এখন আবার কীটনাশক (সংশ্লেষিত পাইরেথ্রয়েড) ছিটানো মশারি পাওয়া যায়। এই মশারির উপর কোন পতঙ্গ বসলে মারা পড়ে। যে কীটনাশক ব্যবহার করা হয় তাতে মানুষের কোন ক্ষতির কথা শোনা যায় না। জাম্বিয়াতে কীটনাশক মশারি ব্যবহার করে—ম্যালেরিয়া থেকে শিশু মৃত্যুর হার অর্ধেক কমিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে। **(খ) গা হাত পা ঢেকে রাখা**—সন্ধ্যা থেকে ফুলহাতা জামা, ট্রাউজার, মোজা পরতে হবে। ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের ম্যালেরিয়া কম হয়। তার একটা কারণ নিশ্চয়ই কাপড় চোপড় দিয়ে শরীর তাদের বেশী ঢাকা থাকে ছেলেদের চেয়ে। **(গ) গায়ে মশা তাড়ানোর কোন ওষুধ লাগনো**—ডাইমিথাইল থ্যালেট, ডাইইথাইল টলুয়ামাইড (DEET) প্রভৃতি এই ধরনের ওষুধ। গায়ে লাগালে কয়েক ঘন্টা মশা বসবে না। লাগাতে হয় শরীরের খোলা অংশে পায়ে, হাতে, ঘাড়ে, মুখে। নিমতেলেরও এই গুণ আছে। **(ঘ) মশা মাছি নিরোধক জাল**—যাঁদের পক্ষে সম্ভব, জানালায় জাল লাগাতে পারেন। (ঙ) খাবার দাবার ঠিকমত ঢেকে রাখলে আরশোলা মাছি প্রভৃতি বসতে পারে না।

9.3.2.3. উৎসে লার্ভা ধ্বংসে

মশা মারার শ্রেষ্ঠ উপায় উৎসে লার্ভা ধ্বংস করা। [মশার জীবনচক্রের চারটি দশা—ডিম, লার্ভা, পিউপা ও পূর্ণাঙ্গ মশা। ডিম, লার্ভা ও পিউপা দশা কাটে জলে। কলকাতাসহ বড় বড় শহরে মশার লার্ভা খুঁজে তাকে মারার উপরই জোর দেওয়া হয়। কলকাতায় ম্যালেরিয়ার মশা (অ্যানোফেলিস স্টিফেনসাই) ও ডেঙ্গুর মশা (ঈডিশ ইজিপ্টাই) জন্মে স্বাদু জলে—চৌবাচ্চা, অব্যবহৃত খালি টব, ড্রাম, ভাঙ্গাচোরা পাত্র, জলাধার প্রভৃতিতে জমা জলে, ছাদের উপর জমা জলে বা নতুন সিমেন্টের মেঝে করা হলে তাতে জমা জলে, এমনকি ফুলদানির জলে ও পিঁপড়ে তাড়াতে জল পাতা হলে

কিংবা ভাঙ্গা পাইপে অথবা এয়ার কণ্ডিশন্ মেসিনে, পড়ে থাকা টায়ারে, রেফ্রিজারেটরের নীচে জমা জল লার্ভার আঁতুড় ঘর হিসেবে চিহ্নিত করা সম্ভব এবং এই কারণেই উৎসে লার্ভা ধ্বংস করা যেতে পারে।

9.3.2.4. জৈবিক নিয়ন্ত্রণ

দিনদিন গুরুত্ব পাচ্ছে এই পদ্ধতি। মশার লার্ভা মারতে কার্যকর ভূমিকা নিচ্ছে। যেমন (ক) ব্যাসিলাস থারিনজিয়েনসিস এইচ ১৪ নামে এক ধরনের বীজাণু মশার লার্ভার শরীরে ঢুকে তাকে ধ্বংস করতে পারে। বলা হয় মশার লার্ভা ছাড়া মানুষ বা অন্য কোন প্রাণীর কোন ক্ষতি করে না। পরিবেশকেও দূষিত করে না। (খ) আর এক ধরনের বীজাণু (ব্যাসিলাস স্ফেরিকাস) ও মশার লার্ভা মেরে ফেলতে পারে। এই ধরনের বীজাণু পরিবেশে থেকে যায় এবং একবার পরিবেশে টিকে যেতে পারলে মশার লার্ভা সংক্রামিত হতেই তাকে মেরে ফেলে। প্রাকৃতিক নিয়মেই তখন মশার লার্ভা নিয়ন্ত্রিত হয়, বাইরে থেকে আর ছড়ানোর দরকার হয় না। (গ) মাছ—গাপ্পিমাছ মশার লার্ভা খেতে খুব পটু। এই মাছ তাড়াতাড়ি বংশবৃদ্ধি করে এবং নোংরা জলেও থাকতে পারে। এইরকম আর যে সব মাছ লার্ভা খায়—গ্যাম্বুসিয়া, তেচোখো, তেলাপিয়া প্রভৃতি। চৌবাচ্চাতেও মাছ ছাড়া যায়।

9.3.2.5. কীটনাশক

কীটনাশক সেইসব রাসায়নিক পদার্থ যা কীটপতঙ্গকে মেরে ফেলে। এক এক ধরনের কীটনাশক এক এক ভাবে কাজ করে।

(ক) পেটে গিয়ে বিষক্রিয়া—খাবারে মিশিয়ে দেওয়া হয়, যেমন প্যারিস গ্রীণ (অ্যানোফেলিস মশার লার্ভা মারতে ব্যবহার হয়)।

(খ) সংস্পর্শে বিষক্রিয়া—যেমন পাইরেথ্রাম, পতঙ্গের শরীরে লাগলে বহিঃআবরণ ভেদ করে ভেতরে ঢোকে, শ্বাসনালীর ভিতর দিয়েও ভিতরে ঢোকে। বাতাসে স্প্রে করা হয়।

(গ) দেওয়ালে স্প্রে করে দিলে কীটনাশকের অবশিষ্টাংশে দেওয়ালে বহুদিন কার্যকর থাকে। কোন পতঙ্গ সেই দেওয়ালে বসলে তার শরীরে কীটনাশক ঢোকে ও সে মারা পড়ে। যেমন ডি ডি টি, গ্যামাক্সিন (অর্গানোক্লোরিন), ম্যালাথিয়ন (অর্গানোফসফরাস), ডেলটামেথ্রিন (সিনথেটিক পাইরেথ্রয়েড) প্রভৃতি।

(ঘ) গ্যাস, যেমন হাইড্রোসায়ানিক অ্যাসিড গ্যাস, সালফার ডাইঅক্সাইড, মিথাইল ব্রোমাইড প্রভৃতি।

কীটনাশক ব্যবহার পদ্ধতি

(ক) রেসিডুয়াল স্প্রে : কীটনাশক ছড়াবার আগে সমীক্ষা করে জানতে হবে যে কোন কীটনাশক দেওয়ালে স্প্রে করা হবে বা ছড়ানো হচ্ছে তার বিরুদ্ধে রোগবাহী পতঙ্গ প্রতিরোধ ক্ষমতা অর্জন করেছে কিনা — যেমন এখনো কালাজ্বরের বাহিকা স্যাণ্ডফ্লাই দমনে ডিডিটি কার্যকর, কিন্তু ম্যালেরিয়ার মশা অনেক জায়গায় ডিডিটির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্ষমতা অর্জন করেছে। তখন ম্যালাথিয়ন ব্যবহার করা হয়। ম্যালাথিয়নের বিরুদ্ধেও যদি প্রতিরোধ ক্ষমতা অর্জিত হয়ে থাকে, তখন সিনথেটিক পাইরেথ্রয়েড প্রয়োগ করতে হতে পারে।

শহরে কিন্তু দেওয়ালে কীটনাশক ছড়ানো কোন কাজ দেয় না। কারণ শহরের অধিকাংশে ধরণের মশাই অধিকাংশে কীটনাশকের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্ষমতা অর্জন করেছে, তাছাড়া তাদের স্বভাবও বদলেছে, দেওয়ালে বিশ্রাম নেওয়ার জন্য বসেও না, রক্ত খেয়েই বেরিয়ে আসে। তাই শহরে উৎসে মশার লার্ভা ধ্বংস করাই মশা নিয়ন্ত্রণের সব থেকে ভাল উপায়।

(খ) **স্পেশ স্প্রে** : ঘরের মধ্যে বাতাসে স্প্রে করলে সাধারণতঃ ঘরের মশা বা অন্য ছোট পতঙ্গ থাকলে মারা পড়ে। পাইরেথ্রাম এক ধরনের কীটনাশক পাওয়া যায় ক্রিসেনথেমাম (চন্দ্রমল্লিকা গোত্রের) ফুল থেকে, মানুষের কোন ক্ষতি করে না কিন্তু কেরোসিনের সঙ্গে মিশিয়ে দিতে হয়। তাৎক্ষণিক কার্যকর, কিন্তু সীমিত সময়ের জন্যও পরিবেশ দূষিত করে।

(গ) **মশা মারতে গাড়ী থেকে ধোঁয়া ছড়ানো** : এই ধোঁয়ায় থাকে সাধারণতঃ পাইরেথ্রাম বা ম্যালাথিয়ন। বিশেষ কার্যকর নয় এবং পরিবেশ দূষিত করে। এক জায়গার মশা অন্য এক জায়গায় পালায়। সব জায়গায় সমানভাবে ছড়িয়ে পড়তে পারে না ও খুব উঁচুতে উঠতে পারে না। যে সময়ে দেওয়া হয় মশারা আসে না বা ঘরে থাকে না। মিথ্যা নিরাপত্তাবোধ জাগায়।

(ঘ) মাট, কয়েল, ধূপ, ধোঁয়া সম্বন্ধেও একটা কথা মনে রাখা দরকার যে এরা পরিবেশ দূষিত করে। শিশুদের স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয়।

(ঙ) মাথার উকুন মারতে মাথায় গ্যামাক্সিন লোশন বা মলম বা ম্যালাথিয়ন ব্যবহার করা হয়। গায়ের উকুন মারতে গ্যামাক্সিন পাউডার বা মলম ব্যবহার করা হয়।

লার্ভার রাসায়নিক নিয়ন্ত্রণ

উৎসে যখন লার্ভা নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হয় না, তখন লার্ভা মারার ওষুধ ব্যবহার করা হয় : (ক) ডিজেল বা ম্যালেরিয়ল জলে ছড়ালে জলের ওপর তেল ভাসে, লার্ভা অক্সিজেন নিতে না পেরে মারা পড়ে। ৭ দিন অন্তর ছড়াতে হয়। খুব একটা কার্যকর নয়। কারণ তেলের পর্দা সরে গেলেই লার্ভার অক্সিজেন নেবার ও বেঁচে থাকবার কোন অসুবিধে হয় না। তাছাড়া এখন দাম খুব বেশী। (খ) ফেনথিয়ন, অ্যাবেট প্রভৃতি (অর্গানোফসফরাস) রাসায়নিক ১০ দিন অন্তর ছড়াতে হয়। কিন্তু এইসব রাসায়নিকের কতকগুলি খারাপ দিক আছে। দীর্ঘ ব্যবহারে ধার কমে এসেছে। লার্ভা অনেক ক্ষেত্রে প্রতিরোধ ক্ষমতা অর্জন করে ফেলেছে। মানুষসহ অন্য যে কোন প্রাণীর পক্ষে বিষাক্ত। পরিবেশ দূষিত করে। জলজ অনেক প্রাণী যারা মশার লার্ভা খায়, তাদের মেরে ফেলে। এই ধরনের কীটনাশক যত কম ব্যবহার করা যায় ততই ভাল। এ সবের পরিবর্তে এখন জৈব কীটনাশক (যেমন ব্যাসিলাস থারিনজিয়েনসিস) ব্যবহারের সুপারিশ করা হয়।

টোপ হিসাবে রাসায়নিকের ব্যবহার : যেমন মাছি মারতে দুধে ফরম্যালডিহাইড মেশানো বা চিনির সঙ্গে ডায়াজিনিন (অর্গানো-ফসফরাস রাসায়নিক) মিশিয়ে ছিটানো, আরশোলা মারতে প্রপকসুর (কারবামেট) টোপ ব্যবহার করা।

9.3.2.6. আটক রাখা (Quarantine)

যেমন পীতজ্বর এলাকা (যেমন আফ্রিকা) থেকে আসা বিমানকে সরাসরি ঢুকতে না দিয়ে দেশের বাইরে কোন বিমানবন্দরে আটকে রেখে তার ভিতর কীটনাশক ছড়ানো হয়। আবার ভারতের বিমানবন্দরে পৌঁছলে আর একবার। অনেক সময় উপযুক্ত ছাড়পত্র না থাকলে যাত্রীকে কিছুদিনের জন্য আটকে রাখা হয় চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে।

9.3.2.7. অন্যান্য পদ্ধতি

(ক) নির্বীজকরণ পদ্ধতি—পুরুষ মশাকেও ওষুধ খাইয়ে বা গামা রেডিয়েশন প্রয়োগ করে প্রজনন ক্ষমতাহীন করা যায়। এমন মশা স্ত্রী মশার সঙ্গে মিলিত হলে স্ত্রী মশা যে ডিম পাড়বে তার থেকে সক্ষম লার্ভা বেরুবে না। (খ) জিন পরিবর্তন করে মশার আয়ু কমিয়ে দেওয়া বা শুধু পুরুষ মশার জন্ম দেওয়া (গ) আলোর ফাঁদ পাতা (ঘ) পতঙ্গের যৌন হরমোন দিয়ে ফাঁদ পাতা (ঙ) বিশেষ একটা শব্দ তরঙ্গ সৃষ্টি করে মশা বা অন্য ক্ষতিকারক পতঙ্গকে আকৃষ্ট করা। এসব এখনো পর্যন্ত পতঙ্গ দমনে কার্যকর ভূমিকা নিতে পারেনি, তবে ভবিষ্যতে এইসব উন্নততর নব নব প্রযুক্তি, বিশেষ করে জৈবপ্রযুক্তি প্রয়োগের সম্ভাবনা বাড়ছে।

9.4. কৃষিক্ষেত্রে রাসায়নিক কীটনাশক ব্যবহারের ঝুঁকি, সার্বিক নিয়ন্ত্রণ, জৈব নিয়ন্ত্রণ এবং জৈব প্রযুক্তির ব্যবহার

আমাদের দেশ কৃষিপ্রধান। শস্য, ফলমূল, শাকসব্জি ও গাছের বড় শত্রু পোকামাকড়। এই সব পোকামাকড় মারতে নানা ধরনের রাসায়নিক ব্যবহার করা হয় এবং এগুলি সবই বিষাক্ত, মানুষের শরীরে ঢুকতে পারে প্রশ্বাসের সঙ্গে মিশে, খাবার জিনিষের সঙ্গে পেটে গেলে বা ভুল করে খেয়ে ফেললে এবং চামড়া থেকে বিশোষিত হলে বিষক্রিয়ার সৃষ্টি হয়।

যেসব ক্ষেত্রে কীটনাশক থেকে বিষক্রিয়ার সম্ভাবনা

(১) কীটনাশক তৈরীর কারখানায়

(২) কৃষিক্ষেত্রে ব্যবহার করার জন্য যখন তৈরী করা হচ্ছে ও মেশানো হচ্ছে

(৩) কীটপতঙ্গ নিয়ন্ত্রণ বা ধ্বংস করার জন্য যখন ছড়ানো হচ্ছে, শস্যে, ফলে, শাকসব্জিতে অল্প পরিমাণে জমা হতে থাকে। মানুষ সে সব খেলে মানুষের শরীরে কীটনাশকের অবশিষ্টাংশ জমা হয়

(৪) ঘরে অরক্ষিত অবস্থায় যখন রাখা থাকে এবং

(৫) খাদ্যশস্যে বা খাদ্যে কীটনাশকের অবশিষ্টাংশ যখন জমা হয়। ক্ষেতে কীটনাশক ছড়ানো হলে কোন কোন কীটনাশক খাদের ভিতর দিয়ে বেরোয়।

প্রথম তিনটি ক্ষেত্রে কীটনাশক (ক) নিঃশ্বাসের সঙ্গে শরীরে ঢুকতে পারে (খ) খাবার-দাবারের সঙ্গে মিশে পেটে যেতে পারে বা ভুল করে খেলেও পেটে যায় বা আত্মহত্যার জন্য ব্যবহার করা হয়। (গ) চামড়ার সংস্পর্শে এলে চামড়া থেকে বিশোষিত হয়। এই ধরনের দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পেতে হলে আগে থেকে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। কর্মীদের এমন মুখঢাকা মুখোশ পরতে হবে যাতে শ্বাসনালী বা খাদ্যনালীতে কীটনাশক না ঢোকে।

খাবার-দাবার ঢেকে রাখতে হবে, কাজ করার পর ভাল করে হাত পা ধুয়ে খেতে হবে। সারা গা ঢাকা পোষাক পরতে হবে, হাতে গ্লাভস পরতে হবে, পায়ে থাকবে বুট জুতো। এসব পোষাক-আশাক কাজ করার পর রোজ বদলাতে হবে, কেচে বা পরিষ্কার করে নিতে হবে।

চতুর্থ ক্ষেত্রে কীটনাশক অরক্ষিত অবস্থায় ঘরে রাখা উচিত নয়। কেউ ভুল করে খেয়ে ফেলতে পারে। ঘরে যদি রাখতে হয় তাহলে এটা যে বিষাক্ত ও বিপজ্জনক সেই চিহ্ন দিয়ে রাখতে হবে। শিশুদের কাছ থেকে দূরে রাখতে হবে। আত্মহত্যা করার জন্য মানুষ কোন কোন বিষাক্ত কীটনাশক বেছে নেয় সেদিকে যথোচিত সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত।

পঞ্চম ক্ষেত্রে খাদ্যে যে সব কীটনাশকের অবশিষ্টাংশ জমে সেই সব কীটনাশকের ব্যবহার পরিহার করে পরিবেশ সহায়ক কীটনাশক অথবা পরিবেশের বন্ধু ভাবাপন্ন কীটনাশক ব্যবহার বাঞ্ছনীয়।

9.4.1. কীটনাশক থেকে বিষক্রিয়া

অর্গানোক্লোরিন কীটনাশক ঃ ডিডিটি : মাথা ধরা, শারীরিক দুর্বলতা, সূচ ফোটানো অনুভূতি বা অসাড়ভাব এবং বিষক্রিয়া বেশী হ'লে হাত পা কাঁপা ও খিঁচুনী হয়। ডিডিটি বিষক্রিয়া থেকে মৃত্যুর সম্ভাবনা কম।

বেনজিন হেক্সাক্লোরাইড বা গ্যামাক্সিন : গ্যাসের আকারে নাক মুখ দিয়ে ঢুকলে মাথা ধরা, নাকমুখ জ্বালা, আমবাত ও চামড়ার বিরূপ প্রতিক্রিয়া (allergy) দেখা যায়। এই কীটনাশক থেকেও মৃত্যুর সম্ভাবনা নেই।

ডায়েলড্রিন : চামড়ার মধ্য দিয়ে সহজে বিশোষিত হয়, চামড়ার বিরূপ প্রতিক্রিয়া (অ্যালার্জি), আমবাত প্রভৃতি দেখা দেয়, ক্ষুধামান্দ্য এবং মৃগী রোগীর মত খিঁচুনী, মৃত্যু হতে পারে। মাছ ও অন্যান্য জীবজন্তুর পক্ষেও বিপজ্জনক, তাই কৃষিক্ষেত্রে এর ব্যবহার নিষেধ করে দেওয়া হয়েছে।

বেশীরভাগ কীটপতঙ্গ ডিডিটির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্ষমতা অর্জন করেছে। ডিডিটি জলজ পোকামাকড় মেরে ফেলে, মাছের খাবার কমে যায়। বেশী মাত্রায় ডিডিটি ব্যবহারে মাছও মরে যেতে পারে। মাছ যদি মারা নাও পড়ে, তাহলেও তাদের শরীরে যথেষ্ট পরিমাণে এই ডিডিটি থেকে যায়, সেই মাছ খেলে পাখীর প্রজনন ক্ষমতা কমে। এই সব খাদ্য-শস্যের মধ্যে দিয়ে মানুষের শরীরেও ডিডিটি জমতে থাকে। মায়ের বুকের দুধেও ডিডিটির অস্তিত্ব পাওয়া গেছে। চারণভূমিতে ডিডিটি ছড়ালে গরুর শরীরে যায় এবং গরুর দুধেও ডিডিটি পাওয়া যায়। এমনকি হাঁস মুরগীর ডিমেও এর অস্তিত্ব থেকে যায়। এইসব কারণে কৃষিক্ষেত্রে ডিডিটি ব্যবহার ভারতে নিষিদ্ধ। শুধু সীমিত ক্ষেত্রে, যেমন কালাজ্বর নিয়ন্ত্রণে ব্যবহার করা হয়।

বেশীরভাগ কীটপতঙ্গ গ্যামাক্সিনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্ষমতা অর্জন করেছে। এছাড়া মানুষের শরীরে অবশিষ্টাংশ হিসাবে গ্যামাক্সিনের পরিমাণও ক্রমবর্ধমান, তাই এই কীটনাশকটির ব্যবহার ভারতে নিষিদ্ধ।

অর্গানোফসফরাস কীটনাশক : (ম্যালাথিয়ন, ডায়াজিনন, ফেনথিয়ন, বেটেক্স, ফেনিট্রোথিয়ন, প্রভৃতি)

বিষক্রিয়া : চোখের মণি কুঁচকে ছোট হয়ে যায়, ঠাণ্ডা লাগে, লালা গড়ায়, বমিভাব, বমি, পাতলা পায়খানা, হাত পা খিমচে ধরা, নাড়ির গতি কম, খিঁচুনী, শ্বাসনালীর সংকোচন, ফুসফুসের শোথ। মারা যাওয়ার ঝুঁকি বেশী। মৃত্যু হয় সাধারণত শ্বাসক্রিয়া বন্ধ হওয়ার ফলে।

কার্বামেট, প্রোপকসুর (বেগন), কার্বারিল (সেভিন) প্রভৃতি :

বিষক্রিয়া : উপসর্গ অর্গানোফসফরাস কীটনাশকের মত, তবে শেষ অবধি সুস্থ হয়ে ওঠার সম্ভাবনা বেশী। মারা যাওয়ার ঝুঁকি থাকে না।

সায়ানাইড : ইঁদুর মারা বিষ ও কৃষিসারে সায়ানাইড ব্যবহৃত হয়। ফোম পোড়ানো গ্যাসে সায়ানাইড বের হয়।

বিষক্রিয়া : ভুল করে খেলে বা নিঃশ্বাসের সঙ্গে ফুসফুসে গেলে অল্প সময়ের মধ্যে মাথা ঝিমঝিম, মাথা ঘোরা, মাথাধরা, শ্বাস নিতে কষ্ট, শক, রোগী অজ্ঞান হয়ে যায়। চামড়ার রঙ লাল হয়ে যায়। একটা তেঁতো কটুগন্ধ পাওয়া যায়।

প্যারাকোয়াট (Paraquat dichloride) :

কৃষিক্ষেত্রে লতাগুল্ম ধ্বংসের কাজে ব্যবহৃত হয়। তরল আকারে এবং গুঁড়ো পাউডারে পাওয়া যায়। নেত্রবর্ত্মকলা (conjunctiva) ও অক্ষিগোলকের আবরণ (cornea)-এ সাংঘাতিক প্রদাহ, চোখ নষ্ট হয়ে যেতে পারে। চামড়ায় লাগলে চামড়ার সাংঘাতিক প্রদাহ, জ্বালা, ফোস্কা। নিঃশ্বাসের সঙ্গে ফুসফুসে গেলে নাক দিয়ে রক্তপাত, অন্ননালীর উপরের অংশের (গলবিল—pharynx) ও স্বরনালী (larynx)-র প্রদাহ, ভুল করে খেলে, মুখে অন্ননালীতে ও পেটে বেদনাদায়ক অনুভূতি, ঠোঁটে, জিভে ও গলবিলে ঘা।

বমিভাব, বমি, ঘাম, হাঁপানী, খিঁচুনী, শ্বাস নিতে কষ্ট, ফুসফুসের শোথ। হার্ট বা কিডনী ফেল করতে পারে। মৃত্যু হয় শ্বাসক্রিয়া বন্ধ হবার ফলে।

সংশ্লেষিত পাইরেথ্রয়েড (ডেলটামেথ্রিন) :

বিষক্রিয়া : সব থেকে দামী কীটনাশক, মানুষের উপর এই কীটনাশকের বিষ ক্রিয়া সব থেকে কম। কারুর কারুর ক্ষেত্রে চামড়ায় বিরূপ প্রতিক্রিয়া বা অ্যালর্জী হতে পারে। তাহলেও স্প্রে করার সময় সবরকম সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে।

9.4.2. সার্বিক নিয়ন্ত্রণ

এখন কৃষিক্ষেত্রে মূলতঃ অর্গানোফসফরাস, কার্বামেট ও সিনথেটিক পাইরেথ্রয়েড কীটনাশক ব্যবহার করা হয়। এগুলির কোনটাই পরিবেশের বন্ধু নয়। অনেক উপকারী পোকামাকড় ও প্রাণী মারা পড়ে। তাছাড়া কীটপতঙ্গ এইসব ধরনের বেশীরভাগ কীটনাশকের বিরুদ্ধে প্রতিরোধক্ষমতা অর্জন করে চলেছে। তাই এখন তেমন কাজও দেবে না, দামও বেশী। মানুষের ও গৃহপালিত পশুর স্বাস্থ্যের ক্ষতিও করে।

এখনই হয়ত এইসব রাসায়নিক কীটনাশককে একেবারে বাদ দেওয়া সম্ভব হবে না। তাহলেও অনেক ধরনের নতুন চিন্তা ভাবনা শুরু হয়েছে। কীটপতঙ্গ নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে শুধু রাসায়নিক কীটনাশকের উপরেই নির্ভর করা আর চলছে না। জোর দেওয়া হচ্ছে সার্বিক নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির উপর। যত দিক দিয়ে পারা যায় সব রকম পদ্ধতি অবলম্বন করার কথা বলা হচ্ছে। এইরকম কয়েকটি নতুন পদ্ধতি এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে।

9.4.2.1. জৈবিক নিয়ন্ত্রণ

(ক) একধরনের বীজাণু (ব্যাসিলাস থারিনজিয়েনসিস, কুরসটাকি (*Bacillus thuringiensis, kurstaki*) থেকে তৈরী বিষ শুঁয়োপোকা (লেপিডপটেরা) নিধনের কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। এই বীজাণুর বিষ মানুষ বা অন্য কোন প্রাণীর কোন ক্ষতি করে না, শুধু ঐ পোকাদের ধ্বংস করে, তাই পরিবেশের বন্ধু।

(খ) কৃষিক্ষেত্রে বীজ ও মাটি থেকে ছত্রাক ধ্বংস করার জন্য এই রকম ব্যবহার করা হচ্ছে আর এক ধরনের বিষ, যা পাওয়া যায় আর এক ধরনের বীজাণু (*Trichoderma viridae*) থেকে।

(গ) এক ধরনের ভাইরাস নিউক্লিওপলিহেড্রোসিস ভাইরাস—(Nucleopolyhedrosis virus) টোমাটোর ক্ষতিকারক পোকা (Podoptera) মারতে ব্যবহার করা হয়।

9.4.2.2. ভেষজ থেকে প্রাপ্ত জৈবরাসায়নিক

নিম থেকে প্রাপ্ত এক ধরনের জৈবরাসায়নিক অ্যালকালয়েড—অ্যাজাডিরাকটিন (Azadirachtin) ব্যবহার করা হচ্ছে, মেরী পোকা (aphids), শ্যামা পোকা (jassids) ও সাদা মাছি (white fly) নিধন করতে। এই জিনিষ ছড়ালে পোকা তার উপরে বসলে পোকার খাবার ইচ্ছা লোপ পায়, তাছাড়া এই জৈবরাসায়নিক ছড়ানো থাকলে কীট পতঙ্গ ঘেঁষতে চায় না।

9.4.2.3. হরমোন

ফেরোমোন, কীটপতঙ্গের এক ধরনের যৌন হরমোন। ফাঁদে পুরুষ বা স্ত্রী হরমোন ব্যবহার করা হয়। যথাক্রমে স্ত্রী ও পুরুষ পতঙ্গ আকৃষ্ট হয় ও মারা পড়ে। ফুলকপি, বাঁধাকপির পোকা (Podoptera) মারতে ব্যবহার করা হয়।

9.4.2.4. জীবপ্রযুক্তি (জিনপ্রযুক্তি)

জিনের বদল ঘটিয়ে উপযুক্ত জিন ঢুকিয়ে এমন বীজ তৈরী করা সম্ভব, সেই বীজ থেকে গাছ হলে কীটপতঙ্গ সেই গাছ, তার ফুল ও ফলের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। এইভাবে জীবপ্রযুক্তির সাহায্যে কীটপতঙ্গ নিয়ন্ত্রণ সম্ভব। যা এই শতাব্দীতে আনবে যুগান্তর। কীটপতঙ্গের বিরুদ্ধে গাছ নিজেই গড়ে তুলবে প্রতিরোধ।

এমন রাসায়নিক আছে, যা ছড়ালে গাছ মারা যায়। সেই গাছের বীজের জিনের অদল-বদল ঘটালে ক্ষতিকারক রাসায়নিক ছড়ালেও গাছ আর মরবে না।

9.5. ধাতু ও জৈবদূষণ থেকে বিষক্রিয়া—প্রকৃতি ও প্রতিরোধ

9.5.1. ধাতু থেকে বিষক্রিয়া

9.5.1.1. সীসা (Lead)

উৎস : (১) কলকারখানার কর্মীদের মধ্যে যে কোন বিষাক্ত বায়ুর তুলনায় সীসা থেকে বিষক্রিয়ার সম্ভাবনা সব থেকে বেশী। ২০০ ধরনের বেশী শিল্পে সীসার ব্যবহার হয়। উদাহরণ—ব্যাটারী, কাচ, জাহাজ নির্মাণ, ছাপাখানা, রবার, মৃৎশিল্প প্রভৃতি।

(২) পরিবেশে সীসা দূষণ সব থেকে বেশী হয় গ্যাসোলিন থেকে। মোটর গাড়ীর ধোঁয়ার সঙ্গে হাজার হাজার টন সীসা প্রতিবছর পরিবেশে মিশছে।

(৩) সীসার নল দিয়ে জলসরবরাহ হলে, সীসার জলাধার ব্যবহার করা হলে সেই জল থেকেও বিষক্রিয়ার সম্ভাবনা।

(৪) শিশুদের খেলনায় যে সব রঙ করা হয় তাতে সীসা থাকে। শিশুরা সেগুলো মুখে দেয়।

(৫) সীসা ঝালাই দেওয়া পাত্রে খাবার-দাবার, পানীয়-জল রাখলে বিষক্রিয়ার সম্ভাবনা।

(৬) যেখানে সীসা গলানো হয়, সেখানে রাস্তার উপর আশেপাশে সীসা জমে থাকে। সীসা লেগে থাকতে পারে ফল ও শাকসব্জীর উপর।

(৭) মৃন্ময় পাত্রের কারখানায়, মৃন্ময় পাত্র চকচকে করা ও রঙ করার সময়ে সীসা ব্যবহার করা হয়। ঐ ধরনের পাত্রে খাবার-দাবার রাখলে বিষক্রিয়ার সম্ভাবনা।

(৮) অনেক সময়ে ঘরবাড়ী যে রঙ করা হয়, তাতে সীসা দিলে একটা মিষ্টি গন্ধ আসে, শিশুরা চেটে খায়, পেটে গেলে বিষক্রিয়া হয়। শরীরে গেলে সীসা শরীরে জমা হতে থাকে। শরীর থেকে বের হয় ধীর গতিতে। বেশীর ভাগ সীসা শেষ অবধি জমা হয় হাড়ে।

উপসর্গ : ক্ষুধামান্দ্য, বমিভাব, বমি, দাঁতের মাড়িতে একটা নীলদাগ, পেটে শূলবেদনা, সাংঘাতিক কোষ্ঠকাঠিন্য, রক্তাল্পতা, মাংসপেশী শ্লথ, হাত ও পা নীচের দিকে ঝুঁকে পড়ে, অনিদ্রা, মাথাধরা, মানসিক বিভ্রান্তি, ভুলবকা, আচ্ছন্নতা, শেষপর্যন্ত রোগী জ্ঞান হারায়।

প্রতিরোধ : (১) যেখানে সম্ভব সীসার বদলে অন্য ধাতুর ব্যবহার, (২) ক্ষতিকারক সীসার ধোঁয়া ও ধুলা যে সব শিল্প কারখানা থেকে বের হয়, সেগুলো লোকালয় থেকে দূরে রাখা, ঢেকে রাখা, (৩) ধোঁয়া, ধুলো যাতে তাড়াতাড়ি বার করে দেওয়া যায়, সেরকম বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা রাখা, (৪) যে সব জায়গায় সীসার ধুলা পড়ার সম্ভাবনা, যেমন মেঝে,

বসার জায়গা, মেশিন প্রভৃতি জল দিয়ে মুছে পরিষ্কার করা, (৫) যে সব কারখানায় সীসা নিয়ে কাজ হয়, সে সব জায়গায়, আবহাওয়ায় সীসার পরিমাণ যেন বিপদসীমার মাত্রার নীচে থাকে, সেটা দেখা, (৬) কর্মীদের নির্দিষ্ট সময় অন্তর স্বাস্থ্যপরীক্ষা করা, (৭) ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যরক্ষা যেমন খাবার আগে জল দিয়ে ভাল করে হাত ধোওয়া, (৮) কারখানায় স্নান করার, হাতপা ধোয়ার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা, (৯) স্বাস্থ্যশিক্ষা দিয়ে কর্মীদের সচেতন করা।

প্রাথমিক অবস্থায় ধরা পড়লে বিষক্রিয়ার উৎস খোঁজা ও চিকিৎসার মাধ্যমে বিষক্রিয়া দূর করা সম্ভব হয়।

9.5.1.2. আর্সেনিক (Arsenic)

উৎস : (১) কোন কোন কীটনাশক ও ইঁদুর মারার ওষুধে আর্সেনিক থাকে (২) অবৈধভাবে মদ তৈরী ও গর্ভপাতের জন্য আর্সেনিক ব্যবহৃত হয়। (৩) তামা গলানো কারখানায় যাঁরা কাজ করেন তাঁরা আর্সেনিকের বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত হতে পারেন কারণ তামা গলানোর একটি স্তরে উপজাত (byproduct) হিসাবে আর্সেনিক পাওয়া যায় (৪) অ্যালোপ্যাথিক নানা ওষুধে আগে আর্সেনিক ব্যবহৃত হত, এখন অনেক কমেছে (৫) ভারতসহ বহু দেশে বহু টোটকা ওষুধে আর্সেনিক এখনো ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয়। আমেরিকা ও আর্জেনটিনার কোন কোন নদীর জলে স্বাভাবিকের তুলনায় বেশী মাত্রায় আর্সেনিক আছে (৬) কীটনাশক ওষুধে আর্সেনিক থাকে। (৭) কৃষিক্ষেত্রে গুল্ম ধ্বংস করার কাজে আর্সেনিক ব্যবহার হয় (৮) পমফ্রেট ও ইলিস মাছে আর্সেনিক তুলনামূলকভাবে বেশীমাত্রায় পাওয়া যায়। মাটির কোন স্তরে আর্সেনিক থাকতে পারে—রাসায়নিক বিক্রিয়ায় আর্সেনিক মুক্ত হয়ে সেই স্তরের জলে মিশতে পারে। ঐ স্তর পর্যন্ত নলকূপ গেলে সেই নলকূপের মধ্যে আর্সেনিক স্বাভাবিকের তুলনায় বেশী মাত্রায় থাকতে পারে। এইভাবে পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি জেলায় কোন কোন জায়গায় নলকূপের জলে আর্সেনিক পাওয়া গেছে। জলে আর্সেনিকের স্বাভাবিকের মাত্রা 0.05 মিলিগ্রাম/লিটার।

উপসর্গ : বহুদিন ধরে অল্পমাত্রায় দূষিত জলের সঙ্গে আর্সেনিক পেটে গেলে গলা, ঘাড়, বুক ও পিঠের চামড়ায় ছোট ছোট কালচে ধূসর ছোপ দেখা যায় বৃষ্টির ছিটের মত। দীর্ঘস্থায়ী আর্সেনিক বিষক্রিয়ায় এটাই অনেক সময় একমাত্র উপসর্গ। কিন্তু সারা বছর এইরকম চলতে থাকলে হাতের চেটো ও পায়ের তলার চামড়া পুরু খসখসে হয়ে ওঠে, আঁচিলের মত গুটি বের হয়, চামড়া উঠে যায়, দাঁড়াতে, চলতে, ধরতে অসুবিধা, হাত পায়ে হুলফুটানো অনুভূতি, স্পর্শ, বেদনা ও তাপ বোধের অনুভূতি কমে যায়। এসব ক্ষেত্রে ক্যান্সার হতে পারে বলে সাধারণ যে ধারণা, বাস্তবিক ক্ষেত্রে ততটা নয়—চামড়ার ক্যান্সার হবার সম্ভাবনা কিন্তু কমই থাকে।

আর্সেনিক সরাসরি খেলে তীব্র তাৎক্ষণিক বিষক্রিয়ার লক্ষণ : বমিভাব, বমি, পাতলা পায়খানা, সাংঘাতিক মুখ ও গলা জ্বালা, পেটে নিদারুণ বেদনা, বমির সঙ্গে রক্ত উঠে আসে। কয়েকঘণ্টার মধ্যে মৃত্যু হতে পারে।

প্রতিরোধ : (১) আর্সেনিকযুক্ত কীটনাশক ইঁদুর মারার জন্য ব্যবহার না করা, (২) নিজের বাড়ীর কাছে কূয়োর জল দূষণরোধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা, (৩) তামা গলানো কারখানায় যথোচিত সাবধানতা অবলম্বন করা, (৪) নলকূপের জলে কোথাও মাত্রাতিরিক্ত আর্সেনিকের সন্ধান পাওয়া গেলে সেই নলকূলের জল খাওয়া বন্ধ করা, (৫) সন্দেহজনক এলাকায় নলকূপের জলে আর্সেনিক আছে কিনা পরীক্ষা করা।

9.5.1.3. পারদ (Mercury)

উৎস : (১) ভূ-ত্বক থেকে যখন স্বাভাবিক গ্যাস বেরিয়ে আসে, কিছুটা পারদ তখন পরিবেশে মেশে। (২) কয়লা পোড়ানো, স্টীল ও সিমেন্ট তৈরীর সময়ে, ধাতু আকরিক গলাবার সময়ও পারদ পরিবেশ দূষিত করে। (৩) জাপানের মিনামাটায় স্থানীয় কারখানা থেকে পারদজাত পদার্থ মিথাইল মার্কারি নদী ও সাগরের জলে মিশে গেলে মাছের শরীরে

ঐ পারদ যায়, সেই মাছ খেয়ে বহু লোক অসুস্থ হয়ে পড়েছিল (৪) পারদজাত পদার্থ ব্যবহার করা হয়েছিল গম বীজের ছত্রাক মারার জন্য, ভুলক্রমে সেই গম খেয়ে ইরাকে বহুলোক অসুস্থ হয়ে পড়েছিল।

উপসর্গ : দীর্ঘস্থায়ী পারদ বিষক্রিয়া ঃ লালা পড়ে, মুখের ভিতর ঘা হয়, পাতলা পায়খানা, হাতপা, জিভ, ঠোঁট কাঁপে, হাঁটাচলায় অসামঞ্জস্য ও কথা বলার অসুবিধা ও উত্তেজনা, হতবিহ্বলভাব, শ্রবণশক্তি ব্যাহত, দুশ্চিন্তা, অন্ধত্ব। পারদ গ্যাস ফুসফুসে ঢুকলে ফুসফুসের শোথ হতে পারে, রোগীর জীবন সংশয় দেখা দেয়।

প্রতিরোধ : (১) কলকারখানার পারদ মেশানো বর্জ্যপদার্থ যেন নদনদী সাগরের জল দুষিত না করতে পারে, (২) গম বীজের ছত্রাক মারার জন্য যখন ব্যবহার করা হবে তখন সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে যেন ঐ গম থেকে ভুলক্রমে আটা ময়দা প্রস্তুত না করা হয়।

9.5.1.4. ক্যাডমিয়াম (Cadmium)

উৎস : (১) খনি আকরিক থেকে দস্তা ও সীসা গলাবার সময় পরিবেশে ক্যাডমিয়াম মেশে (২) কখনও তেল পুড়লে এবং শিল্পের নানা বর্জ্যপদার্থ থেকে ক্যাডমিয়াম পরিবেশ দূষিত করে (৩) প্লাস্টিক, তেজস্ক্রিয় রঙ, অ্যান্টিসেপটিক ওষুধ ও ছত্রাকনাশক ওষুধে ক্যাডমিয়াম থাকে।

উপসর্গ : দীর্ঘদিন বহুক্ষণ ধরে ক্যাডমিয়াম গ্যাস ও কণা শরীরে ঢুকলে বিষক্রিয়া হয়। ক্ষতি করে ফুসফুস ও কিডনীর। তাৎক্ষণিক বিষক্রিয়া হতে পারে কোন অম্ল জিনিষ যেমন লেমনেড ক্যাডমিয়াম ধাতু তৈরী পাত্রে রাখলে। সেক্ষেত্রে উপসর্গ বমিভাব, বমি, পাতলা পায়খানা, দুর্বলতা। উপসর্গ দেখা দেয় খাবার 10 মিনিটের মধ্যে। ঐ উপসর্গগুলি সাধারণতঃ 24 ঘণ্টার মধ্যে মিলিয়ে যায়।

প্রতিরোধ : (১) ক্যাডমিয়াম ধাতু মিশ্রিত পাত্র ব্যবহার না করা এবং এ রকম পাত্রে কোন অম্লজিনিষ না খাওয়া (২) আকরিক দস্তা, সীসা প্রভৃতি গলাবার সময় সতর্কতা অবলম্বন (৩) যেসব প্লাস্টিক, তেজস্ক্রিয় রঙ ও ওষুধে ক্যাডমিয়াম আছে সেগুলি ব্যবহার না করা।

9.5.1.5. অ্যান্টিমনি (Antimony)

উৎস : (১) সস্তায় এনামেল পাত্র তৈরী করতে অ্যান্টিমনি ব্যবহৃত হয়, সেই পাত্রে বহুক্ষণ ধরে কোন অম্ল খাবার রাখলে বিষক্রিয়া হয়। (২) কালাজ্বরের ওষুধ হিসাবে অ্যান্টিমনি ব্যবহার করা হয়। মাত্রার তারতম্য হলে বিষক্রিয়া হতে পারে।

উপসর্গ : আর্সেনিক বিষক্রিয়ার মত।

9.5.1.6. দস্তা (Zinc)

বিষক্রিয়া হতে পারে খাবার ও পানীয়ের সঙ্গে অত্যাধিক মাত্রায় দস্তা মিশে থাকলে। এ সম্ভাবনা বিরল। পিতলের বাসন তৈরির সময় দস্তার অতি সূক্ষ্ম গুঁড়ো (zinc oxide), শরীরে ঢুকলে বিষক্রিয়ার প্রভাবে জ্বর, সাংঘাতিক হাঁপানী, অত্যাধিক লালা গড়ানো, মাথাধরা, কাশি, দুর্বলতা। আপনাআপনিই ঠিক হয়ে যায়।

9.5.1.7. বেরিলিয়াম (Beryllium)

বেরিলিয়াম ব্যবহৃত হয় উড়োজাহাজ ও আণবিক শক্তি সংক্রান্ত শিল্পে। এর থেকে হতে পারে অন্ত্রের ক্ষতি ও টিউমার।

9.5.1.8. রূপা (Silver)

উৎস : নাকে দেবার কোন কোন ওষুধে সিলভার নাইট্রেট থাকে। এইরকম নাকের তরল ফোঁটা ফেলা ওষুধ দীর্ঘদিন ব্যবহার করলে চামড়ায় অদ্ভুত নীলচে রং হয়। নাকে দেওয়া ওষুধে সিলভার নাইট্রেট থাকলে সেটা ব্যবহার করা উচিত নয়। ভুলক্রমে সিলভার নইট্রেট খেয়ে ফেললে তীব্র বিষক্রিয়া হয়। উপসর্গ বমিভাব, বমি, পাতলা পায়খানা, শক বা ক্রিয়াশক্তি লোপ। মৃত্যু হতে পারে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে।

9.5.2. জৈবদূষণ

অ্যালার্জি : নাকের প্রদাহ (অ্যালার্জি রাইনাইটিস) এই ধরনের নাকের প্রদাহ দুরকম হতে পারে ঃ

(ক) মরশুমী বা নির্দিষ্ট ঋতুতে—তখন বাতাসে মেশে ফুল, ঘাস, লতাগুল্ম বা বড় গাছের ফুলের পরাগ। এই পরাগ নাকের ভিতর ঢুকলে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়।

(খ) সম্বৎসর—বিছানা বা চাদরের ধুলো (এতে থাকে মাকড়), ছত্রাক, বা কুকুর, বিড়াল, ঘোড়া প্রভৃতি পশুর রোম, পাখির পালক বাতাসের সঙ্গে মিশে নাকে ঢোকে ও বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।

উপসর্গ : সাধারণতঃ বংশগত। যাদের আমবাত, একজিমা বা হাঁপানী আছে তাদের হবার সম্ভাবনা বেশী। হাঁচি, নাক দিয়ে জল গড়ায়, নাক বন্ধ হয়ে যায়, গলা সুড়সুড় করে বা চুলকায়, চোখ লাল হয়ে যায়, চোখ দিয়ে জল গড়ায়, জ্বর কিন্তু হয় না, মরশুমে যারা ভোগে এইসব উপসর্গ তাদের বেলায় বেশী দেখা যায়। সম্বৎসর রোগে যারা ভোগে তাদের উপসর্গগুলো হয় তুলনামূলকভাবে মৃদু।

প্রতিরোধ : (১) নির্দিষ্ট ঋতুতে পরাগ যখন বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে তখন তা যেন নাকে ঢুকতে না পারে। এর জন্য যতদূর সম্ভব বাড়ীর ভিতর থাকতে হবে। ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করে রাখতে হবে। নাকে ফিলটার ব্যবহার করা যেতে পারে যাতে ঐ সব জৈবপদার্থ নাকে ঢুকতে না পারে বা ঐ মরসুমে যেখানে বাতাসে পরাগ থাকে না, সেই জায়গায় যেতে হবে। তবে এ সব ব্যবস্থার কোনটাই খুব একটা কার্যকর নয়। (২) সম্বৎসর যারা ভুগছে, তাদের চিহ্নিত করতে হবে, কিভাবে উপসর্গ হচ্ছে। বিছানা ও চাদরের ধুলো নাকে গেলে হচ্ছে কি না। রোজ বিছানা ও ঘর পরিষ্কার করতে হবে। ভ্যাকুয়াম ক্লিনারও ব্যবহার করতে পারা যায়। কোন গৃহপালিত জীবের লোম থেকে হলে, তাকে সরাতে হবে। নাক দিয়ে যাতে ঐসব বস্তু না ঢুকতে পারে তারজন্য নাকে ফিলটার ব্যবহার করা যেতে পারে।

বহিরাগত হাঁপানী

জৈবদূষণ থেকে হাঁপানী হতে পারে। দূষক পদার্থ প্রশ্বাসের সঙ্গে নাকে ঢোকে। তাছাড়া কোন কোন খাবার জিনিব বা বিভিন্ন জৈব পদার্থ থেকেও হতে পারে। যেমন ফুল, ঘাস, লতাগুল্ম ও তাদের পরাগ, ছত্রাক, লেপ তোষক, বিছানা, মেঝের ধুলো, (এতে মাকড় থাকে)।

পাখির পালক—কোন কোন সময় লেপ বা বালিশ তৈরী হয় পাখির পালক অথবা পশুর রোম প্রভৃতি দিয়ে। কোন কোন খাবার যেমন মাছ, ডিম প্রভৃতি।

এছাড়া রাসায়নিক পদার্থ যেমন, আইসোসায়ানেট গ্যাস, রেজিন প্রভৃতি। বার্নিশ, রঙ ঝালাই ইত্যাদি নানা ধরনের ওষুধ যেমন অ্যাসপিরিন, পেনিসিলিন, সালফোনামাইড প্রভৃতি।

উপসর্গ : শ্বাসকষ্ট, বুকে চাপ, শ্বাসক্রিয়ায় শোঁ শোঁ শব্দ ; মাঝে মাঝে হয় অথবা দীর্ঘস্থায়ী।

প্রতিরোধ :

হেতু	প্রতিরোধের পদ্ধতি	সাফল্য
পরাগ	মরশুমে শোবার ঘরের দরজা জানালা বন্ধ রাখা, যতদূর সম্ভব বাইরে না যাওয়া, নাকে ফিলটার ব্যবহার করা।	তেমন কার্যকর নয়
ঘরের ধুলোয় মাকড়	প্রতিদিন বিছানার তোষক পরিষ্কার করতে হবে, সম্ভব হলে ভ্যাকুয়াম ক্লীনার দিয়ে চাদর, লেপ প্রভৃতি ঝাড়তে হবে, রোজ শোবার ঘর ধুয়ে মুছে পরিষ্কার রাখতে হবে।	তেমন কার্যকর নয়
পশুর রোম	কুকুর, বিড়াল, ঘোড়া ও অন্যান্য পশুর সংস্পর্শ এড়িয়ে চলা।	কার্যকর
পালকের বালিশ বা তোষক থাকলে	তুলা বা ফোমের তোষক, বালিশ ব্যবহার করা	কার্যকর
ওষুধ	যে ওষুধ থেকে হচ্ছে সেটা ব্যবহার না করা	কার্যকর
খাবার	যে খাবার থেকে হচ্ছে, সেই খাবার না খাওয়া	তেমন কার্যকর নয়
শিল্প থেকে রাসায়নিক পদার্থ	এড়িয়ে যাওয়া বা বৃত্তি বদলানো	কার্যকর

উপসংহার

আগে থেকে সাবধানতা অবলম্বন ক'রে যথেষ্ট সতর্কতার সঙ্গে উৎসকে সঠিকভাবে চিহ্নিত ক'রে এড়িয়ে যাওয়াই বাঞ্ছনীয়।

দশম অধ্যায়

পরিবেশনীতি, আইনী ব্যবস্থা, পরিবেশ আন্দোলন এবং পরিবেশগত নৈতিকতা

অধ্যায় সূচী

10.1. পরিবেশগত প্রতিষ্ঠান এবং পদ্ধতির ইতিহাস

উৎপাদন সম্পর্কের পঠনপাঠনের একটি বড় ফাঁক বা অসুবিধা হল এই যে উৎপাদন যে ধরনের হোক না কেন—তা কলকারখানাভিত্তিক হোক বা ভূমিকেন্দ্রিক হোক—প্রাকৃতিক পরিবেশকে এই উৎপাদন কীভাবে প্রভাবিত করছে তা পঠনপাঠনের মধ্যে যথাযথভাবে প্রতিফলিত হচ্ছে না। কলকারখানাভিত্তিক ও ভূমিকেন্দ্রিক উৎপাদন যেমন প্রাকৃতিক পরিবেশের দ্বারা প্রভাবিত হয়, তেমনি এই সমস্ত উৎপাদন প্রাকৃতিক পরিবেশকে রূপান্তরিতও করে, পরিবেশ বিজ্ঞানীরা তাই উৎপাদনের পরিধিকে শুধুমাত্র ভূমি বা কলকারখানার সীমানার মধ্যে আবদ্ধ না রেখে, প্রাকৃতিক উপকরণগুলিকে অন্যান্য ধরনের উৎপাদনের ক্ষেত্রে কীভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে তাও অনুসন্ধান করেন। এই প্রকার উপকরণের কয়েকটি উদাহরণ হল—কোন অঞ্চলের

উদ্ভিদ, প্রাণী, জল ও খনিজ সম্পদ ইত্যাদি। এই তথ্য বিজ্ঞানীদের উৎপাদন সম্পর্কে একটি বিস্তৃত ধারণা দিতে পারে। এই ধরনের বিস্তৃত ধারণার একটি বড় সুবিধা হলো এই যে, বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রকম ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে কোন জাতীয় সামাজিক সংগঠন ও প্রথার নিরিখে প্রাকৃতিক সম্পদকে কীভাবে ব্যবহার করা হয়েছে সে সম্বন্ধে একটি সুস্পষ্ট ধারণায় উপনীত হওয়া যায়। সামাজিক সংগঠন ও প্রথা বলতে এখানে সম্পদের মালিকানার ধরন নিয়ন্ত্রণ ও সম্পদের ব্যবহার, সম্পদের বন্টন ও সম্পদের উপর আর্থিক প্রভাব বোঝান হয়। এছাড়া বিভিন্ন সামাজিক কাঠামোয় প্রাকৃতিক উপকরণগুলির ব্যবহার, রূপান্তর ও স্থানান্তর করার জন্য কি ধরনের কৌশল গ্রহণ করা হয় তা জানাও খুব গুরুত্বপূর্ণ।

মানব ইতিহাসের দীর্ঘদিনের পরিক্রমায় পরিবেশ বিজ্ঞানীরা প্রাকৃতিক উপকরণের চার প্রকার ব্যবহারের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন যেমন,

(ক) সংগ্রহকারী ও স্থান-পরিবর্তনকারী কৃষি জীবন (gathering including shifting cultivation)

(খ) যাযাবর রাখাল জীবন (nomadic pastoralism)

(গ) স্থায়ী কৃষি জীবন (settled cultivation)

(ঘ) শিল্প (industry)

10.1.1. সংগ্রহকারী ও স্থান-পরিবর্তনকারী কৃষি জীবন

এই ধরনের প্রাকৃতিক উপকরণের ব্যবহারের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি হল বন্যপ্রাণী শিকার ও বিভিন্ন প্রকার শাকসব্জী আহরণ যা হল জীবনধারণের ন্যূনতম উপায়। সংগ্রহ-নির্ভর জীবনযাপন ব্যবস্থায় (gathering mode) দৈহিক শক্তি হল জীবনধারণের প্রধান হাতিয়ার (দৈহিক শক্তির উপর নির্ভর করে মানুষ জীবনধারণের বিভিন্ন উপকরণ সংগ্রহ করত) এবং জ্বালানী কাঠই ছিল শক্তির প্রধান উৎস। সুতরাং সেই সময়ের মানুষের বস্তুগত প্রয়োজনীয়তা ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য মিটত প্রকৃতিগতভাবে প্রাপ্ত গাছপালা, বন্যপ্রাণী ও পাথর প্রভৃতি থেকে। এছাড়া প্রকৃতির উপর মানুষের কোন নিয়ন্ত্রণ ছিল না, তাই প্রকৃতির খামখেয়ালীপনা মানুষকে সহ্য করতে হত।

সংগ্রহ-নির্ভর সমাজ (gatherer society) তার সম্পদ সম্ভারের নিরিখে তিন রকম অবস্থার সম্মুখীন হত।

প্রথমতঃ এই ধরনের সমাজে সম্পদের চাহিদা মোট সম্পদের যোগানের তুলনায় খুব কম ছিল, এই ধরনের অবস্থাকে পরিবেশ বিজ্ঞানে "আর স্ট্র্যাটেজি" (r-strategy)-এর সঙ্গে তুলনা করা যায়, যেখানে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অধিকাংশ সময়ে খুব উচ্চহারে হয়ে থাকে ; r-strategist বলতে এমন আগাছা ধরনের প্রজাতিকে বুঝায় যারা প্রতিকূল পরিবেশেও খুব দ্রুতহারে বৃদ্ধি পায়, অথবা এমন প্রকার রোগবাহী জীবাণুকে বোঝায়, যেমন ইনফ্লুয়েঞ্জা (influenza), যা বৃদ্ধি পেতে পেতে মহামারী আকার ধারণ করে, অন্যদিকে যে সমস্ত সমাজব্যবস্থায় সম্পদের যোগান তার চাহিদার সাথে ভারসাম্য অবস্থায় থাকে, যেমন বিচ্ছিন্ন প্রবাল দ্বীপে মৎস্যজীবীদের জীবনধারণ যা পরিবেশ বিজ্ঞানে r-strategist-এর সঙ্গে তুলনীয়, উদাহরণ স্বরূপ বৃষ্টি-নিবিড় জঙ্গলে 'ছায়ায়' বেড়ে ওঠা এবং কাষ্ঠল প্রজাতির গাছ, অথবা বিভিন্ন জীবাণুবাহিত অসুখ যেমন যক্ষ্মা রোগ সংক্রান্ত জীবাণু। পরিশেষে বিভিন্ন সমাজে দীর্ঘদিন ব্যবহারের পর সঞ্চিত উপকরণের ভাণ্ডার ক্রমশই হ্রাস পেতে থাকে, যেমন সংগ্রহ-নির্ভর সমাজে মানুষ এক স্থান হতে অন্যস্থানে চলে যায় প্রাকৃতিক দুর্বিপাকের জন্য যেমন ধাবমান তুষারস্রোত বা হিমবাহ। অনেক সময়ে প্রযুক্তির দিক থেকে উন্নত ধরনের সমাজের চাপেও তারা স্থানান্তরিত হতে বাধ্য হয়েছে।

সংগ্রহকারী সমাজে (gatherer society) প্রকৃতি মানুষের বশীভূত নয়, এই ধরনের সমাজে বসবাসকারী মানুষেরা তাদের সমগ্র সমাজের একটি অংশ বলে মনে করে এবং সমাজের অন্যান্য অংশ হিসাবে তারা অন্যান্য প্রাণী ও জমি, নদী

ও পাহাড়-পর্বতকে বোঝায়। বিশেষতঃ সংগ্রহকারী সমাজের মানুষেরা যদি কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ভুক্ত হয়ে থাকেন এই বিশ্বাস গাঢ় হয়। উৎপাদনশীল ও স্থায়ী নাতিশীতোষ্ণ আর্দ্র বনাঞ্চলের মানুষেরা গাছকে দেবদেবীর মত পুজো করে এবং অনুরূপভাবে একই ধরনের আচরণ দেখা যায় পুকুর, পর্বত, শিখর, অথবা কোনো বিশেষ প্রজাতির গাছপালার ক্ষেত্রে যেমন বটজাতীয় (Ficus) গাছ ও বিশেষ প্রজাতির বন্যপ্রাণী। তারা প্রায়শই গাছপালা, প্রাণী ও প্রাকৃতিক ভূ-চিত্রের বিভিন্ন মূলসূত্রকে কখনো কখনো আত্মীয় হিসাবে মনে করত আবার কখনো কখনো শত্রু হিসাবে ভাবত। সুতরাং নদীকে কখনো কখনো মাতৃসম মনে করা বা কোন কোন জীবজন্তুকে কুসংস্কারবশতঃ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতীক বা ভাই হিসাবে মনে করা (যেমন ভাল্লুক বা হরিণ জাতীয় প্রাণী), কিংবা অনেক ক্ষেত্রে কিছু কিছু গাছ দৈত্যের নিবাস বলে মনে করে তাদের সন্তুষ্ট করার বিভিন্ন উপায় বার করা ছিল এই ধরনের সমাজের আর একটি বৈশিষ্ট্য। সুতরাং এইভাবে সংগ্রহকারী সমাজ ব্যবস্থায় (gatherer society) মানুষের সঙ্গে অন্যান্য ধরনের প্রাণীদের এক পারস্পরিক সম্পর্কের চমৎকার বাতাবরণ সৃষ্টি হয়ে থাকে।

প্রকৃতিকে এইভাবে পুজো করার রীতির মাধ্যমে মানুষ প্রকৃতিকে সুষ্ঠুভাবে ব্যবহারের উপর গুরুত্ব আরোপ করে। নানা সংগ্রাহক ও স্থানান্তরকারী কৃষক তাদের আচার ব্যবহারের মাধ্যমে প্রকৃতিকে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে বিচার করত। দীর্ঘকাল ধরে এই ধরনের আচার ব্যবহার প্রাকৃতিক উপকরণকে কীভাবে ব্যবহার করা যায় তার একটা সূত্র উপরোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে পাওয়া যায়।

10.1.2. যাযাবর রাখাল জীবন

গৃহপালিত জীবজন্তু ও গাছপালা পরিচর্যার সাথে সাথে সংগ্রহভিত্তিক জীবনের ইতিহাস শেষ হয়ে যায়। প্রায় দশ হাজার বছর আগে এই নতুন সামাজিক জীবনের শুরু এবং ক্ষীয়মান হিমবাহের ধ্বংসলীলার সমাপ্তি যুগপৎভাবে লক্ষ্য করা যায়। দেখা যায় যে জলবায়ুর পরিবর্তন ও গাছপালার বৃদ্ধির রকমারী বৈচিত্রের ফলে মানুষ প্রাকৃতিক সম্পদকে বিভিন্নভাবে ব্যবহার করতে শুরু করল—যেমন কৃষিকার্যের প্রবর্তন ও পশুপালন প্রবৃত্তি। গোচারণভিত্তিক জীবনে বন্যপ্রাণীর শক্তিকে বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করা ছিল একটি বিরল বৈশিষ্ট্য। সেই হিসাবে বিশেষ করে যানবাহনের ক্ষেত্রে প্রাণীর ব্যবহার শক্তির একটি প্রধান উৎস ছিল। এছাড়া এই সমস্ত প্রাণীকে মানুষের খাদ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসাবে ব্যবহার করা হত, যা প্রয়োজন মত যোগান দেওয়া সম্ভব ছিল। গোচারণভিত্তিক সমাজ জীবনে পশুপালক বিভিন্ন গৃহস্বামীর হয়ে কাজ করত এবং এখান থেকে বোঝা যায় যে ব্যক্তিগত সম্পদের সৃষ্টি প্রায় তখন থেকেই শুরু হয়ে গেছে। যাই হোক, গোচারণভূমি সর্ব সাধারণের সম্পদ হিসাবে ব্যবহার করা হত।

বিভিন্ন পরিবেশের প্রকৃতির মধ্যে খুব কষ্টকরভাবে বেঁচে থাকবার মাধ্যমে এবং কোন বিশেষ বাসস্থান না থাকার ফলে যাযাবর পশুপালকের জীবনযাত্রা কঠিন ছিল। এটি মানব সমাজ ও প্রকৃতির মধ্যে একটা পার্থক্য নির্দেশ করে। সুতরাং কালক্রমে মানব সমাজে প্রকৃতির উপর নিয়ন্ত্রণ করা শুরু হয়। যাযাবর গোচারণভিত্তিক জীবনে প্রকৃতির সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার কিভাবে করা যায় সে সম্বন্ধে কোন সুস্পষ্ট ও সুসংহত ঐতিহ্য গড়ে ওঠেনি।

বস্তুতঃপক্ষে দেখা যায়, যে এই যাযাবর শ্রেণীর মানুষের জীবনদর্শনে কোন প্রাণী ও প্রাকৃতিক বিষয়কে কোন ভক্তি বা শ্রদ্ধার বস্তু হিসাবে বিচার করা হত না, কৃষক ও সংগ্রহকারী সমাজের মানুষের তুলনায় যাযাবর শ্রেণীর পশুপালকেরা প্রকৃতির প্রতি ভক্তিভাব প্রদর্শন করার খুব দরকার বোধ করত না। কোন স্থানে যদি কখনো সম্পদের অপ্রতুলতা দেখা দিত তবে তারা সেই জায়গা ছেড়ে সম্পদবহুল স্থানে চলে যেত—যা কৃষক সম্প্রদায়ের মানুষের পক্ষে সম্ভব হত না।

উপরোক্ত ধ্যানধারণা ছাড়াও কিছু কিছু যাযাবর শ্রেণীর লোকেরা সীমিত ভাবে সম্পদ ব্যবহার করত। যেমন প্রচলিত অভ্যাসমত বৎসরের কোন কোন সময়ে গোচারণকারী মানুষেরা শস্যসম্ভারযুক্ত ক্ষেত খামারে পশুচারণ একেবারে বন্ধ করে

দিত। অথবা বছরের অন্য সময়ে পশুচারণের ব্যাপারে বিভিন্ন নিয়মনীতি মানত। যেমন ওই সব শস্যক্ষেত্রে কী করলে সংখ্যায় কতটা পশুচারণের জন্য নেওয়া যাবে ইত্যাদি—উদাহরণস্বরূপ—সৌদি আরবের তাইফ (Taif) অঞ্চলের আহমিয়া সামাজিক কাঠামোয় এই ধরনের ব্যবস্থা দেখা যায়।

যাযাবর শ্রেণীর পশুপালকের গোচারণভূমি অত্যধিক ব্যবহারের ফলে এক ধরনের পরিবেশ অবক্ষয় করেছে। এছাড়া দূরদূরান্তে ব্যবসা বাণিজ্যের মাধ্যমে ও উৎপাদন কৌশলের ব্যাপক প্রয়োগের মাধ্যমেও পরিবেশ বিঘ্নিত হয়েছে। তবে তাদের যে ধারণাটি উল্লেখযোগ্য তা হল মানুষ প্রকৃতিকে নিজেদের বলে মনে করতে পারে।

10.1.3. স্থায়ী কৃষি জীবন

মানুষ প্রায় দশ হাজার বছর আগে কৃষিকাজ ও পশুপালন করতে শেখে। কোন কোন অঞ্চলে কৃষি ও পশুপালন একই সাথে গড়ে ওঠে যার ফলে পশুর কর্ষণ শক্তি ও তাদের বর্জ্য পদার্থ থেকে সৃষ্ট সারের প্রয়োগ কৃষি উৎপাদনের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এটাই উদাহরণস্বরূপ মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলিতে কৃষি-উৎপাদনের প্রধান কারণ। গবাদিপশু ও লাঙ্গলের ব্যবহারের মাধ্যমে এই অঞ্চলে গম, বার্লিসহ অন্যান্য কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদনের প্রসারলাভ ঘটেছে যা পরবর্তীকালে এশিয়া, আফ্রিকা এবং ইউরোপের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পড়ে। অন্যান্য অংশে গৃহপালিত পশুর গুরুত্ব কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে প্রায় নেই বললেই চলে, যেমন এশিয়ার কোন কোন ধান উৎপাদন অঞ্চলে গৃহপালিত পশুর কোন প্রভাব দেখা যায় না। বস্তুত কলম্বাসের আগের আমেরিকাতে (Pre-Columbian America) ভুট্টা উৎপাদনের ক্ষেত্রে গৃহপালিত প্রাণীর কোন ভূমিকা নেই।

কৃষিকাজের মাধ্যমে যেমন বিভিন্ন প্রজাতির উদ্ভিদের প্রসারলাভ ঘটে, তেমনি উৎপাদিত শস্য মাটি থেকে পুষ্টির উপকরণগুলিকে সরিয়ে ফেলে। সরিয়ে ফেলা উপকরণগুলির মধ্যে নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও পটাশিয়াম এবং কম মাত্রায় হলেও অন্যান্য ধরনের অনুপুষ্টি যেমন বোরন, দস্তা ইত্যাদি থাকে।

একই জমিতে বারবার চাষ করার ফলে মাটির উর্বরতা যেমন হ্রাস পায়, তেমনি মাটিও এই চাষের মাধ্যমে কিছু উর্বরতা ফিরে পায়। Shifting cultivation-এ জমি দীর্ঘদিন অকর্ষিত থাকলে মাটি কিছুটা উর্বরতা ফিরে পায়। একই জমি বছরের পর বছর চাষ করলে হ্রাসপ্রাপ্ত উর্বরতাকে ফিরে পেতে গেলে বিভিন্ন ধরনের জৈব, অজৈব সার ও নদী বা পুকুরের পাঁক প্রভৃতি ব্যবহার করা যেতে পারে। Shifting cultivation পদ্ধতিটি তখনই প্রয়োগ করা যায় যখন আবাদযোগ্য জমির চাহিদার তুলনায় তার যোগান বেশী থাকে। জনসংখ্যার বৃদ্ধি আবাদযোগ্য জমির চাহিদার একটি বড় কারণ। জমি-মানুষ অনুপাত যতই হ্রাস পেতে থাকে, ততই জমির নিবিড় চাষ পদ্ধতি বৃদ্ধি পেতে থাকে। এর ফলে জমিতে জৈব সার প্রয়োগও বৃদ্ধি পায় যার স্বাভাবিক পচন জমির উর্বরতা শক্তি বৃদ্ধি করে। এই ধরনের জৈব সার সংগ্রহ বিভিন্ন ধরনের গৃহপালিত জীবজন্তু ও গবাদি পশুপালনের মাধ্যমে হতে পারে অথবা মানুষের জৈব সার সৃষ্টির প্রচেষ্টায় জমির উর্বরতা বৃদ্ধি হতে পারে।

জমিতে শক্তির উৎস হিসাবে ভূগর্ভস্থ জীবাশ্ম জ্বালানী এক বিশেষ ভূমিকা পালন করছে, যেমন এই শক্তি পরিবহনের ক্ষেত্রে, চাষের কাজে এবং রাসায়নিক প্রণালীতে তৈরী অজৈব রাসায়নিক সার হিসাবে কৃষি উৎপাদনকে বৃদ্ধি করেছে।

সুতরাং স্থায়ী কৃষিব্যবস্থা যৌথভাবে মানুষের ও জীবের পরিশ্রমের উপর নির্ভর করে। শিল্পোন্নত দেশগুলি ক্রমশই এই ভূগর্ভস্থ জীবাশ্ম জ্বালানী থেকে সৃষ্ট শক্তির উপর অধিকমাত্রায় নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে। যাই হোক, শিল্পের প্রসারলাভ হওয়ার পূর্বে কৃষি-উৎপাদন মূলতঃ চাষ-আবাদের জন্য যন্ত্রপাতি, পশুপ্রাণী নির্ভর ও সেচ ব্যবস্থার জন্য জলের উপর নিয়ন্ত্রণের মত কিছু সাধারণ উপকরণের উপর নির্ভরশীল ছিল। কাজেই প্রাক্-শিল্পভিত্তিক কৃষি সমাজ ব্যবস্থায় বৃক্ষ রোপণ ও পশুপালন

সহ অন্যান্য কৃষিকার্যের শিল্পগুলির উপর যে যথেষ্ট জ্ঞান আহরণ হয়েছিল তা নিয়ে কোন সন্দেহ নেই। তবে তারা যে বিষয়টির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন তা হল প্রকৃতি অনেকাংশে মানুষের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

পশুশিকার ও সংগ্রহভিত্তিক সমাজের তুলনায় কৃষিভিত্তিক সমাজ প্রাকৃতিক পরিমণ্ডলের উপর অনেকখানি নিয়ন্ত্রণ বিস্তার করেছে। তবুও এখানে প্রকৃতির খামখেয়ালীপনা বন্ধ করা যায়নি—খরা, বন্যা, তুষারপাত, কীট-পতঙ্গের সংক্রমণ প্রভৃতি মানব জীবনকে দুর্বিবহ করে তোলে। সুতরাং কৃষিভিত্তিক সমাজে মানুষকে পুরো সমাজের একটি অংশ হিসাবে ভাবা হয় এবং ক্রমশই মানুষ প্রাকৃতিক সম্পদের তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে গুরুত্ব পেল। সীমিত প্রাকৃতিক সম্পদকে কীভাবে সুষ্ঠুভাবে ব্যবহার করা যায় তাও এই সমাজের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য।

10.1.4. শিল্প

মানব-সমাজে বৃহৎ শিল্পের প্রসারলাভ ঘটেছে প্রায় দু'শ বছর ধরে। কিন্তু পরিবেশের উপর এর মারাত্মক প্রভাব প্রাক-শিল্পবিপ্লব যুগের তুলনায় অনেক বেশি। পরিবেশ দূষণের অন্যতম কারণগুলি হল কয়লা, তেল সহ অন্যান্য পুনর্নবীকরণের অযোগ্য শক্তির উৎসগুলির অতিমাত্রায় ব্যবহার এবং এর সাথে পরিবেশ দূষণের আর একটি সমান নতুন ধরনের কারণ হল পারমাণবিক শক্তির ব্যবহার। শিল্পোৎপাদনে প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার সাধারণত নিষ্কাশন-জাতীয় যেখানে প্রাকৃতিক সম্পদকে ব্যবহার করে নতুন শক্তির সৃষ্টি করা হয় যেমন জলকে কাজে লাগিয়ে জলবিদ্যুৎ সৃষ্টি এবং অন্যদিকে জীবাশ্ম জ্বালানী দ্বারা শক্তির মাধ্যমে মানবজাতিকে সেবা করা হয়। এছাড়া শিল্পোৎপাদনে মানুষের দ্বারা নির্মিত বিভিন্ন বস্তুর প্রয়োগও দেখা যায়, যেমন বিভিন্ন ধরনের ধাতু, প্লাস্টিক, সিলিকন টুকরো (silicon chips) এবং রাসায়নিক কীটপতঙ্গাদিনাশক দ্রব্য। শিল্প উৎপাদনের ক্ষেত্রে দ্রুত প্রসারলাভ হওয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হল পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতি, এর ফলে যে কোন ধরনের ভারী জিনিস যেমন বড় বড় পাথর বা গাছের টুকরো যে কোন দূরবর্তীস্থানে পাঠানো যায়।

পরিবহনের সুব্যবস্থা ছাড়াও প্রাকৃতিক উপকরণগুলির স্থানান্তরকরণের ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের জন্য অন্যান্য কিছু উপকরণও দায়ী যেমন বিভিন্ন দ্রব্যের সুষ্ঠু আকৃতিগত পরিবর্তন (material processing), দ্রব্য মজুতের সুষ্ঠু ব্যবস্থা ইত্যাদি উৎপাদন ব্যবস্থাকে প্রকৃত অর্থে পৃথিবীব্যাপী ছড়িয়ে দিয়েছে (globalization) ; উৎপাদন ব্যবস্থার এই বিশ্বায়নের মাধ্যমে মানবজাতির এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ, (যদিও তা বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর তুলনায় অনেক কম), পৃথিবীর বিভিন্ন উপকরণকে কাজে লাগাবার ও বিভিন্ন ধরনের উৎপাদনকে ভোগ করার সুযোগ পেয়েছে।

সংগ্রহকারী (gatherer) ও কৃষিভিত্তিক সমাজে জমিসহ প্রাকৃতিক উপকরণ যেভাবে ব্যবহৃত হত সেগুলি পরবর্তীকালে শিল্পভিত্তিক সমাজে অন্যভাবে ব্যবহৃত হতে লাগল। ইয়োরোপীয় দেশগুলিতে শিল্পের প্রসারলাভের দরুন যতই প্রাকৃতিক উপকরণ ও বনজঙ্গল হ্রাস পেতে থাকল ততই এসব দেশগুলিতে উপকরণগুলির সমস্যা ও সঙ্কট দেখা দিতে থাকল। এই কারণে ঐসব দেশগুলি পৃথিবীর অন্যান্য দেশের প্রাকৃতিক উপাদান দখল করতে সচেষ্ট হল এবং তারই ফল হিসাবে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে একটা ঔপনিবেশিকতাবাদ ছড়িয়ে পড়ল। Alfred W. Crostey তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'Ecological Imperialism' বইটিতে দেখিয়েছেন যে যেখানে এই সমস্ত ইয়োরোপীয়দের 'portmanteau biota'—গম, গবাদি পশু, তাদের প্রজাতি এবং রোগ—সহজে প্রসারলাভ করতে পেরেছে সেখানে প্রকারান্তরে নয়া-ইয়োরোপ গড়ে উঠেছে। উত্তর আমেরিকা, আর্জেন্টিনা, দক্ষিণ আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ডে এই ধরনের ইয়োরোপীয় অভিযান শুরু হয়েছিল। কিন্তু পরিবেশসংক্রান্ত সমস্যা থাকার ফলে তারা অনেক জায়গায় চিরস্থায়ীভাবে বসবাস করতে পারেনি, অথচ পূর্ববর্তী সভ্যতার মানুষ মধ্যপ্রাচ্য, এশিয়া অথবা আমাজনের আর্দ্র নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চল, কঙ্গো এবং মালয়েশিয়ায় চিরস্থায়ীভাবে বসবাস করেছিল। কিন্তু এই সমস্ত ইয়োরোপীয় মানুষেরা চিরস্থায়ীভাবে বসবাস করতে না পারলেও তারা ঐ সমস্ত অঞ্চলের প্রাকৃতিক সম্পদের উপর তাদের

ভোগদখল কায়েম করেছিল এবং তাদের দেশের বা মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ এইসব দেশগুলি থেকে চালান দিতে শুরু করল।

সুতরাং ভারত থেকে বিভিন্ন ধরনের উপকরণ রপ্তানী শুরু হয় যেমন সেগুন গাছ, অন্যান্য মূল্যবান গাছপালা, পাট, তুলো, চা, নীল (ইন্ডিগো) এবং বিভিন্ন মূল্যবান ধাতব পদার্থ ; বার্মা রপ্তানি করতে শুরু করল চাল ও সেগুন কাঠ ; ওয়েস্ট ইন্ডিজ থেকে চিনি, ব্রাজিলের রাবার ও কফি। যদিও প্রথাগত ভাবে ঔপনিবেশিকতাবাদ বন্ধ হয়ে গেছে, কিন্তু এই প্রক্রিয়া এখনও বিভিন্নভাবে অবস্থান করছে এবং ভারত এখন সেগুন ও তুলোর বদলে অন্য ধরনের উপকরণ যেমন বাগদা চিংড়ী, চা ও প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কর্মী বাইরে পাঠাচ্ছে। ব্রাজিল সম্প্রতি রাবারের বদলে গোমাংস এবং অরণ্যজাত উৎপাদন রপ্তানি করছে। উপকরণের এই ধরনের আদানপ্রদান অত্যন্ত অসামঞ্জস্যপূর্ণ বলে মনে হয়। শিল্পভিত্তিক সমাজ প্রচুর পরিমাণে কাঁচামাল জাতীয় উপকরণ খুবই কম দামে আমদানি করছে। অন্যদিকে এই সমস্ত উপকরণের মাধ্যমে উৎপাদিত দ্রব্য অতি অল্প পরিমাণে এবং অনেক বেশী দামে রপ্তানি করছে। এই আদানপ্রদানের আর একটি বৈশিষ্ট্য হল শিল্প উৎপাদনকারী সমাজ প্রচুর পরিমাণে বর্জ্য পদার্থ উৎপাদন করছে ; যা কিভাবে অথবা কোথায় সরানো হবে সে নিয়ে প্রশ্ন দেখা দেয়। সাধারণতঃ সেগুলিকে সমুদ্রে অথবা অন্য কোন স্থানে যেখানে মানুষ বাস করে না, অথবা যে সমস্ত তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি বৈদেশিক ঋণের ভারে জর্জরিত সেই সমস্ত দেশে এই সব বর্জ্য পদার্থ সরিয়ে দেওয়া হয়। যা পরিবেশ দূষণকে অনেকাংশে বৃদ্ধি করে। শিল্পভিত্তিক সমাজ প্রাকৃতিক সম্পদ এবং সামগ্রিকভাবে প্রকৃতির সম্বন্ধে এক ভিন্ন ধরনের মতাদর্শ পোষণ করে। তারা সং গ্রহকারী সমাজের মত মানুষকে সমগ্র সমাজে বসবাসকারী প্রাণীদের মধ্যে একটি অংশ হিসাবে ভাবতে চায় না, এমন কি কৃষি ভিত্তিক সমাজের মতাদর্শ অনুযায়ী মানুষকে প্রাকৃতিক সম্পদের রক্ষক হিসাবে যে ভাবনা তাও অস্বীকার করে। তাদের মতে মানুষ প্রকৃতির থেকে সম্পূর্ণ আলাদা এবং সে হিসাবে প্রাকৃতিক সম্পদকে খুশীমত ব্যবহারের মাধ্যমে নিজেদের স্বাচ্ছন্দ্য যতটা সম্ভব বৃদ্ধি করাই হল মানুষের একমাত্র আদর্শ। শিল্পভিত্তিক সমাজের ধ্যানধারণা হল প্রকৃতি অপবিত্রস্থল এবং বাজার হল পবিত্রস্থল। কারণ বাজার হল এমন একটি মাধ্যম যা প্রাকৃতিক সম্পদকে লাভজনকভাবে ব্যবহার করতে সাহায্য করে। বাজারের মাধ্যমে সম্পদের কাম্য ব্যবহার সম্ভবপর। এই ধরনের সমাজব্যবস্থায় এটি ধরে নেওয়া হয় যে প্রতিটি মানুষ নিজেদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য সব কিছু করতে পারে। অর্থাৎ বাজার ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রকৃতিকে লাভজনক ভাবে ব্যবহার করে নিজেদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করা শিল্পভিত্তিক সমাজের মূল মন্ত্র।

শিল্পভিত্তিক সমাজের মানুষের মূল উদ্দেশ্য হল নিজেদের পরিবেশকে রক্ষা করা এবং সেজন্য সার্বিক প্রয়াস চালানো। 1890-র আদমসুমারী অনুযায়ী আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিম প্রান্তে ব্যাপক ভূমিক্ষয় দেখা যায় যা বনাঞ্চল হ্রাস পাওয়ার ফলে ঘটেছে বলে মনে করা হয় (1860 সালে সুইস আলপ্স পর্বতমালাতেও এই ধরনের ভূমিক্ষয় হয়েছে)। এর ফলশ্রুতি হিসাবে আমেরিকাযুক্তরাষ্ট্র বিভিন্ন ব্যবস্থার মাধ্যমে ভূমিক্ষয়প্রবণ অঞ্চলগুলি সুরক্ষিত করার চেষ্টা করছে। এই ঘটনার পরবর্তীকালে পশ্চিমে পরিবেশ বিশারদগণ ক্রমশঃ ইউরোপ এবং উত্তর আমেরিকায় অবস্থিত বিভিন্ন বনাঞ্চল পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হন। এছাড়া তারা বিভিন্ন বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে ভূমিক্ষয় কিভাবে রোধ করা যায় এবং বিভিন্ন পতিত জমিতে কিভাবে বনভূমি সৃষ্টি করা যায় সে বিষয়ে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে থাকেন। রাসায়নিক দূষণ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর মানব সমাজের এতটাই ক্ষতি করেছে যে সে নিয়ে পরিবেশ বিজ্ঞানীরা এ দূষণের হাত থেকে কিভাবে রক্ষা পাওয়া যায় সে নিয়ে ভাবনা চিন্তা করতে থাকেন। যেমন টেমস্ নদীকে দূষণমুক্ত করার প্রচেষ্টা হল এই ধরনের একটি প্রয়াস। কালক্রমে নতুন ধরনের পরিবেশসংক্রান্ত সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। যেমন এ্যাসিড বৃষ্টি এবং পৃথিবীর উত্তাপ বৃদ্ধি পাওয়া (গ্লোবাল ওয়ারমিং, global warming) বা এই ধরনের প্রাকৃতিক বিপর্যয়কে রোধ করতে গেলে চাই বিশ্বব্যাপী সমাধানের প্রচেষ্টা। সুতরাং এদিক থেকে দেখতে গেলে শিল্পভিত্তিক সমাজকে শুধুমাত্র নিজেদের পরিবেশ দূষণকে কিভাবে রোধ করা যায় শুধু সে নিয়ে চিন্তা করলে চলে না। তাদের অঞ্চলের বাইরে পরিবেশ দূষণ কিভাবে রোধ করা যায় সে চিন্তাও করতে হবে।

পরিবেশ দূষণের সমস্যা ও অন্যান্য পরিবেশসংক্রান্ত সমস্যা থাকা সত্ত্বেও শিল্পবিকাশ তত্ত্ব এখন উন্নয়নের যে একটা পার্থিব সীমা থাকা উচিত তার গুরুত্ব স্বীকার করেনা। বিপরীত ক্রমে এইতত্ত্বে যান্ত্রিক কৌশলের নতুন নতুন আবিষ্কারের মাধ্যমে পরিবেশসংক্রান্ত সমস্যাকে নিয়ন্ত্রণ করা যায় সে কথাই বলা হচ্ছে। এক্ষেত্রে বাজার ব্যবস্থার মাধ্যমে নতুন নতুন প্রতিযোগী দ্রব্য আবিষ্কার করা যায় এবং প্রাকৃতিক সম্পদের দক্ষতা বৃদ্ধিও করা যায় বলে যুক্তি দেখানো হয়। যাই হোক গত শতকে বিভিন্ন ধরনের বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে মাটি, বনাঞ্চল, মৎস্য চাষ, এবং অন্যান্য ধরনের পুনর্নবীকরণযোগ্য সম্পদ কিভাবে দীর্ঘদিন ধরে ব্যবহার করা যায় তা নিয়ে ভাবনা চিন্তা হয়েছে এবং আশা করা যায় যে প্রাকৃতিক উপকরণকে আরো দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহার করা সম্ভব হবে।

নিয়ন্ত্রণমূলক পদ্ধতি (regulatory system) ও উৎসাহমূলক পদ্ধতি (incentive-based system) : একবার সমাজ যদি একটি গ্রহণযোগ্য পরিবেশসংক্রান্ত নীতি নির্বাচন করে যার ভিত্তি হিসাবে বিভিন্ন উপকরণের মধ্যে অর্থনৈতিক লাভ-ক্ষতির হিসাবও থাকে, তাহলে অন্যান্য ধরনের সমস্যার সমাধান করার প্রয়োজন হয়। বাস্তবে কোন প্রস্তাবকে সার্থকভাবে রূপায়ণ করতে গেলে ভোগকারী এবং উৎপাদকের চিন্তাভাবনারও সঠিক পরিবর্তন হওয়া প্রয়োজন। পরিবেশসংক্রান্ত অর্থনীতি, দূষণকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আদেশ ও নিয়ন্ত্রণমূলক নিয়মকানুন (command and control regulations) এবং বাজারভিত্তিক উৎসাহ নীতির মধ্যে নিরবিচ্ছিন্ন বিতর্ক চলছে।

নিয়ন্ত্রণমূলক পদ্ধতির মাধ্যমে কোন সরকারী সংস্থা কোন কাজ করা বা না-করা সংক্রান্ত বিষয়ে বিভিন্ন ধরনের আদেশ বা উপদেশ বা নিষেধাজ্ঞা জারী করতে পারে। (যেমন কোন যন্ত্রপাতি স্থাপন ও চালনা করার পদ্ধতি অথবা উৎপাদন ক্ষেত্রে নতুন কোন পদ্ধতি চালু করা ইত্যাদি)। সরকারী নিয়ম কানুন নিম্নলিখিত ব্যাপারে প্রবর্তিত হতে পারে।

(ক) দূষণ সৃষ্টিকারী কোন জায়গা বা যন্ত্রপাতির সর্বাধিক দূষণ মাত্রা নির্ধারণ করে দেওয়া ;

(খ) দূষণ নিরোধক পদ্ধতি বা বিভিন্ন ক্ষয় ক্ষতি সংক্রান্ত ব্যয় সম্পর্কিত দূষণ নির্গমনের উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করা ;

(গ) কোন নির্দিষ্ট উৎপাদক পদ্ধতিতে কি ধরনের উপকরণ ব্যবহৃত হবে বা কি ধরনের দ্রব্য উৎপাদিত হবে সে সম্পর্কে নির্দিষ্ট বিধি নির্ধারণ করা।

অর্থনৈতিক উৎসাহভিত্তিক ব্যবস্থায় সুবিবেচক দূষণ সৃষ্টিকারী ব্যক্তিদের ব্যবহার পরিবর্তনের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়, যেমন এই সমস্ত উৎপাদনকারীরা দূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য যে ব্যয় করে থাকেন তার সাথে দূষণ কর হ্রাসের মাধ্যমে সমতা আনা যেতে পারে।

বিভিন্ন দেশের জাতীয় সরকার বিভিন্ন ধরনের নিয়ম কানুনের মাধ্যমে সমাজে স্বাস্থ্য, কল্যাণ এবং পরিবেশ উন্নয়নকে দূষণের হাত থেকে কিভাবে রক্ষা করা যায় সে সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে থাকে। অর্থনীতিবিদদের বিভিন্ন উপদেশ থাকা সত্ত্বেও অধিকাংশে প্রশাসকরা উৎসাহভিত্তিক পদ্ধতির উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন, যেমন পরিবেশ দূষণের মাত্রা নির্ধারণ ইত্যাদি।

অর্থনীতিবিদরা নিয়ন্ত্রণমূলক পদ্ধতিকে দক্ষতার নিরিখে উৎসাহভিত্তিক পদ্ধতি থেকে নিকৃষ্ট বলে মনে করেন। তাঁরা উৎসাহভিত্তিক পদ্ধতির উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেন কারণ এই পদ্ধতিতে বিভিন্ন ধরনের কর বা রাজস্বনীতির পরিবর্তনের মাধ্যমে পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন। নিয়ন্ত্রণমূলক পদ্ধতি যতই সফলকাম হবে ততই সমাজ একটি দূষণমুক্ত পরিবেশ পাবে এবং এইজন্য উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পেলেও সমাজকে দূষণমুক্ত পরিবেশ পাওয়ার জন্য বর্ধিত উৎপাদন ব্যয়ের জন্য বর্ধিত বাজার দাম দিতে হবে। সুতরাং জাতীয় স্তরে একটি নিয়ন্ত্রণমূলক পদ্ধতি তখনই অধিকতর পছন্দমূলক বলে মনে

হবে যখন এই পদ্ধতির মাধ্যমে সমাজ দূষণমুক্ত পরিবেশ পাবে, এবং এজন্য জাতীয় স্তরে যদি কিছু ব্যয় নির্বাহ হয় তাও গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা উচিত।

প্রশাসকরা এই নিয়ন্ত্রণমূলক পদ্ধতিকে নিম্নলিখিত কারণগুলির জন্য পছন্দ করেন :

(ক) এই পদ্ধতির জন্য খুব বেশী তথ্যাদির প্রয়োজন নেই।

(খ) পূর্ব নির্ধারিত উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়িত করার জন্য এই পদ্ধতিকে গ্রহণ করা যায়।

(গ) রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিক গ্রহণযোগ্যতা থাকার জন্য এই পদ্ধতি অনেক বেশী কার্যকরী।

বিভিন্ন শিল্প এই নিয়ন্ত্রণমূলক পদ্ধতিকে নিম্নলিখিত কারণে পছন্দ করে। একটি নিয়ন্ত্রিত শিল্পে অবস্থিত ফার্মগুলি এই ধরনের 'নিয়ন্ত্রণমূলক বন্ধনকে' বেশী পছন্দ করে কারণ 'এই বন্ধনদশা' ধারণাটি দূষণ সৃষ্টিকারী এবং দূষণ নিয়ন্ত্রণকারী পক্ষগুলির মধ্যে একটি পারস্পরিক সহযোগিতা ও বোঝাপড়ার পরিবেশ সৃষ্টি করে। একবার এই অবস্থা চালু হয়ে গেলে প্রশাসকরা একটি শিল্পে অবস্থিত ফার্মগুলিকে তাদের স্বার্থ রক্ষার জন্য নিয়ন্ত্রণ করতে থাকে। উৎপাদন প্রক্রিয়াকে দূষণমুক্ত করার জন্য এই সমস্ত নিয়ন্ত্রণমূলক পদ্ধতির মাধ্যমে নতুন ফার্মের প্রবেশাধিকার বাতিল করা হতে পারে, প্রয়োজন বোধে উৎপাদনকে চালু রাখার জন্য ভর্তুকী দেওয়া হতে পারে এবং বিভিন্ন সমস্যাবহুল প্রশ্নের সমাধান স্থগিত রাখা হয় যতক্ষণ না পর্যন্ত সমাধানের রাস্তা পরিষ্কার হচ্ছে। সরকারী নিয়ম কানুনের আওতায় অবস্থিত ফার্মগুলি যখনই সংরক্ষণ চাইত তখন তাদের বলা হত Rent Captive। সুযোগসন্ধানী ফার্মগুলি সরকারী কর্তৃপক্ষকে বিভিন্নভাবে বিশ্বাস জাগিয়ে ভর্তুকী আদায় করার চেষ্টা চালায় এবং এর মাধ্যমে বিনিয়োগের ধরনধারণ পক্ষপাতিত্বপূর্ণ ক'রে উৎপাদন উপকরণগুলির সুষ্ঠু ব্যবহারের অসুবিধা সৃষ্টি করে। সুতরাং নিয়ন্ত্রণমূলক পদ্ধতিতে নতুন কোন আবিষ্কার বা উন্নয়নমূলক কাজকর্মের প্রচেষ্টা দেখা যায় না। কারণ এই পদ্ধতিতে যেটুকু উৎপাদন করা দরকার তার থেকে বেশী উৎপাদনের প্রচেষ্টা ফার্মগুলির থাকে, এবং এই ধরনের উৎপাদন উপকরণের ব্যবহারে উন্নয়ন ঘটাতে সাহায্য করে না। কাজেই নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা যতটা সম্ভব হ্রাস করে অর্থনৈতিক প্রচেষ্টা ও উৎসাহবর্ধনকারী উপকরণগুলির বৃদ্ধি ঘটানো হয়েছে।

যে সমস্ত ক্ষেত্রে উৎপাদনের বর্জ্য পদার্থ অবিরামভাবে প্রকৃতিতে মিশে যাচ্ছে অথবা যেক্ষেত্রে মানুষের স্বাস্থ্যহানি ঘটছে সেক্ষেত্রে সতর্কতামূলক ব্যবস্থার অবশ্যই অগ্রাধিকার পাওয়া উচিত। অন্যদিকে পরিবেশ দূষণকারী পদার্থগুলির নির্গমনকে যদি সম্পূর্ণভাবে দূর করতে হয় তাহলে নিয়ন্ত্রণভিত্তিক নিয়ম কানুন অধিকতর ফলপ্রসু, অধিকতর নির্ভর যোগ্য, এবং অধিকতর রাজনৈতিকভাবে গ্রহণযোগ্য মনে করা যেতে পারে। অনুরূপভাবে যদি দেখা যায় যে কোন বিশেষ উপকরণ অধিক মাত্রায় ব্যবহার করার ফলে পরিবেশগত ভারসাম্য বিনষ্ট হতে যাচ্ছে সেক্ষেত্রে সরকারী রাজস্ব ব্যবস্থার মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করার থেকে নিয়ন্ত্রণভিত্তিক কাঠামো অধিকতর গ্রহণযোগ্য। যেমন বায়ু, জল ও ভূমির ক্ষেত্রে বর্জ্য পদার্থ গ্রহণ করার একটা সীমা আছে, কিন্তু যে মুহূর্তে এই সীমা অতিক্রান্ত হয় তখন প্রাকৃতিক উপকরণগুলি দূষণের ভারে জর্জরিত হয়ে যায়।

উৎসাহমূলক প্রচেষ্টা (incentive) পরিবেশ উন্নয়নের সম্বন্ধে ইতিবাচক মনোভাব এবং বিনিয়োগকে বৃদ্ধি করার জন্য কয়েকটি অর্থনৈতিক উৎসাহবর্দ্ধনকারী ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। অধিকাংশ অর্থনৈতিক উৎসাহ প্রদানকারী ব্যবস্থাগুলি কোন না কোন ধরনের কর বা মূল্যাদি প্রদানভিত্তিক :

(1) সরাসরিভাবে দাম ও ব্যয়ের পরিমাণের পরিবর্তন ;

(2) পরোক্ষভাবে দাম ও ব্যয়ের পরিবর্তন আর্থিক অথবা রাজস্ব ব্যবস্থার মাধ্যমে ;

(3) বাজার সৃষ্টি এবং বাজারের সমর্থন।

দাম ও ব্যয়ের মাত্রার সরাসরি পরিবর্তন করা যায় উৎপাদিত দ্রব্যগুলির উপর কোন না কোন মূল্য বা কর ধার্য করার মাধ্যমে অথবা যে পদ্ধতিতে উৎপাদন হচ্ছে তার উপরও কর ধার্য করা যায়। পরোক্ষভাবে মূল্য ও ব্যয়ের পরিবর্তন করা যায় সরকারী ভর্তুকী, সহজ কিস্তিতে ঋণের ব্যবস্থা অথবা সুবিধাজনক শর্তে রাজস্ব ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে এবং যে ধরনের উৎপাদন কৌশল পরিবেশকে দূষণমুক্ত রাখে তারাই এই সুবিধাগুলি ভোগ করতে পারবে। এছাড়া বাধ্যতামূলকভাবে কিছু উৎসাহ বর্দ্ধন করার ব্যবস্থাও প্রয়োগ করা যেতে পারে। যেমন যে সমস্ত সংস্থা পরিবেশ রক্ষাসংক্রান্ত বিধি লঙ্ঘন করে তাদের কাছ থেকে বিভিন্ন ধরনের মূল্য আদায় করা যেতে পারে এবং এই সমস্ত ক্ষেত্রে বিভিন্ন কার্যকরী সম্পাদন বিধি (performance bonds) প্রবর্তন করা যেতে পারে। প্রচলিত নিয়মকানুন পরিবর্তনের মাধ্যমে বাজার ব্যবস্থায় উৎসাহ প্রদানের সুযোগ বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

10.2. জাতীয় স্তরে পরিবেশগত নীতি

কোন দেশের অর্থনৈতিক এবং সামাজিক অগ্রগতির জন্য যে পরিবেশ রক্ষণাবেক্ষণ প্রয়োজন সে বিষয়ে ইদানীং সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। 1992 সালে রিয়ো ডি জেনেরিও তে যে বসুন্ধরা সম্মেলন হয়েছিল তাতে এই সচেতনতার প্রতিফলন ঘটেছে। উন্নয়নের প্রত্যাশার সঙ্গে পরিবেশগত চিন্তাভাবনার সমন্বয়ের উদ্দেশ্যে ২১তম এজেণ্ডা (Agenda 21) নামে একটি বিশ্ব কর্মসূচী গৃহীত হয়েছে। এ কথা এখন মেনে নেওয়া হয় যে প্রাকৃতিক সম্পদের সাপেক্ষে কোন দেশের ক্ষমতার উচ্চাশা তার ধারণ ক্ষমতাকে কোন মতেই ছাড়িয়ে যাবে না। গত কয়েক দশক ধরে ভারতেও নানা আইন, নীতি এবং কর্মসূচী গৃহীত হয়েছে প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ এবং পরিবেশ রক্ষার তাগিদে। ভারত সরকারের এই নীতি প্রকাশিত হয়েছে বন, দূষণরোধ, জাতীয় সংরক্ষণ নীতি এবং পরিবেশ ও উন্নয়নসংক্রান্ত বিভিন্ন নীতি নির্ধারণের মধ্য দিয়ে। ২১তম এজেণ্ডার নীতিগুলির মর্মকথা এই নির্ধারিত নীতির মধ্যেই বিবেচিত হয়েছে।

বিশ্ব পরিবেশের মূল সমস্যাগুলির কয়েকটি নমুনা হল ওজোন ক্ষয়, জলবায়ুর পরিবর্তনে গ্রীন হাউস গ্যাসের পুঞ্জীভবন, জীববৈচিত্র্যের ক্ষয় ইত্যাদি। এই সমস্যাগুলির মূলে হল উন্নত দেশগুলির দ্রুত শিল্পায়ন। গ্রীন হাউস গ্যাসের পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য ভারত অবশ্য স্বল্পভাবেই দায়ী। ভারতে পরিবেশগত মূল সমস্যাগুলি জলদূষণ, জাতীয় সম্পদের অবক্ষয়, জীববৈচিত্র্যের অবলুপ্তি, কঠিন বর্জ্য পদার্থের নির্গমন এবং নিষ্কাশনী ব্যবস্থা সংক্রান্ত। বন কেটে ফেলা, শিল্পায়ন, নগরায়ন, পরিবহণ এবং উপাদান-নিবিড় কৃষিব্যবস্থাই এই সব সমস্যার কারণ। ভারতে পরিবেশ সমস্যার মূলে রয়েছে এই সব কারণ। সীমিত সম্পদ এবং অতিরিক্ত জনসংখ্যা নিয়ে ভারতে দারিদ্র্যও এক্ষেত্রে কয়েকটি বিশেষ সমস্যার সৃষ্টি করেছে।

নবম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার একটি উদ্দেশ্য ছিল উন্নয়নে পরিবেশগত ধারণক্ষমতার বৃদ্ধি। এই বৃদ্ধির মাধ্যম হিসাবে ধরা হয়েছিল সামাজিক সহযোগিতা এবং অংশগ্রহণের ভিত্তিতে একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোয় জাতীয় পরিকল্পনা রূপায়ণের দায়বদ্ধতা। পরিবেশের কথা মাথায় রেখে বলা যায় যে নবম পরিকল্পনার মূল বক্তব্য ছিল যে অর্থনৈতিক বৃদ্ধি এবং পরিবেশের সুষ্ঠু পরিচালনা এই দুইয়ের জনাই প্রয়োজন অর্থনৈতিক স্থায়িত্ব। উন্নয়নের জন্য নবম পরিকল্পনা একটি বহুমুখী কর্মসূচী গ্রহণ করেছিল। সেই কর্মসূচীর মূল নীতিগুলি নীচে দেওয়া হল।

এযাবৎ বনাঞ্চলকে শুধুমাত্রই বাস্তুতান্ত্রিক ভারসাম্য রক্ষার হাতিয়ার বা শিল্পের কাঁচামালের যোগানের উৎস হিসাবে দেখা হয়েছিল। সাধারণতঃ বনাঞ্চলকে গরীব মানুষের বেঁচে থাকার হাতিয়ার হিসাবে দেখা হয়নি। যৌথ বনরক্ষা পরিচালনার মাধ্যমে পরিচালন ব্যবস্থায় সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ নবম পরিকল্পনায় অগ্রাধিকার পেয়েছে। নবম পরিকল্পনায় সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন এন জি ও র-ভূমিকাকেও বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে উৎসাহদান করা হবে। পরিবেশ রক্ষার জন্য প্রতিরোধক এবং প্রতিষেধক এই দুই ধরনের পদ্ধতিরই প্রয়োজন। পরিবেশ রক্ষার জন্য বিভিন্ন দপ্তর যেমন স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা, পরিবহন, গ্রামোন্নয়ন, শক্তি, কৃষি, সার এবং বিভিন্ন রাসায়নিক ক্ষেত্র, নগরোন্নয়ন এবং শিক্ষা ইত্যাদির নীতি এবং পরিকল্পনা রূপায়ণ তো আছেই ; সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া উচিত প্রতিষেধক ব্যবস্থার উপর।

শক্তির ক্ষেত্রে অতিরিক্ত দূষণের সৃষ্টি হয়। পরিবেশে এর ক্ষতিকারক প্রভাব হ্রাস করার উদ্দেশ্যে নানা পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। প্রতিটি বৃহৎ শক্তিকেন্দ্রগুলিকে প্রাথমিক ভাবে পরিবেশগত দিক দিয়ে যাচাই করে নেওয়া হয়। পরিবেশগত প্রভাব পরিচালনার পরিকল্পনা গৃহীত হলে তবেই শক্তি প্রকল্পগুলিকে ছাড়পত্র দেওয়া হয়। এগুলিকে খুবই গুরুত্বের সঙ্গে দেখা হয়। পারমাণবিক শক্তিকেন্দ্রগুলির জন্য একটি বিশেষ নিয়ন্ত্রণাত্মক সংস্থাকে কার্যকরী করা হয়েছে। পেট্রোলিয়াম এবং প্রাকৃতিক গ্যাসমন্ত্রক পেট্রোলিয়াম পণ্য যেমন মোটর স্পিরিট, ডিজেল ইত্যাদির মত গাড়ির জ্বালানীর গুণগত মান বৃদ্ধি করার উপর যথেষ্ট জোর দিয়েছে।

নবম পরিকল্পনায় বিষয়-ভিত্তিক, ক্ষেত্র-ভিত্তিক এবং কার্যক্ষেত্র-ভিত্তিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এই পরিকল্পনার মূল কথা হল ঃ মানুষের অংশগ্রহণ, নিয়ন্ত্রণাত্মক পদ্ধতি জোরদার করা, সারা ভারতের জন্য রাজ্য এবং জেলাস্তরে পরিবেশগত অবস্থানের রিপোর্ট তৈরী করা, পরিবেশগত প্রভাবের থেকে অর্থনৈতিক প্রভাব পর্যালোচনা, পরিবেশের অর্থনীতির মূল্যায়ন এবং প্রাকৃতিক সম্পদের যথাযথ মূল্যায়ন।

এই আলোচ্য উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রয়োজন মানুষের অংশগ্রহণ এবং তথ্য আদানপ্রদানের গুরুত্ব অনুধাবন। পরিবেশ রক্ষার কাজে মানুষের অংশগ্রহণ একটি চ্যালেঞ্জ। পরিবেশ রক্ষার দায়িত্ব শুধুমাত্র সরকারের নয়। এই জাতীয় সমস্যা মোকাবিলায় সমাজের সব স্তরের মানুষের সাহায্য প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে কয়েকটি নির্দিষ্ট পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছে। পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন সংক্রান্ত বিষয়ে একটি নোটিস জারি করা হয়েছে এবং এর জন্য আদালতে যাওয়ার কথাও বলা হয়েছে। আইনের এই সংশোধনের মাধ্যমে সব গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়নের প্রক্রিয়ার কথাই বলা হয়েছে। এর ফলে একমাত্র যথাযথ সাংবাদিক সম্মেলনে ঘোষণা সহ আদালতে পরিবেশসংক্রান্ত প্রভাবের মীমাংসা হওয়ার পর যথাযথ নোটিস দেওয়ার পরই কোন প্রকল্পের কাজ শুরু হতে পারে। পরিবেশ-রক্ষণ আইন অনুযায়ী রাজ্য সরকারগুলিকে যথেষ্ট ক্ষমতা দেওয়া সত্ত্বেও, আদালতের রায় প্রয়োজন। পরিবেশ রক্ষার কাজে সহায়তার জন্য ছাত্র থেকে অবসরপ্রাপ্ত সৈনিকসহ নানা ক্ষেত্রের মানুষের সহায়তা লাভের জন্য বিভিন্ন প্রকল্প ঘোষিত হয়েছে। জাতীয় নদী সংরক্ষণ প্রকল্পে নাগরিকদের কমিটি গঠন ক'রে এই মর্মে আশা করা হয়েছে যে এই কাজে ব্যাপকভাবে মানুষ এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলির বিজ্ঞান, কলা ও কারিগরী বিভাগও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবে।

পরিবেশ রক্ষার কাজে মনোভাবের পরিবর্তনের প্রয়োজন রয়েছে। দূষণ রোধে নাগরিকের তথ্যের সম্ভার অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজে লাগতে পারে। যদি বায়ু এবং জলসম্পদ সাধারণ মানের নীচে হয় এবং ব্যবহারের অযোগ্য হয়, তবে সে কথা জানা থাকলে কাছাকাছি বসবাসকারী মানুষ যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। তারা নিজেরা সংগঠিত হয়েও গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা এবং আইনবিদদের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বাধ্য করতে পারে। যদি যথাযথ ব্যবস্থা না গৃহীত হয়, সেক্ষেত্রে আইনের সাহায্য নিয়ে তারা আদালতের দ্বারস্থ হতে পারে। তাই তথ্যসমৃদ্ধ জনসাধারণ যা পারেন, আইন এবং আইন রক্ষার হাতিয়ারও সে কাজ পারে না। কোন গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে তথ্যের আদান-প্রদান এবং তথ্যসমৃদ্ধ নাগরিকেরাই যথাযথ ব্যবস্থা নিয়ে আসতে সক্ষম। গবেষণার জন্যও তথ্য প্রয়োজন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, বর্তমানে দূষণ এবং রোগাক্রান্ত হওয়া এবং মৃত্যুহারের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে বিশেষ কোন গবেষণা দেখা যায় না। তথ্যও একটি বিশেষ উপাদান যা মানুষকে সংগঠিত এবং কর্মক্ষম করতে সাহায্য করে।

ন্যাশনাল অ্যামবিয়েন্ট এয়ার কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট, গ্লোবাল এনভায়রনমেন্ট মনিটরিং সিস্টেম নামে বদ্ধ বায়ু এবং জল পরিশোধনকারী প্রকল্প গৃহীত হয়েছে। এগুলিকে যথাযথভাবে ব্যবহার করতে হবে। প্রযুক্তিগত বিষয়গুলিকে মাথায় রেখে নিবারণার্থক পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে, বিশেষভাবে বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ, কীটনাশক, ভারী ধাতু ইত্যাদি সম্বন্ধে। জৈব পদার্থের দিকেও নজর রাখতে হবে।

বর্তমানে শুধুমাত্র জাতীয় উৎপাদন বা অভ্যন্তরীণ জাতীয় উৎপাদন মানবকল্যাণের একমাত্র নির্ধারক বলে মনে করা হয় না। উৎপাদিকা শক্তি এতটুকু ক্ষয় না করে একটি অর্থনীতি যে পরিমাণ পণ্য এবং সেবা উৎপাদন করতে পারে তার সবটাই এই সূচকের মাধ্যমে ধরা পড়ে না। এছাড়া পরিবেশগত অবক্ষয় এবং সমাজের বিভিন্ন অংশের মধ্যে এই অবক্ষয়ের ব্যয়ভার এবং কষ্টের কোন প্রতিফলন এই সূচকে নেই। তাই বর্তমানে বিতর্কের বিষয়বস্তু হল মানবোন্নয়ন এবং কল্যাণের একটি নির্দিষ্ট সূচক থাকা সম্ভব—না কি বর্তমান ব্যবস্থার মধ্যে একাধিক সূচকের সৃষ্টির মাধ্যমে এটি সম্ভব। আয়ের হিসাবের মধ্যে প্রাকৃতিক সম্পদের হিসাব ঢোকানোর বহু প্রচেষ্টা হয়েছে। এই প্রচেষ্টা শুরু করার জন্য পরিকল্পনা এবং কর্মসূচী রূপায়ণ দপ্তর (কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান সংস্থা—সি এস ও) এক বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করেছে। এই কমিটি রাজ্যের জাতীয় উৎপাদনের মধ্যে আর্থিক এবং প্রাকৃতিকভাবে প্রাকৃতিক সম্পদের খতিয়ান কীভাবে দেখানো যায় সে বিষয়ে নির্দেশ দেবে।

10.2.1. রাজ্যস্তরে পরিবেশনীতি (পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে)

পশ্চিমবঙ্গ সরকার পরিবেশ দূষণ নিয়ে গভীরভাবে উদ্বিগ্ন এবং রাজ্যে পরিবেশ সংরক্ষণ এবং রক্ষণাবেক্ষণের প্রতি তাঁরা মনোযোগ দিয়েছেন। 1994 সালে রাজ্য শিল্পনীতি ঘোষিত হয়। এই নীতি অনুযায়ী বহু উন্নয়নমুখী প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে। ভারাক্রান্ত পরিবেশের উপর এই পরিস্থিতি আরো নতুন নতুন চাপ সৃষ্টি করবে।

উন্নয়নমুখী এবং পরিবেশমুখী চিন্তাভাবনার মধ্যে যাতে কোন বিরোধ না ঘটে সেই কারণে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক একটি বিশেষ নীতি ঘোষিত হয়। সেই নীতির উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলি নীচে বর্ণিত হল।

(1) নিয়ন্ত্রণাধীন সীমার মধ্যে জল, বায়ু এবং শব্দদূষণের মাত্রাকে রাখতে হবে।

(2) সংগঠিত শিল্পে এবং বিভিন্ন শিল্পবহুল অঞ্চলে বিশেষ কতকগুলি পরিবেশ দূষণের সমস্যা দশ-বছরের কর্মমুখী পরিকল্পনার মাধ্যমে মীমাংসা করতে হবে।

(3) পরিবেশ দূষণের হাত থেকে নদী, বাঁধ, জলাশয় এবং সরোবরগুলি রক্ষা করতে হবে, এগুলির যথাযথ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে যাতে এগুলিকে কৃষি, সেচ, শিল্প, পানীয় জল এবং অন্যান্য জনকল্যাণের কাজে ব্যবহার করা যায়।

(4) মেদিনীপুর থেকে সুন্দরবন পর্যন্ত 220 কিলোমিটার দীর্ঘ উপকূলবর্তী অঞ্চলে সংরক্ষণ এবং রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। এই কাজ সম্পন্ন হবে একটি অখণ্ড উপকূলবর্তী অঞ্চলের পরিচালন পরিকল্পনার মাধ্যমে।

(5) বনস্থাপন, পতিত জমির উন্নয়ন, রক্ষণাবেক্ষণ এবং জীববৈচিত্র্য এবং বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের কাজ ত্বরান্বিত করা হবে এবং সংরক্ষিত বনাঞ্চলের গুণগত ও প্রজননগত উন্নয়ন সম্ভবপর হবে।

(6) শহর এবং শহরাঞ্চলের ভৌগোলিক পরিবেশ উন্নয়নের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন স্তরে কর্মমুখী পরিকল্পনা নিতে হবে। এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য হবে এই সব অঞ্চলের উৎকর্ষতা, উৎপাদনশীলতা, স্বাস্থ্যপরিষেবার উন্নতির মাধ্যমে অনিশ্চয়তা এবং ঝুঁকি কমিয়ে এগুলির ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

(7) শিল্পাঞ্চলের অবস্থান, নগরোন্নয়ন, অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামোগত এবং নাগরিক পরিষেবাগত উন্নয়ন সংগঠিত হবে নিখুঁত আইন অনুসারে এবং পরিবেশগত ফলাফলের কথা সম্পূর্ণভাবে বিবেচনা ক'রে।

(8) চাহিদার পরিচালনা, পুনর্ব্যবহার এবং পুনরুৎপাদনের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিগুলিকে জলসম্পদ এবং পতিত জমি সংরক্ষণ ও পরিচালনার কাজে গুরুত্ব দিতে হবে।

(9) রাজ্যে পরিবেশগত সব কটি প্রকল্পের উন্নয়নসাধনের উদ্দেশ্যে এবং বেশী মাত্রায় অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে সরকার-শিল্প, সরকারী-বেসরকারী, শিল্প-বুদ্ধিজীবী, এন-জি-ও—সি-বি-ও, সরকারী-ব্যক্তিমালিকানা, সরকার-প্রচারমাধ্যম ইত্যাদি

সম্পর্কগুলিকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিতে হবে এবং কার্যকরী করতে উৎসাহদান করতে হবে। এই উদ্দেশ্যে সরকারী এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলির বিভিন্ন স্তর যাতে নিজস্ব দায়িত্ব এবং দায়বদ্ধতা নিয়ে কাজ করতে পারে, সেজন্য এই স্তরগুলিকে যথাযথ ক্ষমতা প্রদান করা হবে।

(10) পরিবেশ সংরক্ষণ এবং প্রাকৃতিক সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত যে আইনগুলি কার্যকরী আছে, সেগুলিকে প্রয়োজনীয় সংশোধন করে আরো সহজবোধ্য এবং সমাজের বৃহত্তর স্বার্থে ব্যবহার করার জন্য কার্যকরী করা হবে।

(11) রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তর যেমন বন, কৃষি, সেচ, শিল্প, পৌরবিষয়ক, নগরোন্নয়ন, স্বাস্থ্য, জনস্বাস্থ্য, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন, পরিবহন, গ্রামোন্নয়ন, পঞ্চায়েত, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, স্বরাষ্ট্র, আইন, তথ্য ও সংস্কৃতি ইত্যাদির মধ্যে পারস্পরিক সমন্বয় জোরদার করে পরিবেশ সংরক্ষণ, প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ, দূষণ প্রতিরোধ এবং পরিবেশসংক্রান্ত সচেতনতা বৃদ্ধির কাজ সংঘটিত করতে হবে। এই বিভিন্ন দপ্তরগুলি বিশেষ বিশেষ কার্যকরী পরিকল্পনা আন্তদপ্তর বোঝাপড়া এবং গৃহীত নীতি রূপায়ণের কাজ পর্যবেক্ষণ এবং কার্যকর করার কাজে মনোযোগ দেবে।

(12) এই নীতি রূপায়ণের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার সবরকম জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান থেকে আর্থিক সহায়তার কথা চিন্তা করবে এবং নিজে যথেষ্ট পরিমাণে অর্থ বরাদ্দ করবে।

10.3. পরিবেশ ও নারী

1972 সালে স্টকহোম আন্তর্জাতিক সম্মেলনে 'পরিবেশ' বিষয়টি একটি আলোচনাসাপেক্ষ আন্তর্জাতিক স্তরে উদ্বেগের বিষয়রূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর আরও কুড়ি বছর কেটে গেছে। দুই দশক পরে 1992 সালে জুন মাসে পরিবেশ ও উন্নয়ন বিষয়ক রাষ্ট্র সংঘের সম্মেলন (United Nations Conference on Environment and Development, UNCED) রিও ডি জেনেরিওতে অনুষ্ঠিত হয়। এই দুই দশকের মধ্যে পরিবেশ নিয়ে উদ্বেগের নানা কারণ চিহ্নিত হয়েছে। এর মধ্যে একটি বিষয় হল পরিবেশের সঙ্গে নারীর সম্পর্ক। এটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায় যে জীবন সংগ্রামের পথে নারীরা আরো বেশী বেশী করে ক্রমবর্দ্ধমান প্রাকৃতিক সংকটের সম্মুখীন হচ্ছেন। নারীরাই জীবন রক্ষার কাজে, জীবনযাপনের ক্ষেত্রে সরাসরি ভাবে যুক্ত ; কিন্তু এ কথাও ঠিক যে এই নারীরাই আবার শ্রমের ক্ষেত্রে লিঙ্গ বৈষম্যের ফলে প্রান্তিকতায় ভোগেন। এই প্রান্তিকতার সূচনা উন্নয়ন ; আবার উন্নয়নই এই প্রান্তিকতাকে তুলে ধরে। ফলে খুব পরিষ্কারভাবে বোঝা যায় যে দীর্ঘ সময় ধরে পরিবেশ সংক্রান্ত পদ্ধতিগুলিও নারীকে আরো প্রান্তিক করে তুলবে। তৃতীয় বিশ্বের নারীদের ক্ষেত্রে এই কথা বিশেষভাবে প্রযোজ্য।

বিগত কয়েক দশক ধরেই গরিব, উন্নতিকামী দেশগুলিতে বিশেষ করে পরিবেশসংক্রান্ত সমস্যার ফলে নারী এবং জীবনরক্ষাকারী প্রাকৃতিক ও জৈব উপাদানগুলি গভীর বাস্তুতান্ত্রিক সংকটের ফলে পরিবর্তিত হচ্ছে। উৎপাদনের উপাদান এবং নারীর মধ্যে একটি দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আছে। বাস্তুতান্ত্রিক ভারসাম্যহীনতা নারীকে সবথেকে বেশী আঘাত করে। এই আঘাতের ফল পুরুষ এবং নারীর উপর পৃথক। নারী প্রকৃতির সর্বাপেক্ষা কাছে থাকে বলে পরিবেশসংক্রান্ত সমস্যাগুলি সবথেকে বেশী বুঝতে পারে। তাই নারীকে সহজে সংঘবদ্ধ করে পরিবেশ রক্ষার বিভিন্ন কমিটি গঠন করা যেতে পারে। সারা পৃথিবীতে এরকম অনেক কমিটি ভালভাবে কাজ করছে। যখন আমরা প্রকৃতি এবং নারীর মধ্যে, বাস্তুতন্ত্র এবং নারীর মধ্যে সম্পর্কের কথা আলোচনা করি তখন এই দুটি বিষয় মাথায় রাখা দরকার।

10.3.1. পরিবেশ দূষণ মহিলাদের সবথেকে বেশী আঘাত করে

সমাজ এবং সংস্কৃতিতে দায়িত্ব বণ্টনে লিঙ্গ বৈষম্য মহিলাদের উপর জ্বালানী, জল, পশুখাদ্য ও খাদ্য সংগ্রহ করার ভার দিয়েছে। এই কাজের জন্য মহিলাদের পুরুষের চাইতে প্রকৃতির অনেক বেশী কাছাকাছি আসতে হয়। ঐতিহাসিকভাবে

মহিলারা উৎপাদনের উপাদানগুলির রক্ষাকর্ত্রী এবং পরিচালিকা। কিন্তু তাদের উদ্বেগের প্রতি কম দৃষ্টিপাত করা হয়েছে। তাদের প্রয়োজন এবং যোগাযোগের তুলনায় তা অনেকই কম। মহিলারা জীবনদায়ী উপাদান যেমন জমি, অরণ্য এবং জল ব্যবহার এবং পরিচালন করেন। তারা শক্তিও ব্যবহার করেন। এই বিষয়টি প্রতিটি ক্ষেত্রেই বিশ্লেষণ হওয়া প্রয়োজন এবং প্রতিটি ক্ষেত্রেই কিভাবে তারা বিভিন্ন উন্নয়নের নীতির দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন তা দেখা প্রয়োজন।

এছাড়াও এখন আমরা বুঝতে পারি যে স্বাস্থ্য ও পরিবেশের সমস্যাগুলি পৃথক পৃথক ভাবে আলোচনা করা যায় না। এই দুটি বিষয় একে অপরের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত এবং কোন একটিকেই দ্রুততার সঙ্গে সমাধান করা সম্ভব নয়। আজকে দূষণ শুধুমাত্র রাসায়নিক নয়। এটি জৈব, সামাজিক এবং মনস্তাত্বিক। এছাড়াও নিত্য প্রয়োজনীয় উপাদানের অভাব, যেমন পুষ্টির অভাব, নিরাপদ এবং যথেষ্ট পানীয় জলের অভাব, বিশুদ্ধ বায়ুর অভাব, সুস্বাস্থ্যের অভাব, শিক্ষার অভাব, চাকুরীর অভাব, বেঁচে থাকার জন্য নিরাপদ এবং স্বাস্থ্যকর বাসস্থানের অভাব, মানবিক সম্মানের অভাব মানুষকে আঘাত করছে। পিতৃতন্ত্রের প্রভাব এবং আর্থসামাজিক ব্যবস্থার সঙ্গে পিতৃতন্ত্রের বোঝাপড়া নারীকে পুরুষের সাপেক্ষে সবদিক দিয়ে বঞ্চিত করেছে।

যদিও সারা পৃথিবী জুড়ে মহিলাদের স্বাস্থ্যের বিষয়টি নিয়ে সোরগোল উঠেছে, এবিষয়ে লিঙ্গভিত্তিক তথ্যের অভাব রয়েছে ; এবং এর ফলে যথাযথ নীতি এবং সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। যদিও ক্রমশঃই এটি বোধগম্য হচ্ছে যে শুধুমাত্র মহিলা হওয়াই অভাব, অনাদর, উপাদান এবং সম্পদের বঞ্চনা এনে দিয়েছে, তবুও এটি বোঝার জন্য যথাযথ পরিসংখ্যান নেই। যেসব কারণে মহিলাদের সাধারণভাবে বঞ্চিত করা হয় সেগুলি হল মূলতঃ যথেষ্ট শিক্ষা এবং অবস্থানের অভাব, কম আর্থিক ক্ষমতা, কম স্বাস্থ্যের অধিকারী, সীমিত গণ্ডী, পারিবারিক দায়-দায়িত্ব এবং সামাজিক অনুশাসন।

অঞ্চলের পরিবেশ সাধারণভাবে মহিলাদের পুরুষের তুলনায় বেশী আঘাত করে। পরিবেশ দূষণ তাদের ঘাড়ে অতিরিক্ত বোঝা চাপিয়ে দেয় কারণ অন্যত্র তাদের কাজের বোঝা লাঘব হয় না। যখন প্রাকৃতিক সম্পদ কমে আসে তখন একই উৎপাদনের জন্য নারীকে অতিরিক্ত শ্রম দান করতে হয়। শ্রমিক বা শ্রমিক নয় এমন শিশুর কাজও বেড়ে যায়। শিশুকন্যার ক্ষেত্রে দায়িত্ব শিশুপুত্রের তুলনায় আরও বেশী বাড়ে। যখন মহিলাদের সময় এবং কর্মক্ষমতার উপর চাপ পড়ে, শিশুপুত্র অপেক্ষা শিশুকন্যাকে স্কুল ছাড়িয়ে বাড়িতে বসিয়ে রাখা হয় গৃহস্থালীর কাজ সামলানোর জন্য। সাধারণতঃ সমস্ত নিম্ন আয়ের দেশেই স্কুলে, প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক উভয় ক্ষেত্রেই, শিশুকন্যা অপেক্ষা পুত্রের উপস্থিতির হার বেশী। পিতৃতন্ত্র, দারিদ্র্য এবং উপাদানের অভাব গরীব মহিলাদের পরিবেশ দূষণের বলি করে চলেছে।

10.3.2. নারী ও জমি

জমির উপরে জীবন নির্ভর করে। যদি জমি উর্বর হয় তবে কৃষি এবং পশুপালনের সুযোগ পর্যাপ্ত খাদ্য উৎপাদন করবে। সারা পৃথিবীতে খাদ্য উৎপাদনের কেন্দ্রে রয়েছে নারী, কিছু কিছু দেশে আশি শতাংশেরও বেশী খাদ্য উৎপাদন করে নারী। তাই জমি নিয়ে কোন আলোচনা নারীর এই কেন্দ্রীয় ভূমিকাকে বাদ দিয়ে হতে পারে না।

সারা পৃথিবীতে জমির মালিকানার রাজনীতি এমনই যে সব থেকে উৎপাদনশীল জমি মাত্র কয়েকজনের হাতে রয়েছে। যেখানে জমির মালিকানার অর্থ রাজনৈতিক ক্ষমতা সেখানে খাদ্যের বণ্টন আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রশ্ন। সারা পৃথিবীর অর্ধেকের বেশী খাদ্য উৎপাদন করে নারী, কিন্তু তারা মোট পৃথিবীর জমির মাত্র এক শতাংশের মালিক। খাদ্য-সংকটের দেশেও নারীরা অর্ধেকের বেশী খাদ্য উৎপাদন করে।

জীবনযাপনের প্রান্তরেখায় অবস্থিত চাষীদের বেশীর ভাগই মহিলা। কৃষিতে মহিলারা যে কাজ করেন তার মূল্যায়ন ঠিকমতো করা যায় না। তারা শ্রম দান করেন কিন্তু বেতন পান না অথবা প্রান্তিক বলে বিবেচিত হন। তাদের লাঙ্গল ধরার অধিকার নেই কিন্তু তাদের সাহায্য ছাড়া ফসল ফলানো সম্ভব নয়। একটি চাষী পরিবারে এই কাজগুলিকে মূলতঃ গৃহস্থালীর কাজের মধ্যেই ধরা হয়।

মহিলারা অর্থকরী ফসলও ফলান। বড় চাষীর কাছে শ্রমিক হিসাবে অথবা ফসল ফলানোর সময় অতিরিক্ত পরিশ্রম করে এই কাজ তারা করেন। মাঝে মাঝে মহিলারা রপ্তানী উৎপাদনে পুরুষের থেকে বেশী সময় ব্যয় করেন। কৃষিতে শিল্পায়ন যত বৃদ্ধি পাচ্ছে, মহিলারাও ততো আক্রান্ত হচ্ছেন। প্রযুক্তির ব্যবহারের ফলে ভূমিক্ষয়, মরুকরণ, জমির মালিকানার অধিক বৈষম্য সব দেশেই চোখে পড়ছে। এর ফলে যাদের প্রয়োজন বেশি তারাই জমি থেকে উৎখাত হচ্ছেন। জমির উর্বরতার উপরও চাপ পড়ছে। ব্যাপকভাবে সেচের কাজ জল জমতে সাহায্য করছে, প্রয়োজনীয় খনিজ দ্রব্য কমিয়ে দিচ্ছে, বর্ধিত বাষ্পায়নের ফলে জমিতে নুনের অংশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। সারা পৃথিবী জুড়ে দেখা যায় যে মাটিতে নুনের অংশ বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য সেচ থাকা সত্ত্বেও মানুষ জমি ছেড়ে চলে যাচ্ছে। অতিরিক্ত কীটনাশক এবং সংকর বীজ ব্যবহারের ফলে অনেক শস্যে সাবেক জিনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বিলুপ্ত হচ্ছে।

এই সব কিছুই মহিলাদের প্রতিদিনের বেঁচে থাকার জন্য খাদ্য, জ্বালানী এবং জল সংগ্রহের কাজ ব্যাহত করছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে সমাজে শ্রমভিত্তিক লিঙ্গবিভাজনের ফলে শুধুমাত্র মহিলারাই আক্রান্ত হয়েছেন। খাদ্য শোধন, জ্বালানী ও জল সংগ্রহ এবং বিভিন্ন কৃষিকাজ যেমন বপন, ফসল তোলা, সেচ, পশুপালন, পশু ও গবাদিপশু চরানো, খাদ্য প্রস্তুত করা এবং বিক্রয় করা মহিলাদের উপর নির্ভরশীল। জমির ক্ষয় এবং মরুকরণের ফলে এই কাজগুলি কঠিন এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে অসম্ভব হয়ে পড়েছে। যত মহিলাদের অংশগ্রহণ অসম্ভব হচ্ছে ততই তাদের প্রান্তিকতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

যত উর্বর জমি ব্যবহার করা কঠিন হচ্ছে, মহিলাদের দূরবর্তী, ভঙ্গুর ও অপেক্ষাকৃত কম উর্বর জমিতে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে চাষের কাজের জন্য, অথবা ভূমিহীন ক্ষেত মজুরে রূপান্তরিত করা হচ্ছে। জীবনরেখার সীমানায় অবস্থিত কৃষি যখন অপেক্ষাকৃত কম উর্বর জমিতে স্থানান্তরিত করা হচ্ছে, তখন মহিলাদের অনেক পথ হেঁটে মাঠে পৌঁছাতে হচ্ছে। যখন তারা মাঠে পৌঁছাচ্ছেন, ভূমিক্ষয় এবং অনুর্বরতার জন্য তাদের আরো পরিশ্রম করতে হচ্ছে।

শিল্পোন্নয়ন অনেক সময়ই পুরুষ শ্রমিককে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় সরিয়ে নিয়ে যায়। এর অর্থ হল যে মহিলারা পিছনে পড়ে রইলেন তাদের গৃহস্থালী সামলানো, সন্তান পালন, খাদ্য এবং পোষাকের যোগান দেওয়া ইত্যাদি সব কাজেরই দায়িত্ব নিতে হবে। গরীব অঞ্চলে এইভাবে মহিলাদের তত্ত্বাবধানে পরিবার বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং এইভাবে মহিলারা আরও বেশী সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত।

10.3.3. নারী ও অরণ্য

অরণ্যের অর্থনীতিতে নারীর ভূমিকা নিয়ে সম্প্রতি খুব আলোচনা হচ্ছে। গাছ এবং অরণ্য গ্রামীণ মহিলাদের একমাত্র জীবিকার সূত্র। বিশেষ করে ফল ইত্যাদি খাদ্যের জন্য যখন গাছের প্রয়োজন হয় তখন মহিলারাই সেই গাছ ঘরের বাগানে লাগান। পরিবারের খাদ্যের একটা বড় অংশের পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ উপাদান হলো গাছ। যখন ফসল ফলেনা তখন খাদ্যের যোগান যোগায় গাছ। জ্বালানীরও যোগান যোগায় গাছ। জ্বালানী এবং ঘরের আগুন জ্বালানোর কাজ মহিলাদের। জ্বালানী সংগ্রহ এবং স্থানান্তরিত করার দায়িত্ব মহিলাদের। গৃহপালিত পশুপালনও মহিলাদের কাজ এবং গাছ তাদের এই খাদ্য যোগান দেয়। সংসারের নানান টুকিটাকি কাজে মহিলারা গাছের উপর নির্ভরশীল। ছোটখাটো মেরামতির কাজেও গাছ সাহায্য করে। বাড়ি বানানোর কাজে, আচ্ছাদন তৈরীর কাজে গাছের ডাল কাজে লাগে, চালের উপর গাছের পাতা, বাঁশ ইত্যাদি বিছিয়ে দিয়েও গৃহ নির্মাণের কাজ সারা হয়। মহিলারা ঘরে-বাইরে এমন অনেক জিনিষ ব্যবহার করেন যা সরাসরি গাছ থেকে পাওয়া যায়। রং এবং ওষুধও গাছ থেকে উৎপন্ন হয়। ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানও অরণ্যের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠে। অরণ্য থেকে নানা উপাদান সংগ্রহের কাজ অনেক গরীব মানুষকে, বিশেষ করে ভূমিহীন চাষী-পরিবারের গ্রামীণ মহিলাদের জীবিকার সন্ধান দিয়েছে।

তাই বলা যায় অরণ্য থেকে বড় অংশের একটা সংগ্রহের কাজ মহিলারাই করে থাকেন। কিছু কিছু ক্ষেত্রে যদিও যৌথ শ্রমের প্রচলন আছে কিন্তু মহিলাদের ছাড়া একাজ সম্ভব নয়। যেহেতু যিনি শ্রম দান করেন তারই মজুরি প্রাপ্য, এক্ষেত্রে কৃষি অপেক্ষা মহিলাদের আয়ের উপর নিয়ন্ত্রণ অধিক। সভ্যতার শুরু থেকে অরণ্যবাসীদের কথা আমরা জানলেও তাদের কোনও দিন মূল স্রোতের অংশ হিসেবে ধরা হয়নি।

এখানে বিড়ি শিল্পের উল্লেখ করা যায়। কেন্দু পাতা থেকে উৎপন্ন বিড়ি সিগারেটের একটি সস্তা, ছোট সংস্করণ। বিড়ি শিল্পে শুধুমাত্র যারা বিড়ি বাঁধেন তাঁরাই নয় যারা পাতা সংগ্রহ করেন তাঁরাও আছেন। এই পাতার যোগান মূলতঃ মহিলা ও শিশুদের কাজ। এই কাজে এশিয়ায় লক্ষ লক্ষ মহিলা নিযুক্ত কিন্তু এখানে চরম স্বাস্থ্যহানির ভয় রয়েছে। মহিলা ও শিশুদের ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যহানির ভয় অনেকটাই।

কিন্তু যেভাবে এতকাল মহিলারা অরণ্যের উপাদান ব্যবহার করে আসছেন তা বেশ কিছুটা ক্ষতিকারক। গ্রামীণ মহিলাদের জীবনের উপর এই ক্ষতিকারক ভূমিকার নানা কারণ আছে। প্রথমতঃ অনেক অঞ্চলে মরুকরণ এবং অরণ্যহানির ফলে চিরাচরিত ভাবে ব্যবহার্য গাছের ক্ষতি হচ্ছে এবং মহিলাদের সংগ্রহের কাজের জন্য অনেক দূর যেতে হচ্ছে। পুরুষ যখন অন্যত্র কাজের খোঁজে যান তখন ঘরের মহিলাদের উপর সংগ্রহের সব দায়িত্বই পড়ে। একাজে তাদের সময়ও বেশী লাগে। তৃতীয়তঃ নতুন প্রযুক্তি এবং পরিবর্তনশীল জমির ব্যবহারের ফলে অরণ্য থেকে মহিলাদের অতিরিক্ত আয়ের সুযোগ কমছে। যখন কোনও বিকল্প সুযোগ খোলা নেই, পুরানো সূত্র থেকে আয় কমে গেলে মহিলারা ক্ষতিগ্রস্ত হন। যে গতিতে মরুকরণ এবং অরণ্যহানি ঘটছে মহিলাদের রোজকার জীবনে জ্বালানী ও জল সংগ্রহের কাজে অনেক দূরবর্তী স্থানে হেঁটে যেতে হচ্ছে। এই পরিশ্রমের বিকল্প হলো কম উৎকর্ষ জ্বালানী ব্যবহার যা রান্নার কাজকে আরও কঠিন এবং সময় সাপেক্ষ করে তুলবে। এতেও স্বাস্থ্যহানি এবং পুষ্টির অভাবের সম্ভাবনা রয়েছে।

10.3.4. নারী ও জল

মহিলারাই মূলত জলবাহক, পরিচালক, সর্বশেষ ব্যবহারক এবং পারিবারিক স্বাস্থ্যের শিক্ষিকা। গৃহস্থালীর কাজের মধ্য দিয়ে তাদের সবসময় জল ব্যবহার করতে হয়। মহিলারা শুধুমাত্র জল বহন করেই আনেন না, তারা খাদ্য প্রস্তুত করেন, বাসনপত্র ধোন, জামাকাপড় কাচেন, ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের স্নান করান, শিশুদের মলমূত্র পরিষ্কার করেন। এই গুরুত্বপূর্ণ এবং বহুমুখী কাজের দায়িত্ব সত্ত্বেও প্রাথমিক ব্যবহারিক হিসাবে মহিলাদের যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয় না। মহিলাদের জল - সংক্রান্ত কাজকে অনিবার্য ধরে নিয়ে এদের আর্থিক এবং সামাজিক মর্যাদা দেওয়া হয় না। বহু মহিলাই নিত্য ব্যবহার্য কাজের জন্য যথেষ্ট জল পান না, যখন পান তা দূষিত এবং মহিলাসহ সারা পরিবারের পক্ষে স্বাস্থ্যহানির কারণ হয়। প্রাথমিক ব্যবহারিক হিসাবে মহিলারাই সর্বপ্রথম দূষিত জলের সংস্পর্শে আসেন। তাই স্বাস্থ্যহানির বিপদ পুরুষ অপেক্ষা মহিলাদের বেশী।

10.3.5. নারী ও শক্তি

গ্রামে মহিলারা শক্তির যোগানের জন্য দায়ী, কারণ গৃহস্থালীর কাজ, কৃষিক্ষেত্র এবং গ্রামীণ শিল্পোন্নয়নে যে শক্তির প্রয়োজন তা তারাই যোগান দেন। তাই শক্তির ব্যবহারের সংকটের ক্ষেত্রে মহিলাদের বিষয়টি আলোচনা করতে হবে। বিভিন্ন গবেষণা থেকে জানা যায় যে মহিলা ও পাঁচ বছরের অনূর্ধ্ব শিশুরাই চিরাচরিত উনুনে যে জৈব জ্বালানীর ব্যবহার হয় তার দূষণের বলি হয়। শ্বাসকষ্ট, ফুসফুসের কষ্ট, ফুসফুসের ক্যান্সার এবং গর্ভবতীদের নানান রকম কষ্টের কারণ ঘটায় এই জ্বালানীজনিত স্বাস্থ্যহানি।

10.3.6. স্বাস্থ্য ও পরিবেশ

নারীর ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য এবং পরিবেশের বিষয়গুলি সংযুক্ত। বাস্তুতন্ত্রে যে বিভিন্ন ধরনের চাপ লক্ষ্য করা যায় তা এক সময়ে কোনও বড় বিপদ না ঘটালেও, এখন ধ্বংসের কারণ। শুধুমাত্র ওষুধ এবং ডাক্তার স্বাস্থ্য তৈরী করতে পারেনা। যদি বাস্তুতাত্ত্বিক ক্ষয়ের দ্বারা নিত্যপ্রয়োজনীয় উপাদান উধাও হয়ে যায় তাহলে এর কার্যত কোন প্রতিকার নেই। মহিলারা সাধারণভাবে কয়েকটি বিশেষ অসুখে ভোগেন এবং এগুলি সরাসরিভাবে পরিবেশের সঙ্গে যুক্ত। পুষ্টির অভাব, বিশেষ করে লৌহঘটিত পুষ্টির অভাবে যে রক্তাল্পতা তা ঘনঘন গর্ভধারণ, সন্তান পালন এবং সন্তানকে দুধ খাওয়ানোর ফলে ঘটে থাকে। এগুলো ঘটে এমন মহিলার শরীরে যিনি স্বাভাবিক ভাবেই অপুষ্টিতে ভুগছেন। স্বাস্থ্যের প্রতি অবজ্ঞা অপুষ্টিজনিত অসুখের উপর আয়োডিন ও ভিটামিনের অভাব মহিলাদের আরও অসুস্থ করে দেয়। এর মধ্যে অল্প বয়সে বিবাহ, অল্প বয়সে এবং ক্রমাগত গর্ভবতী হওয়া, পারিবারিক কাজের সমস্ত দায়িত্ব মহিলাদের স্বাস্থ্যের ক্ষতি করে। জল পরিবাহী অসুখের দ্বারাও মহিলারা সহজে আক্রান্ত হন। লম্বা কাজের সময়ের ফলে মহিলাদের কষ্ট বাড়ে, অনেক দূর যাতায়াতের ফলে তাদের আরও স্বাস্থ্যহানি হয়।

10.3.7. নারী ও সম্পদ ব্যবস্থাপনা

মহিলাদের বঞ্চনা অনেকক্ষেত্রেই অনেকটা কমিয়ে আনা যায় যদি পরিবেশসংক্রান্ত যে বিষয়গুলি তাদের সর্বাপেক্ষা আঘাত করে তার পরিচালনের কেন্দ্রবিন্দুতে মহিলাদের রাখা যায়। মহিলাদের ক্ষেত্রে সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক বাধাই তাদের এই ধরনের কোনও পরিকল্পনা থেকে দুরে সরিয়ে রেখেছে এবং তাদের অংশগ্রহণকে ন্যূনতম করে রেখেছে। কিন্তু চিপকো আন্দোলনে মহিলারা পথ দেখিয়েছেন। বিভিন্ন সময়ে কৃষকমহিলাদের দ্বারা যে কথা ব্যক্ত হয়েছে তাতে জানা যায় যে তারাই অরণ্য এবং জল সম্পদের ব্যবহার সম্পর্কে অভিজ্ঞতা রাখেন। প্রকৃতিকে সুন্দর করে গড়ে তোলা এবং সংরক্ষণ করার দায়িত্ব তারা নিতে পারেন।

গ্রামীণ মহিলাদের পরিবেশের সঙ্গে এক গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে। যদি ধরেও নেওয়া হয় তারা অশিক্ষিত তাহলেও তারা পরিবেশসংক্রান্ত বিষয়গুলি অনেক ভাল বুঝতে পারেন কারণ তারা এগুলিকে কোনও আলাদা বিষয় বলে ভাবেন না। বাস্তুতন্ত্রের সাথেও এর যোগাযোগ রয়েছে। যখন মহিলারা জ্বালানী এবং পশু খাদ্যের সংকটের কথা বলেন তারা পরিবেশের সাথে এর সম্পর্কের কথা জেনেই বলেন ; এবং কৃষিক্ষেত্রে রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবহারে পরিবেশ দূষণের কথাটিও তারা জানেন। বিভিন্ন ক্ষেত্রের মধ্যে যথাযথ সংযোগের অভাবে সেচ, জলের যোগান, সামাজিক অরণ্যায়ন ইত্যাদির ক্ষেত্রে সঠিক ফল পাওয়া যায়না। এক্ষেত্রে সংযোগ স্থাপনের মূল একটি হাতিয়ার হল বিশেষতঃ মহিলাসহ আঞ্চলিক মানুষের সহযোগিতা। কারণ এরাই এই প্রকল্পগুলির প্রত্যক্ষ ব্যবহারী। পরিকল্পনা ও প্রকল্প রূপায়ণের কাজে তাই এদের চিন্তাভাবনা প্রয়োজন।

মহিলাদের পরিবেশরক্ষার কাজে অংশগ্রহণের অর্থ জ্ঞান ও তথ্যের আদান-প্রদান। এটি জমির মালিকানা প্রশ্নের সঙ্গে যুক্ত কারণ জমি এবং অরণ্যের উপর মহিলাদের অধিকার, পঞ্চায়েতের প্রতিনিধিত্ব, পৌরসভায় প্রতিনিধিত্ব, বিভিন্ন গ্রাম কমিটিতে মহিলা ও পুরুষের সমান অবস্থান আঞ্চলিক স্তরে উন্নয়নের কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রশ্নের সঙ্গে যুক্ত। পশ্চিমবঙ্গ সহ অনেক রাজ্যে স্বামী এবং স্ত্রীর নামে যৌথ পাট্টা চালু করা হয়েছে। বহু ক্ষেত্রেই যেখানে বৃক্ষ রোপণের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে সেখানে মহিলাদের গোষ্ঠী এবং পারিবারিক গোষ্ঠীকে অরণ্য উন্নয়ন এবং সংরক্ষণের কাজে ব্যবহার করা হয়েছে। সেখানে পুরুষের সঙ্গে সমান তালে মহিলারা সেসব প্রকল্পে অংশগ্রহণ করছেন।

দরিদ্র চাষী পরিবারের মহিলাদের সংগঠিত করে তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে তাদের দাবী আদায়ের লড়াইতে সামিল করা যেতে পারে। ভারত সরকার কর্তৃক গৃহীত 1988 সালের অরণ্যনীতিতে রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত অরণ্য পরিচালন

ব্যবস্থা থেকে বিকেন্দ্রীভূত ও অংশগ্রহণকারী যৌথ অরণ্য পরিচালন ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে। অরণ্য থেকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বনজ দ্রব্যের সংগ্রহের বিষয়ে মানুষের চিরাচরিত অধিকারের কথা স্মরণ রেখে এই পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে ভালো সংখ্যক মহিলাদের গোষ্ঠী রয়েছে যারা বন সংরক্ষণ এবং পরিচালনের কাজে ক্ষমতা এবং পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। এইভাবেই বিভিন্ন উপাদানের সংরক্ষণের কাজে মহিলাদের ব্যবহার করা যেতে পারে। মহিলারা সঙ্ঘবদ্ধ না হলে এ ঘটনা সম্ভব হত না। অন্যথা আমরা মাটির কাছাকাছি যে মহিলারা আছেন, তাদের আত্মবিশ্বাস এবং যোগ্যতা কোনদিনই প্রত্যক্ষ করতাম না। কৃষিজীবী-মহিলারা বরাবরই উৎপাদকের উপাদান সংরক্ষণের কাজ করতেন, কিন্তু পরিবেশসংক্রান্ত যাবতীয় বিতর্কে এই বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা দরকার। মাটির কাছাকাছি কৃষিজীবী-মহিলাদের সংগঠনকে শুধুমাত্র তাদের চিন্তা, অভিজ্ঞতা এবং বিবেচনারই সুযোগ দিলে চলবে না, কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরের সমস্যাগুলিও তাদের গোচরে আনা প্রয়োজন। মহিলারাই পারেন তাদের জীবিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি চিহ্নিত করতে। এই বিষয়গুলির কয়েকটি নমুনা হল ভূমিক্ষয়, জমির দলিল সঠিকভাবে না রাখা, অরণ্যহানি, জলসম্পদ সংরক্ষণের পরিচালনা, পরিবেশ এবং সামাজিক পরিবর্তনের মধ্যে সম্পর্ক, অঞ্চলের বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে মহিলাদের কণ্ঠস্বর জোরালো করার উদ্দেশ্যে সংগঠিত ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা, উপাদান ব্যবহারের ক্ষেত্রে মহিলাদের চিরাচরিত অধিকারের অতিরিক্ত নিরাপত্তা রক্ষার জন্য প্রচেষ্টা।

উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ যেমন জমি, বাগিচা, গ্রামীণ অরণ্য, জলসম্পদ ইত্যাদির যৌথ নিয়ন্ত্রণ এবং পরিচালন ব্যবস্থা মহিলাদের অধিকার বৃদ্ধি করে এবং এইভাবে শ্রম সম্পর্ক এবং ক্ষমতার বিন্যাসেরও পরিবর্তন ঘটান। এইরকমই একটি প্রকল্প রূপায়িত হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া জেলায়, যেখানে মহিলারা পতিত জমি উদ্ধারের কাজে সংগঠিত হয়েছেন। নিচুতলার এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাগুলির উপর বৃহত্তর অর্থনৈতিক শ্রীবৃদ্ধি নির্ভর করে।

10.3.8. বিশ্বায়নের প্রভাব

বিশ্বায়নের একটি বড় অঙ্গ হল উন্নতিকামী দেশগুলিতে পরিকাঠামোগত সংস্কারনীতির (Structural Adjustment Programmes) প্রবর্তন। এই নীতি চালু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেখা যায় যে উন্নতিকামী দেশে বিভিন্ন মানবিক সূচকগুলি পড়তির দিকে। বহু গবেষকের লেখাতেই এর খবর পাওয়া যায়। স্বল্পপুষ্টি, শিশুমৃত্যুর বর্দ্ধিত হার, বিপজ্জনক গর্ভাবস্থার বর্দ্ধিত হার, কম ওজন নিয়ে শিশুর জন্ম, রোগের ব্যাপকতা বৃদ্ধি, আগে দূরীভূত হয়েছিল এমন সব অসুখের প্রত্যাবর্তন, এবং শিক্ষার মান নেমে যাওয়া—এসবই পরিলক্ষিত হচ্ছে। ধনী ও দরিদ্র দেশের মধ্যে সম্পদের ফারাক বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং দরিদ্রের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ধনী ও ধনীদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা দরিদ্রের মধ্যেও ফারাক বৃদ্ধি পাচ্ছে।

মহিলারাই প্রাথমিকভাবে পরিবারে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের দায়িত্ব নেন। পরিবারের স্বাস্থ্যের প্রয়োজন তাদেরই মেটাতে হয় এবং শিশুদেরও তাদের মানুষ করতে হয়। সব দেশেই এটি সত্য। কিন্তু উন্নতিকামী দেশে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের জন্য সরকার থেকে সাহায্য কমছে। অন্যদিকে উন্নত দেশগুলিতে বেশির ভাগই জাতীয় শিক্ষা ও স্বাস্থ্যকর্মসূচী বহাল থাকে। সংস্কার নীতির ফলে যখন শিক্ষা ও স্বাস্থ্যে রাষ্ট্রের ব্যয়বরাদ্দ কমে, প্রথম বলি হন দরিদ্র নারী।

নানা দেশ থেকে সংগৃহীত তথ্যের ফলে সংস্কারকর্মসূচীর এই ফলাফলগুলি জানা যায়। স্বাস্থ্যপ্রকল্পে সরকারী ব্যয় সংকোচের ফলে বিশেষ করে মহিলাসহ গরীব মানুষের স্বাস্থ্যহানি ঘটছে। এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশে সংক্রামক ব্যাধির প্রকোপ এবং অন্যান্য ব্যাধি ক্রমে মৃত্যুর হার বাড়াচ্ছে। দ্বিতীয়তঃ, খাদ্য ভর্তুকী ব্যাপকভাবে হ্রাস পাওয়ার ফলে মহিলা ও শিশুদের মধ্যে অপুষ্টি বৃদ্ধি পাচ্ছে। এছাড়াও উৎপাদনের দাম বৃদ্ধি বা অবমূল্যায়নের ফলে খাদ্যপণ্যের নিদারুণ মূল্যবৃদ্ধি ঘটে। এর ফলে মহিলা ও শিশুদের মধ্যে অপুষ্টি বৃদ্ধি পায়। মহিলাদের অবস্থানের উপর পরিসংখ্যান চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় গরীব এবং মহিলাদের দুদফায় দুঃখভোগের কথা। উন্নতশীল দেশগুলিতে মহিলারা

স্বাভাবিকভাবেই কম পুষ্টি ও অধিক মৃত্যুহারে ভোগেন। তাই এই নীতির ফলে এরাই যে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন, তা তো সহজেই বোঝা যায়। সংস্কার নীতির অন্য একটি ফল হল কারখানাগুলিতে মহিলা শ্রমিকের প্রান্তিকরণ এবং বিধিবহির্ভূতকরণ। কারখানায় কাজ করা এই শ্রমিকশ্রেণী চূড়ান্ত স্বাস্থ্যহানির শিকার হয়, যা মালিকরা ক্রমাগতই অবজ্ঞা করেন। এই প্রতিষ্ঠানগুলিকে ঘর্ম প্রতিষ্ঠান (sweat shops) আখ্যা দেওয়া হয়ে থাকে এবং বহুজাতিক সংস্থাগুলিতেও বহু ক্ষেত্রেই মহিলারা এইভাবে অস্বাস্থ্যকর পরিস্থিতিতে কাজ করতে বাধ্য হন।

বৈদেশিক ঋণ, বাণিজ্য এবং প্রযুক্তির আদানপ্রদানের ফলে বহু ক্ষেত্রেই সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রণের অধিকার আঞ্চলিক থেকে জাতীয় বা আন্তর্জাতিক হয়ে ওঠে।

10.3.9. নারী ও চিপকো আন্দোলন

চিপকোর মতন পরিবেশ আন্দোলন ঐতিহাসিক ; কারণ এই আন্দোলন দেখিয়ে দিয়েছিল কিভাবে রাজনৈতিক এবং নৈতিক শক্তির সাহায্যে বাস্তুতান্ত্রিক সত্যের ভিত্তিতে মহিলারা আন্দোলন করতে পারেন। এর ফলে নারীশক্তির উদ্ভব হয়েছিল। গারওয়াল হিমালয়ে নানা ঘটনাবলীর সমষ্টি ঘটেছিল। মূল কারণ ছিল বৃক্ষরোপণ এবং বাস্তুতান্ত্রিক অর্থে যথাযথ বৃক্ষরোপণ। যখন মিশ্রিত বনাঞ্চলের পরিবর্তে অর্থকরী গাছ হিসাবে পাইন লাগানো হয়েছিল, মহিলারা প্রতিবাদ করেছিলেন, কারণ এটিই ছিল হিমালয়ে আর্থিক ভারসাম্যতা হারানোর কারণ এবং গারওয়ালি মহিলাদের আর্থিক অবনতিরও কারণ। জীবনবিধ্বংসী অরণ্যের পরিবর্তে তাঁরা চেয়েছিলেন জীবনদায়ী অরণ্য। এই আন্দোলন দেখিয়ে দিয়েছিল যে পরিবেশ রক্ষার অধিকার এবং দায়িত্ব পরিবেশ পরিচালনার একটি বড় অঙ্গ। এ সম্বন্ধে 10.5.1. অনুচ্ছেদে বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে।

10.4. পরিবেশ-সংক্রান্ত মানবাধিকারের বিষয়গুলি

পরিবেশগত বিষয় এবং মানবাধিকার—এই দুটিই গত কয়েক বছরে বহু আলোচিত বিষয়বস্তু। মানবসম্পদ এবং পরিবেশরক্ষার বিষয়ে বর্তমানে আইনী সহায়তার প্রয়োজন রয়েছে। একই লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে পরিবেশবিদ্ এবং মানবাধিকারের কর্মীরা। কিন্তু মাঝে মাঝে এদের মধ্যেও বিরোধ ঘটে। পরিবেশবিদ্‌রা অগ্রাধিকারের বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন তোলেন এবং মানবাধিকারের প্রবক্তারা প্রাণীজগৎ এবং বাস্তুতন্ত্রের উর্ধ্বে মানুষের অস্তিত্বের কথা বলেন। যদি জীবন, স্বাস্থ্য, সম্পদ, সংস্কৃতি, এবং ভদ্রভাবে বেঁচে থাকার মানবাধিকার অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমে অর্জন করতে হয়, তাহলে প্রাকৃতিক সম্পদের দ্রুত অবক্ষয় ঘটবে। অন্যদিকে বহু মানবাধিকারের প্রবক্তা পরিবেশবিদ্দের এই বলে সমালোচনা করেন যে তারা প্রাণী, প্রাকৃতিক সম্পদ এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মৌলিক চাহিদার দিকে তাকিয়ে মানুষের প্রয়োজনের কথা ভুলে যান। যদিও চলতি কথায় মনে করা হয় যে মানবাধিকার এবং পরিবেশের বিষয়টি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত, তবুও বিরোধ রয়েছে।

পরিবেশ এবং মানবাধিকারের মধ্যে দুইটি পারস্পরিক সম্পর্ক রয়েছে। প্রথমতঃ, মানবাধিকারের জন্য প্রয়োজন পরিবেশ রক্ষণ। বলা যেতে পারে যে অবক্ষয়ী পরিবেশ জীবন, স্বাস্থ্য এবং জীবিকার জন্য মানবাধিকার খণ্ডন করে। পরিবেশ সুরক্ষিত হলে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম সুখে-স্বস্তিতে থাকবে। দ্বিতীয়তঃ, মানবাধিকারের আইনী রক্ষণাবেক্ষণ, সংরক্ষণ এবং পরিবেশ রক্ষার সহায়তা করে। মানবাধিকারের দিক দিয়ে পরিবেশের বিষয়টি আলোচনা করার কয়েকটি সুবিধা আছে। প্রথমতঃ, চলতি অধিকার রক্ষার কথার ধাঁচেই পরিবেশ সম্পর্কে উদ্বেগের প্রকাশ হতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, পরিবেশ সংক্রান্ত উদ্বেগ প্রকাশ করতে চলতি অধিকারগুলিকে পুনর্বর্ধন করতে হবে। তৃতীয়তঃ, পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়ে সম্পূর্ণ নতুন ধরনের অধিকারের কথা বলতে হবে।

পরিবেশ রক্ষার কাজে মানবাধিকার একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সামাজিক এবং রাজনৈতিক অধিকার যখন সুরক্ষিত হয় তখন পরিবেশগতভাবে সুস্থ রাজনৈতিক পরিবেশ বজায় থাকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, জীবন, সংগঠন, মত প্রকাশ, রাজনৈতিক অংশগ্রহণ, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, সাম্য এবং আইনী সহায়তার ক্ষেত্রে মানবাধিকারের কথা

বললে পরিবেশগত অবক্ষয়ের প্রসঙ্গ চলে আসবেই। উল্টোটাও সত্যি, পরিবেশের অবক্ষয়ের কারণেই প্রতিরোধ আন্দোলন দমিত হয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরেও, তথ্যের সুষ্ঠু আদান-প্রদান ঘটে না। জীবন এবং সম্পদের অধিকার যথাযথভাবে প্রতিষ্ঠিত হলে পরিবেশ রক্ষার কাজ অনেক দূর এগিয়ে যায়।

সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার যেমন পদ্ধতি এবং অংশ গ্রহণের মাধ্যমে পরিবেশ সুরক্ষিত করে, আর্থিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক অধিকার মানবকল্যাণ অর্জনের কাজে সহায়তা করে। বর্তমানে মানবাধিকারের চুক্তিগুলি স্বাস্থ্যের অধিকার, ভদ্রভাবে বেঁচে থাকার অধিকার এবং ভদ্র পরিবেশে বেঁচে থাকার অধিকারের কথা বলে। এই সব অধিকারের সুরক্ষা পরিবেশকেও রক্ষা করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, স্বাস্থ্যের অধিকারের অর্থ হল যে সরকার সঠিক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে যাতে নাগরিকেরা বিষাক্ত পরিবেশ থেকে সুরক্ষিত থাকে এবং শারীরিক এবং মানবিক কল্যাণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিবেশে বাস করতে পারে। মানুষের সুরক্ষার জন্য গৃহীত নীতি বাস্তুতন্ত্র, প্রকৃতি ও পরিবেশও সুরক্ষিত করে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় যে তেজস্ক্রিয় বিকিরণের হাত থেকে মানুষকে বাঁচানোর অর্থই হল মানুষ ছাড়াও অন্যান্য প্রাণীকে বাঁচানো। ঠিক সেই ভাবেই, শিক্ষার অধিকার সুরক্ষিত হলেই পরিবেশগত সচেতনতা বৃদ্ধি পায় এবং রাজনৈতিকভাবে অবহেলিত মানুষ বাস্তুতান্ত্রিক অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে জোটবদ্ধ হতে শেখে। সাংস্কৃতিক অধিকার না থাকলেও পরিবেশগত অবক্ষয় হতে পারে। যদি সামাজিক অংশগ্রহণের অধিকার সুরক্ষিত থাকে, রাষ্ট্রের পক্ষেও পরিবেশ রক্ষা সহজ হয়ে পড়ে এবং এই পরিবেশ রক্ষার উপরেই সংস্কৃতি নির্ভর করে। পরিবেশের অবক্ষয়ের সঙ্গে মানবাধিকার রক্ষার যে পারস্পরিক সম্পর্ক রয়েছে তার দুটি উদাহরণ নীচে দেওয়া হল। একটি হল ইকুয়েডরের আমাজনের প্রাচীন মানবসভ্যতার উপর বর্ষণবহুল বনাঞ্চলে তেল শোধন কার্যকলাপের প্রতিক্রিয়া এবং অন্যটি হল হয়াওরানি উপজাতিদের উপর এই কার্যকলাপের প্রতিক্রিয়া। তেল উন্নয়ন এই হয়াওরানি উপজাতিকে বিলুপ্তির পথে নিয়ে যাবে। ক্যাথলিক মিশনারিদের খ্রীষ্টান করার প্রয়াস এবং তেল কোম্পানিদের প্রভাব সত্ত্বেও, এই উপজাতিরা তাদের চিরাচরিত সংস্কৃতি অনুযায়ী স্বতন্ত্রতা বজায় রেখেছে। তারা মূলতঃ শিকারী এবং সংগ্রহকারী এবং এখনও বেঁচে থাকার জন্য প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল।

পরিবেশ সংক্রান্ত বহু আইন ভারতে রয়েছে। চিরাচরিতভাবে অপরাধ হিসাবে না দেখে পরিবেশের বিষয়ে কথা আইনবিদ্‌রা অধিকার হিসাবেই বলতে পছন্দ করেন। সুপ্রিম কোর্ট জানিয়ে দিয়েছে যে প্রতি ব্যক্তিরই অধিকার আছে দূষণমুক্ত বায়ু এবং জলের। এই পরীক্ষার মর্মেই সুপ্রিম কোর্ট পরিবেশ পরিচালনার জটিল বিষয়গুলি সমাধান করতে চায়। যে দেশে পরিবেশ অবক্ষয়ের বেশীর ভাগ প্রতিক্রিয়াই পড়ে গরিব এবং নিরক্ষর মানুষের উপর এবং তাদের পক্ষে আদালতে যাওয়া যেহেতু দুষ্কর, তাই পরিবেশ রক্ষার নতুন আইন এই সমস্যার দ্রুত এবং স্বল্পব্যয়ে সমাধান করবে বলে মনে হয়। ১৯৮৫ সালের পর থেকে সুপ্রিম কোর্ট এবং হাইকোর্ট পরিবেশগত অধিকার নিয়ে কমপক্ষে আঠারোটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই সব সিদ্ধান্ত ছাড়াও অন্যান্য আইনী ধারায় বহু ব্যক্তিগত অধিকারের কথা বলা আছে। মানবাধিকারের দৃষ্টিতে পরিবেশের বিষয়টি দেখার উদ্দেশ্যেই এই সব সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে আমাদের দেশে।

ভারতে পরিবেশ সংক্রান্ত আইনের অর্থ পরিবেশের বিষয়ে আইন। অপরাধ, অন্যায়, বিধিনিষেধ এবং মৌলিক অধিকারের ক্ষেত্রগুলি এই আইনের আওতায় পড়ে। প্রতিটি ক্ষেত্রই পরিবেশ পরিচালনার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট মান বজায় রাখতে যথেষ্ট প্রত্যাশার কথা বলে। ভারতে ১৮৬০-এর দণ্ডবিধি, ১৯৭৩-এর অপরাধ দমনের নীতি এবং অপরাধের শাস্তির মধ্যেই রয়েছে বিশেষ কতগুলি পরিবেশ সংক্রান্ত আইন যেমন ১৯০৫-এর বাংলার ধোঁয়া দূষণ আইন, ১৯৮০-এর বনসংরক্ষণ আইন এবং অন্যান্য পৌরসভা সংক্রান্ত আইন। অন্যায় দমনের আইনের বেশীর ভাগই লিপিবদ্ধ নয় এবং ক্ষতিসাধন, অবহেলা এবং অন্যায় প্রবেশ রোধে সাধারণ শর্তগুলিই এক্ষেত্রে কাজে লাগে। ঔপনিবেশিক সময় থেকেই পরিবেশ পণ্যের উপর বিধিবদ্ধ নিষেধাজ্ঞা চালু ছিল। বন সংক্রান্ত আইনের মাধ্যমে এগুলি শুরু হয়েছিল এবং বর্তমানে রয়েছে ১৯৭৪-এর জল

সংরক্ষণ ও দূষণরোধ আইন, ১৯৮০-এর বন সংরক্ষণ আইন, ১৯৮১-এর বায়ু সংরক্ষণ ও দূষণরোধ আইন। একসঙ্গে বিবেচনা করলে, এই আইনগুলির মাধ্যমেই সুষ্ঠু পরিবেশ পরিচালনার কাজ সম্পন্ন হতে পারে।

আইনী সুব্যবস্থা সত্ত্বেও, অধিকাংশ সময়েই অনেকেই বলেছেন যে এই আইন কাগজে-কলমে যত কার্যকরী, বাস্তব ক্ষেত্রে তা নয়। বলা হয় ভারতের ক্ষেত্রে পরিবেশগত আইনের কোন বাস্তব প্রয়োগ নেই। বায়ু, জল এবং পরিবেশ দূষণরোধে আইন খুব কার্যকরী নয় কারণ এই আইনের মধ্যে বাঁধ, সেচপ্রকল্প এবং সমুদ্রপ্রাণীদের কথার মত গুরুত্বপূর্ণ পরিবেশের বিষয়গুলি পড়ে না। অনেকে বলেন যে বিধিবদ্ধ নিষেধাজ্ঞা শুধুমাত্র বায়ু এবং জলদূষণ নিয়ন্ত্রণ করে, আঞ্চলিক বিষয়গুলি অনেক কম গুরুত্বের সঙ্গে দেখা হয়। ভারতে পরিবেশ সংক্রান্ত সমস্যার মূলে রয়েছে সম্পদের অবক্ষয়, তুলনামূলকভাবে দূষণ অনেক কম গুরুত্বপূর্ণ। সম্পদের অবক্ষয়ের মধ্যে রয়েছে ভূমিক্ষয়, বনভূমি হ্রাস, মাটির তলার জলের স্তর নেমে যাওয়া, এবং ফুল, ফল, প্রাণীর অবলুপ্তি।

ভারতে পরিবেশবিদ্‌রা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ছাপ ফেলতে সক্ষম হয়েছেন। পরিবেশ, পণ্যের ব্যবহার, পরিচালন এবং সংরক্ষণ সংক্রান্ত বিরোধ শত শত প্রচারধর্মী সংস্থার জন্ম দিয়েছে। ১৯৭০-এর দশক থেকে শুরু করে অঞ্চলের অধিবাসী এবং পরিবেশ রক্ষাকারীরা অনেক প্রতিবাদ আন্দোলন সংগঠিত করেছে যার ফলে অনেক সরকারী নীতি পরিবর্তন করা সম্ভবপর হয়েছে। চিপকোর গাছ রক্ষা আন্দোলন, ভূপাল গ্যাস দুর্ঘটনা এবং নর্মদা বাঁধের ঘটনাগুলি আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করেছে। এ ছাড়াও বহু আঞ্চলিক প্রচারধর্মী সংগঠনও এই মর্মে অনেক প্রচেষ্টা নিয়েছে। বহু ক্ষেত্রে এন জি ও-র প্রতিরোধ এবং প্রতিবাদ, দূষণ প্রতিরোধ এবং সংরক্ষণে সাহায্য করেছে যা সরকারের প্রচেষ্টায় সম্ভবপর হয়নি।

10.4.1. পরিবেশ সংক্রান্ত আইনীব্যবস্থা

1972 সালে সুইডেনের স্টকহোম শহরে রাষ্ট্রসঙ্ঘের বিশ্ব শীর্ষ সম্মেলনে ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সক্রিয় অংশগ্রহণ ভারতে সরাসরি পরিবেশকেন্দ্রিক আইন প্রণয়নের সূত্রপাত করে। যদিও এর বহু আগে থেকেই বেশ কিছু আইনী ব্যবস্থা এদেশে পরিবেশ রক্ষার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন ক'রে এসেছে। নীচের সারণীতে অতীতের এবং পরিবেশ সংক্রান্ত বর্তমান আইনসমূহ, নিয়মাবলী এবং বিজ্ঞপ্তিগুলির পরিচয় দেওয়া হয়েছে (সারণী 10.1 দ্রষ্টব্য)।

সারণী 10.1. পরিবেশ সংক্রান্ত আইন, নিয়মাবলী ও প্রজ্ঞাপন

সাল	আইনের নাম, নিয়মাবলী ইত্যাদি
1878	ভারতীয় বনভূমি আইন (Indian Forest Act) (এই আইনই ভারতে প্রথম সংরক্ষণ প্রচেষ্টা)
1879	হস্তী সংরক্ষণ আইন (Elephant Preservation Act)
1887	বন্যপক্ষী রক্ষণ আইন (Wild Bird Protection Act)
1905	বঙ্গীয় ধূম দূষণ আইন (Bengal Smoke Nuisance Act)
1912	বন্যপক্ষী এবং পশু রক্ষণ আইন (Wild Birds and Animals Protection Act)
1932	বঙ্গীয় গণ্ডার সংরক্ষণ আইন (Bengal Rhinoceros Preservation Act)
1972	বন্যপ্রাণী (রক্ষণ) আইন [Wildlife (Protection) Act]
1974	জল (দূষণ নিবারণ এবং দূষণ নিয়ন্ত্রণ) আইন [Water (Prevention and Control of Pollution) Act]
1977	জল (দূষণ নিবারণ এবং দূষণ নিয়ন্ত্রণ) উপকর আইন [Water (Prevention and Control of Pollution) Cess Act]

সাল	আইনের নাম, নিয়মাবলী ইত্যাদি
1980	বনভূমি রক্ষণ আইন (Forest Protection Act)
1981	বায়ু (দূষণ নিবারণ এবং দূষণ নিয়ন্ত্রণ) আইন [Air (Prevention and Control of Pollution) Act]
1986	বন্যপ্রাণী (রক্ষণ) আইন—সংশোধনী [Amendment to Wildlife (Protection) Act]
1986	পরিবেশ রক্ষণ আইন (Environment Protection Act, E. P. Act)
1988	বনভূমি সংরক্ষণ আইন—সংশোধনী (Modification of Forest Conservation Act)
1989	বিপজ্জনক রাসায়নিক উৎপাদন, মজুত এবং আমদানী সংক্রান্ত নিয়মাবলী (Manufacture, Storage and Import of Hazardous Chemicals Rules under E. P. Act 1986)
1989	বিপজ্জনক বর্জ্য (ব্যবস্থাপন ও পরিচালন) নিয়মাবলী [Hazardous Wastes (Management and Handling) Rules under E. P. Act 1986]
1989	বিপজ্জনক আণুবীক্ষণিক প্রাণী/জীব-প্রযুক্তিজাত প্রাণী অথবা কোষ ইত্যাদির উৎপাদন, ব্যবহার, আমদানী, রপ্তানি ও মজুত সংক্রান্ত নিয়মাবলী (Manufacture, Use, Import, Export and Storage of Hazardous Microorganism/ Genetically Engineered Organism or Cells Rules)
1991	লোকদায় বীমা আইন (Public Liability Insurance Act)
1991	বন্যপ্রাণী (রক্ষণ) আইন 1972–সংশোধনী [Amendment to Wildlife (Protection) Act, 1972]
1991	উপকূলবর্তী অঞ্চল সংক্রান্ত নিয়মাবলীর বিজ্ঞপ্তি (Notification of Coastal Regulation Zone, under E. P. Act 1986)
1993	পশ্চিমবঙ্গ মৎস্যচাষ (সংশোধনী) আইন [West Bengal Fisheries (Amendment) Act]
1993	পরিবেশের উপর প্রভাব মূল্যায়ন বিবরণী সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি (Environmental Impact Assessment Statement Notification under E. P. Act 1986)
1994	পরিবেশের উপর প্রভাব মূল্যায়ন বিবরণী সংক্রান্ত (সংশোধনী) প্রজ্ঞাপন [Environmental Impact Assessment Statement (Modified) Notification]
1994	উপকূলবর্তী অঞ্চল নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত নিয়মাবলীর বিজ্ঞপ্তি (সংশোধনী) (Modification of CRZ Notification)
1995	জাতীয় পরিবেশ ট্রাইবুনাল আইন (National Environment Tribunal Act under E. P. Act 1986)
1996	রাসায়নিক দুর্ঘটনা প্রতিরোধে আপৎকালীন পরিকল্পনা, প্রস্তুতি এবং ব্যবস্থা গ্রহণ সংক্রান্ত নিয়মাবলী (Rules on Emergency Planning, Preparedness and Response for Chemical Accidents)
1996	বিপজ্জনক বর্জ্য এবং রাসায়নিক সংক্রান্ত নিয়মাবলী (সংশোধনী) [Hazardous Wastes and Chemicals (Amendment) Rules]
1997	পরিবেশের উপর প্রভাব মূল্যায়ন বিবরণী সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন (দ্বিতীয় সংশোধনী) [Environment Impact Assessment Statement (Second Modification) Notification]
1998	জৈবনিক এবং চিকিৎসাঘটিত বর্জ্য (ব্যবস্থাপন ও পরিচালন) নিয়মাবলী [Biomedical Waste (Management and Handling) Rules, under E. P. Act 1986]
উৎস :	Environment Acts, Rules & Notifications—Published by the Department of Environment, Government of West Bengal, March, 1999.

যেহেতু আমাদের মত উন্নয়নশীল দেশে অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য শিল্পের প্রসারণ একান্ত প্রয়োজনীয় অপরপক্ষে বহু শিল্পই পরিবেশ দূষণের কারণ হিসেবে পরিগণিত সেজন্য বর্তমান আলোচনায় বিশেষভাবে শিল্পঘটিত পরিবেশ দূষণ আইনের কিছু কিছু অংশ অনুচ্ছেদ 10.4.1.1.-এ তুলে ধরা হয়েছে।

10.4.1.1. পরিবেশ সংক্রান্ত আইনসমূহের পরিপ্রেক্ষিতে শিল্প সংস্থাগুলির বিধিগত দায়সমূহ

1974 সালের আগে পরিবেশ সুরক্ষার ক্ষেত্রে শিল্পসংস্থাগুলির বিধিগত দায় ছিল খুবই সামান্য। বিভিন্ন রাজ্যে সরাসরি পরিবেশ সুরক্ষার জন্য প্রণীত আইনও বিশেষ ছিল না। 1974 সালের পর থেকে দূষণ, বিপর্যয় এবং দুর্ঘটনা ইত্যাদির হাত থেকে পরিবেশকে সুরক্ষিত রাখতে কয়েকটি আইন প্রণীত হয়। স্বাভাবিকভাবেই শিল্পসংস্থাগুলি তাদের উৎপাদন প্রণালী, বর্জ্য পদার্থ, সংরক্ষণ, পরিবহণ, কাঁচামাল আমদানী, উৎপাদিত পণ্য ও উপপণ্যের রপ্তানী ইত্যাদির ব্যাপারে কতকগুলি বিধিনিষেধ মেনে চলতে বাধ্য হয়, যার মধ্যে ঐ সব শিল্পসংস্থায় কর্মরত ব্যক্তিদের নিরাপত্তা ছাড়াও জনসাধারণের নিরাপত্তার প্রশ্নটিও অন্তর্গত। জল (দূষণ নিবারণ এবং নিয়ন্ত্রণ) আইন, 1974 অনুযায়ী কেন্দ্রস্তরে কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ (Central Pollution Control Board) এবং রাজ্যস্তরে রাজ্যগুলিকে রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ (State Pollution Control Board) গঠিত হয় এবং কেন্দ্রে ও বিভিন্ন রাজ্যে পরিবেশ দপ্তরও গঠিত হয়। বর্তমানে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য পর্ষদগুলি নিম্নলিখিত আইনসমূহ কার্যকর ক'রে পরিবেশ রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

(1) জল (দূষণ নিবারণ এবং দূষণ নিয়ন্ত্রণ) আইন, 1974,

(2) বায়ু (দূষণ নিবারণ এবং দূষণ নিয়ন্ত্রণ) আইন, 1981,

(3) জল (দূষণ নিবারণ এবং দূষণ নিয়ন্ত্রণ) উপকর আইন, 1977,

(4) পরিবেশ (সংরক্ষণ) আইন, 1986,

(5) লোকদায় বীমা আইন, 1991,

এছাড়া, পশ্চিমবঙ্গে বঙ্গীয় ধূম দূষণ আইন, 1905 (1978 এ সংশোধিত) বলবৎ আছে। এই আইনে শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির বিধিবদ্ধ দায়বদ্ধতার কথা বিশেষভাবে বলা হয়েছে। এবারে উপরোক্ত আইনগুলির পরিপ্রেক্ষিতে বিধিবদ্ধ দায় দায়িত্বগুলির পরিচয় নীচে দেওয়া হ'ল।

জল (দূষণ নিবারণ এবং দূষণ নিয়ন্ত্রণ) আইন, 1974 : এই আইনের 24 (1) (a) ধারায় কোন বিষাক্ত ক্ষতিকারক বা দূষক পদার্থ সরাসরি নদী, কূপ অথবা জমিতে ফেলা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

25 (1) (a) ধারায় রাজ্য দূষণ পর্ষদের (State Pollution Control Board) আগাম অনুমতি ব্যতিরেকে কোন শিল্প, শিল্প প্রক্রিয়া, শিল্প প্রণালী এবং বিন্যাস ব্যবস্থা গড়ে তোলা অথবা এসবের সম্প্রসারণ বা বিবর্ধন করা নিষিদ্ধ করার কথা বলা হয়েছে। এগুলির থেকে নিষ্কাশিত আবর্জনা বা বর্জ্য পদার্থ কোন জলপ্রবাহে, কূপে অথবা জমির উপরিস্থিত কোন পয়ঃপ্রণালীতে সরাসরি ফেলতে নিষেধ করা হয়েছে।

এছাড়াও 25 (1) (a) (b) (c) ধারায় বর্জ্য পদার্থ নিষ্কাশনের জন্য পর্ষদের আগাম সম্মতি ব্যতিরেকে কোন নতুন বা বিকল্প পয়ঃপ্রণালী তৈরী অথবা ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

বায়ু (দূষণ নিবারণ এবং দূষণ নিয়ন্ত্রণ) আইন, 1981 : এই আইনের 16 (2) ধারায় কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদকে (Central Pollution Control Board) বাতাসে বিভিন্ন দূষক পদার্থের উর্দ্ধতম মাত্রা নির্ধারণের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে

এবং দেশব্যাপী বিভিন্ন কার্যাবলীর মাধ্যমে বায়ু দূষণ নিবারণ ও নিয়ন্ত্রণের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলা হয়েছে। 19 নম্বর ধারায় রাজ্য সরকারকে রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ (State Pollution Control Board)-এর পরামর্শক্রমে কোন অঞ্চলকে বায়ু দূষণ আইনের নিয়ন্ত্রণাধীন করবার অধিকার দেওয়া হয়েছে। এই আইনের 21 ধারা অনুসারে, কোন বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণাধীন অঞ্চলে পর্ষদের আগাম অনুমতি ব্যতিরেকে কোন কারখানা স্থাপন বা পরিচালন বন্ধ করা হয়েছে।

সংবিধি অনুযায়ী, কোন শিল্পপ্রতিষ্ঠান পর্ষদ নির্দিষ্ট পরিমাপের উর্ধ্বে কোন পদার্থ বাতাসে মুক্ত করতে পারবে না।

ধূম দূষণ এবং বায়ু দূষণ সংক্রান্ত আইন অনুযায়ী বিধিবদ্ধ পরিদর্শকের আগাম ছাড়পত্র ব্যতিরেকে কোনো চুল্লী, চিমনী, ধূমবাহী নল, অথবা ধূম হ্রাসকারী যন্ত্রাদি স্থাপন, পুনর্স্থাপন, পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করা নিষিদ্ধ। এই ব্যাপারে ছাড়পত্র একবছর মেয়াদী এবং সংবিধির নিয়মানুযায়ী পুনর্নবীকরণযোগ্য।

পরিবেশ (সংরক্ষণ) আইন, 1986 : এই আইন অনুযায়ী কোন শিল্পপ্রতিষ্ঠান কেন্দ্রীয় সরকার অথবা তার প্রতিভূ কর্তৃক স্থিরীকৃত পরিমাপের উর্ধ্বে কোনো কঠিন, তরল বা বায়বীয় পদার্থ পরিবেশে মুক্ত করতে পারবে না।

এই আইনে আরও বলা হয়েছে যে সংবিধি অনুযায়ী যে কোনো নির্দেশ কেন্দ্রীয় সরকার বা তার প্রতিভূ জারি করতে পারবেন যা শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি মেনে চলতে বাধ্য থাকবে।

জল (দূষণ নিবারণ ও দূষণ নিয়ন্ত্রণ) উপকর আইন, 1977 : এই আইনের 3 ধারা অনুসারে এই আইনে উল্লিখিত শিল্পসমূহ সংবিধিবর্ণিত হারে উপকর দিতে বাধ্য থাকবে।

এই উপকর প্রদানের বিবরণ/দাখিলা, 5 ধারা অনুসারে, সংবিধি নির্দেশিত বিধি অনুসারে প্রণয়ন ও সংবিধি নির্দেশিত কর্তৃপক্ষের কাছে দাখিল করতে হবে।

সমস্ত নির্দিষ্টিকৃত শিল্পসমূহ ও স্থানীয় সংস্থা জল খরচের পরিমাপ ও তা লিপিবদ্ধ করার প্রয়োজনে—সংবিধি নির্দেশিত মান ও স্থান অনুসারে মাপযন্ত্র লাগাবে।

বিপজ্জনক রাসায়নিক দ্রব্যাদির আমদানী, মজুত ও উৎপাদন সম্পর্কিত বিধিবদ্ধ দায়দায়িত্ব সংক্রান্ত নিয়মাবলী, 1989 [পরিবেশ (সংরক্ষণ) আইন, 1986 অনুযায়ী] : নানাবিধ উপকরের উৎস, রাসায়নিক দ্রব্যসমূহ, আমাদের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এদের সংখ্যা, বৈচিত্র্য ও জটিলতা ক্রমবর্ধমান। শিল্পে প্রায়শঃ ব্যবহার্য এদের মধ্যে অনেকগুলিই বিষাক্ত, উচ্চমাত্রায় বিক্রিয়াশীল, বিস্ফোরক এবং দাহ্য। তাই পরিবেশ নষ্টকারী সম্ভাবনা এদের মধ্যে প্রকট। স্বভাবতঃই এই দ্রব্যগুলির উৎপাদন, উৎপাদন প্রণালী, মজুত, পরিবহন এবং ব্যবহারের প্রতিটি ক্ষেত্রেই যত্ন ও সতর্কতা অবলম্বন অবশ্য কর্তব্য।

পরিবেশ (সংরক্ষণ) আইন, 1986 প্রণয়ন করে এইরকম বস্তুর নিরাপদ ব্যবহারের দায়দায়িত্ব কতিপয় সংস্থার ওপর ন্যস্ত হয়েছে।

এই আইনের 6, 8 ও 25 ধারা অনুসারে 'বিপজ্জনক রাসায়নিক উৎপাদন, মজুত এবং আমদানী সংক্রান্ত নিয়মাবলী, 1989' প্রণয়ন করা হয়েছে। নিয়মাবলীর 13 ও 14 ধারা অনুযায়ী শিল্পগুলিকে ব্যবহার স্থলেই আপৎকালীন পরিকল্পনা তৈরী রাখতে হবে। মূল বন্দোবস্তগুলি এইরকম :—

(ক) কারখানার নক্সা এবং সেই নক্সায় বিপজ্জনক বস্তুর চরিত্র ও অবস্থান চিহ্নিত করতে হবে। কারখানার চারপাশে অবস্থিত জনবসতি, রাস্তা ইত্যাদি ঐ নক্সায় চিহ্নিত করতে হবে।

(খ) কর্মস্থল নিয়ন্ত্রক, ঘটনা নিয়ন্ত্রক, পালা অধ্যক্ষ, যোগাযোগ আধিকারিক, নিরাপত্তা আধিকারিকবৃন্দ, অগ্নিনির্বাপক এবং পাহারার আধিকারিক এবং যান নিয়ন্ত্রক আধিকারিক ইত্যাদি অপরিহার্য আধিকারিক নিয়োগ ও এঁদের দায়িত্ব ও কর্তব্য স্পষ্টভাবে ঐ পরিকল্পনায় উল্লেখ করতে হবে।

(গ) আপৎকালীন নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র গঠন ও নক্সায় চিহ্নিতকরণ করতে হবে। এই কেন্দ্র জরুরী অবস্থায় সমস্ত ক্রিয়াকাণ্ডের কেন্দ্র বিন্দু ও সমন্বয়সাধকস্থল হবে। কেন্দ্রটিতে আভ্যন্তরীণ ও বহিস্থঃ টেলিফোন নম্বরসমূহ, আবশ্যিক টেলিফোন নম্বরসমূহ, অপরিহার্য ব্যক্তিসমূহের নাম ঠিকানার তালিকা এবং কারখানায় ব্যবহৃত রাসায়নিক দ্রব্যসমূহের তথ্যসারণী লিপিবদ্ধ থাকবে। জনসম্ভাষণও এই কেন্দ্র থেকে করা যাবে।

(ঘ) 10 নম্বর নিয়মানুসারে, রাজ্য দূষণ পর্ষদ অথবা তার প্রতিভূর কাছে নিরাপত্তাসংক্রান্ত প্রতিবেদন পেশ ব্যতিরেকে কোন সংস্থা, যেটি উপরোক্ত আইনের আওতায় পড়ে, কোনরকম শিল্প চালাতে পারবে না। 11 নম্বর নিয়মানুসারে উপরোক্ত নিরাপত্তা বিবরণীর পরিমার্জন সাধিত করতে হলে অন্ততঃ 90 দিন আগে পর্ষদের সামনে পরিমার্জিত নিরাপত্তাবিবরণী পেশ করতে হবে।

বিপজ্জনক বর্জ্যপদার্থ (ব্যবস্থাপন ও পরিচালন) নিয়মাবলী, 1989 [পরিবেশ (সংরক্ষণ) আইন, 1986 অনুযায়ী] : রাসায়নিক শিল্পের অগ্রগতির ফলস্বরূপ রাসায়নিক বস্তুর বহুল ব্যবহার হচ্ছে, এবং তার ফলে প্রচুর পরিমাণ বর্জ্য পদার্থ কঠিন, তরল ও বায়বীয় অবস্থায় পরিবেশে মিশছে। এদের একটি বৃহদংশ মানবকুল ও সজীব বস্তুর পক্ষে বিপজ্জনক। এইসব বর্জ্য পদার্থের চোয়ানো জল ভূগর্ভস্থ ও মাটির ওপরের জলের উৎসগুলিকেও সংক্রমিত করে ; ফলে, এইসব উৎস মানবশরীরের পক্ষে হানিকর হয়ে ওঠে। উন্নয়নশীল দেশগুলিতে এই সমস্যা প্রকট, কারণ তাদের না আছে পর্য্যাপ্ত উৎপাদন প্রযুক্তি, না আছে বর্জ্য পদার্থ শোধনের সুবিধা ; অথচ বিপজ্জনক বর্জ্যের নিয়ন্ত্রণ একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এতে স্বাস্থ্য ও পরিবেশ রক্ষা ছাড়াও প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠ পরিচালন/ব্যবহার সম্ভব। গত চার দশক ধরে ভারতে বিভিন্ন রাসায়নিকের প্রভূত পরিমাণ উৎপাদনের ফলে পরিবেশে ক্ষতিকারক বর্জ্য এসে মিশেছে। জমিতে বা জলাশয়ে নির্বিচারে বর্জ্য ত্যাগের ফলে আগে ছিল না এমন বহু বিষাক্ত যৌগ পয়ঃপ্রণালী বা জল সরবরাহ ব্যবস্থায় উত্তরোত্তর বাড়তি সংখ্যায় ও পরিমাণে পাওয়া যাচ্ছে।

পরিবেশ সংক্রান্ত প্রত্যেকটি বিষয়ের ওপর নজর রাখবার জন্য এবং এইসব বিষয়ে আগে প্রণীত আইনগুলির ফাঁক বন্ধ করতেই 1986 সালে পরিবেশ সংরক্ষণ আইন চালু করা হয়। এই আইনের 3 (2) (6) এবং (7) ধারায় কেন্দ্রীয় সরকারকে ক্ষতিকারক রাসায়নিক, ক্ষতিকারক বর্জ্য ও ক্ষতিকারক জীবাণুসহ সমস্তপ্রকার ক্ষতিকারক বস্তুর সঞ্চালনার জন্য কার্যক্রম এবং নিরাপত্তাবিধি প্রস্তুত করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

বিপজ্জনক বর্জ্য পদার্থ (ব্যবস্থাপন ও পরিচালন) নিয়মাবলী জারী করা হয় 1989 সালে পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, 1986 আইনের আওতায়। এই বিধিনিষেধসমূহের উদ্দেশ্য হলো ক্ষতিকারক বর্জ্যের উৎপাদন, সংগ্রহ, শোধন, পরিবহন, আমদানী, সংরক্ষণ এবং বর্জন এর নিয়ন্ত্রণ। ক্ষতিকর বর্জ্যের সঠিকভাবে সামলানোর নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থাপত্র তৈরী এই বিধিনিষেধগুলোর মুখ্য উদ্দেশ্য।

বিপজ্জনক বর্জ্য পদার্থ (ব্যবস্থাপন ও পরিচালন) নিয়মাবলী 1989 ক্ষতিকর বর্জ্যের তালিকা তৈরী এবং তা নিয়ন্ত্রিত উপায়ে সামলানো ও বর্জনের ব্যবস্থা করেছে। 18 প্রকার বর্জ্যের বিভাগ স্থির করা হয়েছে যেগুলোর নিয়ন্ত্রিত পরিমাণ বেঁধে দেওয়া হয়েছে এবং আইন-2তে এই বিধিনিষেধ কোন কোন ক্ষেত্রে কার্যকরী হবে তা বলা হয়েছে এবং এগুলি ঐ নির্দিষ্ট প্রকারের বর্জ্যের ক্ষেত্রেই কার্যকরী হবে।

ক্ষতিকারক বর্জ্য উৎপাদনকারীর দায়িত্ব নীচে বর্ণিত হ'ল—

(1) যে সব ক্ষতিকারক বর্জ্য তৈরী হচ্ছে তা সরকারী সংস্থা যারা এর নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বে রয়েছে—তাদের জানানো।

(2) ক্ষতিকারক বর্জ্য সামলানোর দায়িত্ব প্রাপ্তির জন্য নির্দিষ্ট ফরমে দরখাস্ত করতে হবে।

(3) মোটর যান আইন, 1988 অনুযায়ী ক্ষতিকারক বর্জ্য পরিবহনের সময় ঐ বর্জ্য সঠিকভাবে মোড়কবদ্ধ করে তাতে লেবেল লাগাতে হবে।

(4) ক্ষতিকারক বর্জ্যের উৎপাদন ও পরিচালনের কাজে নিযুক্ত কর্মীর বিবরণ নির্দিষ্ট ফর্ম অনুযায়ী রাখতে হবে।

(5) বাৎসরিক দাখিলা জমা করতে হবে।

(6) দুর্ঘটনা ঘটলে তা অবিলম্বে রাজ্যদূষণ পর্ষদকে জানাতে হবে।

পরিবেশ সম্পর্কিত আইনের বিভিন্ন ধারা অনুযায়ী পালনীয় বিধি-নিষেধ মেনে না চললে পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ বা বিচারবিভাগীয় কর্তৃপক্ষ শিল্প সংস্থার বিরুদ্ধে আইনী ব্যবস্থা নিতে পারেন যার ফলে শিল্প সংস্থা বন্ধ করে দেওয়াও হতে পারে।

লোকদায় বীমা আইন, 1991 অনুযায়ী পালনীয় বিধিনিষেধ সমূহ : এই আইন ক্ষতিকারক রাসায়নিক নিয়ে কাজ করবার সময় দুর্ঘটনা ঘটলে দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের তাৎক্ষণিক সাহায্য প্রদানের জন্য লোকদায় বীমার ব্যবস্থা করার উদ্দেশ্যে প্রণীত হয়েছে। এই আইনে এ ধরনের শিল্পসংস্থাকে প্রয়োজনীয় বীমার ব্যবস্থা করতে হবে। যাতে দুর্ঘটনা ঘটলে ক্ষতিগ্রস্তকে তাৎক্ষণিক সাহায্য পেতে বিচার বিভাগের দ্বারস্থ না হতে হয়।

এই আইনকে কার্যে পরিণত করতে কিছু বাধার সম্মুখীন হওয়ায় কেন্দ্রীয় সরকার লোকদায় বীমা (সংশোধিত) অধ্যাদেশ, 1992 নামে একটি অধ্যাদেশ জারী করেন এবং 3 মার্চ 1992 তারিখে লোকসভায় সেই অধ্যাদেশের বদলে লোকদায় বীমা আইন বিল, 1992 গ্রহণ করা হয়।

এই আইনের অধীনে পয়লা মে, 1991 তারিখে ভারত সরকার বিধি নির্দেশ করে একটি বিজ্ঞপ্তি জারী করেন। এই বিধিনিষেধের মধ্যে মুখ্যগুলি—নীচে দেওয়া হলো :

(ক) নির্ধারিত ফর্ম অনুযায়ী নির্দিষ্ট কাগজপত্রসহ কালেক্টরের কাছে দরখাস্ত পেশ করতে হবে।

(খ) এই বিধিনিষেধ বলে কালেক্টর দেওয়ানী আদালতের সমস্ত ক্ষমতা পাবেন।

(গ) শিল্পের মালিককে লোকদায় বীমা তহবিল হিসাবে ব্যাংকে তহবিল রাখতে হবে যাতে করে দাবীর নিষ্পত্তি করা যায় এবং এই তহবিল মালিক-মনোনীত পরিচালক চালাবেন।

এরপরে 24 মার্চ, 1992 তারিখে ভারত সরকার স্থির করে দেন যে এই আইন অনুসারে ক্ষতিকারক বস্তু নিয়ে কাজে নিযুক্ত প্রত্যেক মালিক পক্ষকেই কর্মীদের জন্য নির্দিষ্ট বীমা করতে হবে।

এই বিজ্ঞপ্তিতে 179 রাসায়নিক এবং তাদের পরিমাণগত মাপ নির্দিষ্ট করে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে।

10.4.1.2. গ্রীন বেঞ্চ

পরিবেশ সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানের জন্য ভারতের সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে দেশের বিভিন্ন রাজ্যের হাইকোর্টগুলিতে বিভিন্ন গ্রীন বেঞ্চ স্থাপন করা হয়। এখানে বহু সংখ্যক আপিল জমা পড়ে যা মানবাধিকারের স্বার্থে আইনের সাহায্য নিতে

চায়। সংখ্যার আধিক্যহেতু সুপ্রিম কোর্টকে শিল্পসংস্থার পরিবেশ সমস্যা এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সমস্যা সমাধানের জন্য যথাযথ আইনী ব্যবস্থা গ্রহনের কথা বলা হয়েছে। সুপ্রিম কোর্ট 68 ধরনের চামড়া শোধন এবং দূষণ সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত নেওয়ার ভার হাইকোর্টের উপর ন্যস্ত করেছে।

পরিবেশসংক্রান্ত বেঞ্চ বা গ্রীন বেঞ্চ এইভাবেই কলকাতা হাইকোর্টে শুরু হয় এবং 1996 সালের জুন মাসের পর থেকে প্রতি সপ্তাহে অন্ততঃ একদিন এর বৈঠক বসে। 1996 সালের পর থেকে যতগুলি মামলা হাইকোর্টে উঠেছে তার একটি খতিয়ান নীচে দেওয়া হল।

1996	83
1997	222
1998	219
1999 সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত	151

এই বিভিন্ন মামলাগুলি পরিবেশগত যে বিভিন্ন সমস্যার মোকাবিলা করবে সেগুলি হল :

(ক) যে শিল্পগুলি দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণ করছে না এবং সব বিধিনিষেধ অগ্রাহ্য করছে

(খ) জলাশয়/পুকুর বেআইনীভাবে ভরাট করা

(গ) গাছ কাটা

(ঘ) যানবাহন থেকে ধোঁয়া নির্গত হওয়া

(ঙ) জৈববর্জ্য পদার্থ এবং স্বাস্থ্যবিধি লঙ্ঘন

(চ) বর্জ্য পদার্থের স্তূপ এবং বর্জ্যের উৎস পরিশোধন

(ছ) রাজ্যে বিভিন্ন মর্গের দূষণক্রিয়া

(জ) পুকুর এবং উদ্যানের পরিবেশের গুণগুলি বজায় রাখা

বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান এবং সংস্থা এবং নানা ব্যক্তির অভাব অভিযোগের বিষয় নিয়ে গ্রীন বেঞ্চ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে এবং রাজ্য দূষণ পর্ষদ এবং পৌর সংস্থাগুলিকে দূষণ নিয়ন্ত্রণের অধিকার দিয়েছে। খাল, নদী, পুকুর এবং জলাশয় ভরাট বা সংস্কারের জন্য বিধিনিষেধ আরোপ করার উদ্দেশ্যে হাইকোর্টে বহু আপিল হয়েছে। মাইক্রোফোন ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা জারি করে শব্দদূষণ রোধ করার চেষ্টা করা হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রয়াসে। পশ্চিমবঙ্গে নিষিদ্ধ বাজির ব্যবহার ও বিক্রির উপরও নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছে।

আইনবদ্ধ আপিল ছাড়াও, একটি চিঠিতে দরখাস্ত দাখিল করেও পরিবেশের বিষয়ে গ্রীন বেঞ্চের কাছে আপিল করা যেতে পারে। বহু ক্ষেত্রেই এই আপিলগুলিকেই আইনবদ্ধ আপিল হিসাবে বেঞ্চ গণ্য করে।

10.5. পরিবেশ সম্পর্কীয় আন্দোলন

10.5.1. চিপকো আন্দোলন

1927 সালে ভারতের প্রথম 'অরণ্য আইন' তৈরি হয়েছিল। সেই আইনের অন্তর্গত অনেক বিষয় আদিবাসী ও অরণ্যচারী সাধারণ মানুষের অনুকূলে ছিল না। 1930 সালে এই বিষয়ে তিলারিতে এক বড় জনসমাবেশ ঘটে। সেখানে তৎকালীন রাজার সেনাবাহিনী সতেরো জন সাধারণ নাগরিককে খুন করে। 1949 সালে তেহেরি গাড়োয়াল অঞ্চল উত্তরপ্রদেশের অন্যতম

অঙ্গ হিসাবে ভারতীয় যুক্তরাজ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়। ঐ সতেরো শহীদের স্মরণে 30শে মে প্রতিবছর 'অরণ্যদিবস' পালিত হয়। সাতের দশকের শুরুতেই সেই প্রতিবাদ তীব্র আন্দোলনের রূপ নেয়। এই আন্দোলন 'চিপকো আন্দোলন' নামে পরিচিতি লাভ করে। 'চিপকো' কথার মানে 'জড়িয়ে ধরা'।

1961 সালে মহাত্মা গান্ধীর ভাবশিষ্যা সরলা বেনের উদ্যোগে সেই অঞ্চলে 'উত্তরাখণ্ড সর্বোদয় মণ্ডল' তৈরি হয়েছিল। সমাজ গঠনমূলক কাজের পাশাপাশি 'অরণ্যের লড়াই'ও দৃঢ় করছিলেন সবাই। 1968 সালের 30শে মে আদিবাসী নারীপুরুষ একজোট হয়ে চিপকোর লড়াইয়ে যোগ দিলেন। বিত্তবান ঠিকাদার আর শিল্পপতিদের নিরবচ্ছিন্নভাবে অরণ্য লুণ্ঠনে বাধা দেওয়া হল। 1972 সালের 12 ও 15ই ডিসেম্বর উত্তরকাশী আর গোপেশ্বরে নির্বিচার অরণ্য লুণ্ঠনের বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক পদযাত্রা সংগঠিত হয়। 1973 সালের এপ্রিল মাসে রাতের অন্ধকারে বৃক্ষ লুণ্ঠন করতে এলে আদিবাসী মায়েরা প্রতিটি বৃক্ষকে সন্তানের মতো জড়িয়ে থাকেন। রাতের পর রাত জেগে গাছ পাহারা দিয়েছেন মায়েরা। আন্দোলনে যারা নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে সরলা বেন, মীরা বেন, গোপেশ্বর, সুন্দরলাল বহুগুণা ও চন্ত্রিকাপ্রসাদ ভাটের নাম উল্লেখ করতেই হয়। 1974 সালের মার্চ মাসে অন্যতম সংগঠিকা গৌরী দেবীর নেতৃত্বে সাতাশ জন আদিবাসী মহিলা রাতের পর রাত জেগে বৃক্ষ প্রহরায় ছিলেন। লড়াইয়ের ভেতর থেকে সে সময় একটা অন্য দাবি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। অরণ্যের মূল প্রজাতি বৈচিত্র্য অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে। পশুখাদ্য সংগ্রহ ও হালকা জ্বালানী সংগ্রহে মায়েদের অধিকার থাকবে। ভাবতে ভালো লাগে, আমাদের দেশে প্রথম তথাকথিত অশিক্ষিত আদিবাসী মায়েরা পরিবেশ রক্ষায় বাস্তুতন্ত্রের কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁরা অরণ্য দাবি করেননি, অরণ্য প্রজাতির স্বাভাবিক বিকাশ ও সংরক্ষণ চেয়েছেন।

1977 সালের একটি ঘটনা। নরেন্দ্রনগর আদবানী অরণ্য নীলামে বিক্রির কথা প্রচারিত হল। আন্দোলনকারীরা আপত্তি জানালেন। মায়েরা এগিয়ে এলেন। এক ঠিকাদারের স্ত্রী বাছনি দেবী নেতৃত্ব দিলেন। ধুম সিং নেগি অনশনে বসেছিলেন। পালা করে দিনরাত গাছ পাহারা চলেছিল। তৈরি হল অসামান্য জনপ্রিয় এক স্লোগান, 'What do the forests bear? Soil, water and pure air.'

1978 সালের 1লা ফেব্রুয়ারী যে ঠিকাদার নীলামে অরণ্য পেয়েছিল, দু'গাড়ি সশস্ত্র পুলিশ নিয়ে দখলে এগিয়ে আসে। গরীব মানুষকে নানাভাবে লোভ দেখায়। মায়েরা এক একটি গাছকে তিনজনে মিলে আকড়ে থাকেন। ঠিকাদার ও সশস্ত্র পুলিশ ফিরে যেতে বাধ্য হয়।

আক্রমণ তীব্রতর হতে থাকে। সুন্দরলাল বহুগুণা অনশনে যোগ দেন। এগারো দিনের মাথায় বহুগুণা গ্রেপ্তার হন। খবর পেয়েই হাজার হাজার মানুষ ছুটে আসে। পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য হয় পুলিশবাহিনী। সবশেষে বলা দরকার, চিপকো আন্দোলনকারীদের চাওয়ার কি ছিল? অবিকৃত অরণ্য বাঁচিয়ে রাখতে হবে? না। এরা বলেছেন, অরণ্য শুধুমাত্র সম্পদ অপহরণের উৎস নয়, কাঠ ও লাক্ষা যেমন অরণ্যের সম্পদ ; জল মাটি বাতাসের জন্যও অরণ্য চাই। লাক্ষা সংগ্রহে বারণ ছিল না। পরিমিতি বোধ কাজ করুক—এই ছিল আন্দোলনকারীদের অভীপ্সা।

এই আন্দোলনের তীব্রতা কেন্দ্রীয় প্রশাসনেরও নজর কেড়েছিল। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন, 'উত্তর প্রদেশের হিমালয় অঞ্চলে আগামী পনেরো বছর কোন বৃক্ষ স্পর্শ করা যাবে না'। উত্তরপ্রদেশের হিমালয় অরণ্য থেকে এই আন্দোলনের বার্তা সারা পৃথিবীতে ছড়িয়েছিল। দক্ষিণ ভারতের 'আপ্পিকো' আন্দোলনের মূল প্রেরণা ছিল এই চিপকো আন্দোলন।

10.5.2. নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন

'নর্মদা' ভারতের অন্যতম প্রধান নদী। নর্মদার দৈর্ঘ্য প্রায় 1450 কিলোমিটার। মধ্যপ্রদেশের অমরকন্টক থেকে দীর্ঘ পথ পেরিয়ে আরব সাগরে গিয়ে পড়েছে। নর্মদার তীরে তীরে হাজার হাজার বছরের প্রাচীন সংস্কৃতি ও সভ্যতা গড়ে উঠেছে।

এর উপত্যকায় ভারতীয় সভ্যতার প্রাচীনতম অধিবাসী—ভিল, গণ্ড এরা বাস করেন। এই নদীর স্রোতপথে ও তার উপনদীতে 30টি বড়ো বাঁধ, 135টি মাঝারি বাঁধ ও 3000টি ছোট বাঁধ তৈরির কর্মসূচী নেওয়া হয়েছে। মূল নদীতে দশটি বড়ো বাঁধ তৈরির পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। কিসের জন্য এই পরিকল্পনা? মুখপাত্রদের বক্তব্য, জলসম্পদ থেকে 2700 মেগাওয়াট বিদ্যুৎ পাওয়া যাবে, 50 লক্ষ হেক্টর জমিতে সেচের জল মিলবে। সবচেয়ে বড়ো দুটি বাঁধের নাম 'সর্দার সরোবর' ও 'নর্মদা সাগর'। গুজরাতে 'সর্দার সরোবর' ও মধ্যপ্রদেশে 'নর্মদা সাগর' বাঁধ তৈরি হবে। এই বিষয়ে প্রতিবাদ উঠেছে সারা পৃথিবীতেই। আমাদের দেশে বাবা আমতে ও মেধা পাটকরের নাম খুবই পরিচিতি লাভ করেছে। আন্দোলনকারীদের অভিমতগুলো কি কি দেখা যাক। প্রাথমিক ব্যয় ধরা হয়েছিল 25 হাজার কোটি টাকা। দিন দিন সেই পরিমাণ দ্রুত বাড়ছে। কোত্থেকে এতো টাকা আসবে? বাঁধ তৈরির ফলে সাড়ে তিন লক্ষ হেক্টর অরণ্যভূমি জলমগ্ন হবে। 56 হাজার হেক্টর উর্বর জমি ধ্বংস হবে। দশ লক্ষেরও বেশি মানুষ উদ্বাস্তু হবেন। সমৃদ্ধ অরণ্যবৈচিত্র্য লুপ্ত হবে। বড়ো বাঁধ তৈরি হলে পলি জমতে থাকে। স্রোত বাধা পায়। ভারতীয় বিশেষজ্ঞগণ এক সমীক্ষায় বলেছিলেন, বাঁধের অববাহিকায় প্রতি 100 বর্গমাইলে (259 বর্গ কি.মি.) 75 একর ফুট (9.25 হেক্টর মিটার) পলি জমা হবে। দামোদর বাঁধের জন্য মাইথনে 75 একর ফুটের (9.25 হেক্টর মিটার) জায়গায় 300 একর ফুট (37 হেক্টর মিটার) পলি জমেছে। পাঞ্চেতে 275 একর ফুট (33.9 হেক্টর মিটার) পলি জমেছে। ভাকরা বাঁধ প্রকল্পেরও বড়ো বিপদ এই পলি জমা।

এই প্রকল্পের বিরুদ্ধে প্রথমে সোচ্চার হয়েছিলেন বাবা আমতে। 1987 সালে ছাড় পাওয়া এই প্রকল্পের সব কথা সাধারণ মানুষকে জানতে দিতে হবে। বাস্তবে তা ঘটেনি। 1989 সালের 22শে ফেব্রুয়ারী অহিংস মিছিলকে পুলিশ আক্রমণ করে। যে গ্রামগুলো ডুবে যাবার কথা, তাদের প্রায় দশ হাজার গ্রামবাসী গুজরাত, মধ্যপ্রদেশ ও মহারাষ্ট্র থেকে জমা হয়েছিলেন। প্রশাসন থেকে তখন বলা হয়েছিল প্রয়োজনে আন্দোলন দমন করতে সেনাবাহিনী নামানো হবে।

সর্দার সরোবর প্রকল্পের জল কে পাবে? গুজরাতের সৌরাষ্ট্র এলাকার ছ'টি জেলায় 69টি তালুক রয়েছে। 56টি তালুক একটুও জল পাবে না। শতকরা 81 ভাগ তালুকের কাছে জল যাবেনা। [সূত্র : ORG, 1982 (Regionalisation of Narmada Command) Baroda : A Study for the Government of Gujarat] এরকম আরও অনেক বিষয় রয়েছে যা নিয়ে সরকারী ভাষ্য ও আন্দোলনকারীদের ভাষ্য একটুও মেলে না। পরিবেশ ও বনদপ্তরের হিসাবে নর্মদা সাগর প্রকল্পে বনের গাছ কাটার জন্য ক্ষতি হবে 30,923 কোটি টাকা এবং সর্দার সরোবর প্রকল্পের জন্য ক্ষতি হবে 8,190 কোটি টাকা। বড়ো বড়ো জলাধার তৈরি হলে পাশাপাশি কখনও বিকল্প বনসৃজন যথাযথভাবে গড়ে উঠবে না। উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের প্রশ্নটিও উপেক্ষার সঙ্গেই বিবেচিত হবে। পুনর্বাসনের প্রকৃত সংজ্ঞা অনুসৃত হবে না। কয়েক প্রজন্মের বাসস্থান ও কর্মস্থল এবং তাকে ঘিরে গড়ে ওঠা সংস্কৃতি নিমজ্জমান হবে। এই আন্দোলন আন্তর্জাতিক দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়েছে। দেশের বিশিষ্ট চিন্তাবিদেরাও এই আন্দোলনে সামিল হচ্ছেন। দেশের সর্বোচ্চ বিচারালয় সংস্থা 'সুপ্রিম কোর্ট' একাধিক ক্ষেত্রে এই প্রকল্পের বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ রায় দিয়েছেন। তবে সর্বশেষ রায়ে সুপ্রিম কোর্ট বাঁধের উচ্চতা বৃদ্ধির প্রস্তাব মেনে নিয়ে কয়েকটি শর্তসাপেক্ষে প্রকল্পের কাজ চালিয়ে যাবার নির্দেশ দেওয়ায় আবার নতুন করে বিক্ষোভ শুরু হয়েছে।

10.5.3. 'সাইলেন্ট ভ্যালি' আন্দোলন

উত্তর কেরালার পালঘাট জেলায় এই অরণ্যসংকুল উপত্যকার অবস্থান। চেহারা অনেকটা ত্রিভুজের মত। দু'দিকে কেরালার দুই শহর কোজিকোড় আর পালঘাট। আর একদিকে প্রতিবেশী তামিলনাড়ুর শহর কোয়েম্বাটুর। এমন নাম হল কি করে? অনেকে বলেন, এমন গভীর জঙ্গল অথচ ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক পর্যন্ত শোনা যায় না। তাই এর নাম 'সাইলেন্ট ভ্যালি' বা 'নীরব উপত্যকা'। কথিত আছে যে পাণ্ডবেরা রাজ্য হারিয়ে এই উপত্যকায় এসে বসবাস করেছিলেন। এই উপত্যকার

এলাকা নব্বই বর্গকিমি। মাঝখান দিয়ে কুন্তিপুঝা (Kunthipuzha) বয়ে চলেছে। মালয়ালাম ভাষায় 'পুঝা' বলতে নদী বোঝায়। উত্তর দক্ষিণে বয়ে চলেছে এই নদী। 2400 মিটার উচ্চতা থেকে শুরু হয়েছে। উত্তরে যত গেছে, উচ্চতা আধাআধি নেমে গিয়েছে। প্রায় 15 কিমি সমতল জুড়ে বয়ে চলেছে এই নদী। তারপর হঠাৎ সরু হয়ে প্রায় 1000 মিটার নিচুতে জলধারা নেমেছে। ঐ জলধারার মুখে রাজ্য সরকার বাঁধ তৈরির কথা ঘোষণা করেছিলেন। বহুদিন আগের কথা – 1928 ও 1929 সালে এক বৃটিশ প্রযুক্তিবিদ জানিয়েছিলেন, এই স্রোতধারা থেকে সহজে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করা যাবে। 1958 সাল নাগাদ এই বিষয়ে প্রথম সমীক্ষা হয়েছিল। 1973 সালে ভারতীয় পরিকল্পনা কমিশনের এই প্রকল্পে অনুমতি মেলে। শুরুতে 120 মেগাওয়াট ও পরে 240 মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। শুরুতে প্রতিবাদ হয়নি তেমন। 1976 সালে বিষয়টির দিকে কয়েকজন পরিবেশবিদের নজর পড়ে। ওয়ার্ল্ডওয়াইড ফান্ড, ইন্ডিয়া WWF, India-এর সহ-সভাপতির নেতৃত্বে একটি টাস্ক ফোর্স তৈরি হয়। একবছর পর টাস্ক ফোর্সের সমীক্ষায় এই প্রকল্প গ্রহণ করতে বারণ করা হয়। রিপোর্টে বলা হল, যদি এই কেন্দ্র গড়ে ওঠে তবে 'the richest expression of life that has evolved on this planet' ধ্বংস হয়ে যাবে। সর্বশেষে জানানো হল, এরপরেও যদি রাজ্য সরকার হাত দেন তবে সতেরোটি জিনিস মেনে বাঁধ তৈরির কাজে এগোতে হবে। 1979 সালের 19শে অক্টোবর টাস্ক ফোর্সের প্রধান চিঠি লিখে এই প্রকল্পকে সর্বতোভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করার কথা বলেন এবং আগের প্রস্তাবনাকে ব্যক্তিগত ত্রুটি বলে মেনে নেন।

1976 সালে কেরালার বৃহত্তম জনবিজ্ঞান সংগঠন কেরালা শাস্ত্র সাহিত্য পরিষদ (KSSP) এই প্রকল্প বিষয়ে মনোযোগী হয়। সংগঠনের রাজ্য সম্মেলনে এই জলবিদ্যুৎ প্রকল্প নিষিদ্ধ করার প্রস্তাব গৃহীত হয়। KSSP গণস্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযান শুরু করে। রাজ্যের বিধানসভায় একাধিক সদস্য এই প্রকল্প ত্বরান্বিত করার প্রস্তাব পেশ করেন। বিধানসভায় প্রকল্পের সপক্ষে প্রস্তাব গৃহীত হয়। KSSP থেকে একটি প্রচার পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। The 'Silent Valley' Hydroelectric Project : A Techno-Economic & Socio-Political Assessment'. জনবিজ্ঞান সংগঠনের আন্দোলনের ফলে একসময় রাজ্য সরকার এই প্রকল্প রূপায়ণে বিরত থাকে। 1979 সালের মে মাসে ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মোরারজী দেশাই রাজ্য সরকারকে এই প্রকল্প দ্রুত সমাধা করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। বহু পরিবেশবিদ্ আপত্তি জানান। বিখ্যাত প্রকৃতিবিদ সালিম আলিও আপত্তি করেছিলেন। International Union of Conservation of Nature & Natural Resources (IUCN) আপত্তি জানায়। হাইকোর্টে নাগরিক মামলা পেশ হয়। আবার খারিজও হয়ে যায়। যাই হোক, পক্ষে বিপক্ষে ঝড় বইতে থাকে। রাজনৈতিক ভাবনায় সমভাবাপন্ন মানুষ পরিবেশ বিতর্কে দুই পক্ষে ভাগ হয়ে যান। সবশেষে 1980 সালের ডিসেম্বরে কেরালা সরকার এই পরিকল্পনা পরিত্যক্ত বলে ঘোষণা করেন। 'সাইলেন্ট ভ্যালি'কে 'জাতীয় উদ্যান' হিসেবে ঘোষণা করা হয়। KSSP উন্নয়নবিরোধী ভূমিকা পালন করেনি কখনও। পরিবেশ ও উন্নয়ন—উভয় ভাবনা মাথায় রেখে উপযোগী ও স্থায়ী উন্নয়নমুখী প্রকল্প গ্রহণের অনুরোধ জানায়।

10.6. পরিবেশগত নৈতিকতা : পৃথিবীর ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য সমবেত প্রচেষ্টা

পরিবেশগত সমস্যাগুলি জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরের সমস্যা বলে ভাবা হয়। অনেক সমস্যাই সমস্যার কেন্দ্রের কাছে যাঁরা থাকেন শুধুমাত্র তাঁদেরই ক্ষতিসাধন করে তা নয়, গোটা সমাজ এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের উপরেও এর প্রভাব পড়ে। বিশ্বের প্রতিটি দেশেরই আর্থিক এবং সামাজিক দায়বদ্ধতা আছে তাদের নিজস্ব পরিবেশ রক্ষণাবেক্ষণের উদ্দেশ্যে যথাযথ পরিচালন ব্যবস্থায় উৎসাহ দান করা। কিন্তু পরিবেশগত সমস্যার বহু সমস্যাই মূলতঃ আন্তর্জাতিক। এই সমস্যাগুলির মধ্যে অনেকগুলির উৎসই এক বা একাধিক দেশ এবং কোন একটি দেশের পক্ষে এগুলির মোকাবিলা করা সম্ভব নয়। এই সমস্যাগুলিকে "বিশ্বের সাধারণ সমস্যা" (Common global problems) বলা হয়। বিভিন্ন দেশের যৌথ প্রচেষ্টা ছাড়া এই সমস্যাগুলি বিশ্বের সব দেশকেই বিপদে ফেলবে। এই যৌথ সমস্যাগুলির কয়েকটি নমুনা হল মরুকরণ, আন্টার্কটিকায়

পরিবেশ দূষণ, দীর্ঘস্থায়ী দূষক পদার্থের জৈববিবর্ধন এবং সমুদ্র এবং সমুদ্রপৃষ্ঠতলে দূষণ। এছাড়াও অন্যান্য কিছু নমুনা হল ওজোন ক্ষয়, জলবায়ুর পরিবর্তন এবং জীববৈচিত্র্যের সংরক্ষণের। এগুলির মোকাবিলা করার জন্য বিশ্বব্যাপী প্রতিরোধ কর্মসূচীর প্রয়োজন রয়েছে। এই সমস্যাগুলির কার্যকরী সমাধান না হলে স্থায়ী উন্নয়ন ঘটানো সম্ভবপর নয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে জলবায়ুর পরিবর্তন সমুদ্রপৃষ্ঠকে উত্থিত করে এবং সমুদ্রতীরবর্তী নীচুঅঞ্চল ও দ্বীপভূমিগুলিকে বিপদসঙ্কুল করে তোলে (যেমন মালদ্বীপ এবং বাংলাদেশ)। জলবায়ুর পরিবর্তন উন্নয়নশীল দেশগুলিতে কৃষি উৎপাদনও ব্যাহত করবে। 2050 সালের মধ্যে রাশিয়ান ফেডারেশন এবং আফ্রিকার কিছু কিছু অংশ প্রত্যক্ষ করবে কীভাবে তাদের শস্য উৎপাদন উল্লেখযোগ্যভাবে কমছে। বাতাসে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাসের পরিমাণ দ্বিগুণ হয়ে গেলে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে অভ্যন্তরীণ জাতীয় উৎপাদন 2 থেকে 9 শতাংশ কমে যাবে এবং শিল্পোন্নত দেশগুলিতে এই হ্রাসের পরিমাণ হবে 1 থেকে 1.5 শতাংশ।

পরিবেশগত বিষয়গুলির গুরুত্ব এবং দ্রুত মীমাংসার যথেষ্ট কারণ থাকা সত্ত্বেও বিশ্বের পরিবেশের সাধারণ সমস্যাগুলি নিয়ে যৌথ সহযোগিতার ক্ষেত্র গড়ে তোলা সহজ নয়। এই ক্ষেত্রটি গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজন কয়েকটি বিতর্কিত বিষয়ের মীমাংসা যেমন বিভিন্ন দেশের মধ্যে দায়িত্ব বণ্টন এবং মোকাবিলা করার ক্ষমতার তারতম্য। পরিবেশের আন্তর্জাতিক সমস্যাগুলির মধ্যে অনেকগুলির জন্য দায়ী হল শিল্পোন্নত দেশগুলি। অধিকতর অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্বার্থে, এই দেশগুলি জীববৈচিত্র্যের বহু অংশই নষ্ট করেছে এবং সারা পৃথিবী জুড়ে সামুদ্রিক মৎস্যক্ষেত্রগুলি অতিরিক্ত শোষণ করেছে। এই দেশগুলিই সবচেয়ে বেশী শক্তির ব্যবহার করে এবং বায়ুমণ্ডলে মনুষ্যসৃষ্ট গ্রীনহাউস গ্যাসের পরিমাণ বৃদ্ধি করার জন্য দায়ী। একই সঙ্গে এটিও সঠিক যে বিশ্বের পরিবেশগত সমস্যাগুলির মোকাবিলায় উন্নয়নশীল দেশগুলি কোনমতেই এগিয়ে আসবে না কারণ এই এগিয়ে আসার অর্থ হল শ্লথ অর্থনৈতিক উন্নয়ন। রাষ্ট্রসংঘের ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন্ ক্লাইমেটিক রেঞ্জ-এ এবং কনভেনশন অন্ বায়োলজিক্যাল ডাইভারসিটিতে বিশেষ করে একথাই গুরুত্বের সঙ্গে বলা হয়েছে যে উন্নয়নশীল দেশগুলির সামনে অগ্রাধিকারের বিষয়গুলি হল সামাজিক উন্নয়ন এবং দারিদ্র্য দূরীকরণ। তাই একথা সহজেই বোঝা যায় যে বিশ্বের পরিবেশগত সমস্যার মোকাবিলা করতে হলে ধনীদেশ থেকে দরিদ্র দেশগুলিতে সম্পদ বণ্টন করে দিতে হবে।

শিল্পোন্নত দেশগুলি বিশ্বের পরিবেশগত সমস্যা সৃষ্টির জন্য বেশীভাবে দায়ী এবং সেই কারণেই এই সমস্যা মোকাবিলার জন্য ব্যয়ভারের সিংহভাগ এই দেশগুলিরই বহন করা উচিত ; সমস্যাগুলির দীর্ঘকালীন কোন সমাধান রূপায়িত করতে গেলে উন্নয়নশীল দেশগুলিরও একটি ভূমিকা থাকবে। এক্ষেত্রে বিশ্বের সাধারণ সমস্যার সুরাহা করতে উন্নয়নশীল দেশগুলির উপরেও কিছু দায়িত্ব এসে পড়বে। এ কথা উন্নয়নশীল দেশগুলি মেনেও নিয়েছে। 'গ্লোবাল কমন্স্' (Global Commons)–এর কিছু ক্ষতি উন্নয়নশীল দেশগুলিও করেছে। এই দেশগুলিতে বৃষ্টিবহুল বনাঞ্চল এবং প্রবাল প্রাচীরগুলি দ্রুত ধ্বংসের পথে যাচ্ছে। অতিরিক্ত নগরায়ন, শিল্পায়ন এবং পৃথিবীজুড়ে যানবাহনের সংখ্যা বৃদ্ধি বায়ুমণ্ডলে গ্রীনহাউস গ্যাসের পরিমাণ বৃদ্ধি করে। উন্নয়নশীল দেশগুলির নিয়ন্ত্রণাধীন সমুদ্রগুলিতেও অতিরিক্ত মাছ ধরা হয়। তাই গ্লোবাল কমন্স-এর দায়ভার উন্নত এবং উন্নয়নশীল—এই দুই ধরনের দেশেরই রয়েছে এবং এই ব্যবস্থার মোকাবিলায় সহযোগিতামূলক পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য দুই পক্ষেরই সমান উৎসাহ রয়েছে। এই সহযোগিতামূলক মনোভাবের প্রকাশ পাওয়া যায় বহুজাতিক কাঠামোর মাধ্যমে বিশ্বের পরিবেশের সমস্যাগুলি সমাধান করার যে প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে তার মধ্য দিয়ে। 1972 সালে মানবিক পরিবেশের বিষয়ে স্টকহোম সম্মেলনের পরে বিভিন্ন দেশের সরকার বহু নিয়ন্ত্রণার্থক পরিবেশগত চুক্তি স্বাক্ষরিত করেছে। এই সব চুক্তির সংখ্যা 130 ছাড়িয়ে গেছে। এই চুক্তিগুলিই বহু নির্দিষ্ট যথাযথ উন্নয়নের পথ দেখিয়েছে।

Glossary

of

Common Environment-Related Terms

Terms selected from the text of an environmental dictionary prepared by the Editor

GLOSSARY

A

ABIOTIC : A situation or phenomenon that is characterized by the absence of living organism.

ACCLIMATIZATION : The process by which an organism is able to adapt to a new condition as imposed by edaphic (relating to soil), climatic and other environmental factors.

ACID RAIN : Rain water containing a level of acidity higher than normal, usually weak acidity is due to dissolution of carbon dioxide in rain water. The relatively high acidity of rain water is due primarily to the presence of oxides of sulphur and nitrogen (produced during burning of fossil fuels in automobiles and industrial set ups) in the air and their dissolution in the falling rain drops (generally forming sulphuric and nitric acids); usually acid rains occur far away from the places of origin of the gases as the gases are carried in the wind-drift to quite distant places.

ADAPTATION: The act of adjustment by an organism to environmental conditions through modifications of organs if necessary.

AEROBIOSIS : Life in the presence of air (oxygen) in contrast to anaerobiosis where life thrives in the absence of oxygen.

AEROSOL : Fine liquid, solid or gas particulates that remain suspended in the atmosphere for varying periods; small containers of liquid with a propellant under pressure for spraying of pesticides, cosmetics, etc.

AFFORESTATION : Establishment of a forest cover on land; planting trees on land that was previously used for other purposes or raising a new forest after felling and clearing of an old forest.

AGENDA 21 : Document outlining the extent of global environmental problems and measures to control the same prepared and agreed upon at the UN Conference on Environment and Development (UNCED) Summit at Rio de Janeiro, Brazil in June 1992.

AGENT ORANGE : The code name for the herbicidal preparation used by the U.S. Army in the Veitnam War for clearing jungles to locate guerrillas and for destroying food crops to starve the people containing nearly equal parts of 2, 4-D (2, 4-dichlorophenoxyacetic acid) and 2,4,5-T (2,4,5-trichlorophenoxyacetic acid) with traces of extremely toxic TCDD (2, 3, 5, 7-tetrachlorodibenzo-p-dioxin) as contaminant of 2, 4, 5-T.

AGROCHEMICALS (Syn : AGRICHEMICALS) : Chemicals used in agriculture including fertilizers, pre- and post-emergence herbicides, fungicides, insecticides, nematocides, hormonal chemicals etc.

AIR : The invisible layer of odourless and tasteless mixutre of gases which surrounds the earth all throughout as a most essential cover, primarily restricted to 20 km above the sea level, and that has been responsible for the sustenance and evolution of most forms of life. The air is primarily composed of nitrogen (78%) and oxygen (21%) but other gases such as carbon dioxide (0.035%), water vapour (variable 0-4%), ozone (0.00006%) all have very important specific constitutional and regulatory roles; without air the earth would have been a barren land.

AIRBORNE POLLUTANTS : Pollution-causing substances carried away by air from the source to other places, eg. smoke from tall chimneys of factories, gaseous pollutants, fly ash, dust, fine fibres etc. are carried to other places depending on the direction of wind.

AIR POLLUTION : Any man-made or natural change in the normal composition of air, changing the concentration of one or more relative to the other gases (such as increased carbon dioxide concentration with associated long term effect on global warming or adding newer ones (such as emission of oxides of sulphur and nitrogen — the precursors of acid rain, release of health damaging foul gases, production and release of ozone-depleting chlorofluorocarbons thereby allowing greater penetration of harmful uv-rays), or through release of fine suspended particulate matters (such as generation of excessive quantities of fly ash, fine silica particles, minute textile and asbestos fibres that precipitate serious

respiratory diseases) through various industrial and allied activities — all with adverse short-and long-term effects on the ecosystem and biosphere.

ALBEDO : Earth's reflectivity; ability of a source to reflect light (reflective power); as such, albedo is high for light shiny surfaces and is measured by the proportion of incident light that is reflected by a surface or a body (such as the moon or cloud); expressed in percent values, albedo of land surfaces would generally range from 15 to 30%, oceans 10-20% and snow 70-90%.

ALTERNATIVE ENERGY : Usually nonconventional energy sources such as solar, wind, geothermal, tidal etc. are termed as alternative sources.

ANAEROBIOSIS : Life in the absence of oxygen; anaerobic respiration such as alcoholic fermentation.

ANOPHELES (a MOSQUITO) : Malarial parasite-carrying mosquito; the female *Anopheles* mosquito is responsible for malaria disease caused through transmission (during bite and blood sucking) of the sporozoan parasite of the genus *Plasmodium* into the red blood cells.

ANTARCTICA : The continental landmass measuring 13.8 million sq km around the South Pole usually delineated by the antarctic circle — a small circle of the earth parallel to the equator approximately 23°27′ from the South Pole, it is the world's fifth largest continent nearly 98 percent of which is covered by snow and ice upto an average depth of 2 km.

ANTHRACITE : A superior type of hard coal with a high carbon content and a shiny appearance, and which burns giving little smoke.

ANTHRACOSIS : A disease of the lungs caused by inhalation of coal dust produced during mining, coal crushing and processing.

ANTHROPOCENTRIC : Regarding man as the most significant entity in the universe, the anthropocentric views would consider components of the natural world to be valuable only as the means to some human end.

ANTHROPOGENIC ACTIVITY : Action relating to or involving the impact of man on nature, anthropogenic changes in the natural world may be good or bad — afforestation of denuded areas, preservation of wetlands, preservation of biodiveristy and especially saving endangered flora and fauna, recycling of wastes are some positive anthropogenic activities while emission of pollutants, acid rain, global warming, unregulated deforestation, oil spills, excessive consumerism, population explosion are some of the darker areas of anthropogenic changes that have far-reaching effects on the life-support systems of the earth.

ANTICAKING ADDITIVE : A substance added to food to prevent it from becoming solid.

ANTIKNOCK ADDITIVE : A substance added to a fuel to prevent knocking in an internal combustion engine, eg. tetraethyl lead (or tetramethyl lead) added to petrol.

AQUACULTURE : Rearing in water of aquatic plants, fish and shellfish for food either in special structures or special ponds, or employing specific devices in certain parts of lakes or seas; also known as aquafarming.

AQUIFER : Water-bearing stratum of porous rock, gravel, sand or soil; water accumulates in the layer and passes into wells and other structures built for collection of underground water.

ARSENIC POLLUTION : Arsenic is a highly poisonous metalloid (four times more poisonous than mercury) and arsenic compounds have been routinely used as poison baits especially for rodents. Recently, arsenic pollution of water in many districts of West Bengal (even greater areas in adjoining Bangladesh) due to release of mineral-bound arsenic in the ground water (especially in tubewell lift areas) has become a matter of serious concern. Prolonged use of ground water containing over 0.05 mg arsenic per litre of water for drinking may give rise to arsenicosis (which has been reported from many countries) with symptoms such as melanosis and keratonosis of skin, gastroenteritis followed by liver and kidney disorders and even cancer of skin, bladder, lungs etc. Precautionary steps are therefore essential to avert a major public health crisis.

ASBESTOSIS : A disease of the lungs and respiratory tract (pneumoconiosis) caused by inhalation of fine asbestos particles; asbestos dust can cause some forms of lung cancer, blue asbestos (one form of asbestos) is banned in some countries because of high toxicity.

AUDIOMETER : Instrument used to measure the sharpness of hearing; audiogram is the graph drawn by an audiometer.

AUTOTROPH (Syn : AUTOTROPHIC ORGANISM) : An organism that needs a source of carbon usually carbon dioxide (also often carbonates or biocarbonates) for synthesis of its food (usually carbohydrates) and simple inorganic nitrogen for proteins etc., and do not require exogenous supply of organic food or nutrients for sustenance as exemplified by chlorophyllous green plants which use the energy of sunlight in photosynthesis for carbon-carbon bond formation; chemautotrophic bacteria get the necessary energy from the oxidation of inorganic substances such as sulphur, iron, ammonium nitrate etc. for bonding of carbon atoms in a process known as chemosynthesis.

AZOTOBACTER (AZOBACTER) : Rod shaped or spherical soil bacteria belonging to the genus *Azotobacter* that are capable of fixing free nitrogen of the air into nitrogenous compounds.

B

BHC : 1, 2, 3, 4, 5, 6-Hexachloro cyclobenzene, incorrectly but commonly and popularly known as benzene hexachloride, (lindane, gammexane) — an organochlorine insecticide, (and parasiticide for ectoparasites) — human toxicity and poisoning may occur by ingestion, inhalation or percutaneous (through skin) absorption.

BHOPAL GAS TRAGEDY : The world's most tragic industrial disaster took place in the midnight of December 3, 1984 when 36 tons of highly toxic methyl isocyanate (MIC) gas (used in the production of the insecticide sevin) leaked out of the storage tanks of the factory of the multinational company, Union Carbide, at Bhopal killing as per official records 2300 persons (unofficially over 10,000) and injuring to various degrees nearly half a million people. Lack of foresight, negligence on the part of the management and failure to take adequate precautionary steps were the major reasons of this man-made tragedy.

BIOACCUMULATION : The progressive accumulation over time of toxic components of pesticides and other chemicals and metals through the food chain; also known as biomagnification.

BIODEGRADATION : Breakdown of substances by bacterial activity; nonbiodegradable substances are environmentally less friendly.

BIODIVERSITY : The wide range and richness of the living world as manifested by the vast generic and specific distribution of flora and fauna giving rise to the large qualitative and quantitative differences in the living organisms.

BIOGAS : Usually methane (CH_4) gas (commonly mixed with carbon dioxide) produced through fermentation of farm wastes particularly excreta of farm animals; eg. gobar gas from cowdung.

BIOLOGICAL OXYGEN DEMAND (BOD) : A measure of requirement of oxygen for microbial degradation of organic matter present in water and is expressed as milligram of oxygen consumed for the biological degradation of organic matter present in one litre of water.

BIOMAGNIFICATION : Progressive increase in concentration of certain substances in the body over a long period because of passage through the food chain.

BIOME : Geographically large ecological region characterized by broad similarity in vegetation and climate, the principal biomes of the world are the tundra, temperate coniferous forest, temperate deciduous forest, tropical rain forest, temperate grassland, tropical savanna and desert. A particular biome may often be present in different continents of the world but those regions do have a broad similarity in climate, topography and soils which is reflected on the vegetation in particular and other organisms in general.

BIOSPHERE : All the parts of the earth's lithosphere, hydrosphere, atmosphere that (the parts) taken as a whole, accommodates the living organisms.

BIOTIC PYRAMID : A graphical representation of producer-consumer involvement in the food chain, with the primary producer at the base of the pyramid and the topmost predator at the top, living on lower level carnivores or herbivores — the latter (the herbivores) occupying the position just above the primary producer (green plants).

BOVINE SPONGIFORM ENCEPHALOPATHY (BSE) (Syn : MAD COW DISEASE) : A fatal virus disease of cattle reported from U.K., that affects the central nervous system and spreads to man through consumption of contaminated beef.

BUILT-UP AREA : An area full of houses, shops, offices etc. specially built for urban or semiurban living and related purposes.

BYSSINOSIS (Syn : PNEUMOCONIOSIS) : A kind of lung disease (pneumoconiosis) caused by inhaling cotton dust in cotton textile industry.

C

CANCER : A malignant tumerous growth beyond the usual control mechanism of the body and spread by metastasis via blood stream or lymph system.

CARBON MONOXIDE (CO) : A colourless and odourless gas produced in incomplete oxidation of carbon and highly toxic to the living system.

CARCINOGEN : A substance or an agent that may produce cancer or incite cancerous growth.

CARCINOMA : A malignant tumor of epithelial tissue (membranous cellular tissue covering a free surface).

CARNIVORE : (Syn : CARNIVOROUS ANIMAL) : A flesh-eating animal.

CARRYING CAPACITY : The maximum number of a species that can be accommodated in a given area, usually calculated as the number of individuals of a species per square kilometre. For man also, the term carrying capacity refers to the maximum number of persons that can be sustained per sq km of area.

CELL : The basic unit of life composed of membrane-bound protoplasmic structure that contains the all-important nucleus (the controlling authority of the cell) in a bed of cytoplasm which with the help of a range of bioorganelles and molecules carry out the life-functions under the overall supervision of the nucleus. The nucleus is generally the seat of chromosomes in which the genes — the units of heredity, chemically identified as deoxyribonucleic acids (DNA molecules), are located. Unicellular microorganisms (bacteria, protozoa, certain algae and fungi) consist of a single cell but multicellular organisms may contain millions or even billions of cells.

CHAIN REACTION : A series of reactions occurring in such a way that each reaction initiates the succeeding one; in nuclear chain reaction, each reaction may yield energy or products that initiate further similar reactions so as to become self-sustaining.

CHEMICAL OXYGEN DEMAND (COD) : A measure of the concentration of nonbiodegradable substances dissolved in water, expressed as milligram of oxygen consumed for chemical oxidation of the nonbiodegradable substances present in one litre of water.

CHEMICAL RESIDUE : The waste products left after the completion of a chemical industrial process; a chemical residue left in a plant, animal or product after application of a pesticidal chemical substance.

CHEMICAL WARFARE/CHEMICAL WEAPON : A war in which toxic poisonous chemicals are used as weapons of destruction such as mustard gas, a highly irritating blister-causing oily liquid $[(CH_2CHCl)_2S]$, nerve-gas, or herbicides like Agent Orange used by the American forces in the Vietnam War to destroy forest and field crops (TCDD, one of the deadliest poisonous chemicals known to man had been present as a contaminant in Agent Orange).

CHERNOBYL : A place in Ukraine in the erstwhile USSR where a devastating accident in the nuclear power station in April 1986 scattered nuclear debris over a wide area covering the east European countries and part of Scandinavia.

CHIPKO ANDOLAN (TREE-HUGGING MOVEMENT) : An extraordinary environmental movement initiated in the early 1970s to prevent large scale ecologically damaging deforestation in the Himalayan foot hills of Tehri-Garhwal in UP. Village women were organized into unique resistance groups who literally held the trees in embrace (2-3 women per tree) for days and nights preventing commercial loggers to fell them. Nothing could dislodge these determined

women and despite all efforts the local administration failed to implement logging for which permits were issued to contractors. Ultimately, the provincial as well as the government at the centre had to announce a stoppage of tree felling in Tehri-Garhwal.

CHLOROFLUOROCARBONS (CFCs) : Gaseous compounds made up of carbon, fluorine and chlorine widely used as refrigerant of refrigerators and air coolers, in production of plastic foams, propellant for aerosol cans and cleansing agent of circuit boards of computers; CFCs are held responsible for stratospheric ozone depletion.

CHLOROPHYLL : The green photosynthetic pigment of plants found in chloroplasts; usually present in two forms — chlorophyll 'a' and chlorophyll 'b' with the formula $C_{55}H_{72}MgN_4O_5$ and $C_{55}H_{70}MgN_4O_6$ respectively.

CHROMOSOME : Thread-like nucleoprotein structures in the nucleus of cells that take up basic dyes and become darkly stained; genes (DNA macromolecules) are located on the chromosomes usually arranged in a linear fashion. Chromosome number in a species is usually fixed and retained over generations.

CHRONIC EVENT : An event marked by a long duration or frequent recurrence; especially used for long-lasting or recurring disease.

CLOUD : Visible mass of water vapour or fine ice particles that remain suspended or float high in the air with the potential to condense and precipitate in the form of heavy to light or no rains depending on its kind and prevailing atmospheric conditions; clouds are of a number of types such as cirrus, cirrostratus, cirrocumulus, altostratus, altocumulus, stratocumulus, nimbostratus, cumulus, cumulonimbus and stratus.

COAL : Solid black carbon-rich substance originating millions of years ago from decaying plants which initially formed peat and then under pressure from subsequent deposits were converted to various grades of coal of varying hardness and quality; anthracite is the hardest and best followed in order by bituminous coal and lignite; the same is true for quality and fuel efficiency.

COGENERATION : Production or generation of two or more things at a time such as heat and power generation in a combined heat and power installation.

COLIFORM BACTERIA : Bacteria that resemble the colon bacillus, similar in shape to *Escherichia coli*.

CONGENITAL DEFECT : A defect which existed before birth; genetic defects are all congenital defects.

CONVENTIONAL ENERGY/FUEL SOURCES : Usually traditional energy sources such as coal, wood, petroleum, natural gas etc; solar, tidal, wind power etc. are nonconventional sources of energy.

COST-BENEFIT ANALYSIS : An analysis, in economic terms, of the advantages and disadvantages of a course of action; the total economic and social returns against the expenditure.

CYCLONE : A kind of tropical strom in which the wind rotates around a centre of low atmospheric pressure anticlockwise in the Northern Hemisphere and clockwise in the Southern Hemisphere with wind speed reaching 100 km per hour or more; in anticyclone the wind circulates round an area of high pressure clockwise in the Northern Hemisphere and anticlockwise in the Southern Hemisphere.

D

DECIBEL : One tenth of a "bel" — the unit of sound intensity, abbreviated as dB. Mathematically, $dB = 10 \log_{10} I/I_0$, where I is the intensity of any sound and I_0 is the intensity of a reference sound of the same frequency just audible to the average human ear. The audibility of human ear ordinarily ranges from 0 to 130 dB with the faintest perceptible sound taken as one decibel (1dB).

DDT : Dichloro-diphenyl-trichloroethane, a very potent organochlorine insecticide but a major disadvantage is large bioaccumulation and magnification through food-chain. Presently not recommended (banned in the USA since 1973) because of persistence and bioaccumulation (gradual build up in the food via insect → small predatory animal → big-

ger predatory animal) leading to the detection of DDT or its stable breakdown products DDD or DDE. Further, many insects have acquired resistance against DDT.

DEEP ECOLOGY : An ecological thinking of extreme form in which no particular importance is given to man, and man is considered just as one of the many species living on earth and whose growing number is considered ecologically disastrous.

DEFOLIANT : A chemical herbicidal substance used for removal of leaves of standing plants; Agent Orange, a mixture of two herbicides 2, 4-D and 2, 4, 5-T, was extensively used as a defoliant by the US Army in the Vietnam War to clear jungles.

DEFORESTATION : Clearing of forests, cutting down (clear felling) of standing trees.

DEMOGRAPHY : A branch of human geography that deals with various aspects of human population.

DESERTIFICATION : The process by which a tract of land turns arid and then becomes a desert due to a change in climate or through deforestation, excessive grazing, soil erosion etc.

DEW : Moisture of humid air that condenses at night on surfaces of cool bodies in the form of small droplets.

DIOXIN : A highly poisonous chemical, 2, 3, 7, 8-tetra chlorodibenzo-p-dioxin produced in very small quantities as a by-product during the manufacture of 2, 4, 5-T, a herbicide and in a number of other chemical industries.

DISSOLVED OXYGEN (DO) : Molecules of oxygen that are dissolved in water, support respiration of aquatic organisms.

DOM (DIGESTIBLE ORGANIC MATTER) : The portion of organic matter that can be digested and broken down.

DOMINANT SPECIES : A species of plant or animal that would have the most significant influence on the composition, number and distribution of other species of flora and fauna.

E

EARTH : It is a planet of the sun (a star of the Milky Way galaxy of the universe) and third in order of distance from the sun and revolves round the sun in nearly circular orbit, with its natural satellite the moon, in approximately 365 days. The medium-sized sun-nourished planet, having a mass of 5.98×10^{24} kg and an equatorial radius of 6387 km, has provided through the geological ages a congenial environment for origin and evolution of life and natural ecosystems favouring a rich diversity of species, capable of sustenance through mutual interactions, unless disturbed by natural geoclimatological or anthropogenic events.

EARTHQUAKE : The shaking and trembling of the earth due to movement inside the lithosphere that could be tectonic or volcanic in origin. The intensity of the earthquake is measured in the Richter scale (after Charles Richter) with values ranging from 0 to 10 (logarithmic scale), scale values above 5 would cause damage; the values taper off with increasing distance from the epicentre (the surface of the earth above the focus of the quake).

EARTH SUMMIT : The high level intergovernmental meeting on environment of the earth held in Rio de Janeiro, Brazil in June 1992, namely "United Nations Conference on Environment and Development" abbreviated as UNCED but popularly known as Earth Summit. The points of broad agreement reached at the meeting have been circulated as the Rio Declaration.

ECOLOGICAL BALANCE : A more or less stable state in which the numbers of different organisms in a natural habitat have reached a steady level and remain nearly the same over time.

ECOLOGICAL NICHE : A habitat in an ecosystem that supplies all the requirements and factors for the existence and survival of an organism or a species.

ECOLOGICAL PYRAMID : A graphic representation of the structure of an ecosystem in which the producers (plants, many in number, large biomass) are at the base, the plant eaters (herbivores) are at the middle and the carnivores (fewer

in number, smaller total biomass) are at the top. The ecological pyramid is synonymous with biological pyramid and could be based on numbers of organisms, total biomass of the groups of organisms or on the energy at each level.

ECOLOGICAL SUCCESSION : Stages or steps in a community leading to the climax — the stable state.

ECOMOVEMENT : Organized movements by environmentalists and people concerned with environmental degradation to protect the environment from further deterioration and to take steps for restoration and conservation.

ECOSYSTEM : A complex mutually interacting assemblage of a group of coexisting organisms that interact with the environment forming a functioning whole in nature, the size of such a system may vary from a very small one to a vast geographical area.

EFFLUENT : Something that flows out; in pollution control, the term usually refers to liquid household and industrial wastes (often applied to gaseous pollutants as well).

El NINO : A climatic phenomenon occurring every few years (usually two to five years) in the Pacific Ocean where a mass of warm water moves along the Pacific Coast of South America rising and moving with high tides and rains. El Nino is believed to influence climatic and rainfall patterns all around the Pacific basin with high rainfalls in the Pacific Coast of South America and South India but making Australia and North India drier. El Nino brings about complex interactions of ocean currents and atmosphere with resultant meteorological anomalies such as shifting precipitation belts, unusually high rainfall or stormy weather or poor rainfall and drought etc.

ENVIRONMENT : The term literally means "something that environs" (encircles, surrounds or covers up); as such, it includes the overall effect of the surroundings on an organism, groups of organisms or an ecological community implicating thereby highly complex interactions of climatic, edaphic and biotic factors on the liveliness, sustenance and finally survival of the organism and other members of the community.

ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT (EIA) : A comprehensive and critical assessment and evaluation of the short and long term consequences of a big construction programme or a development project on the environment on the basis of evidences and experiences as available locally and globally for similar activities.

ENVIRONMENT-FRIENDLY (ECOFRIENDLY) : Any activity or activities and actions which do not harm the environment; any thing that helps protecting the environment.

ETHICS : Principles (code) of conduct based on moral values for individuals and groups especially professionals as to what is good and what is bad, and what should be done and what should not be, keeping in view, the interest of mankind and biosphere as a whole.

EVAPOTRANSPIRATION : The loss of water from soil by evaporation as well as transpiration by plants growing on the soil or waterbodies.

EXTERNALITIES : The other soical costs besides the actual cost of the product, eg. the social cost of polluting industry harming public health.

F

FAUNA : The animals and animal-life of a region.

FISSILE : Fissionable, all radioactive isotopes are fissile materials; usually radionucleides that are splitted in nuclear reactors to produce energy.

FLORA : Groups of plants growing naturally in a region.

FLY ASH : Fine particles of noncombustible fraction of a solid burning fuel like coal carried away by air draft and spread over a large region; fly ash may be collected and used for brick making and other purposes.

FOOD CHAIN : The series of organisms involved in the passage of energy of food from the primary producer (plant) to the series of consumers through herbivorous animals to different levels of carnivores.

FOREST : Large land area with a natural assembly of trees and shrubs (or trees planted by man) and animals with trees as the dominant members of the community.

FOSSIL : The remains, traces, impressions of an organism, large or small, of past geological ages in the earth's crust in petrified form.

G

GAIA HYPOTHESIS : The Gaia hypothesis (developed by British biochemist James Lovelock) considers the whole biosphere as a single functional unit where all the flora, fauna, all biotic and abiotic factors act as a functioning whole in the development of a lasting environment that would preserve itself irrespective of anthropogenic activities and interferences.

GAMMA RADIATION : High energy radiation emitted by certain radioactive compounds (radionucleides), rays are shorter in wavelength than X-rays but longer than cosmic rays.

GANGA ACTION PLAN : A master plan to control the large scale pollution of the most important river of the country (mother Ganga as people call it) by domestic, municipal and industrial wastes and effluents taken up in the early nineteen eighties that envisaged, besides physical cleaning up of certain areas, compulsory treatment of raw sewage and industrial effluents before discharging to the river, periodic monitoring of water quality and various other steps. Although a good beginning has been made much more need to be done on a continuously operating basis to protect the river from abuse and exploitation.

GAS POISONING : Poisoning effect or toxicity due to inhalation of toxic gases such as carbon monoxide and oxides of sulphur, nitrogen etc. The Bhopal gas tragedy was due to methyl isocyanate (MIC) poisoning.

GASIFICATION : The process of converting coal into gas in a gasifier for use in gas-fuelled power stations.

GASOHOL : A mixture of petrol and alcohol (ethyl alcohol, also methyl alcohol) for use as a fuel in internal combustion engines. Ethyl alcohol is usually obtained from fermentation of sugarcane or sugarbeet molasses.

GASTROENTERITIS : A bacterial (also viral) disease of the stomach and intestine accompanied by pain and inflammation of lining of stomach and intestines, diarrhoea often with blood in stool.

GENE : Appropriate unit of DNA (deoxyribonucleic acid) on a chromosome which governs the synthesis of a specific enzyme that is characteristic of the organism concerned.

GENERALIST : Organisms (a species or genus) that are capable of living in widely differing environments.

GEOTHERMAL ENERGY : The energy (heat) coming out of the very hot interior of the earth; eg. hot springs; harnessing geothermal energy for commercial use would save fossil fuels.

GLOBAL WARMING : The slow gradual rise in the temperature of the earth due to emission of excess quantities of a number of radiation-trapping gases [such as carbon dioxide, methane, chlorofluorocarbons, ozone (tropospheric), nitrogen oxides], collectively called "green house gases" (as they prevent radiating back of heat rays as in a glass house for growing green plants — also called a green house).

GREEN CONSUMERISM : A popular movement which encourages people to buy and go for environment-friendly (ecofriendly) items for food as well as other consumer goods.

GREEN ENERGY : Power generated from non-conventional sources of energy — solar, tidal, wind etc. that do not cause pollution or produce wastes.

GREEN POLITICS : Ecofriendly political thoughts and proposals advocated by environmentalists.

GREEN HOUSE EFFECT : A rise in temperature of the atmosphere due to rise in the levels of certain gases (carbon dioxide, methane, chlorofluorocarbons, water vapour etc.) that prevent heat loss in a manner similar to the trapping of heat in a glass-covered 'green house' (used commercially in the temperate countries for raising vegetables and flowers during cold winter months).

GROWTH RINGS : Annual rings, layers of wood produced annually as seen in cross sections of the stem, attributable to seasonal variations in the rate of deposition of building materials and their composition and degree of compaction.

H

HALOPHYTE : A plant which is adapted to saline conditions (also shows some drought tolerant xerophytic characters).

HAY FEVER : An allergic reaction of the body of susceptible people to pollens, spores or dust particles floating in the air, fever accompanied by nasal catarrh, conjunctivitis, skin rashes etc.

HEALTH : The condition in which the body is sound and mind is free.

HERBICIDE : A substance that kills a plant on contact (contact herbicide, eg. dinitrophenol, diquat) or systemically through absorption by plant (systemic herbicide, eg. 2,4-D).

HEREDITY : The genetically desired traits and qualities obtained from parents and ancestors.

HOLISTIC APPROACH : Dealing with something in its totality rather than in parts or sections.

HOMEOSTASIS : A relatively stable state of equilibrium in organisms that resists major changes within an organism even when external conditions show large fluctuations.

HOT SPOT : A place showing higher background radiation than what is normal, very often indicating presence of radioactive materials.

HYDROGEN ION CONCENTRATION : Number of grams of hydrogen ions per litre of solution that gives a measure of acidity of the solution and is usually expressed as pH which is the negative logarithm of the hydrogen ion concentration ($pH = \log_{10}\frac{1}{[H^+]}$; pure water at ordianry temperatures dissociates slightly into H^+ and OH^- ions ($H_2O \rightleftharpoons H^+ + OH^-$) giving 10^{-7} gram molecules of each type of ion, the pH will be $\log_{10}\frac{1}{10^{-7}} = 7$ which represents neutrality on the pH scale, if acid is added the $[H^+]$ will increase and pH will decrease, if alkali is added pH will increase (pH below 7 indicates acidity, a pH in excess of 7 indicates alkalinity).

HYDROLOGICAL CYCLE : The cycle that incorporates the events starting from evaporation of water of the sea by solar radiation, formation of cloud, precipitation on land and sea, and final return to the sea.

HYDROPOWER (HYDROELECTRIC POWER, HYDEL POWER) : Electric power obtained by using water to drive the turbines.

HYDROPHYTE : A plant adapted to aquatic, marshy habitat.

HYDROSPHERE : All sources of water taken as a whole, namely water in the oceans and seas, in land (lakes, rivers, ponds etc.) and in the atmosphere.

HYPERPARASITE : A parasite on another parasite.

HYPERSENSITIVE : Very high sensitivity to certain conditions, for example atmospheric or food allergens.

HYPOTHALAMUS : A small part of the brain situated above the pituitary gland that controls the production of hormones concerned with the regulation of autonomic functions such as hunger, thirst, etc.

I

INCINERATION : The process of burning waste materials to ashes in a special furnace (or incinerator).

INDUSTRIAL DISEASE : Disease that may be attributed to an industrial process through release of fine particulate matters, toxic gases, chemicals and other pollutants.

INFESTATION : The spread of an insect pest or a parasite or pathogen in large number that may cause a lot of harm.

INSECTICIDE : A substance that kills an insect such as the organochlorine (eg. DDT) and organophosphorus (eg. malathion) compounds.

INTEGRATED PEST MANAGEMENT (IPM) : A holistic approach for control of agricultural pests incorporating appropriate cultural practices, biological control, if possible, along with minimal use of toxic chemical pesticides.

INTERNAL COMBUSTION ENGINE : The type of engine in which the fuel, a mixture of petrol and air is burnt in a closed combustion chamber for generation of the rquired energy for moving the pistons.

INTERTIDAL ZONE : The zone of shore lying in between the high and low tide marks (portion that is only periodically submerged).

IRRADIATION : Exposure to radiation in general but more specifically to ionizing radiation for sterilization of food at low doses and using X-rays for medical diagnosis, γ-rays for radiotherapy of cancer, or for producing point mutation in plants etc.

ITAI-ITAI DISEASE : A very painful (itai = pain) bone disease caused by cadmium poisoning first reported from Japan with 95% of the victims being post-menopausal women of over fifty years of age.

J

JET STREAM : Fast-moving air stream at the top layer of troposphere near the tropopause, of the mid latitude region, blowing generally in the form of narrow meandering current from a westerly direction and often exceeding a wind speed of 400 km per hour; also the flow (blast) of gases from a jet engine.

JUNGLE : Tangled mass of thick vegetation, usually tropical trees and shrubs of diverse nature, often difficult to penetrate.

JUVENILE : Young animal or plant that requires a relatively long period of development before maturity.

K

KALA-AZAR : A tropical disease caused by the parasitic protozoa *Leishmania* spread by flies (sand fly), the symptoms are fever, anemia, swelling of spleen, liver etc.

KNOCK : Noise caused in an internal combustion engine during the burning of a fuel-air mixture usually in the presence of insufficient petrol in the mix., tetraethyl (or tetramethyl) lead is used as an additive to petrol as an anti-knock measure, but recently sale of 'leaded' petrol is banned because of lead pollution through exhaust gases.

KWASHIORKOR : A malnutritional protein deficiency disease of the children of the third world countries, the common symptoms are enlarged abdomen but thinner limbs, anemia and general wasting of the body; diet (that is usually starch-rich), supplemented with proteins (vegetable and animal proteins) would bring speedy recovery.

L

LABEL : Written information given on a product marketed for the consumer that includes in case of a health related product, the nature of product, origin, date of preparation, date of expiry, price and all relevant facts the consumer is entitled to know.

LAKE BLOOM : Profuse growth of aquatic vegetation especially aquatic algae often due to organic sewage effluents, usually accompanied by a reduction in dissolved oxygen concentration in water.

LAND REFORM : A government policy of taking over surplus land usually from absentee landlords and granting the rightful ownership of the land to the actual tiller of the soil.

LAND SLIDE (LAND SLIP) : The rapid downward movement of a mass of earth or a block of rock or an artificial land fill made of waste materials and earth; landslide is common in hilly or mountaneous terrains during the rains espe-

cially when the trees and other vegetation have been cleared from the mountain slopes. The slope of the terrain particularly its degree of inclination, the extent of deforestation, the amount and nature of precipitation, seepage and flow of water are important factors in landslips.

LEISHMANIASIS : A disease caused by minute protozoons *(Leishmania sp.)* transmitted by the sand fly, eg. kala-azar.

LICHEN : A highly specialized form of complex thallophytic plants made up of symbiotic association of a photosynthetic alga and a saprophytic fungus on a solid surface such as a rock or on the trunk of a tree, sensitive to air pollution.

LIGNITE : A type of soft coal with a relatively high percentage of hydrocarbons.

LIMNOLOGY : The scientific study of physical, chemical and biological conditions of fresh water bodies of lakes, rivers etc.

LIQUIFIED PETROLEUM GAS (LPG) : Mostly propane, butane and their combination obtained by refining petroleum, cooled and bottled for domestic use.

LITHOSPHERE : The solid part of the earth consisting of native rocks, rocks at different stages of weathering, soils of differnet kinds etc.

LITHOTROPH : An organism that uses reduced inorganic compounds as electron donors (energy sources) for nutrition.

LOCAL AUTHORITY : An official body responsible to a higher body doing some of the administrative and welfare work of the locality eg. Panchayats.

LOW-WASTE TECHNOLOGY : Advanced technology that generates much less waste material without adversely affecting productivity.

M

MACRONUTRIENTS : Essential elements relatively large quantities of which are required for growth and development of organisms (requirements may differ for different organisms).

MAGNETO HYDRO DYNAMICS (MHD) : A method of generation of electricity (yet to be commercialized) in which the free electrons in a high velocity flame (or plasma) are subjected to a strong magnetic field, the flow of electrons in between the two electrodes within the flame under the influence of the strong magnetic field would constitute the current.

MALNUTRITION : Lack of proper nutrition, starvation or improper absorption of nutrients from the food; chronic malnutrition especially of the children is prevalent in some developing countries of the third world.

MAN : A human being — a bipedal mammalian primate related to the great apes but with greater development of the brain resulting in greater power of abstract reasoning and better articulated speech faculty. Man *(Homo sapiens)* is the sole non-extinct representative of the family, ***Hominidae*** and consists of a variable number of freely interbreeding races distributed across the globe. The future of the biosphere depends greatly on the nature of interaction between man and environment.

MANGROVE : A tropical maritime vegetation of shrubs and trees which are especially adapted to salt water swamps in the estuaries of big rivers in Asia and America with ***Rhizophora, Avicennia, Bruguiera*** and ***Ceriops*** as the dominant species of plants.

MATURATION LAGOON : A large pond into which the sewage is collected in the final stage of treatment.

MEGALOPOLIS : A very large urban unit. Often agglomeration of a number of adjacent small towns into a very big urban unit.

MELANOMA : Malignant tumor containing dark pigments believed to be caused by over exposure to sunlight.

METAMORPHIC ROCK : A rock, the formation of which was effected by pressure, heat or water in such a way that it has become more compact and crystalline.

METROPOLIS : A city or town that is a major centre of activity.

MICROECONOMICS : Economics dealing with small items such as, a single product, a small trade etc.

MINAMATA DISEASE : A mercury poisoning disease due to eating fish from mercury contaminated water of the Minamata bay of Japan (disease named after the place of first report i.e. Minamata).

MONOSODIUM GLUTAMATE (MSG) : A crystalline sodium salt of glutamic acid ($C_5H_8O_4NaN$) used for seasoning and flavouring food.

MONTREAL PROTOCOL [MONTREAL PROTOCOL ON SUBSTANCES THAT DEPLETE THE OZONE LAYER] : A successful agreement made under the auspices of the United Nations in 1987 to phase out production and release of substances that are responsible for the destruction of the protective ozone layer (the protection by ozone involves the blocking of the ultraviolet radiation emitted by the sun), particularly by the chlorofluorocarbons (CFCs) and also several other ozone-depleting chemicals. An amendment to the protocol was made in 1992 and signed by 93 nations including India and China agreeing to eliminate the use of CFCs, carbon tetrachloride and halogens by 2000 AD and methyl chloroform by 2005 AD.

MOON : The only known natural satellite of planet earth (with a mass of about one eightieth of the earth and mean distance of about 3.8×10^5 km from the earth) moving in an elliptical orbit round the earth in about 27.5 days (one complete moon cycle with four phases — full moon, new moon and two half-moons) shining in the sun's reflected light; the moon besides its aesthetic appeal and other unknown effects on the earth's abiotic and biotic systems directly influences through gravitational effect the tides in the oceans and waterbodies connected with the ocean.

MORBIDITY RATE : The number (rate) of incidence of a disease per thousand population.

MUTAGEN : An agent that is capable causing mutation (a hereditary genetic change) such as ionizing radiations, chemical mutagenic substances etc.

N

NATURE : The visible and perceived world with all its abiotic and biotic natural resources.

NATURE CONSERVATION : Maintenance of a favourable balance of nature with respect to the quantity and quality of the physical components of nature through prevention of over-exploitation of nonrenewable natural resources, effective trapping of renewable resources, preservation of biodiversity and judicious management practices to avoid undue conflict between economic development and environmental degradation.

NATURAL RESOURCES : Mineral deposits, water, air, plant and animal resources, in the lithosphere, hydrosphere, atmosphere and biosphere.

NATURAL SELECTION : An essential component of the evolutionary process : selection in nature of organisms with such heritable characters (with required genetic changes brought forward by mutation) that enable them to adjust to changed conditions imposed by nature, and elimination of those who cannot.

NEIGHBOURHOOD NOISE : The noise produced by a local source such as a factory or a very busy highway passing through the locality and any other sources of noise often characteristic of the particular locality.

NETWORK : An interconnected or interrelated system of communication (including wireless communication), channels, groups etc.

NGO [NON GOVERNMENTAL ORGANIZATION] : An organization that works outside the government either independently or in collaboration with other public or private institutions, charitable organizations, trusts and endowments on issues relating to various aspects of environment (or other activities) through a range of actions, often even direct nonviolent physical resistance to achieve the goal. Since the 1992 Earth Summit in Rio de Janeiro in which over 9000

delegates of the NGOs assembled, they have drawn considerable international attention in their moves to safeguard the environment. However, the recent mushrooming of NGOs has since brought up questions on credibility, authenticity of purpose and efficacy of many of them.

NICHE : A place of special habitat within an ecosystem that supplies the necessary factors for the existence of an organism or species.

NOISE : Sound usually of a high level that is noticeably unpleasant, disturbing and causes annoyance.

NOISE POLLUTION : The act of damaging the tranquility of the surroundings with high levels of unpleasant, disturbing and annoying sound.

NOMAD : A person who does not settle permanently in a particular place but keeps on moving, staying only in temporary shelters eg. herdsmen who graze cattle and sheep, nomadic hunters etc.

NONBIODEGRADABLE : Not decomposable by biological means, implying that the enzymes that break up complex synthetic substances are as yet nonexistent in nature.

NONDEGRADABLE : Not possible to degrade or decompose naturally by agents (physical, chemical or biological) present in the surroundings.

NONRENEWABLE RESOURCES : Usually an exhaustable natural resource which cannot be replaced, e.g. coal, petroleum etc.

NUCLEAR BOMB : An atomic bomb in which the explosive power is derived from nuclear fission or nuclear fusion.

NUCLEIC ACID : Polynucleotide such as deoxyribonucleic acid (DNA) or ribonucleic acid (RNA) — a nucleotide is composed of a nitrogenous base, a pentose sugar and phosphate — many such nucleotides combine to give rise to a polynucleotide (nucleic acid)

O

OASIS : A small green patch usually around a water hole in a desert area with an otherwise extremely arid landscape.

OCCUPATIONAL DISEASE : A disease the occurrence of which can be attributed to the occupation of the person, specifically to the microenvironment of the work place — floating dust particles, fibres, chemical fumes, high noise level etc.

OCEAN DUMPING : Discharging liquid and solid wastes (including radioactive wastes in sealed corrosion resistant leak-proof containers) into the ocean.

OCEAN THERMAL ENERGY CONVERSION (OTEC) : A potential source for generation of power (electricity) utilizing the large difference in the temperature of upper and lower layers of a tropical ocean water. The method is yet to become commercially viable.

ODOUR : Smell; the quality of a substance that stimulates or sensitizes the olfactory nerves; the term is usually used to mean unpleasant smell.

ODOUR NUISSANCE : Unpleasantness and annoyance due to bad smell may be from sewage, garbage dump, morgue, tannery, etc.

ORGANOCHLORINE COMPOUNDS : The group of chlorine containing synthetic organic compounds (chlorinated hydrocarbons) that are potent insecticides eg. aldrin, dieldrin, endrin, heptachlor, DDT, BHC (gammexane), etc.

ORGANOPHOSPHORUS COMPOUNDS : Phosphorus containing synthetic organic compounds used as insecticides, eg. malathion, parathion, diazinon, etc.

OZONE DEPLETING POTENTIAL (ODP) : The capacity of certain chemical substances such as chlorofluorocarbons (CFCs), oxides of nitrogen, chlorine, methane etc. to destroy (break up) ozone molecules in the stratospheric ozone layer.

OZONE HOLE : The creation of a very thin area or "hole" in the stratospheric ozone layer because of destruction of ozone molecules through reaction with chlorine molecules (especially from chlorofluorocarbons, CFCs), nitrogen oxides from fossil fuels in presence of water molecules, molecules of methane gas etc.

P

PAH [POLYCYCLIC AROMATIC HYDROCARBONS] : A group of chemicals with many industrial uses, but are toxic to man; naphthalene, anthracene, pyrene, benzo (a) pyrene with 2, 3, 4 and 5 rings respectively are some of the members of the group. PAHs are often products of incomplete oxidation of fossil fuels, garbage incineration process etc.

PAN [PEROXYACETYL NITRATE] : A substance present in low concentrations in photochemical smog.

PASTEURIZATION : Partial sterilization of a fluid such as milk at a temperature that destroys objectionable microorganisms without adversely affecting the physico-chemical properties or quality of the liquid.

PATENT : An official privilege or right that confers to an inventor of a new product or a scientific process the exclusive rights to make, use and sell the invention for commercial exploitation for a specific term of years.

PBB [POLYBROMINATED BIPHENYL] : Aromatic compounds containing benzene and bromine used in plastics and fire retardant materials, highly toxic fat soluble compounds, believed to be carcinogenic, very persistent.

PCB [POLYCHLORINATED BIPHENYL] : Similar to PBB except that bromine has been substituted by chlorine, fat soluble highly toxic chemicals that persist for a long time.

PEAT : Decayed and partly decomposed vegetation (mosses and other plants) that has become partially carbonized, quite often found in bogs and boggy soils.

PERSISTENT ORGANIC POLLUTANTS (POPs) : Compounds which are extremely resistant to natural degradation, persist unaltered with the possibility of bioaccumulation (accumulation in different organisms) and biomagnification (gradual increase in concentration within the body of organisms). The polycyclic aromatic compounds, particularly the organochlorine compounds such as polychlorinated biphenyls (PCBs) polybrominated biphenyls (PBBs), polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs), many of which are widely used in agriculture and industry are all of the persistent type and are therefore ecologically hazardous.

PHOSGENE : A colourless toxic gas (carbonyl chloride, $COCl_2$) of unpleasant smell, has been used as a war gas (chemical warfare). The lethal concentration for rats is only 50 ppm, with relatively high concentrations fatal pulmonary edema may occur in man.

PHOTOCHEMICAL POLLUTION : Polluting substances produced by photochemical reaction (light induced chemical reactions), eg. photochemical smog.

PHOTOSYNTHESIS : The process by which green chlorophyllous plants utilize the energy of sunlight for synthesis of food (usually carbohydrates, initially) from carbon dioxide and water and release oxygen (from the breakdown of water) as a byproduct.

PHOTOTROPHIC ORGANISM : Organisms (chlorophyllous green plants) that can synthesize their own food by photosynthesis (initially carbohydrates and subsequently converting carbohydrates to other vital metabolites such as proteins, fats etc.)

PHYTOPLANKTON : Minute aquatic plants that float or drift on water, especially abundant in sea water serving as food for small aquatic animals.

PLATE TECTONICS : A geologic theory suggesting the structure of earth as one lying on a series or rocky plates of huge dimensions floating on the liquid (molten) mantle, touching or meeting of adjacent plates would result in the shaking of earth's crust.

PNEUMOCONIOSIS : A chronic respiratory disease affecting the lungs caused by the habitual inhalation of mineral or metallic particles.

POIKILOTHERM : Cold-blooded animal with body temperature that changes with the outside temperature.

POLLUTER : A company or a person that is responsible for pollution of the environment, for example a paper mill, an asbestos factory; a person who throws any sort garbage in a public place etc.

POLLUTION : Naturally-occurring or man-made processes by which the usually favourable natural conditions for a healthy living is disturbed or disrupted; pollution of air, water and soil being areas of especial emphasis.

POLYCONDENSED PLASTIC : A kind of plastic not usually degraded and is therefore recycled.

POLYTHENE : Polyethylene — a tough thermoplastic chemically resistant flexible material produced by polymerization of ethylene (C_2H_4), used as a good electrical insulating material and various other purposes.

POPULATION CONTROL : Controlling increase in the number of people in a region or country by various means of contraception.

POTABLE WATER : Water safe and suitable for drinking.

PVC [POLYVINYL CHLORIDE] : A white thermoplastic material produced by polymerization of vinyl chloride ($CH_2 = CHCl$), which has good resistance to acids, alkalis and alcohols and has many industrial and commercial uses.

PRAIRIE : Plain grass-covered land in North America (also in Canada) especially the vast area of rolling land in the Mississipi valley with rich fertile soil.

PRECIPITATOR [ELECTROSTATIC] : A device for precipitating fine particulate matters — dust, ash etc. by passing them through a charged electrostatic field.

PRIMARY COLOUR : Basic colours in the spectrum, green, blue and red from which all other colours may be derived.

PRIMARY CONSUMER : An animal that eats plants — a herbivore (herbivorous animal).

PRIMARY PRODUCT : A product that serves as the basic raw material for other products for example milk, cotton, jute etc.

PRIMARY PRODUCTIVITY : The rate of production of organic matter by photosynthesis.

PRIMARY SUCCESSION : The initial ecological community on a bare surface.

PROTOPLASM : All the inclusions of the living cell consisting of the nucleus, the cytoplasm, plastids (in plant cells), mitochondria, ribosomes and other organelles, and proteins, organic substances, minerals in an aqueous medium.

PUTREFACTION : The decomposition of organic matter, specifically anaerobic breakdown of proteins by bacteria.

PYRAMID OF BIOMASS : Graphic figure showing the different amounts of biomass at each trophic level with the highest at the primary producer level at base and lowest in highest consumer level at the apex.

Q

QUADRAT : A small area of land measuring one square metre (1m x 1m) chosen as a sample for ecological population studies usually on small vegetation.

QUOTIENT : The number resulting from the division of one number by another; intelligence quotient — the ratio of test score (giving the mental age of a child) and the actual age and multiplying that by 100; respiratory quotient — ratio of carbon dioxide given off and oxygen taken up in respiration.

R

RAD : The unit of absorbed dose of ionizing radiation, one rad is equal to the energy absorption of 100 ergs per gram of irradiated material.

RADIATION HAZARD : The potential danger to health resulting from exposure to ionizing radiation from radioactive materials, X-rays etc. or inhalation or consumption of radioactive substances.

RAINFALL : The amount of rains that fall in an area over a period of time usually measured in centimetres or inches.

RAINFOREST : Thick tropical forest growing in an area with high rainfall usually over 250 cm.

RAW MATERIAL : Material used for manufacture of finished products for example iron ore for making steel, cotton lint as raw material for cloth etc.

RECYCLING : Processing of waste materials for reuse — metals, glass, paper, plastic etc. can be recycled and reused (recycling is an environment-friendly process and is officially encouraged).

RELATIVE HUMIDITY : The ratio between the amount of vapour in air and the amount that would be present if the air was fully saturated (expressed as percentage).

RESPIRATION : The enzyme catalyzed process of oxidative breakdown and release of energy of food substances (in which energy is stored in carbon-carbon chemical bonds) for energy requiring processes in biological systems, as accomplished in higher animals (a mammal like man) by continuous breathing (inhalation of oxygen containing air and exhalation of carbon dioxide-rich moist spent air).

RHIZOBIUM : Symbiotic nitrogen-fixing bacteria that reside in the root nodules of leguminous plants (peas, beans etc.) getting nutrition from the host and supplying biologically fixed nitrogenous compounds to the host (usually on death and decay).

RIBOSOME : A protoplasmic inclusion (a minute microscopic organ or organelle) containing ribonucleic acid (RNA) that is the seat of intracellular protein synthesis.

RIO DECLARATION : The directive principles of environmentally-sound developments contained in the 27-page document approved at the 1992 Earth Summit (held at Rio de Janeiro, Brazil) of the heads of the participating governments of different countries.

RUN-OFF WATER : The volume of water from rainfall or melted snow that has been carried away.

S

SAFE DOSE : Dose of medicine that is not harmful; dose of radiation that can be absorbed by the body without causing harm.

SALINITY : The degree or extent of saltiness of a solution of salt in water.

SALMONELLA : Rod-shaped aerobic usually motile bacteria of the genus *Salmonella* that are pathogenic in man and warm-blooded animals causing food poisoning, severe gastrointestinal disorder and also diseases of the genital tract.

SAPROPHYTE : An organism that lives on dead and decaying organic matter.

SAVANNAH : Tropical or subtropical grass land in Africa, South America, North America (Florida) etc. with scattered trees and drought resistant plants (in the tropics).

SCRUBBER : A device for removing inpurities and fine particulate matters especially from gases; cleaning waste gases by removing sulphur and other pollutants, etc.

SEA FARMING : Marine aquaculture for the production of edible sea weeds, shellfish etc.

SEDIMENTARY CYCLE : Rocks that are weathered to silty particles which may be turned to rocks again when such silty sediments are allowed to settle at the bottom of a lake or sea.

SEPTIC TANK : A tank in which household sewage, human excreta in particular, accumulate and undergoes anaerobic decomposition.

SEVESCO : Italian town where an industrial disaster occurred in 1976 — the escape of dioxin (TCDD — tetrachloro-dibenzo-p-dioxin) gas killed over eighty thousand fouls and half of the pigs in the town.

SEWAGE : Waste water, human excreta etc. flushed down the toilets and carried away by the sewers.

SEWAGE TREATMENT PLANT : An area with accessories and equipments for treatment and purification of liquid sewage for safe disposal to a river or sea.

SEX EDUCATION : Education on all aspects of sex, especially of the human. The evolution of sex has been a very big step forward in the origin of species and is rightly considered to be one fo the greatest events in biology . A clear understanding of the morpho-physiological and behavioural aspects of sex is now considered essential for our young people to remove any misconception about sex and also to develop the right attitude towards sex. Introduction of sex education at the late school or middle school stage is therefore strongly advocated by most progressively minded people including physicians, sociologists, social psychologists and educationists.

SHELLFISH : Aquatic invertebrate animal covered with a shell, especially edible mollusks and other crustaceans.

SHOCK WAVE : A compressional wave (wave due to a release of tremendous pressure) formed whenever the speed of a body relative to a medium exceeds that at which the medium can transmit sound, as may happen in case of atomic blasts.

SILENT VALLEY : The site for a proposed highly controversial hydroelectric project by building dams across river Kunthipuzha in the Palghat district of north Kerala, India that attracted national and international attention because its implementation would have destroyed an ecologically important primitive rainforest with rare flora and fauna. In view of the tremendous pressure mounted against the project by leading environmentalists and organizations like Kerala Shastra and Sahitya Parishad (KSSP) which played a key role in arousing public awareness and interest, the Silent Valley Hydel project was ultimately shelved.

SILICOSIS : A chronic disease of the lungs (pneumoconiosis) caused through inhalation of fine silica dust especially from stone crushing industries.

SLUM : Highly congested area usually within the city limits (often located centrally) with very poor living conditions in unplanned poorly constructed houses and hutments on very narrow lanes or passages with extreme lack of sanitary facilities inhabited by poor people who are mostly engaged in manual works as daily wage earners, domestic hands, hawkers etc.

SMOG : A relatively dark, smoky, fine dust- and soot-containing fog which under certain meteorological conditions such as temperature inversion (temperature lower at ground surface than in air above) tend to hang over the ground surface for a considerable period and results in poor visibility and serious respiratory problems; photochemical smog is attributed to the photochemical action of ultraviolet rays in sunlight on unburnt hydrocarbon and oxides of nitrogen in the exhaust fumes and smokes of cars and engines, producing smog with traces of toxic ozone gas (tropospheric).

SOFT WATER : Water that easily forms lather with soaps and does not contain salts of calcium, magnesium and often iron.

SOIL POLLUTION : The act of damaging the quality of soil by dumping of garbage, rubbish, municipal wastes containing toxic substances, industrial effluents containing hazardous chemicals, excessive and indiscriminate use of agricultural chemicals such as fertilizers, fungicides, insecticides, herbicides, etc. Soil may also be polluted by deposition of wind borne sand and silt, and in areas adjoining thermal power stations fly ash deposition damages crops and soils. Many pesticidal residues are often persistent and harmful to the beneficial soil microflora. The large scale use of the hormonal defoliant. Agent Orange by the American forces in the Vietnam War rendered the affected soil virtually unfit for cultivation for a considerable period. Contamination of soil by radioactive materials (nuclear wastes deposition through accidents or use of land as atomic test sites) may render the soil useless for productive purposes.

SOLAR CELL : A photoelectric device that converts the energy of sunlight to electricity.

SOLAR DRYER : A device for the utilization of sunlight for generating heat for drying.

SOLID WASTE : Waste matter that is relatively hard and cannot be put directly into the drain pipes.

SPILL : A liquid that has come out accidentally from the container as in oil spills from oil tankers in seas causing serious environmental hazards.

STORM : Atmospheric disturbance caused by gale-force winds accompanied most often by thunder and rains.

STRATOSPHERE : Upper atmosphere above the troposphere and below the mesosphere, approximately between 11 and 50 km depending on latitudes, seasons etc.

SULABH SANITARY MOVEMENT : A successful sanitation movement which is concerned with the generation of public awareness on sanitation and extension of clean toilet facilities in many urban cities of the country with nominal charges from the user thereby directly helping in keeping the local environment clean.

SUN : A star of the Milky Way galaxy of the universe and is the central figure of the solar system consisting of nine planets, including our planet earth and a belt of asteroids that revolve round the sun in nearly circular orbits in nearly the same plane. The sun having a mass of 2×10^{30} kg (i.e. 332900 times the mass of the earth) is about 150 million km away from the earth requiring 8.3 minute for sunlight to reach this planet. The sun is the ultimate source of energy (the tremendous energy of the sun originates from the thermonuclear fusion of hydrogen to helium) on earth and all forms of life on this planet owe their existence to the sun.

SUNDARBANS : Riverine delta region in the Ganga estuary on the Bay of Bengal built up of silt and mud deposits washed away and brought from the vast drainage basin of the river over ages. The area is characterized by a specialized unique vegetation and equally adapted fauna. The Sundarbans occupy an area of about 10,000 sq km of which more than half falls in Bangladesh (the estimated area in West Bengal is 4264 sq km) and is criss-crossed by tidal canals. As such, much of the coastal areas remain periodically submerged depending on the tides and the flora and fauna in this unique ecosystem, known as the mangrove ecosystem, adapt wonderfully to the daily periodic submergence and recession, the semisalinity or salinity of water (depending on the season and the extent of mixing of river water and salty sea water of the bay). The flora include highly specialized plants such as ***Rhizophora, Avicennia, Sonneratia, Nipa, Bruguiera*** etc., some with distinct xerophytic features (because salinity affects water uptake), stilt roots for stability on loose muddy substrate, breathing roots for taking air from oxygen- deficient wet mud, more so during submergence, and viviparous germination (germination of seed while still attached to the mother plant) so that the partly developed seedling can establish successfully in the hostile environment below. Various types of fish, some with amphibian habits, crustaceans with specialized features also thrive well. Deer, wild pigs, reptiles and crocodiles and a range of birds and insects (bees in particular) are typical animal members with the famous Royal Bengal tiger remaining as the top predator.

SUSTAINABILITY : The property of something or some action the advantage of which will not end abruptly but will continue to be of benefit to many succeeding generations eg. afforestation of denuded land (in fact, most ecofriendly actions would be sustainable).

SYNDROME : Signs and symptoms occurring together showing or suggesting the characteristics of a particular abnormality or disease.

T

TECHNOSPHERE : The world (sphere) of technology; artificial human-built so-called "sphere" of technology encompassing all conventional and on-going technologies including nuclear power technology and the more recent revolutionary electronics based information technology all of which have direct or indirect interactions with the environment.

TEMPORARY HARDNESS (OF WATER) : The hardness of water due to the presence of bicarbonates of calcium and magensium that can be cured by boiling which precipitates the bicarbonates as insoluble carbonates of calcium and magnesium.

TERTIARY INDUSTRY : Industry that is not involved in producing primary or basic goods and raw materials (primary industry) or manufacturing finished products (secondary industry) but engaged in giving services (such as banking insurance, transport etc.).

TETRAETHYL or TETRAMETHYL LEAD/LEAD TETRAETHYL : Antiknocking or antifouling agent added to petrol; because of lead pollution use of this additive has now been discontinued in many countries.

THERMAL POLLUTION : The adverse effect of a rise in atmospheric temperature due to release of heat such as from a power-plant cooling tower.

THIRD WORLD : A popular term for the developing countries of Asia, Africa and Latin America (the powerful capitalist countries form the First World, the disintegrated "Communist Block" countries constitute the Second World and the nonaligned less developed countries or developing countries (previously underdeveloped countries) form the so-called Third World.

THREE MILE ISLAND : The scene of an accident and near melt down of the reactor in 1979 in the nuclear power station in Pennsylvania, USA that brought forth world-wide concern over the safety of atomic power plants for generation of electricity.

THUNDERSTORM : Gale-force winds (often violent) with rains accompanied by thunder and lightning.

TIGER PROJECT : This successful wildlife conservation project was taken up with a generous financial grant by the World Wildlife Fund (WWF) in nine forest zones of the country (with a total of 27 tiger reserves in 1999) with the major focus on the Sunderbans to check the rapid decline in tiger population primarily due to illegal poaching. The tiger population in India which went down to approximately 1800 in 1965 rose to over 4000 in 1985.

TRANSBOUNDARY POLLUTION : A kind of pollution that crosses geographic boundaries, the gaseous pollutants of an industry in one country may pollute air of other countries.

TRICHLOROPHENOXYACETIC ACID : 2,4,5-Trichlorophenoxy acetic acid, a herbicide or weed killer, constituted about 50% of the Agent Orange (the other half 2,4-D) extensively used by the U.S. army in the Vietnam War.

TURBINE : Conventionally, a mechanical device for conversion of the energy of falling water into electricity; a motor the shaft of which is steadily rotated by the impact of a very strong current of steam, air, water or any other fluid directed upon the blades of a wheel.

TYPHOON : A tropical cyclone so named when occurring in the far east especially in the Philippines region and China Sea.

TYPHUS : A severe disease causing high fever, intense headache, dark red rash on the body caused by the microorganism *Rickettsia prowazekii*, that is transmitted by body lice.

U

ULTRAVIOLET RAYS (UV RAYS) : Rays having wave length shorter than the wavelengths of visible light but longer than X-rays (range of wavelength 5 to 400 nm.).

UNEP [UNITED NATIONS ENVIRONMENTAL PROGRAMME] : The United Nations have been deeply concerned with the ongoing environmental degradation and over the years took major initiatives to safeguard the environment of the world by arranging major conventions and formalizing international treaties such as the Antarctic Treaty, 1959; Montreal Protocol on Ozone-Depleting Substances, 1987, Biodiversity Convention, 1992, etc.

V

VEGAN : A strict vegetarian who eats food of vegetable origin avoiding milk, eggs etc.

VIRUS : Submicroscopic infection-causing agent, visible under the electron microscope, considered to be an object in between living and nonliving, consists of nucleic acids (DNA in DNA-viruses, RNA in RNA-viruses) coated with proteins and functional only within the body of the host where the virus takes over the metabolic machinery of the host cell and nultiplies itself in the same way as genes (nucleic acid) but the rate is much more rapid, the viruses are responsible for a large number of diseases of plants and animals.

W

WASTE DISPOSAL : The methods involved in dumping of wastes whenever necessary after ensuring that the matter is safe for disposal.

WASTE MANAGEMENT : All the procedural and managerial work involved in collection, treatment and disposal of wastes.

WASTE TREATMENT : Treatment of waste including separation, recycling and reuse of certain things and treatment of nonutilizable things for safe disposal.

WATER : The most common liquid on the earth, chemically a compound of hydrogen and oxygen (H_2O), water is inseparable from life.

WATER BALANCE : A situation where the gain and loss of water are equal.

WATER POLLUTION : Any man-made or natural act that adversely affects or changes the usual physico-chemical and biological characteristics of water. Pure water is a simple chemical compound of two hydrogen atoms bonded to an atom of oxygen, but natural water, except usually in rains and snows, almost always contains physical, chemical and biological inpurities, may be in traces. The common sources of pollution are sewage contamination (pathogenic microorganisms, chemical salts, organic matter etc.), industrial effluents (wastes from petrochemical complexes, fertilizer and other agrichemical industries, sugar textile, paper, leather and pharmaceutical industries etc.), agricultural chemicals (fertilizers, pesticides, etc.), farm wastes, etc. which need to be controlled through various methods of treatment.

WATER QUALITY : The extent of purity of water for drinking as well as for various other uses. As such, water quality standards would be different for different purposes.

WATER REQUIREMENT : The amount of water necessary for various domestic (drinking, bathing, washing etc), agricultural and industrial purposes. Water requirement for irrigation is very high and for one kg of rice 4400 kg of water would be necessary, the amount for 1 kg of cotton lint is 16000 kg; for one kg of paper produced in the factory the water requirement is 362 kg while for a kg of aluminium the requirement in 3624 kg; and an average automobile would require 362 tons of water for its production.

WATER TABLE : The level of first layer of water below the ground surface.

WEB : An intricate woven structure — a network; a chain or series of interconnected things; energy or food chain in an ecosystem; the term is also used for the membranous tissue that connects fingers or toes at their bases as in frog, duck etc.

WETLANDS : Wetlands form a natural ecosystem having the properties of both terrestrial and aquatic systems with the land remaining submerged at least during a part of the year. The soil is basically undrained giving rise to swamps, bogs and marshes. They also include estuaries and deltas, tidal mud flats and mangroves and even waterlogged paddy fields and shallow fisheries. Wetlands play important role in aquifer recharging, flood control and often serve as partly purified sewage reservoirs.

WWF [WORLDWIDE FUND FOR NATURE, WORLD WILD LIFE FUND] : An international conservation organization founded in 1961, known internationally as World Wide Fund for Nature devoted to all activities in the conservation of natural environment, protection of natural habitat and endangered species, preservation of biodiversity, imparting environmental education etc.

X

X-CHROMOSOME : A chromosome associated with sex determination, the female of most animals has two X-chromosomes besides the species-specific pairs of autosomes (nonsex chromosomes) while the male has a nonhomologous pair of sex chromosomes with only one X-chromosome and a Y-chromosome.

XEROPHYTE : Specialized group of plants morphologically and physiologically adapted to dry edaphoclimatic conditions in arid and semiarid desert regions capable of retaining mositure within the body and preventing water loss by transpiration, eg. cacti and succulents.

X-RAY [ROENTGEN RAYS] : X-rays are electromagnetic rays that may pass through tissues and leave images on photosensitive films (wave lengths lie in between ultraviolet and gamma rays, i.e. 6×10^{-3} to 5 nm).

Y

Y-CHROMOSOME : Sex chromosome in the male of most animals, the nonhomologous partner of the X-chromosome (thus the nonhomologous ones XY are the two sex chromosomes of the male besides the usual species-specific number of pairs of autosomes).

YEAST : A fungus of the genus ***Saccharomyces (S. cerevisiae,*** a very common species), unicellular and bud-forming but lacking mycelia (fine thread-like structures), widely used in the brewery and baking industries as source of enzymes that cause fermentation of sugar (anaerobic respiration with the production of alcohol and carbon dioxide).

Z

ZERO POPULATION GROWTH : A stabilization of population growth at the current level implying that the people are just replacing themselves and a balance between birth and death rates has been reached.

ZOOPLANKTON : Plankton (floating or weakly swimming minute organisms that serve as food for small fishes and other aquatic organisms) consisting of minute fauna (animals) only as different from phytoplankton consisting of minute flora (plants such as algae) only.